স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীমানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত

প্রাপ্তিস্থান :

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং

৫৪/৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশিকা :
শ্রীমতী বিজয়া দাশগুপ্ত, এম্. এস্-সি, বি. টি.
ব্লক এ, ফ্ল্যাট নং ২, গবর্ণমেণ্ট হাউসিং স্টেট,
এণ্ট্যাল্লি, কলিকাতা-১৪

প্রথম প্রকাশ : ২১শে পৌষ, ১৩৭০,
স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মতিথি

মূল্য—দশ টাকা

মুদ্রক :
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসুরেন্দ্র প্রেস,
১৮৬/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৪

ব্লক মুদ্রক :
শ্রীঅজিত গুপ্ত
ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিও

স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিক জন্মোৎসবে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

লেখকের নিবেদন

স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী পরিচ্ছন্ন ও ধারাবাহিকভাবে উপস্থিত করিবার উদ্দেশ্যে এই পুস্তকখানি রচিত। ইহার বর্ণিত বিষয় আমি যথাসাধ্য নির্ভুল ও চিত্তাকর্ষকভাবে উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। শুধু শেষের তিনটি অধ্যায় যেরূপ সমৃদ্ধ ও শ্রী-মণ্ডিত করিয়া আমার লেখার ইচ্ছা ছিল তাহা আমি পারি নাই। আমার চোখের অসুখ বৃদ্ধি পাওয়ায় আমি ঐ চেষ্টা হইতে বিরত হইতে বাধ্য হইয়াছি। তাহা হইলেও, আমি আশা ও বিশ্বাস করি, যাহারা স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী পরিচ্ছন্নভাবে জানিতে ও বুঝিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিবেন।

এই পুস্তকখানির রচনায় আমি নিম্ন-লিখিত পাঁচখানি গ্রন্থের নিকট বিশেষভাবে ঋণী :— (১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (স্বামী সারদানন্দ-রচিত); (২) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (শ্রীম-কথিত); (৩) The Life of Swami Vivekananda (মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম হইতে প্রকাশিত); (৪) The Complete Work of Swami Vivekananda (মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম হইতে প্রকাশিত); এবং (৫) Swami Vivekananda in America : New Discoveries (Marie Louise Burke প্রণীত)। ইহা ব্যতীত, ভগ্নী নিবেদিতা, (স্বামীজীর ভ্রাতৃদ্বয়) ৺মহেন্দ্রনাথ দত্ত ও ৺ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি ব্যক্তিগণ লিখিত এবং (উদ্বোধন পত্রিকা সহ) উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত নানা পুস্তক হইতে কিছু কিছু (এবং অধিকাংশ স্থলেই সামান্য সামান্য) সাহায্য লওয়া হইয়াছে। এবং সে সকল পুস্তকের নিকটও আমি আমার ঋণ স্বীকার করিতেছি।

পুস্তকখানি স্বামীজীর শতবার্ষিক জন্মোৎসবে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি। ইহার প্রণয়নে যাহারা আমাকে উৎসাহ দিয়াছেন ও নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন তাহারা সকলেই আমার নিকটতম আত্মীয়। তাহাদের সকলের জন্যই আমি শ্রীশ্রীমা, ঠাকুর ও স্বামীজীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।

মুদ্রণ ক্রটির জন্য এই পুস্তকের একটি আবশ্যকীয় ভ্রম-সংশোধন এই। ছাব্বিশ নং অধ্যায়ের heading'এ (পৃঃ নং ৩৮৪) "আমেরিকার পূর্বোপকূল" স্থলে "আমেরিকার পূর্বাঞ্চল" পাঠ করিতে হইবে।

কলিকাতা
২১শে পৌষ, ১৩৭০
৬ই জানুআরি, ১৯৬৪

শ্রীমানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত

সূচীপত্র

ভারতের আত্মা

ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার দেশ। এবং স্মরণাতীত কাল হইতে তাহার জীবন অধ্যাত্ম সত্য সন্ধানের এক অবিরাম প্রবাহ।

প্রারম্ভে—এই জীবনের উৎস-মুখে—হিমালয়ের ন্যায় দণ্ডায়মান একদল দৃঢ়, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘবপু বীরপুরুষের সুদীর্ঘ শ্রেণী। ইহারা বৈদিক যুগের চির-বরেণ্য আর্য ঋষিগণ। এই নির্ভিক, মেধাবী ও অক্লান্তকর্মা মহাপুরুষগণ শত শত ও সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ তাঁহাদের সমস্ত শক্তি ও সময় এক মহান উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করেন। অকুতোভয়ে তাঁহারা চান জীবন-রহস্যের চরম সমাধান এবং ইহজীবনেই চরম সত্যের সাক্ষাৎকার।

এবং তাঁহাদের এই নির্ভিক ও বিরামহীন সন্ধান ও অনুসন্ধান হইতে, তাঁহাদের তপস্যার যজ্ঞবেদীর চির-প্রজ্জ্বলিত হোমাগ্নি হইতে, তাঁহাদের সত্যোদ্ভাসিত হৃদয় ও ধ্যান-নিরত মানস-সরোবর হইতে—নির্গত হয় ভারতের শাশ্বতঃ আত্মা। অগণিত শতাব্দি ধরিয়া ইহা এক শৈল-শিখর হইতে অপর শৈল-শিখরে, এক জনপদ হইতে অপর জনপদে, এক পুরুষ হইতে অপর পুরুষে ব্যাপ্ত হইতে থাকে এবং যুগে যুগে প্রত্যেক স্থানে ও প্রত্যেক স্তরে শক্তি ও আয়তন সংগ্রহ করিয়া ক্রমে সমগ্র ভারতের বিশাল দেহে অধিষ্ঠিত হয়। এইভাবে স্থল, জল, নদী, পর্বত সম্বলিত প্রাণহীন প্রাকৃতিক ভারত ও তাহার দূর দূরান্তস্থিত বহু বিভিন্ন জাতি ও সমাজের জনগণ একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীবন-স্পন্দন প্রাপ্ত হয়। এবং তদবধি সেই স্পন্দনধারা অবিচ্ছিন্ন-ভাবে অগণিত যুগের অগণিত বৎসরের মধ্য দিয়া তাহার চির-লক্ষ্য সত্যসাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে।

ভারতের এই জীবন-ধারা এইভাবে ইতিপূর্বে বহুকাল ও বহু পথ অতিক্রম করিয়াছে। এখন ইহা অপ্রতিরোধ্য ও অনিবার্য। আজ ভারত বলিতে যে চঞ্চল ও তরঙ্গায়িত মানব-সমষ্টি বোঝা যায়, তাহা

সকল বাহ্য গোলযোগ, সাময়িক পরিবর্তন ও আপাত ব্যত্যয় সত্ত্বেও এই জীবন ধারাতেই বাস করে ও চলে। ভারতবর্ষে তাহার সর্বত্যাগী সাধু-মহাপুরুষগণের ন্যায় ক্ষমতা ও প্রভাব আর কাহারও নাই। জীবনের কোন ক্ষেত্রেই তাহার সাফল্য তাহার আধ্যাত্মিক অর্জনের ন্যায় এত সুষ্ঠু, সবতোমুখী ও পরিপূর্ণ নয় এবং ভারত তাহার আধ্যাত্মিক সম্পদ ও শক্তির দ্বারা যত বড় তত আর কিছুর দ্বারাই নয়। তাহার সুগভীর অতীতের সকল যুগেই যে সকল উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক তাহার জীবন-গগন আলোকিত করিয়াছেন, তাঁহারা তাহার অধ্যাত্ম রাজগণের একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা (রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি) ও তাহার নানা আয়তনের অগণিত সত্যদ্রষ্টা সাধু, সন্ন্যাসী ও মহাপুরুষগণ। তাহার সাগরসম বিশাল সাহিত্যের আলোচ্য বিষয় মাত্র একটি ; তাহার সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহের লক্ষ্য (সকল যুগের সকল পরিবর্তন ও সংশোধনের মধ্যেও) মাত্র একটি,—সত্যের উপলব্ধি বা সাক্ষাৎকার। এই চেতনা তাহার গিরি-গুহায় বিরাজিত, তাহার বাতাসে ভাসমান, তাহার জলসমূহে তরঙ্গায়িত। এবং উত্তর হইতে দক্ষিণে, পূর্ব হইতে পশ্চিমে, ভারতের প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণের এই মহাশক্তিময়ী দুহিতাই অবিরামভাবে প্রবাহমানা এবং যুগে যুগে সকল শক্তির উৎস সত্য-পারাবার হইতে নব-জীবন ও নব-শক্তি লাভ করিয়া আরও প্রবলতর হইয়া চিরকালই প্রবাহিতা রহিবেন।

এই অন্তর্নিবাসী দেবীই ভারতের আত্মা ও আমাদের ভারত-মাতা। ভারত-জীবনের বিশাল বৈচিত্র্যসমূহ ইহাতেই এক। ইহারই সত্যতার বাঁধনে ভারতবর্ষ একটি জাতি। এবং ভারতের কোনও কোনও মহাপুরুষ বলেন ইনিই হিমালয় কন্যা উমা, শিবের সহচরী ও বিশ্ব-জননী। ইহাঁর প্রত্যেক হৃদ্-স্পন্দনের সহিত শাশ্বতঃ ধ্বনি উঠে—

একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।

অর্থাৎ, সত্য এক, জ্ঞানীগণ তাহা বহুনামে ব্যক্ত করেন।

ওঁ তৎ সৎ ওঁ।



শিকাগো—সেপ্টেম্বর, ১৮[illegible]

[illegible] আশ্রমের সৌজন্যে

স্বামী বিবেকানন্দ

এক

পটভূমি

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন (১৮৬৩-১৯০২) যথোচিতভাবে বুঝিতে হইলে, ঐ জীবনের পটভূমির সঙ্গে কিছু পরিচয় থাকা একান্ত আবশ্যক। তাই, তাঁহার জীবন-কথা অবতারণার পূর্বে আমরা ঐ পটভূমির একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দিলাম।

পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭) জয়ী হইয়া ইংরেজ যখন ভারতবর্ষে তাহার আসন সুদৃঢ় করিয়া লইয়াছিল, তখন ভারতে এমন শক্তি ছিল না যে এই নবাগত দুর্ধর্ষ পাশ্চাত্য জাতির সর্বগ্রাসী লৌহকবল হইতে ভারতের স্বার্থ ও পরমার্থকে রক্ষা করে। জাদুকরের জাদু-বাজির ন্যায় ইহা যে কেবল অত্যল্প কালের মধ্যে একটির পর একটি করিয়া ভারতের সমস্ত দেশ-প্রদেশ ও তাহার সঞ্চিত ধন-রত্ন সমূহ গ্রাস করিয়াই নিরস্ত হইল তাহা নহে। ইহা তাহার আসন অটল করিবার নিমিত্ত ভারতের প্রাচীন ধর্ম, সংস্কৃতি ও সত্তাকেও নষ্ট করিতে প্রয়াসী হইল। ইহা ইতিহাসের কথা।[১]

১। ইহা লক্ষণীয় যে প্রথমোক্ত (অর্থাৎ রাজ্য ও ঐশ্বর্য অর্জনের) কাজটি সমাধা করে ভারতবর্ষে ব্যবসায়-রত ইংলণ্ডের এক বণিক-সঙ্ঘ—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি; পরে দ্বিতীয় কাজটির জন্য উদ্যোগী হন ইংরেজ মিশনারীগণ। রাজনীতিক কারণে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বা তৎপ্রতিষ্ঠিত ইংরেজ গবর্ণমেন্ট প্রত্যক্ষভাবে মিশনারীদের কাজে কোন অংশ গ্রহণ করেন না বটে, কিন্তু উহাতে তাহাদের সহানুভূতি ছিল।

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও গুরুতর সঙ্কট দেখা দিল ভারতের নিজের দিক দিয়া। ভারত সম্মোহিত হইল। এই উদীয়মান পাশ্চাত্য-শক্তির অব্যাহত বিজয়-গর্বের সম্মুখে সে তাহার ইহকাল-পরকাল বড়ই অকিঞ্চিৎকর দেখিল। ইহার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবার মত কোন সম্বলই তাহার জুটিল না। ফলে, ইহার সংস্পর্শ স্বতঃই ভারতের পক্ষে এক মহা ক্ষয়-ব্যাধির মত ক্রিয়া করিতে লাগিল।[১] মনে হইল এইবার বুঝি বা সে যায়। অতীতকে মুছিয়া ফেলিয়া, অতীতের ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে বিস্মৃতির অতল জলে ডুবাইয়া দিয়া, বুঝি বা ঐ পাশ্চাত্য জাতির আনুগত্য ও অনুকরণে একটা সম্পূর্ণরূপে নূতন জীবন তাহার গড়িয়া তুলিতে হয়। ভারতের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল।

ইংরেজ শক্তি ও সভ্যতার সংঘাত-ঘটিত এই অন্তর্বিপ্লবই ভারতের নব জাগরণের সূচনা। বৈদিক ঋষিদের তপস্যা-সম্ভূত তাহার অমর প্রাণ মরিতে চাহিল না—মরিতে সে পারে না।[২] তাই তাহার যুগযুগান্তের গর্ভ হইতে সাড়া আসিল। এবং সমগ্র ভারত ব্যাপিয়া এক বিপুল অভিনব প্রতিক্রিয়া দেখা দিল।

তাহার প্রথম সুমহৎ ফল মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)। এই অসীম ধীশক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষকে নবীন ভারতের প্রভাতী তারা বা কীর্তিমান আদিপুরুষ বলা যায়। ইহার পূর্ব পর্যন্ত আমরা কেবল অন্ধকারই দেখিতে পাই, কোন উল্লেখযোগ্য সাড়া-শব্দ নাই। রাজা রামমোহন রায় একাকী সর্বপ্রথম খৃষ্টান

১। এই কালের অনেক শিক্ষিত হিন্দু সত্যই মনে করিতে আরম্ভ করেন যে, ইংরেজের ন্যায় মদ-মাংস না খাইলে ও খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ না করিলে দেশের কোন উন্নতিই হইবে না। ইহার বিষময় ফল রামমোহনের সময়ের (ও তৎপরবর্তী কালের) ইয়ং বেঙ্গল দলের নাস্তিকতা ও সম্ভ্রান্ত ঘরের হিন্দু যুবকদের খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণের ইতিহাস লক্ষ্য করিলেই সুস্পষ্ট হইবে।

২। এই বিষয়ে এই পুস্তকের প্রারম্ভে সন্নিবেশিত "ভারতের আত্মা" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

মিশনারীদিগের আক্রমণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন এবং পরিশেষে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজই চূড়ান্তভাবে ঐ আক্রমণের গতি রোধ করে। এবং তাঁহারই সাগ্রহ চেষ্টার ফলে দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন ও তাঁহার ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারাদি নানা সদনুষ্ঠান ও সৎ-প্রচেষ্টা ভারতের সর্বতোমুখী নবোত্থানের সূত্রপাত করে।[১]

তাঁহার পরবর্তী কালে (১৮৩৩-১৮৯৩)[২] ঊষার কাকলি যেন সমস্বরে আপনি বাজিয়া উঠিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩), পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৩), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩), কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (পরে স্বামী কৃষ্ণানন্দ), পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি মনীষীগণ ভারতের নবোদ্বোধন কার্যে আত্ম-নিয়োগ করিলেন। ইঁহাদের অবিরাম চেষ্টা ও পরিশ্রমে ভারতের দিকে দিকে কত সুরই যে বাজিয়া উঠিল তাহা বলিয়া উঠা সুকঠিন। ধর্মে, সমাজে, সাহিত্যে, রাষ্ট্রে, সর্বত্রই একটা নবজাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল।

কিন্তু এই জাগরণের প্রথম সূচনা হইতেই সঙ্গে সঙ্গে দ্বন্দ্ব, সংশয় ও অনিশ্চয়তাও দেখা দিয়াছিল। দেখা যায়, হিন্দুদিগের রক্ষাকল্পে

১। রামমোহনের কার্যাবলী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "শিক্ষা বল, রাজনীতি বল, বঙ্গভাষা বল, সমাজ বল, ধর্ম বল, কেবলমাত্র হতভাগ্য স্বদেশের মুখ চাহিয়া তিনি কোন্ কাজে না রীতিমত হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন? সমাজের যে-কোন বিভাগে উত্তরোত্তর যতই উন্নতি হইতেছে সে কেবল তাঁহারই হস্তাক্ষর কালে নূতন নূতন পৃষ্ঠায় উত্তরোত্তর পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে মাত্র।"

২। আলোচনা সংক্ষিপ্ত করিবার জন্য, আমরা রামমোহনের তিরোধান-সময় (১৮৩৩) হইতে স্বামী বিবেকানন্দের অভ্যুদয়-কাল (১৮৯৩) পর্যন্ত এই ৬০ বৎসরের কথা একসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি।

রামমোহন[১] যে ধর্ম-সংস্কার প্রবর্তন করিলেন, তাহার বিরুদ্ধে একদিকে দাঁড়াইলেন বিরাট গোঁড়া সম্প্রদায়ের তৎকালীন নেতা স্বনামধন্য রাজা রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭)[২], অন্যদিকে তাহা অবাধে অগ্রাহ্য করিয়া চলিলেন (হিন্দু কলেজের[৩] তরুণ অধ্যাপক ডিরোজিও-সৃষ্ট) ইয়ং বেঙ্গলের দল। এই দলের সভ্যগণ ছিলেন নিছক যুক্তিবাদী। তাই, যুক্তি-সিদ্ধ ন্যায়, সত্য ও সততার সমর্থক হইয়াও, ইঁহারা সকল রকমের ধর্ম, গোঁড়ামী ও অন্ধ-বিশ্বাসের ঘোর বিরোধী ছিলেন।[৪] আবার, রামমোহনের মৃত্যুর পর তাঁহার নিজ অনুগামীদের সমাজ (ব্রাহ্ম-সমাজ) মত-পার্থক্যের জন্য প্রথমে দুইটি[৫] ও পরে তিনটি[৬] পৃথক দলে বিভক্ত হইয়া গেল। অপর

১। রামমোহন ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা হইলেও, তিনি কখনও হিন্দু-সমাজ পরিত্যাগ করেন নাই। ধর্ম-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি যে ব্রহ্মসভা স্থাপন করেন, তাহার সমর্থক ও অনুগামিগণই পরে ব্রাহ্ম আখ্যা লইয়া নিজেদের হিন্দু-সমাজ হইতে বেশীকম পৃথক করিয়া লন।

২। রাজা রাধাকান্ত দেব গোঁড়া বা নৈষ্ঠিক হিন্দু হিসাবে অনেক ক্ষেত্রে রামমোহনের ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের বিরোধিতা করায়, অনেক আধুনিক লেখক তাঁহার প্রতি সরাসরি অবিচার করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। কিন্তু বাস্তবিক ধর্ম ও সমাজ-হিতকর কাজে তাঁহার অবদানও অসামান্য ও স্মরণীয়।

৩। এই কলেজটি রামমোহন, রাজা রাধাকান্ত দেব ও আরও অনেকের সমর্থন ও সাহায্যে ডেভিড হেয়ার কর্তৃক ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা রাধাকান্ত দেব এই কলেজের পরিচালক-সমিতির সভ্য ছিলেন। কিন্তু হিন্দুদিগের আপত্তির জন্য রামমোহন উহাতে যোগ দেন নাই।

৪। এই দলে হিন্দু-কলেজের অনেক প্রতিভাবান ছাত্রও ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী জীবনে ইঁহারা সকলেই বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়া গোঁড়া খৃষ্টান হন।

৫। আদি সমাজ ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ।

৬। আদি সমাজ, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ ও নব-বিধান।

দিকে, রামমোহন ও তৎপরবর্তী যুগের (পাঞ্জাবের আর্য সমাজ-প্রতিষ্ঠাতা) দয়ানন্দ সরস্বতী উভয়েই মূর্তিপূজার বিরোধী ও নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনার সমর্থক হইয়াও, ধর্ম-সংস্কারের জন্য রামমোহন অনুসরণ করেন বেদের জ্ঞানকাণ্ড বা বেদান্ত, আর স্বামী দয়ানন্দ অবলম্বন করেন বেদের কর্মকাণ্ড।

এইরূপ, ধর্মের ন্যায় সমাজ-সংস্কারের ব্যাপারেও নানা রকমের মতভেদ দেখা দিয়াছিল। হিন্দু-সমাজের কল্যাণার্থে রামমোহন যে সকল সংস্কার প্রবর্তন করেন, তন্মধ্যে এক ইংরেজি শিক্ষা ও স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন ব্যতীত অপর সব কিছুরই ঘোর বিরোধী ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব ও তাঁহার অনুগামী গোঁড়া সম্প্রদায়, আর ডিরোজিও প্রভাবিত ইয়ং বেঙ্গলের দল ছিলেন ঐ সকলের প্রবল ও বেপরোয়া সমর্থক। এবং রামমোহনকেও চমকিত করিয়া এই শেষোক্ত দলের যুবকেরা 'সমাজের' বিধি-নিষেধ অমান্য করিবার উত্তেজনায় প্রকাশ্য রাস্তা, পার্ক ও মুসলমানের দোকানে মদ ও মাংস খাইয়া নিজেদের কুসংস্কার-মুক্তি, স্বাধীন চিন্তা, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সৎসাহসের পরিচয় দিতে লাগিলেন। এমনি করিয়া সকল দিক ও সকল ক্ষেত্রেই নব-জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিয়াছিল বহু মত, বহু পথ ও বহু আদর্শের দাবী, বিরোধ ও কলরব। কিন্তু এত সুরের ঐক্য কোথায়, এ জাগরণের অর্থ কি, লক্ষ্য কি,—লক্ষ্যে পৌঁছিবার নিশ্চিত পথ ও শক্তিই বা কি? ধর্মে ধর্মে বিভিন্নতা, মতে মতে পার্থক্য, পথে পথে বিরোধ। এই বিপ্লব ক্রমে ভাষাতেও দেখা দিল। এবং এমন ক্ষেত্র রহিল না যেখানে নানা প্রকারের সুর ও ধ্বনি উত্থিত না হইল।

তাই, এই সর্বতোমুখী জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে জাতির কল্যাণের জন্য প্রয়োজন হইল তাহার অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান, ভারতের নূতন-পুরাতন সকল মত, পথ ও ভাবধারার ঐক্য বা সমন্বয় সাধন। যে সকল মনীষীর প্রচেষ্টায় এই জাগরণ দেখা দিয়াছিল ও পরে ক্রমে তাহা সার্থক হইয়া উঠিতেছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে সে চেষ্টা না

করিলেন তাহা নয়।[১] কিন্তু শুধু বুদ্ধির সাহায্যে তাঁহারা যে সকল উপায় বা পথ নির্দেশ করিলেন, তাহা সবই তাঁহাদের নিজ নিজ ব্যক্তিগত সংস্কারানুযায়ী অনুমান ও পছন্দের দ্বারা সীমাবদ্ধ, সুতরাং সঙ্কীর্ণ, পক্ষপাতদুষ্ট ও অকৃত-নিশ্চিত। সত্যদ্রষ্টা ঋষির দেশ উহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। তাহার সীমাহীন বিশাল প্রাণের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি উহার কোনও পথেই হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই, সারা দেশে চলিতে লাগিল এক দুরপনেয় দ্বন্দ্ব, সংশয় ও সন্দেহের ব্যথা ও বিলাস।

এই গভীর দ্বন্দ্ব-সংশয়ের যুগেই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের (১৮৩৬-১৮৮৬) অভ্যুত্থান। অতি দরিদ্র ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম লইয়া, গ্রাম্য নিম্ন পাঠশালার যৎসামান্য শিক্ষামাত্র সম্বল করিয়া, ইনি কলিকাতায় আগমন করেন এবং দক্ষিণেশ্বরের কালী-বাড়ীতে মা-কালীর পূজারী নিযুক্ত হন। রাষ্ট্র, সমাজ বা সাহিত্যের সহিত ইঁহার কোন সংস্রব ছিল না। এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত ইনি সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত ছিলেন।

কিসের প্রেরণায় বলা সুকঠিন, এই নিঃসম্বল, অশিক্ষিত, মূর্তি-পূজক ব্রাহ্মণ যুবক ঐ কালীবাড়ীতে গভীর সাধনায় রত হইলেন। নিঃশব্দে, লোক-চক্ষুর অন্তরালে, অবিরামগতিতে সে সাধনা চলিতে লাগিল। সিদ্ধি-লাভেও উহার বিরাম হইল না। মতের পর মত, পথের পর পথ বাহিয়া তিনি প্রত্যেকটিরই শেষ দেখিতে লাগিলেন। শাক্ত, বৈষ্ণব, দ্বৈত, অদ্বৈত, হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান কোনও মতই বাদ গেল না। এমন কি, নারী-ভাব অবলম্বন করিয়াও এই বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষটি একটি সাধনা করিয়া লইলেন। এবং পরিশেষে সকল ধর্মের লক্ষ্য এক, সকল মতের উদ্দেশ্য এক, সকল পথের সমাপ্তি এক, এই বিষয়ে নিশ্চিত হইয়া তিনি অদ্বৈতজ্ঞানের চরম প্রশান্তিতে আপনার ঊনবিংশবর্ষীয়া স্ত্রীকে দেবীজ্ঞানে পূজা করিয়া তাঁহার সে দুশ্চর সাধনার

১। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রামমোহনের ধর্মপ্রচারে, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে ও কবি নবীনচন্দ্র সেনের কাব্যমালায় এই চেষ্টা খুবই সুপরিস্ফুট।

পরিসমাপ্তি করিলেন। সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ ধরিয়া এই সাধনা চলে (১৮৫৫-১৮৬৭)।[১] ইহার মধ্যে বিরাম ছিল না, বিশ্রাম ছিল না, ক্লান্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলা ছিল না। সাধনান্তে তাঁহার গৌরবর্ণ, সুঠাম, বলিষ্ঠ দেহের একটা ধ্বংসমাত্র অবশিষ্ট ছিল।

এই প্রাণান্তকর দুশ্চর বিরাট সাধনায় তিনি কেন নিযুক্ত হইয়াছিলেন, নিঃসহায় নিঃসঙ্গ দরিদ্র ব্রাহ্মণ যুবকের ঐ সর্বতোমুখী সাধনার কি প্রয়োজন ছিল এবং ঐ সাধনার ফল কি হইয়াছে, তাহা আমাদের বিশেষ অনুধাবনের বিষয়। দেখা যায়, দক্ষিণেশ্বরের নিরালা কালীবাড়ীর গোপনতা ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে প্রথম আবিষ্কার ও প্রচার করেন ব্রাহ্ম-সমাজের তৎকালীন নেতা বিশ্ব-বিশ্রুত ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেন (১৮৭৫)।[২] তাহার পর তাঁহার নিকট কলিকাতার আরও অনেক বিখ্যাত লোক যাতায়াত করিতে থাকেন। তাহাদের মধ্যে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই সকল বিখ্যাত লোকের প্রয়োজন যে তাঁহার খুব বেশী ছিল তাহা নয়। তিনি যাহাদের অপেক্ষায় ছিলেন তাহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর লোক। তাহারা ক্রমে আসেন এবং তাহাদের অধিকাংশই তখন

১। "উক্ত দ্বাদশ বৎসর ঠাকুরের সাধনকাল বলিয়া বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হইলেও, উহার পরে তীর্থদর্শনে গমন করিয়া ঐ সকল স্থলে এবং তথা হইতে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া তিনি কখন কখন কিছুকালের জন্য সাধনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন।" (লীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব)।

২। প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেবই প্রথম (দক্ষিণেশ্বর হইতে দুই মাইল দূরবর্তী) বেলঘরিয়ায় গিয়া কেশবচন্দ্রকে দর্শন করেন (১৮৭৫, মার্চ)। তাহা হইলেও, এই সাক্ষাৎ-ই কেশবচন্দ্রকে ঐ অজ্ঞাত অখ্যাত আশ্চর্য পুরুষটির সম্বন্ধে আরও সংবাদ লইতে উদ্বুদ্ধ করে। এবং তজ্জন্য তিনি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতে আরম্ভ করেন। এবং তাহার অল্প পরেই তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের বেদী হইতে ও নানা ইংরেজি-বাংলা খবরের কাগজের মাধ্যমে এই মহাপুরুষটি ও তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথা প্রচার করেন।

চৌদ্দ হইতে বিশ বৎসর বয়স্ক বালক মাত্র। তিনি তাহাদেরই সমাদরের সহিত বাছিয়া লইলেন। তাহাদের মধ্যে আবার তিনি যাহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও দলের নেতা বলিয়া নির্বাচন করিলেন, তিনি তখন ছিলেন একটি উনবিংশ বর্ষ বয়স্ক কলেজের ছাত্র, নাম নরেন্দ্র নাথ দত্ত। পরবর্তীকালে তিনিই স্বামী বিবেকানন্দ নামে জগদ্-বিখ্যাত হন।

নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে গিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন ১৮৮১ খৃস্টাব্দে। তারপর তিনি প্রায় পূর্ণ পাঁচ বৎসর কাল (১৮৮১-১৮৮৬) ধরিয়া তাঁহার নিকট যাতায়াত করেন। তাঁহাদের এই ঐতিহাসিক দেখা-সাক্ষাতের সময়টা ছিল ভারতের জাতীয় জীবনের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ যুগ-সন্ধি কাল। ঐ সময়ে (১৮৫৭ খৃস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার ফলে) ইংরেজি ভাষায় ও পাশ্চাত্য আদর্শে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা বাংলা দেশের প্রায় সর্বত্র চালু হইয়াছে ও দেশে তখন এই শিক্ষারই আদর, পসার ও প্রতিপত্তি, পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়া দেশীয় ধর্ম, আদর্শ ও সংস্কৃতির উপর এই শিক্ষাপুষ্ট প্রভাবশালী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আস্থা বহুল পরিমাণে শিথিল হইয়াছে, খৃস্টান মিশনারীদের ব্যাপক আক্রমণ তখনও চলিতেছে, আর তাহা রোধ করিয়া ব্রাহ্ম-সমাজ প্রচুর প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে এবং কলিকাতার কলেজ সমূহের বহু হিন্দু ছাত্র ঐ সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া উহার প্রার্থনা-সভায় নিয়মিতভাবে যোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

অন্যদিকে খৃস্টান, ব্রাহ্ম ও নাস্তিক ইয়ং বেঙ্গল দলের দ্বারা সমভাবে নিন্দিত ও আক্রমণগ্রস্ত বিরাট হিন্দু-সমাজও এখন আর অবশ বা নিশ্চেষ্ট নাই। রামমোহনের সময়ে এই সমাজ ছিল প্রগতিহীন ও পরিবর্তন-বিরোধী। এবং ইহার তৎকালীন নেতা রাজা রাধাকান্ত দেব শুভেচ্ছাপূর্ণ হইয়াও রামমোহনের নানা কল্যাণ কর সমাজ-সংস্কারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন ও নিজ গোঁড়া মতে বহু জনহিতকর কার্য করিয়াও সমাজের পক্ষে সাবেক ধরনের সঙ্কুচিত

অবস্থাই শ্রেষ্ঠতর মনে করিয়াছেন। কিন্তু এখন অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত। ভারতাত্মার যে প্রতিক্রিয়াতে রামমোহন রায় প্রভৃতি ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারকগণ দেখা দিয়াছিলেন, তাহারই প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্যভাবে আরম্ভ হইয়াছিল সমগ্র হিন্দু-সমাজের আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও আত্ম-প্রত্যয় স্থাপনের কাজ। এবং এই কাজে এখন লিপ্ত ছোট-বড় বহু কর্মী ও মনীষীগণ। দেখা যায়, এই কালেই হিন্দু-সমাজের পক্ষ হইতে একদিকে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ও শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন কলিকাতা ও কলিকাতার বাহিরে হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠা স্থাপনে প্রবল আন্দোলন তুলিয়া এক মহা হৈ চৈ লাগাইয়া দিয়াছেন। অপর দিকে, মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সুচিন্তিত প্রবন্ধমালা ও অতুলনীয় সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের অমর রচনাবলী হিন্দুদিগের মধ্যে এক নূতন আশা, বল, বিশ্বাস ও ভরসা সঞ্চার করিতেছিল।

এইভাবে রামমোহনের যুগে বাংলার ধর্ম ও সমাজ-জীবনে যে আলোড়ন উঠিয়াছিল তাহা এখন আরও ব্যাপক ও প্রবলতর ভাবে চলিতেছিল। তাই, তজ্জনিত দ্বন্দ্ব, সংশয় ও অনিশ্চয়তাও বাড়িয়া উঠিতেছিল। কিন্তু তাহা হইলেও এই কালের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। রামমোহনের যুগ ছিল একটা বাহ্যতঃ অবশ, নিঃস্ব ও আত্মবিশ্বাসহীন জাতির নব-জাগরণের আরম্ভ বা সূচনার যুগ। কিন্তু তারপর সময়ক্ষেপে দেশ এখন অনেক অগ্রসর হইয়াছে। বাংলার সকল ক্ষেত্রেই মহামনীষীগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের অবদানের দ্বারা দেশের শূন্য ভাণ্ডার নানা ঐশ্বর্য-সম্ভারে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম-প্রচারকগণ যখন দ্বন্দ্ব-কলহ লইয়া মত্ত, তখন অপূর্ব মনুষ্যত্ব ও মানবতার আদর্শ বুকে করিয়া উত্থিত হইয়াছেন এক মহামহিমাময় মহামানব—পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এই নির্ভীক, নিঃসঙ্গ ও অক্লান্ত কর্মী মহা-পুরুষটি ধর্মের ধার ধারিতেন না, কিন্তু তিনি আমাদের দেশ ও জাতিকে যাহা দিয়া গিয়াছেন তাহা শ্রেষ্ঠতম ধর্মের দুয়ারেও দুর্লভ—

তাঁহার মহান চরিত্র, অতুলনীয় হৃদয় ও সবল মনুষ্যত্বের আদর্শ এবং আরও অনেক কিছু। অন্যদিকে, তাঁহারই সমসময়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচনা করিয়াছেন বাংলার শ্রেষ্ঠতম মহাকাব্য, বঙ্কিমচন্দ্র গড়িয়াছেন মহাজীবনপ্রদ বাঙ্গালীর অমর গদ্য সাহিত্য, আর দেশ লাভ করিয়াছে এক নূতন ধরনের দেশ-প্রীতি ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বা স্বপ্ন। এই শেষোক্ত জিনিস দুইটির প্রধান উদ্‌যাপক ছিলেন ঋষিকল্প সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র, মহাকবি হেমচন্দ্র ও রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এইভাবে নানা মনীষীর নানা অবদানের ফলে দেশ এই কালে প্রায় সকল দিকেই উচ্চ ভাব-সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।[১]

অর্থাৎ, পূর্ব-কথিত সকল প্রকার দ্বন্দ্ব, সংশয় ও অনিশ্চয়তার মধ্যেও দেশ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে কোনও এক মহা অভ্যুদয়ের পথে। সে অভ্যুদয়ের পরিপূর্ণ রূপ কি হইবে তাহা অজানিত থাকিলেও, একটা অনুভূতি ঐ কালের দেশ নায়কগণের নিকট খুবই সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছিল : রাষ্ট্র হিসাবে ভারতবর্ষ একটি অখণ্ড দেশ এবং উহার ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রিক অভ্যুত্থান একটি সর্বভারতীয় ব্যাপার। এই চেতনা ভারতবাসীর পক্ষে ছিল একটা সম্পূর্ণ অভিনব জিনিস। কারণ দেখা যায়, অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতের আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক একত্ব অনুভূত ও

১। যদিও এই বর্ণনা বিশেষভাবে আলোচ্যকালের কলিকাতা ও বাংলা দেশেরই কথা, তাহা হইলেও ইহাই সমগ্র ভারতেরও নব-জাগরণের কাহিনী। কারণ, বাংলা দেশই সর্বপ্রথম ইংরেজের শিক্ষা-সভ্যতা বুকে ধারণ করে, তাহার আঘাতে অবশ হয় এবং পরিশেষে জাগ্রত হইয়া প্রতিঘাত সুরু করে ও সমগ্র ভারতের পক্ষ হইতে আত্মপ্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হয়। বস্তুতঃ রামমোহন হইতে বিবেকানন্দ পর্যন্ত বাংলার ইতিহাসই ভারতের নবোত্থানের ইতিহাস। এই কালে বাংলায় যাহা ঘটিয়াছে, অন্য সব প্রদেশে তদনুরূপ ঘটনা বেশীকম পরে ঘটিয়াছে। এবং অনেক স্থলেই বাঙ্গালী ও বাংলার সাহিত্য, ভাব ও প্রেরণাই উহাদের উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।

প্রচারিত হইয়া আসিলেও, উহার রাষ্ট্রীয় একত্ব ইংরেজ-পূর্ব কোন যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এবং তাহার আবশ্যকতাও রাষ্ট্রিক চেতনাহীন ভারতবাসীর প্রাণে কখন উদয় হয় নাই। তাই, অতীতের সকল যুগেই উহা ছোট-বড় বহু রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। কিন্তু আজ ইংরেজের কঠিন নাগপাশে শৃঙ্খলিত ভারত পরাধীন হইলেও, উহার রাষ্ট্রীয় একত্ব সুসাধিত হইয়াছে। এবং তৎসঙ্গে, ইংরেজ-প্রবর্তিত পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রেরণায়, উহার অধিবাসিগণের প্রাণে জাগিয়াছে ঐ বহু-বিলম্বিত একত্বের এক উদ্বেল অনুভূতি। তাহারা বুঝিতে শিখিয়াছে যে বিলম্বিত হইলেও এই একত্ব প্রকৃতি-নির্দিষ্ট, বিধাতার অভিপ্রেত ও অপরিহার্য। সাগর ও অত্যুচ্চ গিরি-পর্বত বেষ্টিত ভারতের ভৌগলিক সীমা পর্যবেক্ষণ করিলেই তাহা সুস্পষ্ট হয়। ভারত সকল দিক দিয়াই একটি অখণ্ড দেশ।

তাই, এই নব-জাগ্রত মহা একত্বের আদর্শ বুকে করিয়াই যে ভারত তাহার গরিমাময় ভবিষ্যতের পানে ছুটিয়াছে, তাহা, উপরি-বর্ণিত অবস্থায়, তাহার নেতৃবর্গ বেশ বুঝিতেন। এবং তাঁহাদের সমসাময়িক কালের দ্বন্দ্ব, সংশয় ও অনিশ্চয়তারাশিকে যে নিরসন করিতে করিতে তাঁহাদের পথ চলিতে হইবে তাহাও তাঁহারা জানিতেন।

কিন্তু সেই চলার পথেই যে লুক্কায়িত ছিল আরও কত শঙ্কাপূর্ণ প্রশ্ন, সুতীক্ষ্ণ ছুরিকার মত কত প্রাণঘাতী সমস্যা, কত রকমের কত দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায়, দেশ তখন তাহা কিছুই জানিতে পারে নাই। কারণ, সে সকল প্রশ্ন ও সমস্যা তখনও ছিল অস্ফুট—অনাগত—দৃষ্টির বাহিরে। কিন্তু আজ কিঞ্চিন্ন্যূন এক শতাব্দী পরে আমরা তাহা (দুরপনেয় বেদনার সহিত) খুব ভাল করিয়াই জানি। তখনকার দিনের এইরূপ একটি অনাগত প্রশ্ন ছিল : পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংঘাতে পুরাতন ভারতের বক্ষ হইতে যে নূতন ভারত উত্থিত হইতেছে,—উহার পরিণত রূপ কি হইবে? পুরাতন কি নূতনকে অস্বীকার করিবে, না নূতন পুরাতনকে মুছিয়া ফেলিবে,

অথবা উহারা এক অদৃষ্টপূর্ব মিলন গরিমায় এক হইয়া চলিবে? কে ইহার সঠিক জবাব দিবে? ঐ কালে এই ধরনের আর একটি অনুত্থিত সমস্যা ছিল—দেশের ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের স্রোত, নানা রকমের নানা আদর্শ ও ভাবের স্ফুরণ এবং বরেণ্য মহাপুরুষগণের আবির্ভাব ও অবদান—এ সবই কি শুধু শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়কে অবলম্বন করিয়াই চলিতেছে না? তাহাদের চিন্তা, চেষ্টা ও অবদান যে অভ্যুদয় আনয়ন করিবে, তাহাতে কি তখনও সুষুপ্ত বিরাট অশিক্ষিত ও অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়ের কোন্ অংশ থাকিবে? ভারতের চির-বঞ্চিত ও চির-শৃঙ্খলিত নারী-সমাজ কি উহার মাঝে তাহাদের স্বাধিকার লাভ করিবে? খৃষ্টান, মুসলমান, পার্শী প্রভৃতি অহিন্দু ভারতবাসীরা কি উহাতে সন্তুষ্ট থাকিবে, না তাহারা নিজ নিজ পৃথক সত্তানুযায়ী পৃথক পৃথক ভাবে আত্মবিকাশের আকাঙ্ক্ষী হইবে? তাই, ঐ সকল বিষয় সম্পর্কে আরও প্রশ্ন ছিল: বহু ধর্ম-সম্বলিত ভারতের প্রকৃত ঐক্য কোথায়? উহার অভ্যুদয় কোন্ উপায়ে সর্বজনহিতকর হইয়া উঠিবে? কোন্ দিব্যচক্ষু মহাজন ইহার জবাব দিতে সক্ষম?

আবার, ভারতের যাত্রাপথের এই প্রকারের অজ্ঞাত সমস্যাগুলি যে শুধু অন্তর্দেশীয় সমস্যাই ছিল তাহা নয়। উহাদের অনেকগুলি ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ সর্বজাগতিক সমস্যা। ঐ কালে ইংলণ্ডের রণতরী এবং যাত্রী ও পণ্যবাহী জাহাজ সকল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে আদান-প্রদানের পথ নির্বিঘ্ন ও সুগম করিয়া দিয়াছিল। ফলে, একদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা-সমূহ আপনা হইতেই সার্বজনীন আকার ধারণ করিয়া অন্য নানা দেশ-দেশান্তরে ফুটিয়া উঠিবার অবস্থা সৃষ্ট হইতেছিল। ইহা ব্যতীত, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও তৎ-সম্মত যুক্তি-বিচার পৃথিবীর সকল দেশের সকল ধর্মের ভিত্তিই খান খান করিয়া দিতেছিল। এবং বিজ্ঞানের উন্নতি ও প্রসার মানুষের ঐহিক সুখ-সমৃদ্ধিপ্রসূ হইলেও, উহা তাহার অজ্ঞাতে সমগ্র পৃথিবীকে এক ভয়াবহ ধ্বংসের পথে চালিত করিতেছিল।

তাহার পরিচয় আমরা পরবর্তী কালের মানুষেরা দুইটি বিগত মহাযুদ্ধ ও বর্তমানের জগৎ-বিধ্বংসী আনবিক সংগ্রামের শঙ্কা হইতে খুব ভাল করিয়াই পাইয়াছি। স্থলে, জলে ও আকাশে—ইহার কোথাও আর মানুষ নিঃশঙ্ক নয়। কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন অন্ততঃ ভারতবর্ষে এই সর্বজাগতিক সমস্যা সমূহ একেবারেই দৃষ্টির বাহিরে ছিল এবং উহা লইয়া মাথা ঘামাইবার কোন প্রয়োজনই দেশের তৎকালীন নেতৃবর্গ অনুভব করেন নাই।

তবে তাঁহারা না করিলেও, ইংরেজের সর্বনাশা আঘাত-বিক্ষুব্ধ ভারতের প্রাচীন অন্তরাত্মা অন্তর্দেশীয় সমস্যাগুলির ন্যায় উল্লিখিত সর্বজাগতিক সমস্যা সকলও সমাধানের একান্ত প্রয়োজন অনুভব করে। ভারতের কল্যাণের জন্যই তাহার ত্রিকালদর্শী দৃষ্টির সম্মুখে ফুটিয়া উঠে ভারত ও একীকৃত জগতের বহু শতাব্দীব্যাপী ভবিষ্যতের ছবি। এবং তাহা দেখিয়াই সে যে প্রতিক্রিয়া সুরু করে, তাহার মুখেই উৎক্ষিপ্ত হন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মহামানবগণ। কিন্তু শুধু তাহাতেই তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। তাই, পরিশেষে উত্থিত হন সকল দেশের সকল আগত ও অনাগত সমস্যার জগৎপ্লাবী নিরসন আলো-স্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ।

(এই পটভূমির উপর) অতীত ভারতের গর্ভ হইতে একই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত উত্থিত এই দুই মহান আত্মা মূলতঃ ছিলেন এক ও অবিচ্ছিন্ন। কিন্তু বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁহারা দুইজনে দুই বিপরীত দিক হইতে অগ্রসর হইয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি রামকৃষ্ণ নির্গত হন পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতার দ্বারা অস্পৃষ্ট প্রাচীন ভারতের খাঁটি গ্রাম্য সমাজ হইতে। আর নরেন্দ্রনাথ (পরে স্বামী বিবেকানন্দ) জন্ম গ্রহণ করেন পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রধান ও সর্বপ্রথম প্লাবনক্ষেত্র রাজধানী কলিকাতা শহরে। প্রাচীনপন্থী, স্বল্পে সন্তুষ্ট ও নামমাত্র শিক্ষিত রামকৃষ্ণের জীবনে কোন সমস্যা ছিল না। শুধু নিজ অন্তরের কোন অজ্ঞাত প্রেরণায় তিনি এক অদৃষ্টপূর্ব সত্যান্বেষীর (Explorer of Truth) ন্যায় সত্যসাগর মন্থন

করিতে আরম্ভ করেন। এবং তাঁহার সেই বিশ্ব-বিস্ময়কর প্রচেষ্টার দ্বারা তিনি যে অমৃত উত্তোলন করিয়াছেন তাহাই আজ শঙ্কা-সন্দেহ-বিক্ষুব্ধ ধ্বংসোন্মুখ জগতের একমাত্র ভরসা ও রক্ষার উপায়। অন্যদিকে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় উচ্চ-শিক্ষিত ও সর্বপ্রকারে আধুনিক নরেন্দ্রনাথের বিরাট মস্তিষ্ক ছিল দেশ-বিদেশের সকল সমস্যা ও সকল অসন্তোষের বিধি-নির্দিষ্ট ক্রীড়াস্থল। এবং অতি অল্প বয়স হইতেই তাঁহার মনে জগদ্‌বক্ষের এই সকল ব্যথা-বিষের প্রশ্ন ও তাহা নিরসনের চিন্তা উদয় হইতে সুরু করে। কারণ, বাহ্যতঃ ভিন্ন ধরনের হইলেও, রামকৃষ্ণের ন্যায় তিনিও ছিলেন জগতের হিতে আগত এবং অন্তরের অন্তরে চরমসত্য ও পরম শান্তির একান্ত আকাঙ্ক্ষী। এবং তাহারই অন্বেষণে তিনি যেদিন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া রামকৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন (১৮৮১), সেদিনের সে দৃশ্য স্মরণীয় :

পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর তীরে উথলিত স্নেহের চক্ষে দাঁড়াইয়া প্রাচীন ভারতের মূর্ত বিগ্রহ রামকৃষ্ণ, আর তাঁহারই দিকে উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে চাহিয়া উদীয়মান নবীন ভারতের প্রতীক জিজ্ঞাসু নরেন্দ্রনাথ। দুই মহাশক্তিসম্পন্ন পুরুষ মুখোমুখি—পরস্পরকে দেখিতেছেন। একজনের চোখে অভ্যর্থনা, সমাদর ও আনন্দের অশ্রুজল, অপরজনের দৃষ্টিতে সন্দেহ, সাবধানতা ও ব্যাকুল কৌতূহল। সেদিন তাঁহাদের চোখে চোখে কত তড়িৎ খেলিয়াছিল, প্রাণে প্রাণে কত দোল ও আন্দোলন উঠিয়াছিল, তাহা আমরা না জানিলেও অনুমান করিতে পারি।

ইহার পরের ইতিহাস আমরা এই পুস্তকের অভ্যন্তরেই পাইব। আমরা দেখিব পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত তরুণ তেজস্বী নরেন্দ্রনাথ কি ভাবে ধীরে ধীরে শিক্ষাহীন, প্রাচীনপন্থী রামকৃষ্ণের চরণে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেন ও তাঁহার বাণী বুকে ধারণ করিয়া এক মহা প্রেরণায় সমগ্র ভারতবর্ষ পরিক্রমা করেন। এবং তারপর হঠাৎ একদিন প্রচণ্ড বেগে (ঐহিক জ্ঞানৈশ্বর্যদৃপ্ত, মহাশক্তির আধার,

গরিমাময়) পাশ্চাত্য জগতের উপর ঝাঁপাইয়া পড়েন। ভারত ও ভারতের বাইরে তাহার ফল যাহা হইয়াছে ও হইবে, তাহা আমরা এই পুস্তকে বুঝিবার চেষ্টা করিব।

এবং আমরা দেখিতে পাইব, রামকৃষ্ণ আজ সকল দেশের সকল সমাজ ও মানুষের Common God বা Guide (সাধারণ ঈশ্বর বা চালক)। যুক্তির ভিত্তিতে বর্তমান জগতের কোন কল্যাণকামীরই সাধ্য নাই যে তাঁহাকে এই আসন দিতে অস্বীকার করেন। আর আমরা ইহাও দেখিব যে, তাঁহার বাণীর ধারক, বাহক, প্রচারক ও অতুলনীয় ব্যাখ্যাকার স্বামী বিবেকানন্দই হইতেছেন ভারত ও সর্ব-জগতের হিতে তাঁহার সর্বাপেক্ষা বড় অবদান। কারণ, স্বামী বিবেকানন্দ যে শুধু তাঁহার বাণী প্রচারই করিয়াছেন তাহা নয়। তিনি প্রকৃতপক্ষে ছিলেন তাঁহার ঐ বাণীরই মূর্ত বিগ্রহ। এবং সংক্ষেপতঃ ইহা বলা যায়—The message of Ramkrishna is Vivekananda (অর্থাৎ, বিবেকানন্দই হইতেছেন রামকৃষ্ণের বাণী) এবং তাঁহাকে বুঝিলেই রামকৃষ্ণের বাণী নির্ভুল, সুষ্ঠু ও সর্বোত্তমভাবে বোঝা হয়।

দুই

বংশ-পরিচয়

স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ব নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। কলিকাতা শহরের শিম্‌লা বা সিমুলিয়া পল্লীর প্রসিদ্ধ দত্ত পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। এই পরিবারটি পুরুষানুক্রমে সুশিক্ষিত, সঙ্গতিসম্পন্ন ও বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিল।[১]

তবে নরেন্দ্রনাথের প্রপিতামহ রামমোহন দত্তের[২] আমলে ইহার গৌরব সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। রামমোহন আইনজ্ঞ ছিলেন এবং সুপ্রিম কোর্টের একজন ইংরেজ এটর্নির ম্যানেজিং ক্লার্ক ও সহকর্মী হিসাবে কার্য করিতেন। ঐ কার্য করিয়া তিনি অতি অল্প বয়সে প্রভূত ধন-সম্পত্তি অর্জন করেন এবং তাঁহার (শিম্‌লা পল্লীর মধু রায় লেনস্থ) পৈতৃক বাড়ীর নিকটবর্তী গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীটে একটি সাবেক ধরনের প্রাসাদোপম বাড়ী নির্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। পূর্বে এই বাড়ীর প্রশস্ত প্রবেশ-দ্বার, সুবৃহৎ উঠান,

১। এই পরিবারটির আদি নিবাস ছিল বর্ধমান জিলার অন্তর্গত কালনা মহকুমার দেরেটোন (বা দেরিয়াটোনা) গ্রামে। এবং এই পরিবারের রামনিধি দত্ত সর্বপ্রথম গ্রামাঞ্চল ছাড়িয়া কলিকাতার গড় গোবিন্দপুরে বাস করিতে আরম্ভ করেন। পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ফোর্ট উইলিয়াম নির্মাণের জন্য গোবিন্দপুর গ্রহণ করিলে, রামনিধি ও তৎপুত্র রামজীবন শিমুলিয়ার মধু রায় লেনে একটি নূতন পাকা বাড়ী প্রস্তুত করিয়া সেখানে উঠিয়া আসেন। স্বামিজীর পিতা বিশ্বনাথ দত্তের বিবাহের পর এই বাড়ীটি শরিকগণ একযোগে বিক্রয় করিয়া ফেলেন। (Swami Vivekananda by Dr. Bhupendra Nath Dutta)।

২। ইনি উপরের ১নং পাদটীকায় উক্ত রামনিধি দত্তের প্রপৌত্র।

পূজা-দালান, গোশালা, অন্দর মহলের দ্বিতল বাসগৃহ ও স্ত্রীলোকদের স্নানের পুকুর ইত্যাদি অনেক কিছুই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। কিন্তু পরবর্তীকালে পরিবারটির দুরবস্থার সময়ে ইহার কতকাংশ বিক্রয় হইয়া যায়। এবং বক্রী অংশ অতি জীর্ণাবস্থায় আজিও বিদ্যমান আছে।

রামমোহন গৌরবর্ণ সুশ্রী পুরুষ ছিলেন। এবং তিনি বহু আত্মীয়-স্বজন সহ খুব জাঁকজমকের সহিত থাকিতেন। কিন্তু মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সে ওলাউঠা রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি দুর্গাপ্রসাদ[১] ও কালীপ্রসাদ নামে দুইটি নাবালক পুত্র, কয়েকটি কন্যা ও প্রচুর অর্থ রাখিয়া যান।

দুর্গাপ্রসাদ পিতার ন্যায় গৌরবর্ণ সুপুরুষ ছিলেন। এবং তাঁহারই ন্যায় তিনিও কোন এটর্নি অফিসে আইনজীবীর কার্য করিতেন। তিনি উত্তর কলিকাতা নিবাসী দেওয়ান রাজীবলোচন ঘোষের সুশিক্ষিতা ও পরমাসুন্দরী কন্যা শ্যামাসুন্দরীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। শ্যামাসুন্দরীর গর্ভে তাঁহার দুইটি সন্তান জন্মে। প্রথমটি কন্যা ও মাত্র সাত বৎসর বয়সে মারা যায়। দ্বিতীয়টি পুত্র, ১৮৩৫ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে। পুত্রটির নাম রাখা হয় বিশ্বনাথ। এই বিশ্বনাথই জগদ্‌বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দের পিতা।

বিশ্বনাথের জন্মের অল্প পরেই এবং মাত্র ২৫ বৎসর বয়সে দুর্গাপ্রসাদ সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম অবলম্বন করেন। তৎপর তাঁহার বা তাঁহার স্ত্রী শ্যামাসুন্দরীর যে সংবাদ পাওয়া যায়, তাহা খুবই কম। এবং নিম্নে তাহাই সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইল।

১। লীলাপ্রসঙ্গ এবং মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম হইতে প্রকাশিত 'Life of Swami Vivekananda' পুস্তকে ইহার নাম 'দুর্গাচরণ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু স্বামীজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার 'Swami Vivekananda' পুস্তকে লিখিয়াছেন, তাঁহাদের ১৮৮৩-৮৪ সনের বণ্টন মোকর্দমার আরজিতে ইহার নাম 'দুর্গাপ্রসাদ' বলিয়া লেখা দেখা যায়। সুতরাং আমরা এই পুস্তকে তাহাই সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

বিশ্বনাথের যখন তিন বৎসর বয়স, তখন শ্যামাসুন্দরী তাহাকে লইয়া তীর্থ করিতে নৌকায় কাশী যাত্রা করেন। পথে শিশু বিশ্বনাথ একদিন সকালবেলা নৌকা হইতে জলে পড়িয়া যায় এবং শ্যামাসুন্দরী পুত্রকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া তাহাকে সবলে ধরিয়া ফেলেন। কিন্তু সাঁতার না জানায়, তিনি ঐ অবস্থায় পুত্র সহ ডুবিতে থাকেন। ইহা দেখিয়া কবিরাজ উমাপদ গুপ্ত নামে একজন সঙ্গের যাত্রী নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাঁহাদের উভয়কে টানিয়া তুলেন।

এই ঘটনার পর ৺কাশীধামে পৌঁছিয়া শ্যামাসুন্দরী সেখানকার দেবমন্দির সকল দর্শন করিতে রত হন। একদিন গঙ্গাস্নান করিয়া তিনি যখন বিশ্বনাথের মন্দিরে যাইতেছিলেন তখন একটু একটু বৃষ্টি হইতেছিল। মন্দিরের সন্নিকটে গিয়া তিনি জল-সিক্ত পিচ্ছিল পথের উপর পা পিছলাইয়া পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া পড়েন। তখন একটি পথচারী সাধু তাঁহাকে ধরিয়া তুলিয়া মন্দিরের সোপানের উপর রাখেন। ক্ষণকাল পরে শ্যামাসুন্দরী যখন চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন তখন বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন, একটি সাধু তাঁহার দিকে নত হইয়া চাহিয়া আছেন এবং তিনি তাঁহারই স্বামী। তখন সাধুটিও তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। এবং "মায়া, মায়া" বলিতে বলিতে নিমেষেই দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেলেন।

দুর্গাপ্রসাদ সম্বন্ধে আরও জানা যায় যে, সন্ন্যাসীদের নিয়মানুসারে সন্ন্যাস গ্রহণের দ্বাদশ বৎসর পরে (সম্ভবতঃ ৩৬/৩৭ বৎসর বয়সে) তিনি তাঁহার জন্মস্থান দর্শনের নিমিত্ত একবার কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার এক বন্ধুর গৃহে উঠেন। তখন বন্ধুটি (তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও) এ বিষয় গোপনে তাঁহার আত্মীয়গণকে সংবাদ দেন এবং তাহারা আসিয়া তাঁহাকে জোর করিয়া বাড়ীতে লইয়া যান ও একটি ঘরে তালাবন্ধ করিয়া রাখেন। দুর্গাপ্রসাদ কোন কথা না বলিয়া তিন দিন নীরবে ঐ ঘরে রহিলেন বটে, কিন্তু ঐ তিন দিন তিনি কোন খাদ্য স্পর্শ করিলেন না। ইহাতে তাঁহার আত্মীয়গণ শঙ্কিত হইয়া ঘরের তালা খুলিয়া দিলেন। তখন সুযোগমত তিনি ঐ স্থান ত্যাগ

করিয়া চিরকালের তরে অদৃশ্য হইলেন। এবং তারপর তাঁহার আর কোন সংবাদই পাওয়া যায় না।

জানা যায়, দুর্গাপ্রসাদ গৃহত্যাগ করার পর শ্যামাসুন্দরীর পারিবারিক জীবন খুব সুখের হয় নাই। ঐ কালে কালীপ্রসাদ সংসারের কর্তা হইয়া পরিবারের বহু সহস্র টাকা নষ্ট করেন এবং কোন মোকর্দমা চালাইবার জন্য শ্যামাসুন্দরীর মূল্যবান অলঙ্কারগুলি ধার লইয়া বন্ধক রাখেন। পরে শ্যামাসুন্দরী ঐ অলঙ্কারগুলি ফেরত চাহিয়াও আর ফেরত পান না। ইহা ব্যতীত, কালীপ্রসাদের কোন উপার্জন না থাকিলেও তিনি সংসারের ব্যয় কিছুমাত্র কমান নাই। ফলে, যৌথ পরিবারের সঞ্চিত অর্থ দ্রুত নিঃশেষ হইয়া যায় এবং পরিবারটি তখন শুধু তাহার কয়েকটি স্থাবর সম্পত্তির সঙ্কীর্ণ আয়ের উপর নির্ভরশীল হইয়া কোন মতে চলিতে থাকে। এই সকল কারণে কালীপ্রসাদের কর্তৃত্বকালে শ্যামাসুন্দরী পুত্র বিশ্বনাথকে লইয়া নানা দুশ্চিন্তা ও কষ্ট-অসুবিধার মধ্যে কাল কাটাইয়াছেন। স্বামী সন্ন্যাসী হইবার ১০/১১ বৎসর পরে তিনি ওলাউঠা রোগে প্রাণত্যাগ করেন।

মাতার মৃত্যুর পর স্নেহহীন খুড়া-খুড়ীর আশ্রয়ে বিশ্বনাথ এক দারুণ অযত্ন ও অবহেলার মধ্যে পড়িলেন। তাহা হইলেও, তিনি ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ও প্রতিভাশালী। তিনি শিক্ষার জন্য প্রতিদিন নগ্নপদে হাঁটিয়া শিমুলিয়া হইতে আহেরিটোলায় গিয়া স্কুল করিতেন। এবং তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, তিনি এক ইংরেজ এটর্নির অফিসে শিক্ষানবীশ (articled clerk) হইয়া সেখান হইতে এটর্নিশিপ পরীক্ষায় পাশ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্নি হন (১৮৬৬)।

এটর্নির ব্যবসায়ে বিশ্বনাথ খুবই কৃতকার্য হইয়াছিলেন। এবং ইহা হইতে তিনি প্রচুর অর্থ রোজগার করিতেন। কিন্তু আত্মীয়-স্বজন সহ সুবৃহৎ যৌথ পরিবার প্রতিপালনের ভার তাঁহার উপর থাকায়, তিনি প্রথম জীবনে টাকা জমাইবার কোন সুযোগ পান নাই। এবং পরেও তাঁহার হাতে টাকা কখন জমিতে পারে নাই। তাহার

প্রধান কারণ, তিনি ছিলেন অমিতব্যয়ী এবং ছোট-বড় সকল কাজেই অত্যধিক ব্যয় করিতেন।

ইহা ভিন্ন, আত্মীয়-বন্ধুদের সম্পর্কে তাঁহার ঔদার্যের যেন কোন সীমা ছিল না। বন্ধুদিগকে তিনি প্রায়ই নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন এবং তাহাদের বিপদে-আপদে সাহায্য করিতেন। জানা যায়, তাঁহার কোন কোন দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইয়া আলস্যে কাল কাটাইত ও তাঁহারই অর্থে নেশা-ভাঙ্গ খাইয়া জীবনের অবসাদ দূর করিত। নরেন্দ্রনাথ বড় হইয়া এই সব অযোগ্য লোককে দান করার জন্য পিতাকে অনুযোগ দিলে তিনি বলেন, "মানুষের জীবনে যে কত দুঃখ তা তুই এখন কি বুঝবি ? যখন বুঝতে পারবি তখন ঐ দুঃখ হতে ক্ষণিক মুক্তির জন্যে যারা নেশা-ভাঙ্গ করে তাদেরও তুই দয়ার চক্ষে দেখতে পারবি।"

এই অপূর্ব ঔদার্য ব্যতীত, বিশ্বনাথের আরও নানা গুণ ছিল। শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়া তিনি খুবই উন্নত ছিলেন। তিনি ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দি, ফারসী, উর্দু ও আরবী—এই সাতটি ভাষা জানিতেন। ধর্ম ও সামাজিক বিষয়ে তিনি উদার মত পোষণ করিতেন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত বিধবা-বিবাহের সমর্থক ছিলেন, বাইবেল ও দেওয়ান-ই-হাফেজ গ্রন্থ শ্রদ্ধার সহিত পড়িতেন ও নরেন্দ্রনাথকেও পড়িতে উপদেশ দিতেন এবং মোগল পদ্ধতিতে পোলাও-মাংস রান্না করাইয়া বন্ধু-বান্ধবদিগকে খাওয়াইতে ভালবাসিতেন। আবার নানা বিষয়ে তিনি (তখনকার আরও অনেকের ন্যায়) ইউরোপীয় রীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেন। বস্তুতঃ তিনি হিন্দু, মুসলমান ও খৃস্টান, এই তিনটি সংস্কৃতির উপরই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এবং স্বভাবতঃ তাঁহার মধ্যে ঐ সকলের একটা অস্পষ্ট সমন্বয়ের ভাব খেলা করিত।

এই সকল ব্যতীত, সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যার উপর বিশ্বনাথের খুবই অনুরাগ ছিল। তিনি নিজে সুকণ্ঠ ছিলেন ও ভাল গান গাহিতে পারিতেন। এবং জানা যায়, প্রতি শনি-রবিবারে তিনি তাঁহার

বাড়ীতে গানের আসর বসাইতেন এবং সমাগত ব্যক্তিগণকে প্রত্যেক দিনই পোলাও-মাংস করিয়া খাওয়াইতেন।

বাহ্যিক আচরণে বিশ্বনাথ ধীর, গম্ভীর ও কিছু রহস্য-প্রিয় ছিলেন। পুত্রকন্যাদের কেহ অন্যায় করিলে তিনি তাহাকে তিরস্কার না করিয়া তাহার অপরাধের বিষয় তাহার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে এমন ভাবে প্রচার করাইয়া দিতেন, যাহাতে সে লজ্জা পাইয়া নিজেই নিজেকে সংশোধন করিয়া লইত। একবার নরেন্দ্রনাথ কোন কারণে তাঁহার মাকে কটু কথা বলিলে, বিশ্বনাথ তাঁহার ঘরের দরজার উপর একখণ্ড কয়লা দিয়া লিখিয়া রাখেন—"নরেনবাবু তাঁহার মাকে আজ এই এই কথা বলিয়াছেন।" নরেন্দ্রনাথের বন্ধুগণ ঐ ঘরে প্রবেশ করিতে গেলেই উহা দেখিতে পাইতেন। ইহার ফলে তিনি তাঁহার অপরাধের জন্য বহু দিন পর্যন্ত বিশেষ লজ্জিত ও দুঃখিত বোধ করিয়াছেন।

নরেন্দ্রনাথের মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী সুন্দরী, বুদ্ধিমতী ও অত্যন্ত কর্মঠ ছিলেন। তিনি স্বভাবতঃ কথা কম বলিতেন এবং তাঁহার সকল কর্ম ও চলাফেরার মধ্যে ফুটিয়া উঠিত ধৈর্য, তেজ ও আভিজাত্যের একটা রাজকীয় গরিমা। জানা যায়, সংসারের খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি নানা কার্যের গুরুভার তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল এবং তিনি তাহা সবই অতি সুচারুভাবে সম্পাদন করিতেন।

অন্যদিকে, তিনি ছিলেন অত্যন্ত সদাচারী, নিষ্ঠাবতী ও ধর্ম-পরায়ণা। তিনি প্রতিদিন স্বহস্তে শিবপূজা ও নিয়মিত জপ-ধ্যানাদি করিতেন এবং তৎসঙ্গে প্রায়ই উপবাসাদি নানা কৃচ্ছ্র-সাধনেও রত হইতেন। এইরূপ কঠোর ধর্মাচরণ ও সংসারের বিপুল কর্মরাশি সম্পাদন করিয়াও, তিনি প্রতিদিন সেলাই, বয়ন ও রামায়ণ-মহাভারতাদি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিবার সময় করিয়া লইতেন।

বিশ্বনাথের ন্যায় ভুবনেশ্বরী দেবীও সঙ্গীত-প্রিয় ও সুকণ্ঠ ছিলেন। এবং মাত্র একবার শুনিয়াই তিনি একটি গান সুর-তাল-লয়ের সহিত

আয়ত্ত করিতে পারিতেন। এই প্রখর স্মৃতিশক্তির জন্য তাঁহার নিত্যপাঠ্য বাংলা রামায়ণ-মহাভারত তাঁহার একরূপ কণ্ঠস্থ ছিল। এবং তিনি ঐ মহাগ্রন্থদ্বয়ের কাহিনী সকল তাঁহার পুত্রকন্যাগণের নিকট বর্ণনা করিয়া বাল্যকালেই তাহাদিগকে উহার শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন।

এইরূপ বহুগুণান্বিত অসাধারণ পিতা-মাতা হইতে জন্ম-লাভ করিয়া নরেন্দ্রনাথ তাঁহার বিধিনির্দিষ্ট বিপুল কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

তিন

জন্ম

(১৮৬৩)

মাত্র ষোল বৎসর বয়সে বিশ্বনাথের (১৮৩৫-১৮৮৪) বিবাহ হয়।[১] তখন তাঁহার পত্নী ভুবনেশ্বরী দেবীর (১৮৪১-১৯১১) বয়স মাত্র দশ বৎসর। ভুবনেশ্বরী দেবী অতি অল্প বয়সে সন্তানের জননী হন। এবং তাঁহার প্রথম দুইটি সন্তান (প্রথমটি পুত্র ও দ্বিতীয়টি কন্যা) শৈশবকালেই মারা যায়। তারপর তাঁহার পর পর আরও তিনটি কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তখন বিধি-প্রেরণায় তাঁহার অন্তরে একটি পুত্র-সন্তান লাভের এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। এবং তাহা সফল করিবার মানসে তিনি নীরবে ও সকলের অলক্ষ্যে মনঃপ্রাণ ঢালিয়া এক কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। প্রতিদিন শিব-পূজা করিবার সময়ে তিনি তাঁহার এই প্রিয় দেবতার নিকট অন্তরের ঐ বাসনাটি পূর্ণ করিবার জন্য আকুল-ভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এবং তৎসঙ্গে ঐ একই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার নিত্যনৈমিত্তিক জপ, ধ্যান, উপবাস ও অন্য নানা কৃচ্ছ্র-সাধন অতিমাত্রায় বাড়াইয়া দিলেন। কিন্তু শুধু এই সকলেও তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তাই, তিনি দত্ত-পরিবারের একজন কাশীবাসিনী বৃদ্ধা মহিলাকে এক পত্রদ্বারা অনুরোধ করিলেন যে, তিনি যেন তাঁহার হইয়া তাঁহার পুত্র-কামনা সিদ্ধির জন্য কাশীর বীরেশ্বর শিবের চরণে প্রত্যহ পূজা, ভোগ ও প্রার্থনাদি নিবেদন করেন। তদনুসারে কার্য হইতেছে সংবাদ আসিলে, ভুবনেশ্বরী দেবী অন্তরের আকাঙ্ক্ষা পূরণ

১। বিশ্বনাথ শিমুলিয়ার বিখ্যাত বসু পরিবারের নন্দলাল বসুর একমাত্র সন্তান ভুবনেশ্বরী দেবীকে বিবাহ করেন।

বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া ঐ জন্য (পূর্বের ন্যায় তপঃপরায়ণ থাকিয়া) ধৈর্যের সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এইভাবে কিছুকাল গত হইলে, তিনি এক শুভ নিশীথে একটি অপূর্ব স্বপ্ন দেখিলেন। সেদিন প্রভাত হইতে সমস্ত দিনটি তিনি তাঁহার পূজাঘরে ধ্যান, জপ ও পূজা-প্রার্থনায় কাটাইয়াছেন। ক্রমে সন্ধ্যা আসিয়া রাত্রি গভীর হইলে, তিনি ক্লান্তিবশতঃ ঘুমাইয়া পড়িলেন। তখন চারিদিক নিস্তব্ধ এবং বাড়ীর সকলে সুসুপ্ত। গভীর রাত্রের ঐ সুগভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, 'তুষার-ধবল জ্যোতির্ময় শিব তাঁহার সম্মুখে এবং তিনি তাঁহার মহাধ্যান হইতে ব্যুত্থিত হইয়া একটি ক্ষুদ্র পুরুষ-শিশুর আকার ধারণ করিলেন।' একটা আনন্দ-শিহরণের সহিত ভুবনেশ্বরী দেবীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। বুঝিলেন তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন। কিন্তু স্বপ্ন হইলেও, উহা কি শুধুই স্বপ্ন? উহাতে সত্য কিছুই নাই? শিব—শিব—দেবাদিদেব বীরেশ্বর শিব তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছেন স্বপ্নটি কি তাহারই একটা ঘোষণা নয়! অন্তরের এই উত্থিত প্রত্যয় ভুবনেশ্বরী দেবীর দেহ-মন প্লাবিত করিল। এবং তাহার আবেগ-আনন্দে তিনি কাম্যফলদাতা সর্বলোকেশ্বর শিবের চরণে বারবার প্রণাম করিতে লাগিলেন।

তাঁহার বিশ্বাস সত্যে পরিণত হইল। যথাসময়ে তিনি একটি দিব্যকান্তি পুত্র-সন্তান প্রসব করিলেন। সন্তানটির জন্মের তারিখ—১৮৬৩ খৃস্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী, সোমবার; সময়—প্রত্যুষ, সূর্যোদয়ের ছয় মিনিট পূর্ব। সেদিন কৃষ্ণা-সপ্তমী তিথি, পৌষ-সংক্রান্তি ও পৌষ-পার্বণোপলক্ষে বাংলার ঘরে ঘরে উৎসব।

ক্রমে নবাগত শিশুটির নামকরণের দিন আগত হইল। সুদর্শন ছেলেটি দেখিতে তাঁহার পিতামহ দুর্গাপ্রসাদের ন্যায় হওয়ায়, পরিবারের কেহ কেহ তাঁহার নাম 'দুর্গাদাস' রাখিতে বলিলেন। কিন্তু ভুবনেশ্বরী দেবী উহাকে বীরেশ্বর শিবের প্রসাদে লাভ করিয়াছেন এই বিশ্বাসে উহার নাম 'বীরেশ্বর' রাখিলেন। তদনুসারে

বাড়ীর সকলে ঐ নাম সংক্ষেপ করিয়া উহাকে 'বিলে' বলিয়া ডাকিতেন। ইহার অল্প পরে ছেলেটির আর একটি পোশাকী বা রাশ্যাশ্রিত নাম রাখা হইল—'নরেন্দ্রনাথ'। এবং একটু বড় হইতেই তিনি এই নামেই সর্বত্র পরিচিত হইলেন।[১]

১। নরেন্দ্রনাথের জন্মের পরে তাঁহার ক্রমান্বয়ে আরও তিনটি বোন ও দুইটি ভাই জন্মগ্রহণ করে। ইহাদের সকল ভাই-বোনের নামের জন্য এই পুস্তকের শেষে প্রদত্ত বংশতালিকা দ্রষ্টব্য।

চার

শৈশব-কথা

(১৮৬৩-১৮৬৯)

প্রচুর আশা-আনন্দের মধ্যে শিশু নরেন্দ্রনাথ মায়ের কোল আলো করিয়া বাড়িয়া উঠিতে লাগিলেন। স্বাস্থ্যবান, গৌরবর্ণ ও সর্বাঙ্গ-সুন্দর পুত্রটির দিকে চাহিয়া মাতা ভুবনেশ্বরী দেবীর মনে আনন্দ আর ধরিত না। সে যে তাঁহার কি সাধনার ধন, কত আরাধনার ফল, তাহা আর কেহ না জানিলেও তিনি জানিতেন। ভাবিতে তাঁহার বুক ভরিয়া উঠিত, চোখে জল দেখা দিত। কিন্তু তিনি তখনও বুঝিতে পারেন নাই, তিনি কি চাহিয়াছিলেন, আর কি পাইয়াছেন। তাঁহারই কোলের এই অসহায় ক্ষুদ্র শিশুটির ভিতর যে লুক্কায়িত রহিয়াছে বিশ্ব-সন্ত্রাসী অমিত তেজ, সে যে একদিন একাকী সমগ্র মানব-জাতির কল্যাণে জগদ্বক্ষে এক মহা তোলপাড় সৃষ্টি করিবে, তন্দ্রাচ্ছন্ন জন্মভূমি ভারতবর্ষকে দুই অতিবল হস্তে ঝাঁকিয়া জাগ্রত করিয়া তুলিবে—ইহা তাঁহার স্নেহ-মমতাপূর্ণ কোমল মাতৃ-মনের ধারণারও অতীত বস্তু ছিল।

তাই, তিনি সত্বরই এক অতি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই শক্তিমান শিশুটি যারপরনাই দুষ্ট ও দুরন্ত হইয়া উঠিলেন। সময়ে সময়ে তাঁহার অশান্তপনার কোন অবধি থাকিত না। এবং কোন বিষয়ে গোঁ ধরিলে তাঁহাকে আর তাহা হইতে কোন মতেই টলান সম্ভব হইত না। তখন ভয় বা লোভ-প্রদর্শন, মিষ্ট বা শাসন-বাক্য প্রয়োগ, সবই সমান নিষ্ফল হইত। নানা উপায় পরীক্ষা করিয়া ভুবনেশ্বরী দেবী পরিশেষে দেখিলেন, শিবনাম উচ্চারণ করিতে করিতে শিশুটির মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দিলে, অথবা "দুষ্টুমি করলে শিব তোমাকে কৈলাসে যেতে দেবেন

না” বলিয়া ভয় দেখাইলে সে নিমেষেই শান্ত হয়। তাই, এইরূপ সব ঘটনার পরে তিনি কৃত্রিম ক্ষোভের সহিত বলিতেন, “আমি শিবের কাছে একটি পুত্র চেয়েছিলাম, তিনি আমাকে তাঁর একটা ভূত পাঠিয়ে দিয়েছেন।”

ভূতই বটে! কোন কিছু করিবার না থাকিলে শক্তি-চঞ্চল শিশুটি ভূতের মতই অস্থির ও উপদ্রবশীল হইয়া উঠিতেন। এবং তখন সময়ে সময়ে তিনি অপরকে নানাভাবে বিরক্ত করিয়া বিশেষ আমোদ অনুভব করিতেন। জানা যায়, নরেন্দ্রনাথের দুষ্টামিতে তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী-দ্বয় (হরমণি ও স্বর্ণময়ী) অতিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে মারিবার জন্য ধাওয়া করিলে, তিনি ছুটিয়া গিয়া নোংরা জল-কাদাপূর্ণ নর্দমায় দাঁড়াইয়া হাসিতে থাকিতেন এবং তাঁহাদের দিকে চাহিয়া মুখ ভেঙচাইয়া বলিতেন, “এসো, আমায় ধর এসে।” বুদ্ধিমান শিশুটি জানিতেন ঐ অশুচিপূর্ণ স্থানে তাহারা কখনও তাঁহাকে ধরিতে আসিবে না।

তবে শৈশবে ও পরে কৈশোরেও এইরূপ চঞ্চল ও দুরন্ত হইলেও, নরেন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠার বহু সদ্‌গুণও তাঁহার মধ্যে ঐ দুই কালেই ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করে। আমরা তাহা নিম্নে ও পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনাবলী হইতে সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারি।

জানা যায়, শৈশবকালে নরেন্দ্রনাথকে যে-কেহ কোলে লইতে চাহিতেন, তিনি বিনা-দ্বিধায় তাহারই কোলে যাইতেন। একটি ময়ূর, একটি ছাগল, কয়েকটি গিনিপিগ ও কতকগুলি পায়রা তিনি বিশেষ প্রীতির সহিত পুষিতেন। বাড়ীর গরুটি ছিল তাঁহার প্রিয় খেলাসাথী। আর চাকরদের মধ্যে তাঁহার পিতার ঘোড়ার গাড়ীর বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী কোচোয়ান ছিল তাঁহার বিশেষ বন্ধু।[১]

ভিক্ষুক বা ভিক্ষাপ্রার্থী সাধু-সন্ন্যাসীগণ বাড়ীর দুয়ারে আসিলে তিনি তাঁহাদের মুক্তহস্তে ভিক্ষা দিতেন। একদিন আর কিছু না

১। কোচোয়ানের পাগড়ী, পোশাক ও চাবুকহস্তে গাড়ী চালাইবার মনুষ্যত্বব্যঞ্জক ভঙ্গী ইত্যাদি শিশু নরেন্দ্রনাথকে বিশেষ আকৃষ্ট করিত। এবং “বড় হইয়া কোচোয়ান হইব”—ইহা তাঁহার একটি অতি প্রিয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল।

পাইয়া, তিনি তাঁহার কোমরে জড়ান নূতন পরিধেয় বস্ত্রখানি একটি সাধুকে দিয়া দেন। এই জন্য অপর একদিন একটি সাধু দ্বারে আসিলে, তাঁহাকে একটি ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। কিন্তু সেদিন তিনি ঐ ঘরের ভিতর হাতের কাছে যাহা পাইয়াছিলেন তাহাই জানালার ভিতর দিয়া ঐ সাধুটির দিকে ছুড়িয়া দিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন।

অতি শিশুকাল হইতেই নরেন্দ্রনাথ তাঁহার মাতার নিকট রামায়ণ-মহাভারতের উপাখ্যান শ্রবণ করিতেন। সম্ভবতঃ তাহারই ফলে, তিনি রাম ও সীতার প্রতি বিশেষ ভক্তিযুক্ত হইয়া উঠেন এবং সীতা-রামের একখানি মাটির যুগল-মূর্তি কিনিয়া তাহার পূজা করিতে আরম্ভ করেন। জানা যায়, এই সময়ে একদিন তিনি ও হরি নামে একটি সমবয়সী ব্রাহ্মণ বালক ভিতর বাটীর দোতলার ছাদে উঠিয়া, সেখানকার ছোট ঘরটিতে ঐ মূর্তিটিকে স্থাপন করেন ও তৎপর ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া উহার সম্মুখে ধ্যান করিতে বসেন। এদিকে বাড়ির লোকজন নরেন্দ্রনাথকে অনেকক্ষণ যাবৎ না দেখিয়া, ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে দোতলার ছাদের উপরের ঐ ঘরটির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন। এবং উহার দরজা অর্গল-বদ্ধ দেখিয়া তাহা বলপূর্বক খুলিয়া ফেলেন। তখন তাঁহারা দেখিতে পান যে, ফুল-সজ্জিত সীতারামের মূর্তির সম্মুখে বসিয়া শিশু দুইটি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন।

এই ঘটনার কিছুপরে নরেন্দ্রনাথ একদিন কাহাকেও বলিতে শুনিলেন যে বিবাহ বড় খারাপ জিনিস। ইহাতে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া ভাবিতে থাকেন যে, 'বিবাহ যদি এরূপ খারাপ হয়, তবে ভগবান উহাতে লিপ্ত হইবেন কেন?' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি সীতারামের মূর্তিখানি ফেলিয়া দিয়া একখানি শিবের মূর্তি কিনিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করেন।

তবে এইরূপ করিলেও, রামায়ণের কাহিনীর উপর তাঁহার একটা প্রবল আকর্ষণ থাকিয়াই যায়। এবং নিকটবর্তী কোনও স্থানে

রামায়ণ পাঠ বা উহার কথকতা হইলে, তিনি সেখানে গিয়া একমনে তাহা শুনিতেন। একদিন একটি কথকতার সময়ে তিনি কথককে বলিতে শুনেন যে হনুমান কলাবাগানে থাকেন। ইহাতে তিনি সেদিন রাত্রিকালে কথকতার শেষে সোজা বাড়ী না ফিরিয়া, হনুমান দর্শনের জন্য এক কলাবাগানে গিয়া বহুক্ষণ যাবৎ অপেক্ষা করেন।

শৈশবের স্বভাবানুসারে নরেন্দ্রনাথ এইকালে তাঁহার সমবয়সী সঙ্গীদের লইয়া নানারকমের খেলায় নিযুক্ত হইতেন। আবার, ঐ সকল খেলার অনেকগুলির আবিষ্কর্তা ছিলেন তিনি নিজেই। তাঁহার উদ্ভাবিত একটি খেলা ছিল ধ্যানের খেলা। ইহা তিনি কখনও একাকী, কখনও বা তাঁহার সঙ্গীদের লইয়া খেলিতেন। একদিন তিনি তাঁহার সঙ্গীগণসহ যখন এই খেলাটি খেলিতেছিলেন, তখন একটি কেউটে সাপ সেখানে আসিয়া পড়ে। চক্ষু মেলিয়া দেখিতেই সঙ্গীগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া "সাপ, সাপ" বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিল। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ তখন ধ্যানে এমন সমাহিত ছিলেন যে, তিনি উহার কিছুই টের পাইলেন না। সাপটিও সেখানে কিছুক্ষণ থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। পরে নরেন্দ্রনাথের পিতা-মাতা তাঁহার ঐ সময়ে না পলাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, "আমি সাপের কথা কিছুই জানতে পারি নি, আমি তখন খুব আনন্দে ছিলাম।"

নরেন্দ্রনাথের আর একটি বিশেষ প্রিয় খেলা ছিল 'রাজা ও রাজসভা'। তিনি নিজে রাজা সাজিয়া তাঁহাদের চণ্ডীমণ্ডপে উঠিবার সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপে বসিতেন। তারপর তিনি তাঁহার প্রধান মন্ত্রী, সেনাপতি, অধীনস্থ রাজগণ ও অন্যান্য রাজকর্মচারী প্রভৃতি নিযুক্ত করিয়া তাহাদের পদানুসারে সিঁড়ির অপর ধাপগুলির উপর বসিতে দিতেন। এবং পরিশেষে তিনি দরবার অনুষ্ঠান ও বিচারাদি রাজকার্য সকল রাজোচিত গাম্ভীর্যের সহিত সুসম্পন্ন করিতেন। এবং তখন কেহ কোনরূপ অসঙ্গত আচরণ করিলে, তিনি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির দ্বারা তাহাকে নিরস্ত করিতেন।

অন্যদিকে, শৈশবের এই ক্রীড়া-প্রিয়তার সঙ্গেই, নরেন্দ্রনাথের তত্ত্বান্বেষী মনের স্বাভাবিক বিচারশীলতাও বেশ সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করে। ইহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত এই। নরেন্দ্রনাথের পিতার নানা জাতির মক্কেল তাঁহার বৈঠকখানায় আসিতেন। তাই, প্রত্যেক জাতির জন্য সেখানে একটি করিয়া পৃথক রূপা-বাঁধানো হুঁকা থাকিত, মুসলমানদের জন্যও একটি থাকিত। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ কিছুতেই বুঝিতে পারিতেন না যে এইরূপ জাতি-বিচারের প্রয়োজন কি। এবং ইহা না মানিলে কি অনিষ্টপাত হয় তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি একদিন সকলের অলক্ষ্যে ঐ হুঁকাগুলির প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া টান দিলেন, এমন কি মুসলমানদের হুঁকাটিও বাদ দিলেন না। কিন্তু দেখিলেন, কোন অনিষ্টই ঘটিল না। পরে এই কার্যের জন্য তাঁহাকে তিরস্কার করা হইলে তিনি বলেন, "দেখছিলাম জাত না মানলে কি হয়। দেখলাম কিছুই হয় না।"

শৈশবকাল হইতেই নরেন্দ্রনাথের একটি অত্যাশ্চর্য বিশেষত্ব প্রকাশ পাইত তাঁহার নিদ্রার প্রাক্কালে। নিদ্রার জন্য চক্ষু বুজিলেই তাঁহার ভ্রূ-যুগলের মধ্যে একটি অপূর্ব জ্যোতির্বিন্দু দেখা দিত ও তিনি একমনে উহার নানারূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করিতেন। উহা দেখিবার সুবিধার জন্য তিনি শয্যার উপরে উপুড় হইয়া শুইতেন। ঐ অদ্ভুত বিন্দুটি নানা রঙে পরিবর্তিত ও ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া একটি পিণ্ডের আকারে পরিণত হইত এবং পরিশেষে ফাটিয়া গিয়া তাঁহার সর্বশরীর এক অতি শুভ্র তরল জ্যোতিরাশিতে আবৃত করিয়া ফেলিত। এবং ঐরূপ হইবামাত্র তিনি চেতনালুপ্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িতেন। এই ঘটনা প্রতিরাত্রেই ঘটিত বলিয়া নরেন্দ্রনাথের ধারণা হইয়াছিল যে ইহা সকলের ক্ষেত্রেই ঘটে। তাই, তিনি এ বিষয় কাহাকেও কিছু বলা আবশ্যক মনে করেন নাই। তৎপর বড় হইয়া তিনি যখন ধ্যানাভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন চক্ষু বুঁজিলেই ঐ জ্যোতির্বিন্দু তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইত এবং তিনি উহাতেই চিত্ত একাগ্র করিতেন। পরে (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশে) তিনি যখন

কয়েকজন সমবয়সী বন্ধুর সহিত একত্রে ধ্যান করিতেন, তখন তাহাদের সহিত ধ্যানকালের দর্শনাদি বিষয়ের আলোচনা হইতে তিনি প্রথম বুঝিতে পারেন যে ঐরূপ জ্যোতিদর্শন তাহাদের কখনও হয় নাই এবং তাহাদের কেহ তাঁহার ন্যায় পূর্বোক্তভাবে নিদ্রাও যায় না। ইহার অনেক পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন (১৮৮২, প্রথম ভাগ) নরেন্দ্রনাথকে এ বিষয়ে আপনা হইতেই প্রশ্ন করেন ও বলেন, "যারা ধ্যানসিদ্ধ তারাই ঐরূপ জ্যোতি দেখতে পায়।"

এই ধ্যানসিদ্ধ আশ্চর্য শিশুটির আর একটি এই প্রকারের অলৌকিক বিশেষত্বের কথা জানা যায়। এবং তাহা পরবর্তীকালে তিনি নিজেই তাঁহার গুরুভাইদের নিকট এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন :

"ছেলেবেলা থেকেই সময়ে সময়ে কোন ব্যক্তি, বস্তু বা স্থান দেখে মনে হত, ও সব আমি পূর্বে কোথাও দেখেছি।[১] কিন্তু তা চেষ্টা করেও কিছুতে স্মরণে আনতে পারতাম না। কোন স্থানে বন্ধুদের সঙ্গে হয়তো কোন বিষয় আলোচনা করছি, তখন তাদের একজন হঠাৎ এমন একটা কথা বলেছে যা শুনেই আমার মনে হয়েছে—তাই তো, এই ঘরে এই সব লোকের সঙ্গে এ বিষয় যে আমি পূর্বেই আলোচনা করেছি এবং তখনও যে এই লোকটি এই কথাই বলেছিল! কিন্তু অনেক ভেবে-চিন্তেও এর কোন কারণ স্থির করতে পারিনি। পরে যখন পুনর্জন্মবাদের সঙ্গে পরিচিত হলাম, তখন ভেবেছি বোধ হয় ঐ সব ঘটনা আমার পূর্বের কোন জন্মে ঘটেছে এবং তারই আংশিক স্মৃতি কখন কখন আমার মনে উদয় হয়। কিন্তু আরও পরে বুঝেছি, এই সব ব্যাপারের ঐরূপ মীমাংসা যুক্তিযুক্ত নয়। এখন মনে হয়, এই জন্মে আমার যে সকল লোক বা বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে, তা জন্মাবার পূর্বে চিত্র-পরম্পরায় আমি কোনরূপে দেখতে

১। এ বিষয়ের একটি দৃষ্টান্ত এই। নরেন্দ্রনাথ একদিন বলেন, "আমহার্স্ট স্ট্রীটে যখন শরতের বাড়ীতে গেলাম, শরতকে একান্তে বললাম, এ বাড়ী যেন আমার সব জানা! বাড়ীর ভিতরের পথগুলি, ঘরগুলি, যেন অনেক দিনের চেনা চেনা।"

পেয়েছিলাম এবং জন্মাবার পরে তারই স্মৃতি সময়ে সময়ে আমার মনে উদয় হয়ে থাকে।"

নরেন্দ্রনাথের শৈশবকালের আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই। তিনি একদিন তাঁহার খেলা-সাথীদের সঙ্গে ছুটাছুটি করিতে করিতে বাড়ীর পূজা দালানের বারান্দা হইতে উঠানে পড়িয়া যান ও একখানি পাথরের গায়ে আঘাত লাগিয়া তাঁহার মাথায় (ঠিক ডান চোখের উপরে) একটি ক্ষত হয়। বহু বৎসর পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার কপালের ঐ ক্ষতের দাগ দেখিয়া তাঁহাকে উহার হেতু জিজ্ঞাসা করেন ও বলেন, "ঐ আঘাতের ফলে নরেনের শক্তি সঙ্কুচিত হয় এবং তা না হলে সে (তাঁর শক্তি প্রভাবে) জগৎ ধ্বংস করে ফেলত।"

পাঁচ

কৈশোর-জীবন

(১৮৬৯-১৮৭৯)

(শিক্ষা ও নানা কাহিনী)

নরেন্দ্রনাথের প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হয় তাঁহার মায়ের কাছে। বাংলা বর্ণপরিচয় ও প্যারীচরণ সরকারের ইংরেজি ফার্ষ্ট বুক অব রিডিং তাঁহার মা'ই তাঁহাকে পড়ান।

তারপর, ছয় বৎসর বয়সে তাঁহাকে একটি পাঠশালায় ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু মাত্র কয়েকদিন পরেই দেখা যায় যে, শিশুটি ঐ স্বল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার পাঠশালার নানা শ্রেণীর সঙ্গীগণের নিকট হইতে কতকগুলি সুরুচিবিরুদ্ধ শব্দ শিখিয়া ফেলিয়াছে। ইহাতে শঙ্কিত হইয়া তাঁহার অভিভাবকগণ তাঁহার ঐ পাঠশালায় যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। এবং একটি গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া তাহার দ্বারা নিজেদের পূজা-দালানেই একটি ক্ষুদ্র পাঠশালা স্থাপন করিলেন। সেখানে নরেন্দ্রনাথ ও কয়েকটি প্রতিবেশী ছেলে শিক্ষালাভ করিত। কিন্তু একত্র পড়িলেও, নরেন্দ্রনাথ তাঁহার অসাধারণ মেধা ও স্মৃতি-শক্তির[১] বলে অপর সকলকে বহু পিছনে ফেলিয়া অতি দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিলেন। ইহা ছাড়া জানা যায়, তিনি সাত বৎসর বয়সে প্রায় সমগ্র (সংস্কৃত) মুগ্ধবোধ ব্যাকরণখানি আবৃত্তি করিতে পারিতেন।[২] আর (ঐ কালেই) রামায়ণের পালা গানগুলিও তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। এবং একবার তাঁহাদের বাড়ীতে রামায়ণ গানের

১। জানা যায়, প্রতিদিন পাঠ দিবার সময় শিক্ষক পাঠের যে আবৃত্তি করিতেন, তাহা শুনিয়াই নরেন্দ্রনাথের ঐ পাঠ প্রস্তুত হইয়া যাইত। তজ্জন্য উহা আর তাঁহাকে পড়িতে হইত না।

২। এক বৃদ্ধ আত্মীয় প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে নরেন্দ্রনাথকে কোলে বসাইয়া মুখে মুখে পিতৃপুরুষের নামাবলী, নানা দেবদেবীর স্তোত্র ও মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সূত্রগুলি শিখাইতেন।

সময়, তিনি গায়কদের কতিপয় ভুল সংশোধন করিয়া দিয়া বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন।

যাহা হউক, সাত বৎসর বয়সে নরেন্দ্রনাথ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (মাধ্যমিক বিদ্যালয়) মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউসনের দশম শ্রেণীতে ভর্তি হন। সেখানেও অনতিকাল মধ্যেই তাঁহার প্রখর মেধা ও স্মৃতিশক্তি শিক্ষক ও ছাত্রগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি এইকালে এত চঞ্চল ছিলেন যে, ক্লাসে তিনি কখন একস্থানে স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে পারিতেন না। এবং পাঠের সময়েও তিনি প্রায়ই তাঁহার সহপাঠীগণের নিকট নানারকমের গল্প বলিতে রত হইতেন।

একদিন এইভাবে ক্লাশের মধ্যে গল্প করিতে থাকায়, শিক্ষক তাঁহাকে ও তাঁহার গল্পের সঙ্গীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমি এই মাত্র যা বলেছি, তা বল।" সকলেই চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ তাঁহার মনকে একই সময়ে একাধিক বিষয়ে নিযুক্ত রাখিতে পারিতেন। তাই, তিনি গল্প বলিবার সময়েও শিক্ষকের কথাগুলি শুনিতে পারিয়াছিলেন। এবং তজ্জন্য তিনি তাহার সকল প্রশ্নেরই নির্ভুল উত্তর দিতে সক্ষম হইলেন। তখন শিক্ষক অপর সকলের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের মধ্যে কে কথা বল্‌ছিল ?" সকলেই নরেন্দ্রনাথকে দেখাইয়া দিল। কিন্তু শিক্ষক ইহা বিশ্বাস করিতে না পারিয়া, তাহাদিগকে (কথা বলার শাস্তি-স্বরূপ) দাঁড়াইয়া থাকিতে আদেশ দিলেন। ইহাতে অপর সকলের সহিত নরেন্দ্রনাথও উঠিয়া দাঁড়াইলে, শিক্ষক তাঁহাকে বলিলেন, "তোমাকে দাঁড়াতে হবে না।" তদুত্তরে নরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "কথা আমিই বলেছি, সুতরাং আমি দাঁড়াব।"

নরেন্দ্রনাথের স্কুল-জীবনের এই সময়কার আর একটি কাহিনী এইরূপ। একদিন একটি ক্রোধপরায়ণ শিক্ষক একটি ছাত্রকে নির্দয় ভাবে প্রহার করিতেছিলেন। তাহার এই হাস্যকর উন্মত্ততা দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ হাসি সংবরণ করিতে পারিলেন না। ইহাতে শিক্ষকটি

তাঁহার দিকে ফিরিয়া তাঁহাকেও ঐ ভাবে মারিতে আরম্ভ করিলেন ও তৎসঙ্গে বলিতে লাগিলেন, "বল্, আর কখন আপনার দিকে চেয়ে হাসব না।" কিন্তু নরেন্দ্রনাথ তাহা বলিতে অস্বীকার করায় শিক্ষক তাঁহাকে আরও খানিকক্ষণ মারিয়া, দুই হাতে সজোরে তাঁহার দুই কান মলিতে আরম্ভ করিলেন। এবং তারপর তাঁহার ঐ কান দুইটি ধরিয়া তাঁহাকে উঁচু করিয়া একটি বেঞ্চের উপর দাঁড় করাইয়া দিলেন। ইহাতে নরেন্দ্রনাথের একটি কান ছিঁড়িয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি শিক্ষককে পূর্বের ন্যায় কোন প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার করিয়া ক্রোধের ভরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমার কান মলবেন না। আপনি আমাকে মারার কে? আপনি আর কখন আমার গায়ে হাত দেবেন না।" সৌভাগ্যবশতঃ ঠিক এই সময়েই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও সর্বোচ্চ কর্তা মহামতি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ ঘরে প্রবেশ করিলেন। নরেন্দ্রনাথ কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে সমস্ত কথা জানাইলেন এবং পরিশেষে তাঁহার বইগুলি হাতে লইয়া বলিলেন, "আমি এখনই এ স্কুল ছেড়ে যাচ্ছি।" সব শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে তাঁহার অফিসঘরে লইয়া অনেক সান্ত্বনা দিলেন ও পরে ঐরূপ ঘটনা যাহাতে আর না ঘটে তাহারও ব্যবস্থা করিলেন। ইহার পর জননীর আদেশ সত্ত্বেও নরেন্দ্রনাথ ঐ স্কুল আর পরিত্যাগ করেন নাই।

শৈশবের ন্যায়, কৈশোরেও নরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্রীড়াসক্ত ছিলেন। স্কুলে টিফিনের ঘণ্টা পড়িতেই তিনি ছুটিয়া সর্বাগ্রে খেলার মাঠে উপস্থিত হইতেন। আবার সুযোগ পাইলে তিনি তাঁহার ক্লাস ঘরকেই একটা খেলার জায়গায় পরিণত করিয়া লইতেন। এইকালে তিনি সাধারণতঃ যে সকল খেলা খেলিতেন তাহা ছিল—মারবেল খেলা, দৌড়ানো, লাফানো, ঝাঁপানো, ঘুষাঘুষি ইত্যাদি। কিন্তু কোন নূতন খেলা পাইলে তিনি তাহাতেই অধিকতর মত্ত হইয়া উঠিতেন। এবং ঐ কারণেই দেখা যাইত, তিনি তাঁহার খেলাঘরে সময়ে সময়ে নব-প্রচলিত সোডা-লেমনেড ও খেলিবার রেলগাড়ী

ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে রত হইয়াছেন। ইহা ছাড়া, তিনি নিজেও মাঝে মাঝে নানা নূতন খেলা উদ্ভাবন করিয়া সঙ্গীদিগের আনন্দ বর্ধন করিতেন। আবার, আমোদের জন্য তিনি কখন কখন তাহাদের দুই দলের মধ্যে ঝগড়া বাধাইয়া দিতেন। কিন্তু তাহার ফলে যদি মারামারি আরম্ভ হইত, তাহা হইলে তিনি নিজে আহত হইবার ঝুঁকি লইয়াও দুই দলের মাঝখানে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাদের থামাইয়া দিতেন। বস্তুতঃ এই খেলাধূলার মাঝে ও সর্বত্রই তিনি ছিলেন তাঁহার সঙ্গীদিগের অবিসংবাদিত নেতা। এবং তাহাদের মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহারা তাঁহাকেই মধ্যস্থ মানিয়া লইত।

লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, নরেন্দ্রনাথের ক্রীড়া-মত্ততার পশ্চাতে তাঁহার চরিত্রের একটা খুব বড় সত্য নিহিত ছিল। অলসতা বা নিশ্চেষ্টতা তাঁহার ধাত-বিরুদ্ধ ছিল। তিনি সর্বদাই একটা না একটা খেলা, কাজ, প্রচেষ্টা, আমোদ-প্রমোদ বা অন্য কিছু লইয়া ব্যস্ত থাকিতে ভালবাসিতেন। জানা যায়, কৈশোর কালেই তিনি একটি সখের থিয়েটারের দল গঠন করিয়া তাঁহাদের পূজা-দালানে নাটক অভিনয় করিতেন। কিন্তু কয়েকটি অভিনয়ের পরেই তাঁহার এক কাকা বিরক্ত হইয়া তাঁহার স্টেজটি ভাঙ্গিয়া দেন। তখন তিনি তাঁহাদের বাহিরের প্রাঙ্গনে একটি ব্যায়ামাগার স্থাপন করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁহার এক খুড়তুতো ভাই ব্যায়াম করিতে গিয়া হাত ভাঙ্গিয়া ফেলিলে, তাঁহার ঐ কাকা তাঁহার ব্যায়ামাগারের যন্ত্রপাতিগুলিও বিনষ্ট করেন। নরেন্দ্রনাথ তখন প্রতিবেশী নবগোপাল মিত্রের আখড়ায় গিয়া সঙ্গীগণ সহ জিমন্যাষ্টিক, কুস্তি, মুগুর ভাঁজা, লাঠিখেলা, অসিখেলা, নৌকাচালন, সন্তরণ ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন এবং জানা যায়, একবার এক ব্যায়াম প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন।[১]

১। পূজনীয় শরৎমহারাজ লিখিয়াছেন, নরেন্দ্রনাথের শৈশবকালেই তাঁহার পিতা তাঁহাকে একটি ঘোড়া কিনিয়া দিয়াছিলেন। ফলে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি অশ্বচালনায় বেশ সুদক্ষ হইয়া উঠেন।

আবার এই কালে এই কর্মের প্রেরণাতেই তাঁহার মনে রান্না শিখিবার ঝোঁক আসে। এবং তজ্জন্য তিনি তাঁহার সঙ্গীদের নিকট হইতে কিছু চাঁদা তুলিয়া ও নিজেই অধিকাংশ ব্যয়ভার বহন করিয়া তাঁহার এই প্রচেষ্টা সফল করেন। ইহা ছাড়া জানা যায়, তিনি তাঁহার নিজ বাটীতে কখন কখন ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবি দেখাইতেও প্রবৃত্ত হইতেন।

অন্যদিকে, তিনি সুযোগ পাইলেই সাথীদের লইয়া মিউজিয়াম, চিড়িয়াখানা, অক্টারলোনি মনুমেণ্ট প্রভৃতি নানা দর্শনীয় স্থানে যাইতেন। ইহার একটি কাহিনী এই। মাত্র সাত-আট বৎসর বয়সের সময় তিনি একদিন কয়েকটি সঙ্গীসহ নৌকাযোগে মেটিয়াবুরুজে (লক্ষ্মৌ-এর ভূতপূর্ব নবাব ওয়াজেদ আলি সাহেবের) চিড়িয়াখানা দেখিতে গিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় তাহাদের একজন অসুস্থ হইয়া নৌকার মধ্যে বমি করিয়া দেয়। ইহাতে মাঝিরা খুব বিরক্ত হয় এবং ঘাটে নৌকা লাগিলে ছেলেদিগকে বলিল যে নৌকা পরিষ্কার করিয়া না দিলে তাহাদিগকে নামিতে দিবে না। ছেলেরা ঐ কার্য করিতে অস্বীকার করিয়া উহা অপরের দ্বারা করাইবার ব্যয় দিতে চাহিল। কিন্তু মাঝিরা তাহাতে সম্মত না হইয়া তাহাদিগকে গালি দিতে ও শাসাইতে আরম্ভ করিল। অবস্থা দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ নৌকা হইতে তীরে লাফাইয়া পড়িলেন এবং দ্রুত অগ্রসর হইয়া দুইজন পথচারী ইংরেজ সৈনিকের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে তাঁহার বিপদের কথা বুঝাইতে বুঝাইতে, তাহাদের হাত ধরিয়া নৌকার নিকট লইয়া গেলেন। সৈনিক দুইটি তাঁহার চেহারা ও ব্যবহারে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া স্নেহের সঙ্গে তাঁহার কথা শুনিলেন এবং অবস্থাটা বুঝিতে পারিয়া হাতের বেত উঁচু করিয়া ছেলে কয়টিকে ছাড়িয়া দিবার জন্য মাঝিদিগকে আদেশ দিলেন। ইংরেজ সৈনিক দেখিয়া মাঝিরা অত্যন্ত ভীত হইয়া বিনাবাক্যব্যয়ে ছেলেদের ছাড়িয়া দিল।

এই শ্রেণীর আর একটি কাহিনী এইরূপ। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড

যুবরাজ থাকাকালে যখন ভারতে আসেন, তখন "সিরাপিস্" নামক একখানি বড় যুদ্ধ-জাহাজ কলিকাতার বন্দরে আসে। এবং প্রতিদিন বহু লোক চৌরঙ্গী অফিসের একজন উচ্চ ইংরেজ কর্মচারীর অনুমতি-পত্র লইয়া ঐ জাহাজখানি দেখিতে যাইতেন। একদিন নরেন্দ্রনাথও বন্ধুগণ সহ উহা দেখিবার আকাঙ্ক্ষায় একখানি দরখাস্ত লইয়া ঐ অফিসে গেলেন। কিন্তু তাঁহাকে নেহাৎ ছেলেমানুষ দেখিয়া (তাঁহার বয়স তখন মাত্র ১১/১২ বৎসর) দ্বার-রক্ষক তাঁহাকে ভিতরে যাইতে দিল না। তখন তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, দ্বার-রক্ষক যেসব দরখাস্তকারীকে ভিতরে যাইতে দিতেছে তাহারা দ্বিতলের একটি ঘরে প্রবেশ করিতেছে। ইহা হইতে তিনি বুঝিলেন যে ঐটিই অনুমতি-প্রদানকারী সাহেবের ঘর। তখন তিনি ঐ ঘরে যাইবার অপর কোন পথ আছে কিনা খুঁজিতে লাগলেন এবং পরিশেষে পিছনের দিকে একটি লোহার সিঁড়ি পাইয়া তাহা বাহিয়া উপরে উঠিলেন ও সোজা সাহেবের ঘরে গিয়া আবেদনকারীদের লাইনে দাঁড়াইলেন। যথা-সময়ে সাহেব তাঁহার দরখাস্ত সই করিয়া দিলে তিনি তাহাকে অভিবাদন করিয়া অপর সকলের সহিত সামনের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিলেন। দ্বার-রক্ষক তাঁহাকে ভিতর হইতে আসিতে দেখিয়া অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি করে ঢুকলে?" নরেন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে জবাব দিলেন, "আমি ম্যাজিক জানি।"

এই প্রকার ভ্রমণ সংক্রান্ত না হইলেও, নরেন্দ্রনাথের কৈশোর কালের আর দুইটি ঘটনাও এখানেই উল্লেখযোগ্য। আমরা দেখিয়াছি তিনি নবগোপাল মিত্রের আখড়ায় ব্যায়াম করিতেন। সেখানে একদিন একটি খুব ভারি দোলনা খাটাইবার সময় তিনি দর্শকদের মধ্যে একজন বলবান ইংরেজ সেলরকে (sailor) দেখিয়া তাহাকে ঐ কার্যে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিলেন। সেলরটি খুশীমনে উহাতে যোগ দিল বটে, কিন্তু দোলনাটি তুলিবার সময় দড়ি ছিঁড়িয়া উহা তাহার মাথার উপর পড়িল ও তাহাতে সে অজ্ঞান হইয়া গেল। তখন সেলরটি মারা গিয়াছে মনে করিয়া, নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার দুই একজন

সঙ্গী ব্যতীত অপর সকলেই ঐ স্থান হইতে পলায়ন করিল। ইহাতে নরেন্দ্রনাথ একটুও না দমিয়া নিজের পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়িয়া সেলরের ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিলেন ও তাহার চোখে মুখে জল দিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। পরে তাহার জ্ঞান ফিরিলে, তিনি সঙ্গীগণের সাহায্যে তাহাকে ধরাধরি করিয়া একটি নিকটবর্তী স্কুল গৃহে লইয়া গেলেন ও তাহার চিকিৎসার জন্য একজন ডাক্তার আনাইলেন। তারপর এক সপ্তাহ কাল শুশ্রূষা করিয়া নরেন্দ্রনাথ তাহাকে আরোগ্য করিলেন ও পাড়ার উপর হইতে কিছু চাঁদা তুলিয়া তাহাকে তাহা দিয়া বিদায় করিলেন।

দ্বিতীয় কাহিনীটি এই। কিশোর বয়সে নরেন্দ্রনাথ তাঁহার এক প্রতিবেশী খেলাসাথীর বাড়ীতে গিয়া তাহাদের একটি চাঁপা গাছে উঠিয়া ফুল পাড়িতেন, উহার ডালে পা বাধাইয়া মাথা নীচুর দিকে ঝুলাইয়া দিয়া দোল খাইতেন এবং পরিশেষে একটি ডিগ্‌বাজি খাইয়া মাটিতে পড়িতেন। তাঁহার এই দৌরাত্ম্যে ঐ বাড়ীর একটি বৃদ্ধ বিরক্ত বোধ করিতেন। তাই, তিনি উহা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে নরেন্দ্রনাথকে একদিন বলিলেন, "দেখ, এই গাছে একটি ব্রহ্মদৈত্য থাকেন, তার সাদা পোশাক,—আর যে এই গাছে উঠেছে তিনি তারই ঘাড় মটকে দিয়েছেন।" নরেন্দ্রনাথ নীরবে তাহার কথা শুনিলেন। কিন্তু বৃদ্ধটি চলিয়া যাইতেই তিনি পুনরায় ঐ গাছে উঠিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে তাঁহার খেলাসাথীটি ভয় পাইয়া বলিল, "এই, উঠিস্ না, ব্রহ্মদৈত্য ঘাড় মট্‌কে দেবে।" শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "তুই একটা গাধা। এ গাছে ব্রহ্মদৈত্য থাকলে সে কবেও আমার ঘাড় মট্‌কে দিত। গাছে যাতে আর না উঠি তার জন্যে তোর ঠাকুরদা একটা গল্প বানিয়ে ভয় দেখিয়ে গেলেন।"

আবার এইসব পুরুষোচিত গুণের সঙ্গে, তিনি নানা কোমল গুণেও ভূষিত ছিলেন। তাঁহার সবল সুগঠিত দেহ ছিল মনোরম, তাঁহার তেজোদীপ্ত সুন্দর মুখমণ্ডল ছিল লাবণ্যমাখা। আর নাচ, গান, বাজনা ও রঙ্গরসে তাঁহার ছিল বিধিদত্ত অধিকার। এবং উহারই

সঙ্গে তাঁহার অন্তর ছিল স্বভাবতঃ প্রীতি ও পবিত্রতাপূর্ণ। তাই, তিনি ছিলেন সকলেরই প্রিয়। এবং পাড়ার ছোট বড় সকল পরিবারের সঙ্গেই গড়িয়া উঠিয়াছিল তাঁহার একটা আত্মীয়তা। তিনি তাহাদের শোকে সান্ত্বনা দিতেন, বিপদ-আপদে সহায় হইতেন। আবার, অন্য সময়ে তিনি তাঁহার হাস্য, কৌতুক ও দুষ্টামির দ্বারা তাহাদের প্রত্যেককে, এমন কি গম্ভীর প্রকৃতির প্রবীণ ব্যক্তিদিগকেও, প্রচুর আনন্দ দিতেন। অন্তঃপুরের মেয়েরা তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি স্নেহ করিতেন। এবং তিনি তাহাদের দিদি, খুড়ী, জ্যেঠী ইত্যাদি বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

এই প্রকার নানা গুণের আধার প্রিয়দর্শন অদ্ভুত বালকটি অত্যন্ত চঞ্চল, আমোদপ্রিয় ও ক্রীড়াসক্ত হইয়াও, অন্তরের অন্তরে ছিলেন অতি গম্ভীর ও সত্যের একান্ত উপাসক। তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলিতেন না। এবং জানা যায়, তিনি তাঁহার সঙ্গীদের মাঝে মাঝে বলিতেন, "জানিস্, আমি সন্ন্যাসী হব,—একজন গণক আমার হাত দেখে বলেছেন।" বলিয়া তিনি তাঁহার হাতের একটি রেখা তাহাদের দেখাইতেন।

আমরা পরে দেখিতে পাইব গণক মিথ্যা বলেন নাই। তাই, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল ও ক্রীড়াপ্রিয় কিশোর নরেন্দ্রনাথের মধ্যে একটা আশ্চর্য ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তাঁহার যখন মাত্র তের-চৌদ্দ বৎসর বয়স তখন হইতেই তিনি জ্ঞানান্বেষী হইয়া নানা রকমের পুস্তক ও খবরের কাগজ পাঠ করিতে ও শহরের নানা সভাসমিতিতে যোগদান করিয়া বক্তৃতাদি শুনিতে অনেক সময় ব্যয় করিতে লাগিলেন।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে নরেন্দ্রনাথ যখন তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র, তখন তাঁহার পিতা কর্মোপলক্ষে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত রায়পুর শহরে যান। এবং ঐ স্থানে কিছু অধিক কাল থাকিতে হইবে বুঝিয়া, তিনি তাঁহার পরিবারবর্গকে সেখানে লইয়া আসিবার জন্য নরেন্দ্রনাথকে নির্দেশ দেন। নরেন্দ্রনাথের বয়স তখন মাত্র চৌদ্দ বৎসর। পথও ছিল যার-পর-নাই দুর্গম। কারণ, তখন রায়পুর পর্যন্ত রেলপথ হয় নাই। এবং

কলিকাতা হইতে সেখানে যাইতে হইলে, প্রথমে রেলগাড়ীতে (এলাহবাদ ও জব্বলপুর হইয়া) নাগপুর পর্যন্ত ও তৎপর তথা হইতে নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়া পক্ষাধিককাল গরুর গাড়ীতে যাইতে হইত। যাহা হউক, এই সুদীর্ঘ অরণ্য-পথটি ছিল অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যপূর্ণ। সেখানে পৌঁছিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া ঐ সৌন্দর্য দেখিতে দেখিতে নরেন্দ্রনাথের পথের কষ্টকে আর কষ্ট বলিয়া মনে হইল না। এবং ক্রমে এক স্থানে আসিয়া এমন একটি দৃশ্য তাঁহার চোখে পড়িল যাহার কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি ধ্যান-তন্ময় হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। ঘটনাটি তিনি নিজে পূজনীয় শরৎ মহারাজের নিকট এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

"সেদিন আমাদের গরুর গাড়ীগুলি বিন্ধ্যপর্বতের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। দুদিকেই উঁচু পাহাড়, মাঝখান দিয়ে পথ। এক জায়গায় এসে দেখলাম দুদিকের পাহাড়ই একেবারে পথের উপর এসে পড়েছে। এবং খুব নিকট থেকে দুপাশের পাহাড় দুটিকে লক্ষ্য করতে করতে হঠাৎ চোখে পড়ল এক অপূর্ব মহাবিস্ময়কর দৃশ্য : এক পাশের পর্বতের গগনস্পর্শী চূড়া হতে নীচের মাটি পর্যন্ত বিস্তৃত একটা বিরাট ফাটল, আর তার সমস্ত অংশ জুড়ে একখানা বিশালকায় মৌচাক। দেখেই সবিস্ময়ে ভাবতে লাগলাম, কত কালের পরিশ্রমের ফলে ঐ বিরাট মৌচাকখানি প্রস্তুত হতে পেরেছে? কত যুগ ধরে মৌমাছিরা ঐ চাকে বাস করছে? অবাক হয়ে ওদের ঐ অত্যদ্ভুত বাসস্থানের কথা ভাবতে ভাবতে আমার মন সৃষ্টিকর্তার অনন্তশক্তির উপলব্ধিতে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে পড়ল। কতক্ষণ ঐ ভাবে ছিলাম তা স্মরণ করতে পারিনি। কিন্তু যখন জ্ঞান হল তখন দেখলাম আমরা এর মধ্যে অনেক পথ অতিক্রম করে এসেছি।"

যাহা হউক, ঐ কালে রায়পুরে কোন স্কুল ছিল না। তাই, সেখানে পৌঁছিয়া নরেন্দ্রনাথ স্কুলের ধরাবাঁধা পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্তে নিজের পছন্দমত সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি নানা বিষয়ক পুস্তক পড়িতে লাগিলেন। পুত্রের এই অধ্যয়ন কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া

বিশ্বনাথ তাঁহার স্বাধীন ও স্বাভাবিক বিকাশে বাধা জন্মাইতেন না। তবে তাঁহার চিন্তা ও তর্ক-শক্তির উৎকর্ষতা সাধনের নিমিত্ত তিনি তাঁহার সহিত নানা বিষয় আলোচনা করিতেন। এবং ইহারই মাধ্যমে প্রত্যেক বিষয়ের সার জিনিসটুকু উপলব্ধি করিতে, প্রত্যেক আলোচনায় মূল আলোচ্য বিষয়টি বুঝিয়া লইতে ও তাহা ধরিয়া থাকিতে এবং সত্যকে একটা মুক্ত, উদার সমন্বয়ের দৃষ্টিতে দেখিতে, তিনিই তাঁহাকে প্রথম শিক্ষা দেন।

ইহা ব্যতীত, রায়পুরের অনেক বিদ্বান ও গণ্যমান্য লোক নরেন্দ্রনাথের পিতার সহিত দেখা করিতে আসিতেন। তাঁহাদের নানা বিষয়ে আলোচনা নরেন্দ্রনাথ শুনিতেন এবং কখন কখন তাহাতে যোগও দিতেন। তাঁহার যুক্তিপূর্ণ কথাগুলি শুনিয়া উপস্থিত সুধীগণ খুবই বিস্মিত ও আনন্দিত হইতেন। কিন্তু এইকালে বালক বলিয়া কেহ তাঁহার মতামতকে উপেক্ষা করিলে তিনি বিষম রাগিয়া যাইতেন। এজন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে আবশ্যক বোধে তিরস্কার করিলেও, তিনি পুত্রের প্রখর বুদ্ধি ও উদ্বুদ্ধ আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মান বোধ দেখিয়া অন্তরের অন্তরে খুশীও হইতেন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে বিশ্বনাথ সপরিবারে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। প্রায় দুই বৎসর কাল স্কুল হইতে অনুপস্থিত থাকায়, নরেন্দ্রনাথের (কোন বৎসর নষ্ট না করিয়া) প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হইতে কিছু বাধা ছিল। কিন্তু তাঁহার স্কুলের শিক্ষকগণ তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন এবং তাঁহার বুদ্ধি ও মেধার বিষয় স্মরণ করিয়া তাঁহারা তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীতেই ভর্তি করিয়া লইলেন এবং তারপর তিনি ঐ ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দেই প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলেন। সেবার তাঁহাদের স্কুল হইতে একমাত্র তিনিই প্রথম বিভাগে পাশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার এই কৃতিত্বের জন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে পুরস্কার স্বরূপ একটি ঘড়ি কিনিয়া দিয়াছিলেন।

তবে এই পরীক্ষা পাশ করা নরেন্দ্রনাথের নিজের কাছে ছিল অতি অকিঞ্চিৎকর জিনিস। কারণ আমরা দেখিয়াছি, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে

জ্ঞান আহরণ করাই হয় তাঁহার জীবনের সর্বগ্রাসী লক্ষ্য। এবং তাহাতেই তিনি তাঁহার প্রায় সমস্ত সময় ব্যয় করিতেন। জানা যায়, প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পূর্বে তিনি ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত পুস্তকগুলির অধিকাংশই পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। এবং ঐ পরীক্ষার বৎসরেই (১৮৭৯) তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়িতে আগ্রহশীল হইয়া মার্শম্যান, এলফিন্‌ষ্টোন প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ বড় হইয়া স্কুলের পাঠ্য পুস্তকগুলি তিনি পরীক্ষা নিকটবর্তী হইবার পূর্বে কখন পড়িতেন না। এবং এ বিষয়ে তিনি তাঁহার গুরুভাইদের নিকট একদিন বলেন, "প্রবেশিকা পরীক্ষার মাত্র দু'তিন দিন থাকতে দেখি, জ্যামিতির কিছুই পড়া হয় নি। তখন আমি সমস্ত রাত জেগে ঐ বই পড়তে লাগলাম এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ওর চার খণ্ডই আয়ত্ত করে পরীক্ষা দিয়ে এলাম।"

ইহা ছাড়া, বহু পুস্তক অধ্যয়নের ফলে নরেন্দ্রনাথের দ্রুতপাঠের ক্ষমতাও এইকালে বিস্ময়কররূপে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। এবং এ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "ঐ (অর্থাৎ, প্রবেশিকা পরীক্ষার) সময় থেকে লেখকের বক্তব্য বুঝতে তার বই'এর প্রতি ছত্র আমার আর পড়তে হত না। প্রত্যেক প্যারার প্রথম ও শেষ লাইন পড়েই আমি তার অর্থ বুঝতে পারতাম। পরে ঐ ক্ষমতা আরও বাড়লে তাও আর আমার দরকার হত না। প্রত্যেক পৃষ্ঠার প্রথম ও শেষ লাইন পড়েই আমি সবটুকু বুঝে নিতাম। আবার যেখানে লেখক কিছু বোঝাবার জন্যে চার-পাঁচ বা তদধিক পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা চালিয়েছেন, আমি প্রথম কয় লাইন পড়েই তার যুক্তির সম্পূর্ণ ধারাটি বুঝতে পারতাম।"

দ্রুতপাঠের এই অদৃষ্টপূর্ব ক্ষমতা, অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, অতুলনীয় মেধা ও অটুট স্বাস্থ্য—এই মহাসম্বলগুলি লইয়া নবযৌবন-প্রাপ্ত নরেন্দ্রনাথ সতর বৎসর বয়সে কলেজে প্রবেশ করেন (১৮৮০, জানুয়ারী) ও অন্তরের এক বিরাম-বিশ্রামহীন দুর্বার প্রেরণায় তাঁহার অতৃপ্ত জ্ঞান-পিপাসা মিটাইতে অগ্রসর হন।

ছয়

কলেজের কয় বৎসর

(১৮৮০-১৮৮৬)

(দুর্বার অন্তর্বাঞ্ছা ও অশ্রান্ত জ্ঞানান্বেষণ)

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়া নরেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে (এফ্ এ) প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হন (২৭শে জানুয়ারী, ১৮৮০)। কিন্তু দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িবার সময় তাঁহার ম্যালেরিয়া জ্বর হয় এবং তজ্জন্য তাঁহার ক্লাশে উপস্থিতির শতকরা হার (Percentage of attendance) কম পড়ায়, প্রেসিডেন্সি কলেজ তাঁহাকে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এফ্ এ পরীক্ষা দিবার অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু জেনারেল এসেম্ব্লিস্ কলেজ (বর্তমানে স্কটিশ চার্চ কলেজ) তাঁহাকে ভর্তি করিয়া লইয়া ঐ সনেই ঐ পরীক্ষা দিতে পাঠান। এবং তাহা দিয়া তিনি (১৮৮১ খৃষ্টাব্দে) দ্বিতীয় বিভাগে এফ্ এ পাশ করেন।

তৎপর তিনি ঐ জেনারেল এসেম্ব্লিস্ কলেজেরই (বি এ) তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ঐ কলেজ হইতে পাস কোর্সে বি এ পাশ করেন। তারপর তিনি মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউসনের (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) ল ক্লাসে ভর্তি হন।[১] এবং ১৮৮৫-৮৬ খৃষ্টাব্দে বি এল পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু পরিশেষে উহা আর তাঁহার দেওয়া হয় না। কারণ, তাঁহার ভাগ্য তৎপূর্বেই তাঁহার জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ রচনা করিয়া রাখিয়াছিল। ইহা আমরা পরে যথাস্থানে দেখিতে পাইব।

১। ইহার পূর্বে—বি-এ পড়িবার সময়ে—নরেন্দ্রনাথ পিতার আদেশে কলিকাতার প্রসিদ্ধ এটর্নি নিমাইচরণ বসুর অফিসে কিছুকাল শিক্ষানবীশ ছিলেন।

জানা যায়, জেনারেল এসেম্‌ব্লিস্‌ কলেজে পড়িবার সময়, নরেন্দ্রনাথের (ইংরেজ ও ভারতীয়) অধ্যাপকগণ তাঁহার অসাধারণ মেধা ও মানসিক শক্তির পরিচয় পাইয়া বিশেষ মুগ্ধ হন। এবং ঐ কলেজের তৎকালীন ইংরেজ অধ্যক্ষ মিঃ উইলিয়ম হেষ্টি একদিন বলেন, "নরেন্দ্রনাথ সত্যই একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি। আমি বহু দেশ ভ্রমণ করেছি, কিন্তু তার মত এরূপ প্রতিভাযুক্ত ছাত্র আমি কোথাও, এমন কি, জার্মান বিশ্ববিদ্যালয় সকলেও দেখিনি। জীবনে ও বড় হবেই।"

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আমরা দেখিয়াছি, নরেন্দ্রনাথের এফ্‌ এ ও বি এ পরীক্ষার ফল (তাঁহার মত মেধাবী ছাত্রের পক্ষে) মোটেই সন্তোষজনক হয় নাই। ইহার একটা হেতু আমরা গত অধ্যায়ে লক্ষ্য করিয়াছি। স্কুলের উচ্চ শ্রেণীতে উঠিবার পর হইতে নরেন্দ্রনাথ জ্ঞান আহরণের জন্য সারা বৎসর ধরিয়া নিজ পছন্দানুযায়ী বাহিরের পুস্তকাদি পড়িতেই ব্যস্ত থাকিতেন, পরীক্ষা নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে কখন মনোনিবেশ করিতেন না।

কিন্তু তাহাই আর এখন উহার সবটুকু নয়। তখনকার ঐ সরল সহজ হেতুটি এখন ধরিয়াছে এক প্রলয় আকার। নরেন্দ্রনাথের মধ্যে এখন উঠিয়াছে এক তুমুল ঝঞ্ঝা—অন্তরের অফুরন্ত প্রশ্ন, প্রয়াস ও আবেগ-আকাঙ্ক্ষার এক তাণ্ডব নর্তন, যাহা জগজ্জাল ছিন্ন করিয়া চরম সত্য ও পরম শান্তি লাভ না করা পর্যন্ত কখন ক্ষান্ত হয় না। অন্তরের এই মহা ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে পরীক্ষা পাশের কথা এক তুচ্ছ তৃণখণ্ডের ন্যায় কখন কোথায় উড়িয়া পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা পরীক্ষা নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত তিনি চাহিয়াও দেখিতে পারেন নাই। এখন তাঁহার এক সর্বগ্রাসী ও সর্বনাশা আকাঙ্ক্ষা : 'জ্ঞান চাই, আরও জ্ঞান চাই, অখণ্ড পরিপূর্ণ জ্ঞান চাই ; স্বপ্নাচ্ছন্ন, চিররহস্যময় ও চিরপরিবর্তনশীল জগৎ ও জীবনের অন্তরালে কি আছে জানিতে চাই ; সর্বহর, অবিরামপ্রবাহী, দুর্নিবার কালের চাতুরী ভেদ করিতে চাই ; মানুষের শান্তি কোথায়, সন্তোষ কিসে, নির্বিঘ্নতার উপায় কি, বুঝিতে

চাই ; চাই অস্থির, ক্ষণভঙ্গুর, মহাদুঃখপূর্ণ, মহা অন্ধকারময় মানব-জীবনের সকল সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধান। তার পূর্বে বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, নিবৃত্তি নাই। আছে শুধু অন্তরের দুর্বার ঝঞ্ঝা ও অশ্রান্ত অন্বেষণ।'

তাই, তুচ্ছ পরীক্ষা নয়, চরম সত্যই হইয়াছিল এখন তাঁহার এক মহা লক্ষ্য। এবং তিনি একজন উৎসর্গিত ও দৃঢ়সঙ্কল্প সত্যান্বেষীর (Explorer of truth) ন্যায় দিকে দিকে তাহার অন্বেষণ চালাইতে লাগিলেন।

দেখা যায়, কলেজে প্রবেশ করিয়া নরেন্দ্রনাথ জ্ঞানলাভের জন্য সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পশ্চাতে ধাবিত হন। মাত্র এফ্ এ পড়িবার সময়ে (১৮৮০-৮১), তিনি পাশ্চাত্য যুক্তিশাস্ত্রের (Logic) বিখ্যাত ইংরেজি গ্রন্থ সকল (হোয়েটলি, জেভনস্, মিল ইত্যাদি) অধ্যয়ন করেন। এবং ঐ সঙ্গে ঐ কালেই পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, কাব্য ইত্যাদি সম্বন্ধেও নানা পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু দেখিলেন, যত পড়েন, যত তাঁহার শাণিত বুদ্ধির উপর নূতন নূতন জ্ঞানালোক পড়িতে থাকে, তত তাহা বিদ্যুচ্চমকের ন্যায় তাঁহাকে আশা দিয়াই বঞ্চিত করে। কারণ, তিনি দেখিতে পাইতেছিলেন ঐ সকল অধ্যয়নের পরেও প্রশ্ন থাকে, সংশয় থাকে এবং মনে নানা নূতন প্রশ্ন ও নূতন সংশয়ের উদ্ভব হয়, জীবন-সমস্যার সমাধান হয় না, অন্তরের হাহাকার থামে না। তাই, তিনি আরও উদ্যোগী হইয়া আরও নানা নূতন পুস্তকের সন্ধান লইয়া তৎসমুদয় অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ফল একই হইল। তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা মিটিল না। বস্তুতঃ ঐ পথে উহা মিটিবার কোন সম্ভবনাই ছিল না।

কারণ, তিনি যে জ্ঞান খুঁজিতেছিলেন তাহা মানুষের যুক্তি, তর্ক ও অনুমান সিদ্ধ কোন আলো-অন্ধকারময় স্বল্প জ্ঞান নয়। তিনি চাহিতেছিলেন সেই নিষ্কলুষ পূর্ণ জ্ঞান যাহা অজ্ঞানের মূলোচ্ছেদ করে, জগৎ ও জীবনের সকল সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধান দেয় এবং

ব্যক্তির জীবনে চির-শান্তি ও চির-মুক্তি আনিয়া তাহাকে সার্থক, সফল ও চির-কৃতার্থ করে। কিন্তু দেখিলেন, সে জ্ঞান পুস্তক অধ্যয়নের দ্বারা লাভ হয় না, বুদ্ধির উৎকর্ষতা ও চিন্তার বিষয় বিস্তারের দ্বারাও উহা মিলে না। উহা লাভের পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু সে পথ কি?

নরেন্দ্রনাথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কলেজের মেধাবী ছাত্র-বন্ধুদের সঙ্গে তিনি এ বিষয় আলোচনা করিলেন, কিন্তু তাহাতে সুফল কিছু পাইলেন না। জননীর শিক্ষাগুণে বাল্যকাল হইতেই ধর্মে তাঁহার আস্থা ছিল। তাই, সে পথেও তাহার অন্বেষণ চলিল। কলিকাতা শহরে তখন প্রবল ধর্মান্দোলন চলিতেছে। হিন্দু, ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান, এই তিনটি সম্প্রদায়ই প্রবলভাবে তাহাদের নিজ নিজ ধর্মের উৎকর্ষতা ও অপর ধর্ম সকলের অপকর্ষতা প্রচারে রত। নরেন্দ্রনাথের বিশাল চক্ষু সে সকলের দিকে চাহিয়া দেখিল। তাঁহার জন্ম-লব্ধ নিজ হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা, বহু দেবদেবীর পূজা, জাতি-বিচার ও অন্য বহু রকমের বহু কুসংস্কার তাঁহার বড়ই অন্যায়, অযৌক্তিক ও অজ্ঞানতার পরিচায়ক বলিয়া মনে হইল। এবং ঐ সকল কুসংস্কার-মুক্ত ব্রাহ্মদিগের নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা অনেক উচ্চ-স্তরের সাধন-পদ্ধতি বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল। বিশেষ তখন পুণ্যশ্লোক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জগদ্‌বিখ্যাত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন এই ধর্মের প্রধান প্রচারক ও নেতা। ইঁহাদের উভয়েরই ব্যক্তিত্বের আকর্ষণও ছিল প্রচুর। বিশেষতঃ কেশবচন্দ্রের নিষ্কলুষ চরিত্র, মিষ্ট কণ্ঠস্বর, সুমিষ্ট ব্যবহার ও অদ্বিতীয় বক্তৃতা-শক্তি ইত্যাদির পশ্চাতে তখন ছুটিত কলিকাতার প্রায় সমস্ত ছাত্র-সমাজ। তাহাদের ন্যায় নরেন্দ্রনাথও সেদিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন, এবং ব্রাহ্ম-সমাজ দ্বিতীয়বার বিভক্ত হইয়া (১৮৭৮) যে নূতন "সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ" প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি তাহাতে নাম লিখাইয়া তাহার সভ্য হইলেন। ঐ সমাজের রবিবাসরীয় উপাসনা সভায় তিনি প্রায়ই গান গাহিতেন ও সমাজের প্রধানদিগের বক্তৃতাদি শুনিতেন। অবশ্য ইহার জন্য তিনি কখন হিন্দু-সমাজ পরিত্যাগ করেন নাই বা তাহা করা তাঁহার

কখন আবশ্যক হয় নাই। তদ্ব্যতীত দেখা যায়, ঐ কালে কলিকাতার কলেজ-সমূহের বহু হিন্দু-ছাত্র তাহাদের নিজ নিজ গ্রাম, পল্লী, এমন কি, বাড়ীতেও ব্রাহ্ম-সমাজের অনুকরণে দল গঠন করিয়া (ঐ সমাজের) ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিতে ও ব্রাহ্মমতে উপাসনা করিতে রত হইতেন এবং তাহা লইয়া তাঁহাদের গ্রাম, পল্লী বা বাড়ীতে কখন কোন প্রশ্ন উঠিত না। জানা যায়, নরেন্দ্রনাথও এইভাবে তাঁহার সঙ্গীদের লইয়া কলিকাতার নানা স্থানে (প্রার্থনা ও আলোচনা সমিতি নামে) এইরূপ দল গঠন করিয়াছিলেন। (লীলাপ্রসঙ্গ ও কথামৃত)।

ইহা ব্যতীত, আমরা দেখিয়াছি নরেন্দ্রনাথের অল্প বয়সেই তাঁহার পিতা তাঁহাকে বাইবেল পড়িতে উপদেশ দিতেন। তদনুসারে নরেন্দ্রনাথ শুধু যে তাহা পড়িয়াছিলেন তাহা নয়। তিনি পরে সত্যান্বেষণের প্রেরণায় ঐ গ্রন্থের প্রচারক খৃষ্টান মিশনারীদের সঙ্গে মিশিয়াছেন, তাহাদের বক্তৃতা শুনিয়াছেন এবং ধর্মান্ধতাবশতঃ তাহারা হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে যে সকল অন্যায় যুক্তির অবতারণা করিতেন, কখন কখন তাহার প্রতিবাদও করিয়াছেন। ফলে, খৃষ্টধর্মের উপর তাঁহার প্রবল শ্রদ্ধা থাকিলেও, সাধারণ মিশনারীদের সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ভাল ছিল না। সম্ভবতঃ এই জন্য এবং কেশবচন্দ্র প্রভৃতি জগদ্-বরেণ্য ব্রাহ্মনেতাগণের প্রভাব-বশে তিনি খৃষ্টধর্ম অবলম্বনের কথা কখনও চিন্তাও করেন নাই। তবে ঐ ধর্মের মধ্যে কি অমূল্য সত্য নিহিত আছে, তাহা বুঝিবার জন্য তিনি খুবই চেষ্টা করিতেন। এবং ঠিক ঐ ভাবেই—অন্তরের উদ্দাম, উন্মত্ত ও অশ্রান্ত প্রেরণায়—তিনি সত্যের সন্ধানে উহার সকল সম্ভাব্য উৎসই পাতি পাতি করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

অন্যদিকে, তাঁহার শরীর ও মন দুই-ই ছিল সবল, সতেজ ও অফুরন্ত শক্তির আধার। এবং উহাদের সুপুষ্ট, সুবিকশিত ও বহুমুখী বৃত্তিগুলি অতি স্বাভাবিক ভাবে তাঁহাকে নানা সুযোগে নানারকমের কাজে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার দেহ-মনের বল, স্বাস্থ্য ও সাম্য রক্ষা

করিত। দেখা যায়, তিনি একদিকে যেমন পড়িতেন, ধর্মালোচনা করিতেন, ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদির বিষয় সমূহ লইয়া আলোচনা ও গবেষণা করিতেন, তেমনি অপরদিকে তিনি ছিলেন ব্যায়ামগির, ক্রীড়ামোদী, রঙ্গপ্রিয়, আলোচনা ও কথোপকথনে (conversation) উজ্জ্বল ও চিত্তাকর্ষক এবং সঙ্গীতে অতি সুদক্ষ, সুমিষ্ট ও অতুলনীয়। এই সকল গুণের জন্য তিনি কলেজের ছাত্রদিগের উৎসব-অনুষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তিনি উপস্থিত না থাকিলে তাহাদের সকল সামাজিক সম্মিলনই নীরস ও বিফল মনে হইত।

এই সকল ব্যতীত আরও জানা যায়, নরেন্দ্রনাথ ওস্তাদ আহাম্মদ খাঁ ও বেণী গুপ্তের নিকট চার-পাঁচ বৎসর সঙ্গীত শিক্ষা করেন। এবং একবার তিনি তাঁহার এক বন্ধুর সঙ্কলিত একখানি বাংলা সঙ্গীত-পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দেন ও তাহাতে ভারতীয় সঙ্গীত-বিজ্ঞান সম্বন্ধে নানা বিষয় আলোচনা করেন। আবার, তিনি নানা বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে পারিতেন এবং কিছুকাল নৃত্য শিক্ষাও করেন। বাজনা-শিক্ষায় (আদি ব্রাহ্ম-সমাজের পাখোয়াজ বাদক) কাশী ঘোষাল তাঁহার একজন ওস্তাদ ছিলেন।

এইভাবে সমস্ত বিষয় লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, এইকালে নরেন্দ্রনাথের সবই ছিল। শুধু ছিল না তাঁহার অন্তরের একান্ত কাম্য চরম সত্য ও পরম শান্তির উপলব্ধি। তাই, অসাধারণ শক্তি ও বহুগুণের আধার হইয়াও তাঁহার অন্তরের অভাব ও অশান্তির কোন অন্ত ছিল না। আমরা দেখিয়াছি শৈশব হইতেই তিনি প্রতিদিন রাত্রে নিদ্রার প্রাক্‌কালে একটি জ্যোতি দেখিতে পাইতেন। এখন যৌবনের উদার ক্ষেত্রে পৌঁছিয়া—যখন জীবনের পথ-নির্বাচন করা একান্ত আবশ্যক, তখন তাঁহার ত্যাগ-ভোগ-সক্ষম দেহ-মন আর একটি অদ্ভুত দর্শনের সম্মুখীন হইল। এই কালে প্রতিদিন রাত্রে শয়ন করিতেই দুইটি বিরুদ্ধ জীবন-চিত্র তাঁহার কল্পনায় ফুটিয়া উঠিত। একটিতে দেখিতেন, তিনি অশেষ ধন-জন, যশ-মান প্রভৃতি ভোগৈশ্বর্য লাভ করিয়া সমাজের

শীর্ষস্থানে আরূঢ় হইয়াছেন। আবার পরক্ষণেই অপর চিত্রটিতে দেখিতেন, তিনি গৃহহীন, সম্বলহীন, কৌপীনমাত্র পরিহিত, পর্বত-অরণ্যচারী সর্বত্যাগী পরিব্রাজক সন্ন্যাসী,—অহর্নিশি ঈশ্বরের ধ্যানচিন্তা, যদৃচ্ছালব্ধ ভোজন এবং রাত্রিকালে বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া তাঁহার কাল কাটিতেছে। তাঁহার মনে হইত তিনি ইচ্ছা করিলেই এই দুইটি জীবনের যে কোনটিই অর্জন করিতে পারেন। কিন্তু চিত্র দুইটি লক্ষ্য করিতে করিতে তিনি দেখিতেন, ভোগের চিত্রটি ধীরে ধীরে মুছিয়া যাইতেছে এবং পরিশেষে শুধু ত্যাগের জীবন-চিত্রই তাঁহার সম্মুখে রহিয়াছে। ইহা হইতে বোঝা যায়, নরেন্দ্রনাথের অন্তরাত্মা এইকালে তাঁহার জন্য কোন্ পথ নির্দেশ করিতেছিলেন।

যাহা হউক, দিনের পর দিন আসিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না। তিনি যে সর্বদুঃখ ও সর্বসংশয় বিনাশী পরশমণি খুঁজিতে ছিলেন, তাহা কোথাও মিলিল না। তাই, বাহিরের চেষ্টার সঙ্গে তিনি অন্তরে অন্বেষণও অতি মাত্রায় বাড়াইয়া দিলেন। তিনি এখন কঠোর তপস্যা-নিরত ব্রহ্মচারীর ন্যায় জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। নিরামিষ ভোজী হইয়া রাত্রে ভূমি বা কম্বল-শয্যায় শয়ন করিতেন। এবং প্রতিরাত্রেই নিজ শয়ন কক্ষের দরজা বন্ধ করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ধ্যান করিতেন, কোন কোন দিন ঐ ধ্যানেই সারারাত্রি কাটিয়া যাইত। এইরূপ ধ্যানে তাঁহার নানা রকমের দর্শন লাভ হইলেও, উহার দ্বারা তাঁহার অন্তরের অন্তহীন ক্ষুধার নিবৃত্তি হইত না। তাই ধ্যান ব্যতীত, তিনি মাঝে মাঝে নিজ মনে অবিশ্রান্তভাবে জ্ঞান-ভক্তি বিষয়ক গান গাহিয়াও সমস্ত দিন কাটাইয়া দিতেন। কিন্তু তাহাতেও সাময়িক শান্তির অতিরিক্ত কিছু তাঁহার মিলে নাই।

এইভাবে সকল দিকে ব্যর্থ হইলেও, তাঁহার একটা সরল স্বাভাবিক বিশ্বাস ছিল। এবং যুক্তির ভিত্তিতেও তাহা বেশ দৃঢ় বলিয়াই তিনি মনে করিতেন। তাই, সে পথেও তিনি তাঁহার একটা অন্বেষণ চালাইতে লাগিলেন। তিনি বিচার করিয়া বুঝিয়াছিলেন, এই চির-

চঞ্চল ও সদা পরিণাম-গ্রস্ত জগতের পশ্চাতে যদি কোন অচঞ্চল, অপরিবর্তনীয়, ধ্রুব সত্য থাকিয়া থাকে এবং সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের নিদান-স্বরূপ কোন চৈতন্যময় ঈশ্বর যদি সেই সত্য হন এবং তিনিই যদি মানুষের শান্তি-আনন্দ লাভের একমাত্র উপায় হন, তবে মানুষ তাঁহাকে নিশ্চয়ই ইহজন্মেই লাভ করিতে সমর্থ হইবে। তাই, তিনি এই সময়ে তাঁহার পরিচিত, অপরিচিত সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের নিকট গিয়া এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন ?" কিন্তু তাঁহাদের কেহই এ বিষয়ে 'হাঁ' উত্তর দিতে সক্ষম হইলেন না। জানা যায়, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে নরেন্দ্রনাথ দুইবার ব্রাহ্ম-সমাজের বরেণ্য নেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখিতে গিয়াছিলেন। ইহার দ্বিতীয়বারে (মহর্ষি তখন কলিকাতার গঙ্গাবক্ষে একখানি বোটে বাস করিতেছিলেন) তিনি তাঁহাকেও উপরি-কথিত প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করেন। মহর্ষি তাঁহার প্রশ্নের কোন জবাব দিতে সক্ষম হইলেন না, কিন্তু তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বৎস, তোমার চক্ষু দুটি যোগীর চক্ষু।"

এই ভাবে সর্বত্র বিফল হইয়া, একদিন হঠাৎ দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা নরেন্দ্রনাথের মনে উদয় হইল। তাঁহাকে তিনি ইতিপূর্বে একদিন প্রতিবেশী সুরেশচন্দ্র মিত্রের বাড়ীতে দেখিয়াছিলেন এবং তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে আমন্ত্রণও করিয়াছিলেন (১৮৮১, নভেম্বর)। তাই, তাঁহার সহিত দেখা করিবার উদ্দেশ্যে নরেন্দ্রনাথ একবার দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া স্থির করিলেন (১৮৮১, ডিসেম্বর)।

ইঁহাদের এই ঐতিহাসিক সাক্ষাতের বিবরণ আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখিতে পাইব।

সাত

শ্রীরামকৃষ্ণের সকাশে

(১৮৮১-১৮৮২)

আমরা প্রথম অধ্যায়ে ('পটভূমি') দেখিয়াছি, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বিষয় কলিকাতায় প্রথম প্রচার করেন সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম-নেতা কেশবচন্দ্র সেন। ঐ প্রচারের ফলে নরেন্দ্রনাথ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বা তৎপূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শুনিয়াছিলেন কিনা তাহা জানা যায় না। তবে এই অজানা তথ্যটি বিবেচনার বাহিরে রাখিলে, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের নাম সর্বপ্রথম শ্রবণ করেন জেনারেল এসেমব্লিস কলেজের স্বনামধন্য ইংরেজ অধ্যক্ষ উইলিয়ম হেষ্টি সাহেবের নিকট হইতে (১৮৮১)। এই উদার ও সুপণ্ডিত সাহেবটি একদিন (অন্য একটি অধ্যাপকের অনুপস্থিতির জন্য) নরেন্দ্রনাথদের এফ্. এ ক্লাসে আসিয়া ইংলণ্ডের মহাকবি ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থের এক্‌স্‌কারসন নামক কাব্যগ্রন্থের এক স্থান ব্যাখ্যা করিতে-ছিলেন। ঐ স্থানে কবি বলিতেছেন যে প্রকৃতির সৌন্দর্যের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার trance বা ভাব-সমাধি হইত। কিন্তু ছাত্রগণ কবির এই অবস্থা ধারণা করিতে না পারায় অধ্যক্ষ সাহেব বলেন, "এরূপ অবস্থা মনের পবিত্রতা ও একাগ্রতা হতে আসে। এর অধিকারী লোক কচিৎ দেখা যায়, বিশেষভাবে আজকালকার দিনে। আমি মাত্র একটি লোকের কথা জানি যাঁর এরূপ অবস্থা হয় এবং তিনি হচ্ছেন দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংস। তোমরা যদি সেখানে যাও, তবে তাঁকে দেখে এই অবস্থা কিরূপ তা বুঝতে পারবে।"

ইহার কিছুদিন পরেই নরেন্দ্রনাথের প্রতিবেশী শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মিত্র একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তাঁহার বাড়ীতে আনিয়া উৎসব করেন এবং সেখানে ভজন গাহিবার জন্য তিনি নরেন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ

করেন। নরেন্দ্রনাথ আসিলে, তাঁহাকে দেখিবামাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমে সুরেশচন্দ্রকে ও পরে সেখানে উপস্থিত ভক্ত (ও নরেন্দ্রনাথের আত্মীয়) রামচন্দ্র দত্তকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া একদিন দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য তাঁহাদের উভয়কে অনুরোধ জানাইলেন। তারপর ভজন গান শেষ হইলে তিনি নরেন্দ্রনাথের নিকটে আসিয়া তাঁহার শারীরিক লক্ষণ সকল লক্ষ্য করিতে করিতে তাঁহার সহিত দুই-একটি কথা বলিলেন ও তাঁহাকে একদিন দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন (১৮৮১, নভেম্বর)।

এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরে নরেন্দ্রনাথ এফ্. এ পরীক্ষা দিলেন। তখন তাঁহার পিতা শহরের কোন সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তির কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিবার ইচ্ছা করিলেন। এই বিবাহে কন্যার পিতা দশ হাজার টাকা পণ দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু নিজ পিতা ও পূর্বোক্ত রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ আত্মীয়গণের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও নরেন্দ্রনাথ বিবাহ করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

উক্ত রামচন্দ্র দত্ত নরেন্দ্রনাথের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় ছিলেন ও তাঁহার পিতার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়া ডাক্তারি পাশ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তাই, নরেন্দ্রনাথ ধর্মভাবের বশবর্তী হইয়া বিবাহ করিলেন না জানিতে পারিয়া তিনি তাঁহাকে একদিন বলিলেন, "যদি সত্যই ধর্মলাভ করতে চাও, তবে ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতির পেছনে না ঘুরে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের (অর্থাৎ, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) কাছে চল।" ঠিক এই সময়েই পূর্বোক্ত সুরেশচন্দ্র মিত্রও নরেন্দ্রনাথকে একদিন তাঁহার সহিত দক্ষিণেশ্বরে যাইতে অনুরোধ করিলেন। ইহা ব্যতীত গত অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি, নরেন্দ্রনাথের নিজের মনেও ইতিপূর্বে আপনা হইতেই রামকৃষ্ণ দেবকে দর্শনের একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল। তাই, পরিশেষে তিনি একদিন দুই-তিন জন বন্ধু সহ সুরেশচন্দ্র মিত্রের সহিত তাঁহার গাড়ীতে দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করিলেন (১৮৮১, ডিসেম্বর)।

সেখানে—তাঁহার ও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাতের দিনে—যে

সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের উভয়েরই নিজ নিজ শ্রীমুখোক্ত উক্তি পাওয়া যায়। এই বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন তাঁহার ভক্তগণের নিকট বলেন—

"পশ্চিমের (গঙ্গার দিকের) দরজা দিয়ে নরেন্দ্র সেদিন (আমার) ঘরে ঢুকেছিল। দেখলাম নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য নেই, মাথার চুল ও বেশভূষার কোন পারিপাট্য নেই। তার সবই যেন আলগা, বাইরের কোন জিনিসেই আঁট নেই। চক্ষু দেখে মনে হল, তার মনের অনেকখানি কে যেন জোর করে সর্বদা ভিতরের দিকে টেনে রেখেছে। অবাক হয়ে ভাবলাম, বিষয়ী লোকের আবাসস্থল কলকাতায় এত বড় সত্ত্বগুণী আধার থাকাও সম্ভব!

"মেঝেতে মাদুর পাতা ছিল, বসতে বললাম। ঘরের ঐ গঙ্গা জলের জালাটার কাছেই বসল। তার সঙ্গে যে আর দু'চার জন ছোকরা এসেছিল, তারা ভিন্ন রকমের ছিল—ভোগের দিকেই দৃষ্টি।

"গান গাইতে বললে, সে ব্রাহ্মসমাজের একটি গান গাইল—

'মন চল নিজ নিকেতনে,' ইত্যাদি।

এবং উহা সে সমস্ত মনঃপ্রাণ ঢেলে এমন একাগ্রতার সঙ্গে গাইল যে আর থাকতে পারলাম না, ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লাম।"

এই দিনের কথা সম্পর্কেই নরেন্দ্রনাথ তাঁহার গুরুভাইদের নিকট বলিয়াছেন—

"গান তো গাইলাম। কিন্তু তার পরেই ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) হঠাৎ উঠে আমার হাত ধরে তাঁর ঘরের উত্তরের দিকের বারান্দায় নিয়ে গেলেন ও সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। তখন শীতকাল, উত্তুরে-হাওয়া আটকাবার জন্যে বারান্দাটা ঝাঁপ দিয়ে ঘেরা ছিল। তাই বাইরের কাউকে আর দেখা যাচ্ছিল না। তারপর তিনি সেখানে যা বললেন ও করলেন তা কল্পনাতীত। তিনি হঠাৎ আমার হাত ধরে চোখের জল ফেলতে ফেলতে পূর্ব পরিচিতের ন্যায় বলতে লাগলেন, 'এতদিন পরে আসতে হয়? আমি তোমার জন্যে যে কি ভাবে প্রতীক্ষা করে আছি তা একবার ভাবতে নেই? বিষয়ী

লোকের কথা শুনতে শুনতে আমার কান ঝলসে গেল, প্রাণের কথা কাউকে বলতে পাইনে।' এই রকম অনেক কথা বললেন ও কাঁদতে লাগলেন। তারপর তিনি আমার সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন—'জানি আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি—নররূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি দূর করবার জন্যে আবার শরীর ধারণ করেছ।' ইত্যাদি।

"আমি তো শুনে নির্বাক—স্তম্ভিত! মনে মনে ভাবতে লাগলাম, এ আমি কাকে দেখতে এসেছি? এ তো একেবারে উন্মাদ! নইলে আমি বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র, আমাকে এই সব কথা বলা! যা হোক চুপ করে রইলাম, পাগল যা ইচ্ছে তাই বলে যেতে লাগলেন। পরে তিনি আমাকে সেখানে অপেক্ষা করতে বলে, ঘরের ভিতর গিয়ে মাখন, মিশ্রি ও কতকগুলি সন্দেশ এনে আমাকে নিজ হাতে খাওয়াতে লাগলেন। আমি বার বার বললাম, 'খাবারগুলি আমাকে দিন, আমি আমার সঙ্গীদের সঙ্গে ভাগ করে খাব।' কিন্তু তিনি তা কিছুতেই শুনলেন না। বললেন, 'ওরা খাবে এখন, তুমি খাও।' বলে সবগুলি আমাকে খাইয়ে তবে নিশ্চিন্ত হলেন। তারপর তিনি আমার হাত ধরে বললেন, 'বল, তুমি শীঘ্র আর একদিন একা আমার কাছে আসবে।' তাঁর এই একান্ত অনুরোধ এড়াতে না পেরে বাধ্য হয়ে বলতে হল, 'আসব।' এবং তখন তাঁর সঙ্গে আবার ঘরে এসে সঙ্গীদের পাশে বসলাম।

"বসেই আমি তাঁকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। এই সময়ে তাঁর চালচলন, কথাবার্তা ইত্যাদিতে উন্মাদের কোন লক্ষণ দেখলাম না। বরং ভক্তদের প্রতি তাঁর উপদেশ শুনে ও তাঁর অদ্ভুত ভাবসমাধি দেখে মনে হল, তিনি সত্য সত্যই একজন ঈশ্বর-জানিত লোক এবং তিনি যা বলছেন তা নিজে অনুভব করেছেন। তাই, ধীরে ধীরে তাঁর দিকে একটু এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলাম, 'মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?' তিনি একটুও বিলম্ব না করে উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, দেখেছি। তোমাদের যেমন দেখছি, তোমাদের সঙ্গে যে ভাবে কথা

বলছি, ঠিক তেমনি ভাবেই তাঁকে দেখা যায় ও তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায়। কিন্তু কে তা চায়? লোকে স্ত্রী, পুত্র, ধন-সম্পত্তি ইত্যাদির শোকে কত চোখের জল ফেলে, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে ঐরূপ করে? তাঁকে পাবার জন্যে কেউ যদি তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকে, তবে তিনি নিশ্চয়ই তাকে দেখা দেন।' তাঁর এই উত্তর শুনে মনে হল তিনি তাঁর নিজ উপলব্ধি থেকেই এই কথা বললেন। কিন্তু এই সকল কথার সঙ্গে তাঁর ইতিপূর্বের উন্মাদের ন্যায় আচরণের কোন সামঞ্জস্য করতে না পেরে ভাবলাম, ইনি একজন monomaniac (এক বিষয়ের পাগল)। তথাপি মনে হতে লাগলো, উন্মাদ হলেও ইনি মহাত্যাগী ও মহাপবিত্র এবং শুধু ঐজন্যই মানবহৃদয়ের শ্রদ্ধা, পূজা ও সম্মান পাবার যথার্থ অধিকারী। এইরূপ চিন্তা করতে করতে সেদিন তাঁকে প্রণাম করে বিদায় নিলাম।"

প্রথমবার দক্ষিণেশ্বর হইতে কলিকাতায় ফিরিবার পর নরেন্দ্রনাথের মনে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা প্রায়ই উদয় হইত এবং তাঁহার প্রতি তিনি একটা আকর্ষণও অনুভব করিতেন। তাহা হইলেও, তাঁহার বহু রকমের বহু কাজের মধ্যে প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থ উদ্যোগী হইয়া আর একবার একাকী দক্ষিণেশ্বর যাইতে তাঁহার প্রায় একমাস দেরি হইয়া গেল। তিনি এবার পদব্রজে সেখানে গেলেন। এবং এই দিনের ঘটনাবলী সম্পর্কে তিনি পরবর্তী কালে তাঁহার গুরুভাইদের নিকট বলিয়াছেন—

"দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী যে কলকাতা থেকে এত বেশী দূরে তা প্রথমবার গাড়ীতে এসে কিছু বুঝতে পারিনি। হাঁটাপথে মনে হল পথ যেন আর ফুরুতে চায় না। যা হোক, লোকের কাছে জিজ্ঞেস করে করে পরিশেষে কালীবাড়ীতে পৌঁছে সোজা ঠাকুরের ঘরে গেলাম। দেখলাম তিনি তাঁর ছোট তক্তাপোশখানির উপর বসে আছেন। আমাকে দেখেই তিনি আনন্দের সঙ্গে ডেকে তাঁর বিছানার উপর বসালেন। বসেই দেখলাম তিনি যেন কি রকম ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েছেন। এবং আমার উপর স্থির দৃষ্টি রেখে অস্পষ্ট স্বরে কিছু

বলতে বলতে আমার দিকে সরে আসছেন। ভাবলাম আগের দিনের মত বুঝি আবার একটা পাগলামি করবেন। কিন্তু ঐরূপ ভাবতে না ভাবতে তিনি তাঁর ডান পা আমার গায়ের উপর রাখলেন। এবং ঐ স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে আমার একটা অদ্ভুত উপলব্ধি উপস্থিত হল। চক্ষু মেলেই দেখতে লাগলাম, দেয়ালগুলি ও ঘরের সমস্ত জিনিসপত্রই বেগে ঘুরতে ঘুরতে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে এবং আমার আমিত্ব সহ সারা বিশ্বটাই যেন এক সর্বগ্রাসী মহাশূন্যে বিলীন হতে ছুটেছে। তখন আমি এক মহাভয়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম। মনে হল— আমিত্বের নাশেই মরণ, সেই মরণ আমার সামনে, অতি নিকটে! সামলাতে না পেরে চীৎকার করে উঠলাম, 'ওগো, তুমি আমার এ কি করলে, আমার যে বাপ-মা আছেন!' আমার কথা শুনে ঠাকুর উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন এবং হাত দিয়ে বুকে টুক টুক করে চাপড় দিয়ে বললেন, 'তবে এখন থাক, একেবারে (এখনই) কাজ নেই, কালে হবে।' আশ্চর্যের বিষয় তিনি এ কথা বলতে না বলতে আমার ঐ অদ্ভুত উপলব্ধি নিমেষে থেমে গেল। আমি পুনরায় প্রকৃতিস্থ হলাম এবং ঘরের ভিতরের ও বাইরের জিনিসগুলি পূর্বের ন্যায় অবস্থিত দেখতে পেলাম।

"বলতে যে সময় লাগে, ঘটনাটি তার চাইতেও কম সময়ে ঘটে গেল এবং ওর দ্বারা আমার মনে এক যুগান্তর উপস্থিত হল। স্তব্ধ হয়ে ভাবতে লাগলাম, এ কি হল? এ কি mesmerism (ইচ্ছাশক্তি-সৃষ্ট মোহ), না hypnotism (সম্মোহন বিদ্যা প্রয়োগের ফল)? ও দুইই তো শুধু দুর্বল মনের উপরই ক্রিয়া করতে পারে। কিন্তু আমি তো দুর্বলমনা নই। তা ছাড়া, আমি তো ওঁর ভক্তও নই। বরং আমি ওঁকে আংশিক পাগল বলেই ধরে নিয়েছি। তা হলে আমার ঐ উপলব্ধিটা কি? ভেবে চিন্তে কিছুই স্থির করতে পারলাম না। তবে দৃঢ় সঙ্কল্প করলাম যে ওঁকে আর কখন আমার মনের উপর এ রকম প্রভাব বিস্তার করতে দেব না।

"আর ঐ সঙ্গে এ কথাও মনে হতে লাগল, ওঁর যদি এত বড়

ইচ্ছাশক্তিই থেকে থাকে, যার দ্বারা উনি আমার মনের মত সবল দৃঢ়-সংস্কারযুক্ত মনকেও অবশ করে ফেলতে পারেন, তবে ওঁকে আর পাগলই বা বলা যায় কি করে? অথচ, প্রথম দিন উনি আমাকে বারান্দায় নিয়ে যে সকল কথা বলেছিলেন, তাতে ওঁকে পাগল ছাড়া আর কিই বা মনে করতে পারি? ফলে এ বিষয়েও কিছু ঠিক করতে না পেরে স্থির করলাম, যে ভাবে পারি ওঁর স্বভাব ও শক্তির বিষয় সঠিকভাবে বুঝে নিতে হবে।

"এই সব চিন্তাতেই সেদিন আমার সময় কাটতে লাগল। কিন্তু দেখলাম, ঘটনাটির পর ঠাকুর যেন এক সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ হয়ে গেলেন। এবং প্রথম দিনের ন্যায়, আমাকে আদর-যত্ন করতে লাগলেন। কোন প্রিয় আত্মীয় বা বন্ধুকে বহুকাল পরে কাছে পেলে লোকে যেমন করে, ঠিক তেমনি করতে লাগলেন। খাইয়ে, আদর করে, কথা বলে ও রঙ্গ-পরিহাস করে তাঁর আশ যেন আর মিটছিল না। এবং তাঁর এই অদ্ভুত স্নেহপূর্ণ ব্যবহারও আমার একটা ভাববার বিষয় হল। পরিশেষে সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখে আমি তাঁর কাছে সে দিনের মত বিদায় চাইলাম। এতে তিনি ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, 'আবার শীঘ্র আসবে, বল।' তখন পূর্ববারের ন্যায় ঐ প্রতিশ্রুতি দিয়েই আসতে হল।"

এই ঘটনার দিন সাতেক পরে নরেন্দ্রনাথ তৃতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন। এইবার তিনি দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি কিছুতেই তাঁহার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে দিবেন না। যাহা হউক, এই দিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া পার্শ্ববর্তী যদুনাথ মল্লিকের নির্জন বাগানবাড়ীতে লইয়া গেলেন। সেখানে কিছুক্ষণ বেড়াইয়া তাঁহারা ঐ বাগানবাড়ীর বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। সেখানে একটু পরেই শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার অনতিদূরে বসিয়া নরেন্দ্রনাথ তাঁহার ঐ অবস্থা স্থিরভাবে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্বদিনের ন্যায় হঠাৎ নিকটে আসিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন। পূর্ব

হইতে বিশেষ সতর্ক থাকা সত্ত্বেও, নরেন্দ্রনাথ ঐ শক্তিপূর্ণ স্পর্শে অভিভূত হইয়া সম্পূর্ণরূপে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন। যখন তাঁহার চৈতন্য হইল, তখন দেখিলেন ঠাকুর তাঁহার বুকে হাত বুলাইয়া দিতেছেন।

বাহ্যসংজ্ঞা লুপ্ত হইবার পর নরেন্দ্রনাথের ভিতরে সেদিন কিরূপ অনুভূতি জাগিয়াছিল, তাহা তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু ঐ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন ভক্তগণের নিকট বলিয়াছেন, "বাহ্যসংজ্ঞা লোপ পেলে, আমি নরেনকে কতকগুলি প্রশ্ন করেছিলাম —সে কে, কোথা হতে এসেছে, কেন এসেছে, কতদিন পৃথিবীতে থাকবে ইত্যাদি। সেও ঐ অবস্থায় তার অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে ঐ সকল প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিয়েছিল। তার সম্বন্ধে পূর্বে যা দেখছিলাম ও ভেবেছিলাম, তা তার ঐ উত্তরগুলির দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল। সে সব কথা বলতে নিষেধ আছে। তবে ও থেকে আমি জেনেছি, সে যেদিন জানতে পারবে সে কে, সেদিন সে আর এ জগতে থাকবে না, স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করবে। নরেন্দ্র ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ।"

নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে আসিবার পূর্বে ঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল দিব্য-দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে তিনি পরে কিছু কিছু তাঁহার ভক্তগণের নিকট বলিয়াছেন। উহার একটি লীলাপ্রসঙ্গে এইভাবে বর্ণিত দেখা যায়ঃ

"একদিন দেখছি—মন সমাধিপথে জ্যোতির্ময় বর্ত্মে উচ্চে উঠে যাচ্ছে। উহা সত্বর চন্দ্র-সূর্য-তারকামণ্ডিত স্থূল জগৎ অতিক্রম করে, প্রথমে সূক্ষ্ম ভাবজগতে প্রবিষ্ট হল। ঐ রাজ্যের উচ্চ হতে উচ্চতর স্তরসমূহে মন যতই উঠতে লাগল, ততই নানা দেবদেবীর ভাবঘন বিচিত্র মূর্তি সকল পথের দুইপাশে অবস্থিত দেখতে পেলাম। এবং পরিশেষে মন ঐ রাজ্যের শেষ প্রান্তে এসে উপস্থিত হল। সেখানে দেখলাম এক জ্যোতির্ময় ব্যবধান (বেড়া) খণ্ড ও অখণ্ডের রাজ্যকে পৃথক করে রেখেছে। ঐ ব্যবধান উল্লঙ্ঘন করে মন ক্রমে অখণ্ডের রাজ্যে প্রবেশ করল। দেখলাম সেখানে মূর্তি-বিশিষ্ট কেহ বা কিছু

নেই। এমন কি, দিব্যদেহধারী দেবদেবীগণও যেন সেখানে প্রবেশ করতে শঙ্কিত হয়ে বহু নিম্নে নিজ নিজ অধিকার বিস্তার করে রয়েছেন। কিন্তু পরক্ষণেই দেখতে পেলাম, দিব্যজ্যোতিঃঘনতনু সাত জন প্রবীণ ঋষি সেখানে সমাধিস্থ হয়ে বসে আছেন। বুঝলাম, জ্ঞান ও পুণ্যে, ত্যাগ ও প্রেমে, এঁরা মানুষ তো দূরের কথা, দেবদেবী-দিগকেও অতিক্রম করেছেন। বিস্মিত হয়ে এঁদের মহত্ত্বের বিষয় চিন্তা করছি, এমন সময়ে দেখি সেই অখণ্ডের ঘরের ভেদ-বিরহিত জ্যোতির্মণ্ডলের একাংশ ঘনীভূত হয়ে এক দিব্য শিশুর আকারে পরিণত হল। ঐ দেবশিশু ঐ ঋষিদের একজনের কাছে এসে নিজ ছোট্ট সুললিত বাহু দুটির দ্বারা তাঁর গলা জড়িয়ে ধরল এবং তাঁকে অতি সুমিষ্ট স্বরে ডেকে সমাধি হতে প্রবুদ্ধ করতে চেষ্টা করতে লাগল। তাঁর প্রেমমাখা সুকোমল স্পর্শে ঋষি সমাধি হতে ব্যুত্থিত হলেন এবং অর্ধস্তিমিত চক্ষে নির্নিমেষভাবে ঐ অদ্ভুত বালককে দেখতে লাগলেন। তাঁর প্রসন্নোজ্জ্বল মুখ দেখে মনে হল, বালক যেন তাঁর বহুকালের পূর্ব-পরিচিত, তাঁর হৃদয়ের ধন। তখন অসীম আনন্দে ঐ অদ্ভুত দেবশিশু তাঁকে বললেন, 'আমি যাচ্ছি, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।' ঋষি কোন কথা বললেন না, কিন্তু তাঁর সপ্রেম চক্ষু তাঁর অন্তরের সম্মতি ব্যক্ত করল। তারপর ঐ প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে শিশুটিকে দেখতে দেখতে তিনি পুনরায় সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। তখন সবিস্ময়ে দেখলাম তাঁর দেহমনের একাংশ উজ্জ্বল জ্যোতির আকারে বিলোমমার্গে পৃথিবীতে অবতরণ করছে। নরেন্দ্রকে দেখেই বুঝেছিলাম, এ সেই ঋষি।"[১]

নরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে ঠাকুর অপর একদিন আর একটি দিব্যদর্শনের কথা বলেন। ঐ দর্শনে তিনি দেখিতে পান, একটি অত্যুজ্জ্বল আলোক-রেখা কাশীধাম হইতে কলিকাতার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। এবং

১। অন্য এক সময়ে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, এই দিব্যদর্শনে দৃষ্ট দেবশিশুটি তিনি নিজে স্বয়ং।

তখন তিনি আনন্দের ভরে বলেন, "আমার প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছে, আমি যাকে চাই সে একদিন না একদিন আমার কাছে আসবেই।"

যাহা হউক, উপরি বর্ণিত প্রথম তিন সাক্ষাতের ফলে, নরেন্দ্রনাথ ও রামকৃষ্ণ পরস্পরের প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও, ঐ আকর্ষণের উপস্থিত হেতু তাঁহাদের উভয়ের ক্ষেত্রে একই ছিল না। তাই, পরস্পরের প্রতি তাঁহাদের মনোভাব ও আচরণও সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাব ধারণ করিল। আমরা নিম্নে তাহাই একটু লক্ষ্য করিলাম।

আমরা দেখিয়াছি, প্রথম সাক্ষাতের দিনে নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণকে অর্ধোন্মাদ (monomaniac) বলিয়া ধারণা করিলেও, তিনি তাঁহার ঈশ্বরীয় কথা শুনিয়া ও তাঁহার ভাব-সমাধি প্রভৃতি দেখিয়া বিশেষ মুগ্ধ বোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তারপর, পর পর পর দুইদিন তাঁহার অলৌকিক শক্তি দর্শনে তিনি একেবারে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ তৃতীয় দিনের ঘটনা হইতে তিনি সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়াছিলেন যে ঠাকুরের দূরতিক্রম্য দৈবশক্তির কাছে তাঁহার মন-বুদ্ধির শক্তি অতি অকিঞ্চিৎকর। তিনি ইচ্ছামাত্রেই মানুষের মনকে ফিরাইয়া উচ্চপথে চালিত করিতে পারেন। সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই একজন মহাদৈব-শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ। এবং তাঁহার অযাচিত কৃপা লাভ করা তাঁহার পক্ষে কম ভাগ্যের কথা নয়।

বাধ্য হইয়া এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার পর, নরেন্দ্রনাথকে তাঁহার পূর্বকার কতকগুলি ধারণা পরিবর্তিত করিতে হইল। পূর্বে তিনি মনে করিতেন—দুর্বল, অসহায় ও স্বল্পদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষকে গুরুরূপে বরণ করা অর্থহীন ও যারপরনাই আপত্তিকর। এবং ব্রাহ্ম-সমাজে যোগ দিয়া তাঁহার এই ধারণা আরও পুষ্টি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু এখন তিনি দেখিতে পাইলেন, সংসারে এমন সকল মহাপুরুষও থাকিতে পারেন যাঁহাদিগকে গুরুরূপে পাইলে মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

তবে এইভাবে ঠাকুরকে গুরুরূপে গ্রহণ করা কল্যাণকর মনে

করিলেও, নরেন্দ্রনাথ এই সময়ে নির্বিচারে তাঁহার সকল কথা মানিয়া লইতে কিছুতেই রাজি হইতে পারিলেন না। কারণ, তিনি ছিলেন (পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রাপ্ত) নিছক যুক্তিবাদী। না দেখিয়া, না বুঝিয়া ও যুক্তির ভিত্তিতে বিশেষভাবে যাচাই না করিয়া কোন কিছু বিশ্বাস করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাই, ঠাকুরের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার যে অবস্থা দাঁড়াইল তাহা এইরূপ:

একদিকে, তিনি শিষ্যের ন্যায় ঠাকুরকে গুরু বা দিশারী জ্ঞানে আগ্রহের সহিত তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলেন ও কি ভাবে ঈশ্বর লাভ করা যায় তাহা তাঁহাব নিকট হইতে জানিবার জন্য যত্নশীল হইলেন। কিন্তু অন্যদিকে, তাঁহার নিকট হইতে কোন নূতন তত্ত্ব গ্রহণ করিবার পূর্বে, তিনি সতর্ক বিচারক বা পরীক্ষকের ন্যায় তাঁহার প্রত্যেকটি অদ্ভুত দর্শন ও ব্যবহার যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা কষিয়া দেখিতে নিযুক্ত হইলেন।

অপরপক্ষে, ঠাকুর প্রথম হইতেই নরেন্দ্রনাথকে অখণ্ডের ঘরের একজন ধ্যানসিদ্ধ প্রবীণ ঋষি ও তাঁহার আপনার পরমাত্মীয় ও নিজস্ব লোক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং তখন হইতেই তাঁহার পানে ছুটিয়াছিল তাঁহার অন্তরের এক স্বতোদ্ভূত দুর্বার অহেতুক ভালবাসা। উহার মধ্যে সংশয়, দ্বিধা বা কোন কিছু চাওয়া-পাওয়ার স্থান ছিল না। এমন কি, স্বয়ং নরেন্দ্রনাথের কোন বিরক্তি বা বিরুদ্ধ আচরণেও উহার কোন ব্যত্যয় ঘটিত না। এবং (বিধি প্রেরণায়) উহার পশ্চাতে ছিল শুধু এক মহা আত্মদানের আকাঙ্ক্ষা, নিজেকে উজাড় করিয়া নরেন্দ্রনাথকে তাঁহার অন্তরের সকল অধ্যাত্ম সম্পদের অধিকারী করা।

পরের কতিপয় অধ্যায় হইতে আমরা এই বিষয়গুলি সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিব।

দ্বিতীয় স্তর

আট

গুরু ও শিষ্য

(১৮৮১-১৮৮৬)

(১) অহেতুক ভালবাসা, অলৌকিক সম্বন্ধ ও দিব্য-সংগ্রাম

দেখা যায়, নরেন্দ্রনাথ মোট প্রায় পাঁচ বৎসর কাল (১৮৮১ ডিসেম্বর—১৮৮৬ আগষ্ট) ঠাকুরের নিকট যাতায়াত করেন। (গত অধ্যায়ে বর্ণিত প্রথম তিন সাক্ষাতের পর) তিনি সাধারণতঃ সপ্তাহে একদিন বা দুইদিন দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন এবং ছুটি থাকিলে দুই-চারি দিন বা তাহার অধিক কাল সেখানে বাসও করিতেন। কোন কারণে তিনি যদি এক সপ্তাহ দক্ষিণেশ্বরে না আসিতে পারিতেন, ঠাকুর তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সংবাদ পাঠাইয়া নিজের কাছে আনাইতেন, অথবা নিজেই কলিকাতায় গিয়া তাঁহার সহিত কয়েক ঘণ্টা সময় কাটাইয়া আসিতেন। তবে জানা যায়, প্রথম দুই বৎসর (১৮৮২-৮৩) নরেন্দ্রনাথের উক্তরূপে নিয়মিত ভাবে দক্ষিণেশ্বর যাতায়াতের ব্যতিক্রম খুব বেশী ঘটে নাই। কিন্তু ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে, তিনি নানা কারণে কিছু দিনের জন্য ঐ নিয়ম রক্ষা করিতে পারেন নাই। (লী)।

যাহা হউক, উপরি-কথিত পাঁচ বৎসর কাল ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথ পরস্পরের সহিত যে মেলা-মেশা ও আলাপ-ব্যবহার করিয়াছেন এবং তখন যেসকল কর্মে তাঁহারা রত হইয়াছেন, তাহার নির্ভুল ও সুসম্বদ্ধ ইতিহাস পাওয়া যায়। উহা একদিকে যেমন বিস্ময়কর ও উপন্যাসের ন্যায় আনন্দদায়ক, অন্যদিকে তেমনি (মানবকল্যাণ সাধনার্থে) দুই

মহাশক্তিধর মহাপুরুষের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা, প্রস্তুতি ও আত্মোৎসর্গের অপূর্ব লীলা-কাহিনী। এবং প্রধানতঃ এই শেষোক্ত হেতুতেই, উহা আজ আধুনিক কালের নরনারীর পক্ষে এক অমৃতময় ও মহাজীবনপ্রদ অমূল্য অধ্যাত্ম সম্পদ হইয়া আছে। নিম্নে ও পরের কয়েক অধ্যায়ে আমরা উহারই একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইলাম।

গত অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি, প্রথম দর্শনের দিন হইতেই ঠাকুর নরেন্দ্রনাথের প্রতি এক প্রবল অহেতুক ভালবাসায় আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ফলে, তাঁহাকে দেখিলেই তিনি আনন্দে উল্লসিত হইতেন এবং তাঁহার অদর্শনে যারপরনাই ব্যাকুল ও ব্যথিত বোধ করিতেন। তাঁহার এই আনন্দ ও বেদনা যে কি গভীর ছিল তাহা দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলে সুস্পষ্ট হইবে।

(ক) ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে স্বামী প্রেমানন্দ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও রামদয়াল বাবুর সহিত) একদিন সন্ধ্যার সময় সর্বপ্রথম দক্ষিণেশ্বরে যান। তিনি বলিয়াছেন, "সেদিন (অল্প কিছু কথা-বার্তাদির পর) ঠাকুর রামদয়ালবাবুকে নরেন্দ্রনাথের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন এবং তিনি ভাল আছেন জেনে বললেন, 'সে অনেক দিন এখানে আসেনি, তাকে দেখতে বড় ইচ্ছে হয়েছে, একবার আসতে বলো।' তারপর (ধর্ম-বিষয়ক নানা কথাবার্তায়) রাত দশটা বাজলে, আমরা খাওয়া-দাওয়া করে ঠাকুরের ঘরের পূর্বদিকে (ও উঠানের উত্তরে) অবস্থিত বারান্দায় শুলাম। কিন্তু ঘণ্টাখানেক না যেতেই ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়ে আমাদের কাছে এসে বললেন, 'ওগো, ঘুমুলে?' আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠে বসে বললাম, 'আজ্ঞে না।' তখন তিনি বললেন, 'দেখ, নরেন্দ্রের জন্যে প্রাণের ভেতরটা যেন গামছা নিংড়োবার মত করে মোচড় দিচ্ছে। তাকে একবার দেখা করে যেতে বলো। সে সত্ত্বগুণের আধার, সাক্ষাৎ নারায়ণ। তাকে মাঝে মাঝে না দেখলে থাকতে পারিনে।' রামদয়ালবাবু ঠাকুরের পুরাতন ভক্ত, তাই তিনি তাঁর বালকের ন্যায় স্বভাবের কথা জানতেন।

এবং রাত পোহালেই তিনি নরেন্দ্রের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে আসতে বলবেন, ইত্যাদি নানা কথা বলে ঠাকুরকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সে রাত্রে ঠাকুরের আর ঘুম হল না। তিনি মাঝে মাঝে তাঁর ঘরে গিয়ে শুলেও, কিছুক্ষণ বাদেই আবার এসে আমাদের কাছে নরেন্দ্রের গুণের কথা ও তাকে না দেখে তাঁর বুকে যন্ত্রণা হচ্ছে তার বিষয় ব্যক্ত করতে লাগলেন।"

(খ) এইরূপ আর একটি কাহিনী এই। ঠাকুরের গৃহীভক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়া দেখিলেন, নরেন্দ্রনাথ অনেক দিন না আসায় ঠাকুর অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া আছেন। এই দিনের অবস্থা বর্ণনায় তিনি বলিয়াছেন, "সেদিন ঠাকুরের মন যেন নরেন্দ্রময় হয়ে রয়েছে, মুখে নরেন্দ্রের গুণানুবাদ ছাড়া অন্য কথা নাই। আমাকে বললেন, 'দেখ, নরেন্দ্র শুদ্ধ সত্ত্বগুণী। আমি দেখেছি সে অখণ্ডের ঘরের চারজনের একজন এবং সপ্তর্ষির একজন। তার কত গুণ তার ইয়ত্তা হয় না।' এই কথা বলতে বলতে তিনি নরেন্দ্রনাথকে দেখবার জন্যে অস্থির হয়ে অজস্র অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। পরে নিজেকে আর সামলাতে না পেরে এবং আমরা কি ভাবব মনে করে, দ্রুতপায়ে ঘরের উত্তরদিকের বারান্দায় গেলেন। এবং সেখানে রুদ্ধস্বরে 'মাগো, আমি তাকে না দেখে আর থাকতে পারছি না' ইত্যাদি বলে ভীষণভাবে কাঁদছেন, শুনতে পেলাম। কিছুক্ষণ পরে ঘরে ফিরে এসে তিনি অতি করুণ কাতর স্বরে বলতে লাগলেন, 'এত কাঁদলাম, কিন্তু নরেন্দ্র তো এলো না। তাকে একবার দেখবার জন্যে বিষম যন্ত্রণা হচ্ছে, বুকের ভিতরটায় যেন মোচড় দিচ্ছে। কিন্তু আমার এই টানটা সে বোঝে না।' এই কথা বলতে বলতে তিনি আবার অস্থির হয়ে ঘরের বাইরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বললেন, 'বুড়ো মিনসে, তার জন্যে এই রকম অস্থির হয়েছি ও কাঁদছি দেখে লোকেই বা কি বলবে, বল দেখি? তোমরা আপনার লোক, তোমাদের কাছে

লজ্জা হয় না। কিন্তু অপরে দেখে কি ভাববে, বল দেখি? কিন্তু কিছুতেই সামলাতে পারছি না।'

(গ) উক্ত ঘটনার বর্ণনা-দাতা (শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল) আরও বলিয়াছেন, "নরেন্দ্রের বিরহে ঠাকুরকে যেমন অধীর দেখেছি, আবার তার সঙ্গে মিলনেও তাঁকে তেমনি উল্লসিত হতে দেখেছি। পূর্বোক্ত ঘটনার কিছুকাল পরে ঠাকুরের জন্মতিথির দিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে দেখি, ভক্তগণ তাঁকে নূতন কাপড় ও মাল্যচন্দনাদি পরিয়ে অতি সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন, এবং তিনি তাঁর ঘরের উত্তর দিকের বারান্দায় বসে কীর্তন শুনছেন ও কখন ভাবাবিষ্ট হয়ে, কখন বা এক একটি মধুর আখর দিয়ে কীর্তন জমিয়ে তুলছেন। কিন্তু নরেন্দ্র না আসায় তাঁর আনন্দের ব্যাঘাত হচ্ছিল। তিনি মাঝে মাঝে চারদিকে চেয়ে দেখছিলেন ও আমাদের বলছিলেন, 'তাই তো, নরেন্দ্র এল না!' শেষে বেলা প্রায় দুপুরের সময় নরেন্দ্র এসে তাঁকে প্রণাম করলেন। তাকে দেখেই তিনি আনন্দে লাফিয়ে উঠে একেবারে তার কাঁধে বসে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। পরে তাঁর সহজ অবস্থা এলে, তিনি নরেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলতে ও তাকে আহারাদি করাতে ব্যস্ত হলেন। সে দিন আর তাঁর কীর্তন শোনা হল না।"

(ঘ) এই ভাবে আনন্দে অধীর হওয়া বিষয়ে ঠাকুর নিজেই একদিন বলেন, "নরেন্দ্র বেশী আসে না। সে ভাল। বেশী এলে আমি বিহ্বল হই।"

(ঙ) অপর একদিন তিনি বলেন, "(নরেন্দ্র প্রথম প্রথম) যখন আসতো—একঘর লোক—তবু ওর দিক্‌পানে চেয়েই কথা কইতাম। ও বোলতো, 'এদের সঙ্গে কথা কন'—তবে কইতাম। যদু মল্লিকের বাগানে কাঁদতুম,—ওকে দেখবার জন্যে পাগল হয়েছিলাম। এখানেও (কালীবাড়ীতে) ভোলানাথের হাত ধরে কান্না! ভোলানাথ বল্‌লে, 'একটা কায়েতের ছেলের জন্যে মশাই, আপনার এরূপ করা উচিত নয়।' মোটা বামুন (প্রাণকৃষ্ণ) একদিন হাত জোড় করে বল্‌লে, 'মশাই, ওর সামান্য পড়াশুনো, ওর জন্যে আপনি এত অধীর হন কেন?' "

(চ) এই বিষয়ে আরও পরে তিনি একদিন বলেন, "দুদিন যদি (নরেন্দ্র) আসতে দেরি করেছে তো বুকের ভিতরটায় যেন গামছায় মোচড় দিত। লোকে কি বলবে বলে, ঝাউতলায় গিয়ে ডাক ছেড়ে কাঁদতুম।"

নরেন্দ্রনাথের প্রতি ঠাকুরের এই অত্যদ্ভুত ভালবাসার সাক্ষ্যস্বরূপ এই প্রকারের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। এবং সে সকল বিবেচনা করিলে ইহা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, ঠাকুরের এই দুর্বার নিষ্কারণ ভালবাসা মনুষ্যসুলভ কোন লৌকিক সাধারণ বস্তু নয়। ইহা সম্পূর্ণরূপে অপার্থিব এবং ইহার পশ্চাতে দেখা যায় ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের এক মহা বিস্ময়কর অলৌকিক সম্বন্ধ ও তাঁহাদের (বিধিনির্দিষ্ট) কর্তব্য সম্পাদনের প্রয়োজন। ইহা আমরা নিম্নে যথাসম্ভব সংক্ষেপে বুঝিবার চেষ্টা করিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, তিনি ও নরেন্দ্রনাথ উভয়েই প্রেরিত পুরুষ ও জগৎ-কল্যাণে আবির্ভূত। একজন (অর্থাৎ ঠাকুর) স্বয়ং সর্বলোকেশ্বর নারায়ণের অবতার, অপর জন (নরেন্দ্রনাথ) অখণ্ডের ঘরের (সপ্ত ঋষির অন্যতম) নরঋষির একাংশ প্রকাশ। এবং তাঁহারা দুইজনে (নর ও নারায়ণ) অভিন্ন যুগ্ম-আত্মার ন্যায় চির-সহচর ও জগতের হিতে যুগে যুগে একত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন।[১]

তবে এইভাবে নিজেদের উভয়কে ঈশ্বরীয় প্রকাশ বলিয়া উল্লেখ করিলেও ঠাকুর আরও বলিতেন, "নর-লীলায় সবই নরের ন্যায় হয়।" অর্থাৎ, তিনি স্বরূপতঃ স্বয়ং নারায়ণ ও নরেন্দ্রনাথ সর্বোচ্চলোকের "দিব্যজ্যোতিঃঘন তনু," অসীম জ্ঞান-শক্তির আধার, নারায়ণকল্প ঋষি হইলেও, নরলীলায় তাঁহারা উভয়েই নরকল্যাণ সাধনের নিমিত্ত নিজেদের মায়াবৃত করিয়া ও (গভীর জড়ের সাহায্যে রচিত) নরদেহ পরিগ্রহ করিয়া নরের ন্যায় চিন্তা, চেষ্টা ইত্যাদি কর্ম করিতেই প্রেরিত ও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এবং তাহারই মাধ্যমে তাঁহারা বিধির ইচ্ছায়

১। নর ও নারায়ণের এইরূপ আবির্ভাবের বিষয় ভারতের নানা প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত দেখা যায়।

তাঁহাদের অন্তর্নিহিত (ও স্বস্বরূপীয়) দেবভাব ও দৈবশক্তির দ্বারা তাঁহাদের আগমনোদ্দেশ্য সফল করিয়াছেন। এই কারণেই দেখা যায়, তাঁহাদের জীবনে নরভাব ও দেবভাবের একটা যুগপৎ খেলা চলিয়াছে। এবং ইহা লক্ষ্য করিয়াই ঠাকুরকে স্বামীজী (নরেন্দ্রনাথ) 'নরদেব' ও পূজনীয় শরৎ মহারাজ 'দেবমানব' আখ্যা দিয়াছিলেন।

এই দেবমানব বলিয়াই ঠাকুর একদিকে যেমন মানবের ন্যায় নরেন্দ্রনাথের অদর্শনে ব্যথিত ও তাহার সহিত মিলনে উল্লসিত হইয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি তিনি তাঁহার দেবভাবের দ্বারা তাহাকে (আধ্যাত্মিক) জ্ঞান ও শক্তির এক প্রচণ্ড ও বিশ্ববিজয়ে সমর্থ অতুলনীয় আধার করিয়া গড়িবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এবং দেখা যায়, এই দুই'এর মূলেই ছিল (বিরাটেচ্ছার অভিপ্রেত) জগৎ-কল্যাণ সাধনের অপরিহার্য প্রয়োজন।

বস্তুতঃ ঠাকুর তাঁহার নানা দিব্যদর্শন হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন, জগৎ-কল্যাণের জন্য তাঁহার এবারকার আবির্ভাব সার্থক করিবেন নরেন্দ্রনাথ, তাঁহার বিরাট সাধনা ও সিদ্ধির সুফলকে রূপ দান করিয়া জগতে ছড়াইবেন নরেন্দ্রনাথ এবং (শান্তি-কল্যাণের আধার, মহা-সাম্যসমন্বয়ের প্রতিমূর্তি এবং জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল নরনারীর আশ্রয়, অবলম্বন ও দিশারী) তাঁহাকে জগতে ব্যাখ্যা ও প্রতিষ্ঠা করিবেন নরেন্দ্রনাথ। তাই, তিনি দৈব-প্রেরণায় (শুধু জীবকল্যাণের জন্যই) নরেন্দ্রগতপ্রাণ। নরেন্দ্রকে দেখিয়া তাঁহার আনন্দ, তাহার গুণগানে তিনি পঞ্চমুখ, তাহার বিরহে তিনি দিক্‌হারা এবং তাহাকে মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য তিনি তাঁহার সর্বস্ব দান করিতে ব্যগ্র।

কিন্তু যাহার জন্য তাঁহার এই আকুল উন্মাদনা, তিনি স্বয়ং তাঁহার ভালবাসা বা তজ্জনিত স্তুতি-প্রশংসার কোনও ধারই ধারিতেন না। বরং দেখা যায়, ঠাকুর ভক্তগণের নিকট তাহার প্রশংসা-সূচক কোন কথা বলিতে আরম্ভ করিলে তিনি কখন সেস্থান হইতে

খাইতেন, কখন ঠাকুরকে তিরস্কার করিতেন, কখন বা তাঁহাকে বলিতেন, 'আপনার মাথা খারাপ হয়েছে।' এই বিষয়ে একদিনকার একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

এই দিন দক্ষিণেশ্বরে কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি বিখ্যাত ব্রাহ্ম-নেতাগণের সহিত নরেন্দ্রনাথ একই আসরে ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়াছিলেন। এবং ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া তাহাদের সকলকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। পরে সভা ভাঙ্গিলে (এবং কেশবচন্দ্র প্রভৃতি ব্রাহ্মনেতাগণ চলিয়া গেলে) ঠাকুর বলিলেন, "দেখলাম, কেশব যে-রূপ একটা শক্তির সাহায্যে জগদ্বিখ্যাত হয়েছে, নরেন্দ্রের ভিতর ঐ রকম আঠারটা শক্তি পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। আবার দেখলাম, কেশব-বিজয়ের ভিতর জ্ঞানালোক দীপশিখার ন্যায় জ্বলছে, আর নরেন্দ্রের ভিতর বিরাজ করছে জ্ঞান-সূর্য, যা সেখান থেকে অজ্ঞানের শেষ চিহ্ন পর্যন্ত দূরীভূত করেছে।" তাঁহার এই কথা শুনিবামাত্র নরেন্দ্রনাথ উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, "মশাই, কি বলছেন? কোথায় জগদ্বিখ্যাত কেশব ও মহামনা বিজয়, আর কোথায় আমার ন্যায় নগণ্য কলেজের ছাত্র! আপনি আর কখন এরকম কথা বলবেন না।" উত্তরে ঠাকুর বলিলেন, "কি করব রে,—তুই কি ভাবিস আমি ঐ কথা বলেছি? মা আমাকে ঐ রূপ দেখালেন, তাই বলেছি। মা তো আমাকে সত্য ছাড়া মিথ্যা কখন দেখান নি।" কিন্তু নরেন্দ্রনাথ তাঁহার এই দাবী সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। তাই বলিলেন, "মা দেখান, কি আপনার মাথার খেয়ালে দেখেন তা কে বলতে পারে? আমার ওরকম হলে, আমি মনে করতাম ও আমার মাথার খেয়ালেই দেখছি। পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞান এ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে যে, আমাদের চোখ কান প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের অনেক স্থলে প্রতারিত করে। বিশেষ মনে যদি কিছু দেখার বাসনা থাকে, তবে তো কথাই নাই। আপনি আমাকে স্নেহ করেন ও সব বিষয়ে বড় দেখতে ইচ্ছা করেন, তাই হয়তো আপনার ঐ রকম সব কাল্পনিক দর্শন এসে উপস্থিত হয়।"

শুধু ইহাই নয়। ঠাকুরের প্রায় সকল প্রকার অলৌকিক দর্শন সম্বন্ধেই নরেন্দ্রনাথ সময়ে সময়ে এইরূপ সংশয় ও অবিশ্বাস-সূচক মন্তব্য করিতেন। ঠাকুরের মন যখন উচ্চস্তরে (অর্থাৎ, উচ্চ ভাব-ভূমিতে) থাকিত, তখন তিনি তাঁহার ঐ সমস্ত মন্তব্যকে কোন আমল দিতেন না। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় নরেন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ যুক্তি সকল তাঁহাকে বিষম ভাবাইয়া তুলিত। বালক-স্বভাব ঠাকুর তখন ভাবিতেন, 'নরেন্দ্র ও কথা বলে কেন? সে তো মিথ্যা বলবার লোক নয়!' তাই, তিনি অবশেষে এ বিষয় স্বয়ং জগন্মাতাকে জিজ্ঞাসা করিতেন এবং তাঁহার শ্রীমুখ হইতে যখন শুনিতেন, "ওর কথা শুনিস কেন? কিছুদিন পরে ও সবই মানবে," কেবল তখনই তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন।

আবার, ঠাকুর যে তাহাকে অত্যধিক ভালবাসিতেন, শুধু সেজন্যও নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে সময়ে সময়ে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতেন। ইহার একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত এই। একবার নরেন্দ্রনাথ কিছুদিন দক্ষিণেশ্বরে না আসায়, ঠাকুর ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য কলিকাতায় রওনা হন। সেদিন রবিবার থাকায় তিনি মনে করিয়াছিলেন যে নরেন্দ্রকে তাহার বাড়ীতে নাও পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সান্ধ্য উপাসনার সময় ভজন গাহিবার জন্য সে নিশ্চয়ই সেখানে উপস্থিত থাকিবে।[১] এই সমাজের বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী-প্রমুখ নেতাগণ ইতিপূর্বে অনেকবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়া ঠাকুরের সহিত দেখা করিয়াছেন। তাই, তিনি কোন ইতস্ততঃ না করিয়া সন্ধ্যাকালে ঐ সমাজের মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অর্ধবাহ্যদশায় উপাসনা-সভায় প্রবেশ করিয়া তিনি বেদীর উপরে উপবিষ্ট আচার্যের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আচার্য তখন বক্তৃতা করিতেছিলেন। কিন্তু ঠাকুর আসিয়াছেন

১। নরেন্দ্রনাথ এই কালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ছিলেন ও (অন্য কোথাও না গেলে) সেখানে প্রতি রবিবারে সান্ধ্যোপাসনায় সময় ভজন গাহিতেন।

শুনিয়া অনেক শ্রোতা দাঁড়াইয়া অথবা বেঞ্চের উপর উঠিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। এইভাবে সভায় বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইলে, আচার্য তাঁহার বক্তৃতা বন্ধ করিলেন এবং নরেন্দ্রনাথ ছুটিয়া ঠাকুরের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু (ঠাকুরের সংস্পর্শে আসিয়া কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণের ধর্মমত পরিবর্তিত হওয়ায়) উপস্থিত ব্রাহ্মনেতাগণ এইকালে ঠাকুরের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই, বেদীর আচার্য বা অপর কোন নেতা ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে অগ্রসর হইলেন না।

এদিকে অর্ধবাহ্যদশাগ্রস্ত ঠাকুর কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া ধীরে ধীরে বেদীর নিকটে আসিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার ঐ অবস্থা দেখিবার জন্য সকলের আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পাওয়ায়, সভার বিশৃঙ্খলতা আরও বাড়িয়া উঠিল। এবং তাহা নিবারণ করা অসম্ভব দেখিয়া, সভার কর্তৃপক্ষ সভামন্দিরের আলো নিবাইয়া দিলেন। ফলে, অন্ধকার হইতে বাহির হইবার জন্য সকলে দরজার দিকে ছুটিলেন এবং তজ্জন্য মন্দির মধ্যে বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। তখন নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমাধি ভাঙ্গিবামাত্র তাঁহাকে মন্দিরের পিছনের দ্বার দিয়া কোনরূপে বাহিরে আনিয়া গাড়িতে করিয়া দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছাইয়া দিলেন।

নরেন্দ্রনাথ পরে বলিয়াছেন, "সেদিন ঠাকুরকে আমার জন্য ঐভাবে অপমানিত হতে দেখে আমি মর্মাহত হয়েছিলাম। তাই, তাঁকে তাঁর ঐ কার্যের জন্য খুবই তিরস্কার করেছিলাম। কিন্তু ঠাকুর সেদিন উক্ত ঘটনায় বা আমার তিরস্কারে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ বা ব্যথিত বোধ করেন নি।"

ইহার হেতু সম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "আমাকে ঐ ভাবে অত্যধিক ভালবাসার জন্যে, আমি তাঁকে কখন কখন অতি কঠোর কথা বলতেও ইতস্ততঃ করিনি। বলেছি, ভরত রাজা 'হরিণ' ভাবতে ভাবতে পরজন্মে হরিণ হয়ে জন্মেছিলেন, আপনিও আমার কথা ভাবতে ভাবতে আমার ন্যায় হয়ে জন্মাবেন।" আমার ঐ কথা শুনে (বালকের ন্যায় সরল) ঠাকুর ভয় পেয়ে বললেন, 'তাই তো রে, তা হলে আমার

কি হবে, আমি যে তোকে না দেখে থাকতে পারিনে।' দারুণ বিমর্ষ হয়ে ঠাকুর ঐ কথা মাকে (শ্রীশ্রীজগদম্বাকে) জানাতে কালীমন্দিরে গেলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে হাসতে হাসতে ফিরে এসে বললেন, 'যা শালা, আমি তোর কথা শুনব না। মা বললেন—তুই ওর ভিতর নারায়ণকে দেখতে পাস, তাই ওকে ভালবাসিস। তা যেদিন না দেখতে পাবি, সেদিন ওর মুখও দেখতে পারবি না।' এই বলে আমি ইতিপূর্বে যা কিছু বলেছি, তা তিনি সেদিন ঐ এক কথায় উড়িয়ে দিয়েছিলেন।"

যাহা হউক, উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যায়, নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দিব্যদর্শনের দাবী ও তাহার উপর তাঁহার অত্যধিক ভালবাসা —বিশেষভাবে এই দুইটির উপরই তাহার আক্রমণ চালাইতেন। ইহা ব্যতীত দেখা যায়, ঠাকুরের সহিত তাহার আরও কয়েকটি বিষয়ে গুরুতর মত-বিরোধ ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, (১) নরেন্দ্রনাথ অবতার মানিতেন না, (২) সাকারোপসনা ও মূর্তিপূজা ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, এবং (৩) অদ্বৈতবাদকে নাস্তিকতা তুল্য বলিয়া মনে করিতেন। তাই, এই বিষয়গুলি লইয়াও ঠাকুরের সহিত তাহার একটা সংগ্রাম চলিত। অলৌকিক দিব্য-বন্ধনে আবদ্ধ এই দুই মহাপুরুষের মধ্যে এই সংগ্রামও যে অপূর্ব দিব্যরূপ পরিগ্রহ করিত, তাহার একটু পরিচয় আমরা সংক্ষেপে নিম্নে দিলাম

(১) অবতারবাদ সম্বন্ধে ইহাদের সংগ্রামের ধারা একদিনকার একটি ঘটনা আলোচনা করিলেই আমরা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারিব।

ঠাকুর বলেন ও নানাভাবে বুঝান, ঈশ্বর মানুষ দেহ ধারণ করে সময়ে সময়ে (মর্ত্যালোকে) অবতীর্ণ হন। কিন্তু নরেন্দ্র তাহা মানেন না। আবার গিরিশ ঘোষের উহাতে জ্বলন্ত বিশ্বাস। তাই, একদিন গিরিশের বাড়ীতে গিয়া ঠাকুরের ভারি ইচ্ছা হইল যে তাঁহার সম্মুখে উহারা দুইজনে ঐ বিষয়ে ইংরেজিতে বিচার করেন।

তাঁহার আদেশে বিচার আরম্ভ হইল, কিন্তু ইংরেজিতে নয়,

বাঙ্গলায়। নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ঈশ্বর অনন্ত। তিনি সকলের ভিতরেই আছেন—শুধু একজনের ভিতরে এসেছেন, এমন নয়।"

ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ সস্নেহে বলিলেন—"ওরও যা মত, আমারও তাই মত। তিনি সর্বত্র আছেন। তবে একটা কথা আছে—শক্তি বিশেষ। তিনি কোনখানে অবিদ্যাশক্তির প্রকাশ, কোনখানে বিদ্যা-শক্তির প্রকাশ। কোন আধারে শক্তি বেশী, কোন আধারে শক্তি কম। তাই সব মানুষ সমান নয়।"

গিরিশ—"তুমি কেমন করে জানলে, তিনি দেহ ধারণ করে আসেন না?"

নরেন্দ্র—"তিনি অবাঙ্মনসোগোচরম্।"

শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন—"না, তিনি শুদ্ধ মনের গোচর। শুদ্ধ মন, শুদ্ধ আত্মা একই। ঋষিরা শুদ্ধ মন, শুদ্ধ আত্মার দ্বারা শুদ্ধ আত্মাকে সাক্ষাৎকার করেছিলেন।"

গিরিশ (নরেন্দ্রের প্রতি)—"মানুষকে জ্ঞান ভক্তি শেখাবার জন্যে তিনি দেহ ধারণ করে আসেন। না হলে কে শেখাবে?"

নরেন্দ্র—"কেন? তিনি অন্তরে থেকে বুঝিয়ে দেবেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)—"হাঁ হাঁ, অন্তর্যামীরূপে তিনি বোঝাবেন।"

ইহার পর গিরিশ ও নরেন্দ্রের মধ্যে ঘোরতর তর্ক চলিল। Infinity (অনন্ত)—তার কি অংশ হয়? Herbert Spencer কি বলেন? Tyndal, Huxley প্রভৃতি কি বলে গেছেন, ইত্যাদি বহু বিষয়ে কথা কাটাকাটি চলিতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"দেখো, এগুনো আমার ভাল লাগছে না। আমি দেখছি তিনিই সব হয়েছেন. বিচার আর কি করবো? তবে এও বটে, আবার তাও বটে। বেদান্ত শঙ্কর যা বুঝিয়েছেন তাও আছে, আবার রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও আছে।"

পরে পুনরায় বলিলেন—"দেখেছি বিচার করে এক রকম জানা যায়, তাঁকে ধ্যান করে এক রকম জানা যায়। আবার তিনি যখন দেখিয়ে দেন—সে এক। তিনি যদি দেখিয়ে দেন—এর নাম অবতার,

এই তার মানুষ লীলা, তা হলে আর বিচার করতে হয় না, কাউকে বুঝিয়ে দিতে হয় না।"

এই ভাবে বিচার শেষ হইলে, ঠাকুর নরেন্দ্রকে ডাকিয়া কাছে বসাইলেন। নরেন্দ্র অবতার মানেন নাই—তাহাতে কি আসিয়া যায়? ঠাকুরের ভালবাসা যেন আরও উথলিয়া উঠিল। তাহাকে একদৃষ্টে দেখিতে দেখিতে তাহার আরও কাছে আসিয়া বসিলেন এবং তাহার গায়ে হাত দিয়া কহিলেন—"মান কয়লি তো কয়লি, আমরাও তোর মানে আছি (রাই)।"

তারপর পুনরায় বলিলেন, "যতক্ষণ বিচার ততক্ষণ তাঁকে পায় নাই। তোমরা বিচার করছিলে আমার ভাল লাগে নাই। ঈশ্বরকে যত লাভ হবে, ততই বিচার কম্‌বে। তাঁকে লাভ হলে আর শব্দ—বিচার—থাকে না। তখন নিদ্রা—সমাধি।"

এই বলিয়া ঠাকুর নরেন্দ্রের গায়ে হাত বুলাইয়া, মুখে হাত দিয়া, আদর করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—'হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ।' এবং ঐরূপ করিতে করিতে তিনি (নরেন্দ্রের পায়ে হাত রাখিয়া) ভাবস্থ হইয়া পড়িলেন। ক্ষণপরে ঐ অবস্থায় নরেন্দ্রের কাছে হাত জোড় করিয়া বলিলেন—'একটা গান।' নরেন্দ্র গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাহা শুনিতে শুনিতে তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন।

উপরের বর্ণনা হইতে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, ঠাকুর আবশ্যকবোধে নরেন্দ্রের মতের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেও, উহাতে তিনি সুখী হইতেন না। ইহা ছাড়া দেখা যায়, বিচারে নরেন্দ্র পরাজিত হইয়াছেন, এ কথা কেহ বলিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিতেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, উক্ত বিচারের দিনেই নরেন্দ্রনাথ আসিবার পূর্বে ঠাকুর গিরিশকে বুঝাইতেছিলেন, 'ঈশ্বর অনন্ত হউন, আর যত বড়ই হউন, তিনি মানুষ দেহ ধারণ করে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন' এবং 'তিনি সর্বত্র থাকলেও অবতারে তাঁর শক্তি বেশী প্রকাশ এবং সেই শক্তি কখন কখন পূর্ণভাবে থাকে,' ইত্যাদি। তাঁহার মুখে এই সকল কথা

শুনিয়া গিরিশ উৎসাহিত হইয়া সহাস্যে বলিলেন—"(পূর্বে একদিন অবতার সম্বন্ধীয় বিচারে) নরেন্দ্র আমার কাছে তর্কে হেরেছে।" শুনিয়া ঠাকুর বলেন, "না। সে আমায় বলেছে, গিরিশ ঘোষের মানুষকে অবতার বলে অত বিশ্বাস, আমি আর কি বলবো। অমন বিশ্বাসের উপর কিছু বলতে নেই।"

বস্তুতঃ যে উচ্চ বুদ্ধি ও বোধে নরেন্দ্রনাথ তাহার যুক্তির অবতারণা করিতেন, তাহার মূল্য যে দুর্বল অন্ধ-বিশ্বাসের চাইতে অনেক বেশী তাহা ঠাকুর বুঝিতেন। এবং অবতার সম্বন্ধে গিরিশের সহিত তাহার বিচার শুনিয়া ঠাকুর তাহাকে পরাজিত মনে করেন নাই। শুধু বলিয়াছেন, 'বিচারের দ্বারা তাঁকে জানা যায় না। তিনি যদি দেখিয়ে দেন, তবেই বোঝা যায় যে তিনি মানুষ হয়ে লীলা করেন।'

(২) ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের সাকারোপাসনা ও মূর্তিপূজা সম্পর্কিত সংঘর্ষও এইভাবে পরিশেষে এক অপরূপ দিব্যশ্রী লাভ করিত। দৃষ্টান্ত :

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইবার সময়ে, নরেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র "অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বরে" বিশ্বাসী হইয়া শুধু তাঁহারই উপাসনা করিবেন এইরূপ এক অঙ্গীকার পত্র সই করিয়া দিয়াছিলেন। তজ্জন্য (ও যুক্তি-বিরুদ্ধ বলিয়া) তিনি সাকারোপাসনা ও মূর্তিপূজার ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু (মহাসমন্বয়ের মূর্ত বিগ্রহ) ঠাকুর তাহাকে তাহার মতের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে কখন কোন অসুবিধা বোধ করিতেন না। বরং সময়ে সময়ে বিশেষ কৌতুকই অনুভব করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একদিন তিনি বলেন, "ব্রহ্মজ্ঞানীরা সাকার মানে না। (তারপর হাসিয়া) নরেন্দ্র বলে 'পুত্তলিকা।' আবার বলে, 'উনি (অর্থাৎ ঠাকুর) এখনও কালীঘরে যান'!" (কথামৃত, ২রা জুন, ১৮৮৩)।

তবে দেখা যায়, বালক-স্বভাব ঠাকুর (তাঁহার সাধারণ অবস্থায়) নরেন্দ্রনাথের ঐরূপ কথায় প্রথম প্রথম দুই-এক দিন বেশ বিচলিত

বোধ করিয়াছেন। একদিন তিনি ঐ কালের একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলেন, "যদু মল্লিকের বাগানে নরেন্দ্র বললে, 'তুমি ঈশ্বরের রূপ-টুপ যা দেখ, ও মনের ভুল।' তখন অবাক হয়ে বললাম, 'কথা কয় যে রে?' নরেন্দ্র বললে, 'ও অমন হয়।' তখন মার কাছে এসে কাঁদতে লাগলাম। বললাম, 'মা একি হলো! এ সব কি মিছে? নরেন্দ্র এমন কথা বললে!' তখন দেখিয়ে দিলে চৈতন্য—অখণ্ড চৈতন্য—চৈতন্যময় রূপ। আর বললে, 'এ সব কথা মেলে কেমন করে যদি মিথ্যা হবে!' তখন বলেছিলাম, 'শালা, তুই আমায় অবিশ্বাস করিয়ে দিয়েছিলি! তুই আর আসিস না'।" কিন্তু দেখা যায়, নরেন্দ্রনাথ উহা গায়ে মাখেন নাই। এবং তিনি উহার পরেও ঠিক পূর্বের ন্যায়ই খোলা ও খুশী মনেই ঠাকুরের নিকট যাতায়াত করিতে থাকেন।

এই বিষয়ে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই। ঠাকুরের কাছে আসিবার পূর্বে, নরেন্দ্রনাথের ন্যায় ও তাহারই পরামর্শে, শ্রীযুত রাখালও (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইয়া শুধু নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করিব বলিয়া পূর্বোক্তরূপ এক প্রতিজ্ঞাপত্র সই করিয়াছিলেন। কিন্তু উহার অল্প পরেই রাখালচন্দ্র ঠাকুরের দর্শন লাভ করিয়া (১৮৮১) সাকারোপাসনায় পুনরায় আস্থাবান হন। ইহার কয়েকমাস পরে, নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট আসিতে আরম্ভ করেন ও কিছুদিন পরে দেখিলেন যে, রাখালচন্দ্র ঠাকুরের সহিত (দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর) মন্দিরে মন্দিরে গিয়া দেববিগ্রহ সকলকে প্রণাম করিতেছেন। ইহাতে সত্যনিষ্ঠ নরেন্দ্রনাথ রাখালকে বলিলেন—"ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীকার পত্র সই করে পুনরায় মন্দিরে প্রণাম করায়, তুমি নিজেকে মিথ্যাচার দোষে দূষিত করছ।" ঐ সময় হইতে কোমল-স্বভাব রাখাল নরেন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিতেও ভীত ও সঙ্কুচিত বোধ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ঠাকুর উহার কারণ জানিতে পারিয়া নরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "রাখালকে আর কিছু বলিস নি, সে তোকে দেখলেই ভয়ে জড়সড় হয়। তার এখন

সাকারে বিশ্বাস হয়েছে, তা আর কি করবে, বল্। সকলেই কি প্রথম হতেই নিরাকারের ধারণা করতে পারে ?”

ঠাকুরের এই অনুরোধে নরেন্দ্রনাথ নিরীহ-স্বভাব রাখালচন্দ্রের উপর দোষারোপ করিতে বিরত হইলেন বটে। কিন্তু সাকারোপাসনার প্রতি তিনি পূর্বের ন্যায় বিরূপই রহিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তিনি রাধাকৃষ্ণের ঐতিহাসিক সত্যতা বিশ্বাস করিতেন না এবং তাহাদের (শাস্ত্রবর্ণিত) ক্রিয়া-কলাপ তিনি অবৈধ ও আপত্তিকর বলিয়া মনে করিতেন। আর বিশেষভাবে ঠাকুরের নিত্য উপাস্য (ও অনুক্ষণের আশ্রয়) মা-কালীর উপরই চলিত তাহার সর্বাপেক্ষা তীব্র আক্রমণ। অথচ ইহাতেও তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কখন কোন বিচ্ছেদ ঘটে নাই। ইহার হেতু সম্বন্ধে ঠাকুর একদিন (২৪শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩) বলেন—

“আমার যারা আপনার লোক, তাদের বোকলেও আবার আসবে। আহা, নরেন্দ্রের কি স্বভাব! মা-কালীকে আগে যা ইচ্ছে তাই বলতো। আমি বিরক্ত হয়ে একদিন বলেছিলাম, ‘শালা, তুই আর এখানে আসিস্ না।’ তখন সে আস্তে আস্তে গিয়ে তামাক সাজে। যে আপনার লোক, তাকে তিরস্কার করলেও যাবে না। কি বল ? তারপর পুনরায় বলিলেন—“নরেন্দ্র স্বতঃসিদ্ধ—নিরাকারে নিষ্ঠা।”

(৩) সাকারোপাসনার ন্যায় অদ্বৈতবাদেও নরেন্দ্রনাথের অনাস্থা ছিল অতি প্রবল। কিন্তু ঠাকুর অকস্মাৎ একদিন তাঁহার অলৌকিক শক্তি প্রয়োগে যেভাবে উহার অবসান ঘটান তাহা এক অশ্রুতপূর্ণ দিব্যকাহিনী।

নরেন্দ্রনাথ অদ্বৈততত্ত্বের উত্তম অধিকারী জানিয়া, ঠাকুর তাহার আগমনের প্রথম দিন হইতেই তাহাকে ঐ তত্ত্বে বিশ্বাসী করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসিলেই ঠাকুর তাহাকে অষ্টাবক্র-সংহিতা প্রভৃতি অদ্বৈত মতের গ্রন্থ সকল পড়িতে দিতেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ও সগুণ ব্রহ্মের দ্বৈতভাবে উপাসনায় নিযুক্ত নরেন্দ্রনাথের ঐ সকল গ্রন্থ পাঠের অযোগ্য মনে হইত। এবং উহা অল্প কিছু পড়িয়াই তিনি বলিতে আরম্ভ করিতেন—“এতে আর

নাস্তিকতায় তফাৎ কি ? সৃষ্ট জীব আপনাকে স্রষ্টা বলে ভাববে—এর অপেক্ষা বড় পাপ আর কি হতে পারে ? আমি ঈশ্বর, তুমি ঈশ্বর, জন্ম-মৃত্যুশীল সব পদার্থই ঈশ্বর, এর চেয়ে অযুক্তিকর কথাই বা কি আর হতে পারে ? যে সকল মুনিঋষি এই গ্রন্থগুলি লিখেছিলেন, তাদের নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছিল, নচেৎ তারা এরকম সব কথা লিখতে পারতেন না।" ঠাকুর তাহার কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিতেন —"তা তুই ও কথা এখন নাই বা নিলি। তা বলে মুনিঋষিদের নিন্দা বা ঈশ্বরীয় স্বরূপের ইতি করিস্ কেন ? তুই তাঁকে ডেকে যা, তারপর তিনি তোর কাছে যেভাবে প্রকাশ হন তাই-ই বিশ্বাস করিস্।" কিন্তু নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই কথায় সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না। কারণ, যাহা যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা যায় না, তাহা এইকালে তাঁহার নিকট মিথ্যা বলিয়াই মনে হইত। তাই, (ঐ মিথ্যার প্রতিবাদেই) তিনি অন্য অনেকের নিকটও কথাপ্রসঙ্গে অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিতে ও সময়ে সময়ে তীব্র শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিতেও কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিতেন না।

ইহা হইলেও, ঠাকুর জানিতেন যে জ্ঞানের পথই নরেন্দ্রনাথের পথ। এবং তজ্জন্য তিনি সুযোগ পাইলেই তাহার নিকট অদ্বৈতবাদের নানা সিদ্ধান্ত তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন। এইভাবে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর একদিন নরেন্দ্রনাথকে অদ্বৈত মতে জীব ও ব্রহ্ম যে এক তাহা বুঝাইতেছিলেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ উহা মনোযোগের সহিত শুনিয়াও মানিয়া লইতে পারিলেন না। এবং ঠাকুরের কথা শেষ হইতেই তিনি (বারান্দায় গিয়া) হাজরা মহাশয়ের[১] নিকট

১। হাজরা মহাশয় (প্রতাপচন্দ্র হাজরা) ঠাকুরের দেশের লোক, বয়স ৪৬-৪৭। তিনি ঠাকুরের ঘরের পূর্ব দিকের বারান্দায় বসিয়া প্রায় সর্বদাই জপ করিতেন এবং নিষ্কাম উপাসনার উচ্চ উচ্চ কথা বলিতেন। কিন্তু কিছু দেনা ও সংসারের অসচ্ছল অবস্থার জন্য তিনি মনে মনে অর্থ কামনা করিতেন। ঠাকুর বলিতেন, "হাজরা শালার ভারি পাটোয়ারী বুদ্ধি।" তাহা হইলেও, নরেন্দ্রনাথ তাহার উপর বিশেষ সদয় ছিলেন।

বসিয়া ঐ সকল কথা আলোচনা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন —"এ কি কখন হতে পারে? ঘটিটা ঈশ্বর, বাটিটা ঈশ্বর, যা কিছু দেখছি, সবই ঈশ্বর এবং আমরা সকলেই ঈশ্বর!" স্বভাবানুসারে হাজরা মহাশয়ও নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে এই ব্যঙ্গে যোগ দেওয়ায়, উভয়ের মধ্যে এক প্রবল হাসির রোল উঠিল। ঠাকুর এই সময়ে তাঁহার ঘরে অর্ধবাহ্যদশায় ছিলেন। নরেন্দ্রের হাসি শুনিয়া তিনি বালকের ন্যায় পরিধেয় কাপড়খানি বগলে করিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন— "তোরা কি বলছিস্ রে?" এবং তৎসঙ্গেই নরেন্দ্রের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। এই স্পর্শের ফল নরেন্দ্রনাথের ভিতর যাহা হইল তাহা তিনি নিজে এই-ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন:—

"সেদিনকার ঐ অদ্ভুত স্পর্শে নিমেষের মধ্যে আমার ভিতর এক আশ্চর্য ভাবান্তর উপস্থিত হল। স্তম্ভিত হয়ে দেখতে লাগলাম, সত্য সত্যই ঈশ্বর ছাড়া এ বিশ্বে আর কিছুই নেই। দেখেও নীরব রইলাম, ঐ ভাব কতক্ষণ থাকে তাই দেখবার জন্যে। কিন্তু সে ঘোর সেদিন কিছুমাত্র কমলো না। বাড়ী ফিরে দেখি, সেখানেও তাই—যা কিছু দেখি সবই তিনি। খেতে বসলাম, দেখি ভাত, থালা পরিবেশক এবং আমি নিজেও ঐ তিনিই। দুই এক গ্রাস ভাত খেয়ে আমি স্থির হয়ে বসে রইলাম। মা বললেন—'বসে আছিস কেন রে, খা না?' মার কথায় হুঁস হওয়ায় আবার খেতে আরম্ভ করলাম। এইভাবে খেতে, শুতে, কলেজে যেতে এবং সব সময়েই ঐ রকম দেখতে লাগলাম ও কেমন যেন একটা ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে রইলাম। রাস্তায় চলেছি, গাড়ী আসছে দেখছি, কিন্তু সরবার প্রবৃত্তি হত না। মনে হত ঐ গাড়ী ও আমি একই বস্তু। এই সময়ে হাত-পা সর্বদা অসাড় হয়ে থাকত; ভাবতাম বোধ হয় পক্ষাঘাত হবে। খেয়ে কোন তৃপ্তি হত না। মনে হত, যেন আর কেউ খাচ্ছে। খেতে খেতে মাঝে মাঝে শুয়ে পড়তাম এবং কিছুক্ষণ পরে উঠে আবার খেতাম। ফলে, আমি কোন কোন দিন অনেক বেশী খেয়ে ফেলতাম,—কিন্তু তাতে কোন অসুখ হত না। মা

ভয় পেয়ে বলতেন, 'তোর দেখছি ভিতরে ভিতরে একটা বিষম অসুখ হয়েছে।' কখনও বা বলতেন, 'ও আর বাঁচবে না।' যখন আমার ঐ আচ্ছন্ন ভাবটা কমে যেত, তখন জগৎটাকে একটা স্বপ্ন বলে মনে হত। হেদুয়া পুকুরের পারে বেড়াতে গিয়ে, রেলিং-এ মাথা ঠুকে দেখতাম এগুলি স্বপ্ন, না সত্য! মনের এই অবস্থা কিছুদিন ধরে চলেছিল। তারপর যখন প্রকৃতিস্থ হলাম, তখন বুঝলাম যে আমি অদ্বৈতজ্ঞানের একটা আভাস পেয়েছি। এবং শাস্ত্রে এ বিষয়ে যা লেখা আছে তা মিথ্যা নয়। এর পর অদ্বৈততত্ত্বের সত্যতা আমি আর কখন অস্বীকার করতে পারি নি।"

আমরা ক্রমে দেখিতে পাইব, এইভাবে—উপরের এই শেষোক্ত বিষয়টির ন্যায়—নরেন্দ্রনাথ তাহার প্রত্যেক আপত্তির বিষয়েই ধীরে ধীরে ঠাকুরের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। শুধু তাহাই নয়। তিনি পরিশেষে ঠাকুরের নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্ম-সমর্পণ করেন ও নিজের বলিয়া কিছুই অবশিষ্ট রাখেন না। তবে তাহা অনেক পরের ঘটনা।

নয়

গুরু ও শিষ্য

(১৮৮১-১৮৮৬)

(২) অলৌকিক দর্শন ও তাহার লৌকিক পরীক্ষা : ডঃ শীলের স্মৃতিকথা

নরেন্দ্রনাথ যখন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে যাইতে আরম্ভ করেন, তখন তিনি এক অপূর্ব শ্রীসম্পন্ন (ঊনবিংশবর্ষ-বয়স্ক) তরুণ যুবক। তাঁহার দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, বিশাল বক্ষ, আকর্ণবিস্তৃত চক্ষু ও গরিমাময় চলন-ভঙ্গী সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। ইহা ব্যতীত, তাঁহার ভিতর ছিল বহু গুণ, অসাধারণ মেধা ও অমিত তেজ। এবং তাহারই ফলস্বরূপ, তিনি স্বভাবতঃই ছিলেন যারপরনাই আত্মবিশ্বাসী, নির্ভীক, সত্যপ্রিয় ও অপরের নিন্দা-প্রশংসায় একান্ত উদাসীন। তাই দেখা যাইত, তিনি কোন কিছুর জন্য কাহারও অপেক্ষা রাখেন না, কাহাকেও লজ্জা-ভয় করেন না এবং নিজের কোন কার্য গোপন করিয়া চলেন না।

তাঁহার এই প্রকার স্বাধীন, স্বচ্ছ ও গর্বমাখা আচরণ দেখিয়া অনেকে ভুলবশতঃ ধারণা করিয়া বসিতেন—ছেলেটা দাম্ভিক, উদ্ধত, অনাচারী, ইত্যাদি। নরেন্দ্রনাথের একজন প্রতিবেশী এইকালে একদিন তাঁহাকে এইভাবে বর্ণনা করেন, "এই বাড়ীতে একটা ছেলে আছে, তার মত ত্রিপণ্ড ছেলে কখন দেখিনি। বি এ পড়ছে বলে ধরাকে যেন সরা দেখে,—বাপ-খুড়োর সামনেই তবলায় চাঁটি দিয়ে গান ধরলে, পাড়ার বয়োজ্যেষ্ঠদের সামনে দিয়েই চুরুট খেতে খেতে চললো! এই রকম সব বিষয়েই।"[১]

কিন্তু (দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন) ঠাকুর কখন এই ভুল করেন নাই।

১। পূজনীয় শরৎ মহারাজও এক বন্ধুর বাড়ীতে নরেন্দ্রনাথকে প্রথমবার দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ একটা ভুল ধারণা করিয়াছিলেন। ঘটনাটি তিনি তাঁহার লীলা-প্রসঙ্গে (দিব্যভাব) বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

নরেন্দ্রনাথের দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমনের অল্প পরেই, তিনি একদিন (১৮৮২, ৫ই মার্চ, রবিবার) তাহার সম্বন্ধে ভক্তগণের নিকট বলেন, "এই ছেলেটিকে দেখছ, এখানে এক রকম। দুরন্ত ছেলে বাবার কাছে যখন বসে, যেন জুজুটি; আবার চাঁদনিতে যখন খেলে, তখন আর এক মূর্তি। এরা নিত্যসিদ্ধের থাক। এরা সংসারে কখন বদ্ধ হয় না। ইত্যাদি।"

অপর একদিন (১৮৮৩, ১৯শে আগস্ট, রবিবার) তিনি বলেন, "নরেন্দ্র······নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি। এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ। দেখ না, নরেন্দ্র কাউকে care (গ্রাহ্য) করে না। আমার সঙ্গে কাপ্তেনের গাড়ীতে যাচ্ছিল, কাপ্তেন ভাল জায়গায় বসতে বললে—তা চেয়েও দেখলে না। আমারই অপেক্ষা রাখে না! আবার যা জানে, তাও বলে না—পাছে আমি লোকের কাছে বলে বেড়াই যে, নরেন্দ্র এত বিদ্বান। মায়ামোহ নেই,—যেন কোন বন্ধনই নেই! খুব ভাল আধার। একাধারে অনেক গুণ—গাইতে, বাজাতে, লিখতে, পড়তে। এদিকে জিতেন্দ্রিয়, বলেছে—বিয়ে করবো না। ইত্যাদি।"

এই সম্পর্কে ঠাকুরের আরও একটি উক্তি লক্ষণীয়। তিনি একদিন (তৎকালে নবাগত বালকভক্ত) শরৎ মহারাজকে দেখাইয়া (যদু মল্লিকের বাগানবাড়ীর প্রধান কর্মচারী) রতনের নিকট বলেন, "এরা সব ছেলে মন্দ নয়, দেড়টা পাশ করেছে (শরৎ মহারাজ তখন এফ্ এ পড়তেন), শিষ্ট, শান্ত,—কিন্তু নরেন্দ্রের মত একটি ছেলেও আর দেখতে পেলাম না! যেমন গাইতে-বাজাতে, তেমনি লেখাপড়ায়, তেমনি বলতে-কইতে, আবার তেমনি ধর্মবিষয়ে। সে রাতভোর ধ্যান করে, ধ্যান করতে করতে সকাল হয়ে যায়, হুঁস থাকে না! আমার নরেন্দ্রের ভেতর এতটুকু মেকি নেই, বাজিয়ে দেখ—টং টং করছে। আর সব ছেলেদের দেখি, যেন চোখ-কান টিপে কোনও রকমে দু-তিনটে পাশ করেছে, বস্ এই পর্যন্ত—ঐ করতেই যেন তাদের সমস্ত শক্তি বেরিয়ে গেছে। নরেন্দ্র কিন্তু তা নয়, হেসে

খেলে সব কাজ করে, পাশ করাটা যেন তার কাছে কিছুই নয়! সে ব্রাহ্মসমাজেও যায়, সেখানে ভজন গায়, কিন্তু অন্য সকল ব্রাহ্মের ন্যায় নয়,—সে যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী। ধ্যান করতে বসে তার জ্যোতিঃদর্শন হয়। সাধে নরেন্দ্রকে এত ভালবাসি?"

আর তাহার উপর তাঁহার আস্থারও কোন সীমা নাই। ভক্তির হানি হইবে বলিয়া আহার, বিহার, নিদ্রা ও জপধ্যানাদি বিষয়ে তিনি নিজে যে সকল নিয়ম পালন করিয়াছেন ও তাঁহার অপর সকল ভক্তকেই পালন করিতে বলিতেন, তাহা নরেন্দ্রনাথের পালন করিবার আবশ্যক নাই ইহা তিনি মুক্তকণ্ঠে সকলের সমক্ষে প্রচার করিতেন। বলিতেন, "নরেন্দ্র নিত্যসিদ্ধ—নরেন্দ্র ধ্যানসিদ্ধ—নরেন্দ্রের ভিতর জ্ঞানাগ্নি সর্বদা প্রজ্বলিত থেকে সকল প্রকার আহার্য-দোষকে ভস্মীভূত করে দিচ্ছে। সে যেখানে সেখানে যা তা খেলেও তার মন কলুষিত বা বিক্ষিপ্ত হবে না। জ্ঞান-খড়্গের দ্বারা সে মায়াময় সকল বন্ধনকে নিয়ত খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলছে, তাই মহামায়া তাকে কোন মতেই আয়ত্তে আনতে পারছেন না।"

ভক্তেরা অবাক হইয়া প্রায়ই ঠাকুরের মুখে এইরূপ সব কথা শুনিতেন। একদিন একদল মাড়োয়ারি ভক্ত ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়া মিছরি, পেস্তা, বাদাম, কিস্‌মিস্‌ প্রভৃতি নানা রকমের খাবার জিনিস তাঁহাকে উপহার দিয়া গেলেন। কিন্তু ঠাকুর উহা নিজে গ্রহণ করিলেন না এবং উপস্থিত ভক্তগণকেও দিলেন না। বলিলেন, "ওরা (মাড়োয়ারিরা) নিষ্কাম-ভাবে দান করতে জানে না। সাধুকে এক খিলি পান দেবার সময়েও তার সঙ্গে ষোলটা কামনা জুড়ে দেয়। এই রকম সকাম দাতার জিনিস খেলে ভক্তির হানি হয়।" ইহাতে প্রশ্ন উঠিল, ঐ খাবারগুলি কি করা যাইবে? তখন ঠাকুরই বলিলেন, "যা, নরেন্দ্রকে ঐগুলি দিয়ে আয়, সে ওসব খেলে তার কোন ক্ষতি হবে না।"

অপর একদিন নরেন্দ্রনাথ হোটেলে খাইয়া আসিয়া ঠাকুরকে বলিলেন, "মশাই, লোকে যাকে অখাদ্য বলে তাই আজ খেয়ে

এসেছি।" শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন, "তোর ওতে কোন দোষ লাগবে না। শোর-গরু খেয়ে যদি কেউ ভগবানে মন রাখে, তবে তা হবিষ্যান্ন তুল্য। আর শাকপাতা খেয়ে কেউ যদি বিষয়-বাসনায় ডুবে থাকে, তবে তা শোর-গরু খাওয়ার চাইতে বড় কিছু নয়। তুই অখাদ্য খেয়েছিস তাতে আমার কিছু মনে হচ্ছে না। কিন্তু (অন্য সকলকে দেখাইয়া) এদের কেউ এসে যদি ঐ কথা বলত, তবে তাকে স্পর্শও করতে পারতাম না।"

বস্তুতঃ তাঁহার এই মহান শিষ্যটিকে ঠাকুর যে কত সম্মান ও স্বাধীনতা দিতেন এবং তাহার উপর কত নির্ভর করিতেন, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। পূজনীয় শরৎ মহারাজ লিখিয়াছেন, ঠাকুর অন্তরের সকল কথা নরেন্দ্রনাথকে না বলিয়া থাকিতে পারিতেন না, সকল বিষয়ে তাহার মতামত লইতে অগ্রসর হইতেন এবং কখনও কোন বিষয় পরীক্ষা না করিয়া তাহাকে গ্রহণ করিতে বলিতেন না। আবার সময়ে সময়ে তাহার সহিত তর্ক বাধাইয়া তিনি তাঁহার অপর ভক্তদের বুদ্ধি ও বিশ্বাসের বল পরীক্ষা করিয়া লইতেন। দৃষ্টান্ত :

১। নরেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "১৮৮২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে একদিন (দক্ষিণেশ্বরের) পঞ্চবটীতে বসে আছি, এমন সময় ঠাকুর সেখানে এসে আমার হাত ধরে বললেন, 'আজ তোর বিদ্যা-বুদ্ধি বোঝা যাবে। তুই তো মোটে আড়াইটে পাশ করেছিস্ (নরেন্দ্রনাথ তখন বি এ পড়িতেছিলেন), আজ সাড়ে তিনটে পাশ করা মাষ্টার এসেছে (মাষ্টার মহাশয় এইকালে বি এ পাশ করিয়া বি এল পড়িতেছিলেন)। চল্, তার সঙ্গে কথা কইবি।' অগত্যা ঠাকুরের সঙ্গে যেতে হল। তারপর তাঁর ঘরে বসে মাষ্টার মশাই'এর সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হলাম। ঐভাবে আমাদের কথা বলতে লাগিয়ে দিয়ে ঠাকুর চুপ করে বসে আমাদের আলাপ শুনতে লাগলেন। পরে মাষ্টার মশাই বিদায় নিয়ে চলে গেলে তিনি বললেন, 'পাশ করলে কি হয়, মাষ্টারের মাদিভাব, কথা

কইতেই পারে না।' ঠাকুর এইভাবে আমাকে সকলের সঙ্গে তর্কে লাগিয়ে দিয়ে মজা দেখতেন।"

২। এই প্রকার আর একটি দৃষ্টান্ত এই। উপরি-বর্ণিত ঘটনার অল্প পূর্বে, ঠাকুর একদিন তাঁহার বিশিষ্ট গৃহীভক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত নরেন্দ্রনাথের তর্ক বাধাইয়া দিয়াছিলেন। কেদার তর্ক ভালই করিতেন। কিন্তু সেদিন নরেন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ যুক্তির সম্মুখে তাঁহাকে নিরস্ত হইতে হইয়াছিল। এইদিনকার ঘটনা সম্বন্ধে ঠাকুর পরে একদিন (১৮৮২, ৫ই মার্চ) তাঁহার ভক্তগণের নিকট বলেন. "দ্যাখো, নরেন্দ্র গাইতে, বাজাতে, পড়াশুনায়, সব তাতেই ভাল। সেদিন কেদারের সঙ্গে তর্ক করছিল। কেদারের কথাগুলো কচ কচ করে কেটে দিতে লাগল।"[১]

এই সকল ব্যতীত দেখা যায়, ঠাকুর মাঝে মাঝে বলিতেন, 'তিনি ও নরেন্দ্রনাথ পৃথক দেহ ধারণ করিয়া আসিলেও, তাঁহারা বস্তুতঃ এক।' এবং এই বিষয়ে তিনি একদিন নরেন্দ্রনাথের সমক্ষে অপর ভক্তগণকে বলেন, "এর (নিজেকে দেখাইয়া) ভিতর যেটা রয়েছে, সেটা মাদী; আর ওর (নরেন্দ্রকে দেখাইয়া) ভিতরে যেটা আছে, সেটা মদ্দা। ও আমার শ্বশুর ঘর।" সম্ভবতঃ এই রকম কোন অনুভূতির বশেই তিনি অনেক সময় নরেন্দ্রনাথকে তাঁহার সেবা করিতে দিতেন না। অন্য বালক ভক্তগণ সুযোগ পাইলেই তাঁহাকে বাতাস করিতেন, তাঁহার পদসেবা করিতেন এবং অন্য নানাভাবে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিবার প্রয়াস পাইতেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ ঐরূপ কিছু করিতে অগ্রসর হইলে তিনি প্রায়ই নিষেধ করিতেন। একদিন নরেন্দ্রনাথ তাঁহার গাড়ুটা আগাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে স্পর্শ করিতেই তিনি বলেন, "ওর ছোঁয়া জলে আমার শৌচ করা চলবে না। ও ফেলে দিয়ে অন্য জল আন।"

১। এই দিন নরেন্দ্রনাথের তর্ক করিবার কৌশল দেখিয়া ঠাকুর বিস্মিত হন ও পরে মাস্টার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন—"ইংরেজিতে কি কোন তর্কের বই আছে গা?"

অন্যদিকে, কেহ যদি কোন কারণে ঠাকুরের নিকট নরেন্দ্রনাথের নিন্দা করিত, ঠাকুর তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। এইরূপ নিন্দাকারীকে সমঝাইয়া দিয়া তিনি কখন বলিয়াছেন, "কর কি ? তুমি শিবনিন্দা করছ ?" আবার কখন বা বলিয়াছেন, "নরেন্দ্রকে কেউ যেন বিচার করতে না যায়। তাকে কেউ কখন পরিপূর্ণরূপে বুঝতে পারবে না।" একবার একটি ভক্ত আসিয়া ঠাকুরকে সংবাদ দিলেন যে নরেন্দ্রনাথ খারাপ লোকদের সঙ্গে মিশিয়া কুপথে যাইতেছে। কথাটা শুনিয়াই ঠাকুর তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "না, তা সত্য নয়। মা আমাকে বলেছেন নরেন্দ্র কুপথে যেতে পারে না। তোরা যদি ফের এই রকম সব কথা বলিস, তবে আমি আর তোদের মুখ দেখব না।"

কিন্তু ইহা হইলেও ঠাকুর ছিলেন পাকা মাঝি—মহা সাবধানী লোক। নানা দিব্যদর্শনের ফলে নরেন্দ্রনাথের মহত্ব ও জীবনোদ্দেশ্য জানিতে পারিয়াও, তিনি তাহাকে লৌকিক ভাবেও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। ইহার হেতু সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, মায়ার অধিকারে প্রবেশ করিয়া দেহ ধারণ করিলে অবতার-পুরুষদের দৃষ্টিও স্বল্পবিস্তর অপরিচ্ছন্ন হইয়া সময়ে সময়ে ভ্রমপূর্ণ দর্শন উৎপন্ন করিতে পারে। তাই নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনি যে সকল অলৌকিক দর্শনলাভ করিয়াছিলেন, তাহার সত্যতা তিনি নানা লৌকিক উপায়েও যথাসম্ভব পরীক্ষা করিয়া দেখিতে উদ্যোগী হন।[১] দৃষ্টান্ত

১। জানা যায়, ঠাকুর মানুষের শরীর ও অবয়বাদির গঠন প্রকার দেখিয়া তাহার বুদ্ধি, স্বভাব, পূর্বসংস্কার ও ত্যাগভোগের প্রবৃত্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কিছু বুঝিতে পারিতেন। এবং তাঁহার ঐ অদ্ভুত জ্ঞান সহায়ে তিনি তাঁহার সকল ভক্তকেই অল্পবিস্তর পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। নরেন্দ্রনাথের শারীরিক লক্ষণ সকল পর্যবেক্ষণ

১। কুচবিহার-বিবাহে মতভেদের জন্য কেশববাবুর দল ভাঙিয়া গেলে, ঠাকুর তাহাকে বলেন—"তুমি পরীক্ষা না করে লোক নাও, তাই তোমার দল ভেঙ্গে যায়। আমি পরীক্ষা না করে কখন কাউকে গ্রহণ করি না।"

করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "তোর শরীরের সকল স্থানই সুলক্ষণযুক্ত, কেবল দোষের মধ্যে নিদ্রা যাবার কালে নিশ্বাসটা কিছু জোরে পড়ে। যোগীরা বলেন, অত জোরে নিশ্বাস পড়লে অল্পায়ু হয়।" অন্য একদিন তিনি তাঁহার মুখশ্রী দেখিতে দেখিতে বলিয়াছিলেন, "এইরূপ চক্ষু কি শুষ্ক জ্ঞানীর কখন হয়? জ্ঞানের সঙ্গে তোর ভিতর নারীসুলভ ভক্তির ভাবও প্রচুর পরিমাণে রয়েছে।"

২। দ্বিতীয়, ঠাকুর তাঁহার ভক্তদের ছোট ছোট কার্য ও ঐরূপ কার্যে প্রকাশিত মানসিক ভাব সকল লক্ষ্য করিয়াও তাহাদের প্রকৃতি ও সংস্কার প্রভৃতি বুঝিতে পারিতেন। (পূজনীয় শরৎ মহারাজ লিখিয়াছেন) দক্ষিণেশ্বরে আসার পর হইতে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথের প্রতি কার্য তন্ন তন্ন করিয়া লক্ষ্য করিতেন এবং তাহা হইতে তিনি বুঝিয়াছিলেন, তেজ, বীর্য, সংযম, সাহস, সত্যনিষ্ঠা ও মহৎকাজে আত্মোৎসর্গের প্রবৃত্তি প্রভৃতি বহু সদ্‌গুণ তাহার অন্তরে স্বভাবতঃ প্রদীপ্ত রহিয়াছে।

উপরি-বর্ণিত উপায় সকল ব্যতীত, ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে (জ্ঞাত ও অজ্ঞাত) আরও নানা উপায়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। ইহার একটি বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত এই ঃ—

৩। আমরা দেখিয়াছি, নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে আসিলে ঠাকুর তাহাকে অপরিসীম আদর-যত্ন করিতেন। বস্তুতঃ তাহাকে দূর হইতে দেখিয়াই তাঁহার সকল অন্তর তাহার দিকে ধাবিত হইত। এবং কখন কখন "ঐ ন—, ঐ ন—" বলিতে বলিতেই সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। কিন্তু কিছুকাল পরে ঠাকুর হঠাৎ একদিন তাহার সহিত সম্পূর্ণরূপে উদাসীনের ন্যায় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। সেদিন নরেন্দ্র আসিলেন, তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, তাঁহার সম্মুখে বসিয়া কিছু সময় অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু ঠাকুর অপরিচিতের ন্যায় তাহার দিকে একবার মাত্র চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। নরেন্দ্র ভাবিলেন, ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। তাই, তিনি কিছুক্ষণ পরে বাহিরে গিয়া হাজরা মহাশয়ের সহিত আলাপ করিতে ও তামাক

খাইতে রত হইলেন। তারপর ঠাকুর অপরের সহিত কথা কহিতেছেন শুনিতে পাইয়া তিনি পুনরায় তাঁহার ঘরে গেলেন, কিন্তু ঠাকুর তাহার সহিত কথা না বলিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া পড়িলেন। এইভাবে সমস্ত দিন কাটিয়া সন্ধ্যা হইলে তিনি ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া কলিকাতায় ফিরিলেন।

ইহার পরের সপ্তাহেও দক্ষিণেশ্বর গিয়া নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট ঐ একই রকমের ব্যবহার পাইলেন। তাই, তিনি সেদিনও হাজরা মহাশয় ও অপর সকলের সহিত নানা কথাবার্তায় দিন কাটাইয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিলেন। তৎপর, পর পর আরও দুইদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়া তিনি ঠাকুরের উক্তরূপ বিরূপ ভাবের কোন পরিবর্তন দেখিলেন না। কিন্তু উহাতেও তিনি কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ বা বিচলিত না হইয়া পূর্বের ন্যায় সমভাবে ঠাকুরের নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলেন। এইভাবে মাসাধিক কাল গত হইলে, ঠাকুর একদিন তাহাকে কাছে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, আমি তো তোর সঙ্গে একটা কথাও বলি না, তবু তুই এখানে কি করতে আসিস্ বল দেখি ?" নরেন্দ্রনাথ অটল ভাবে কহিলেন, "আমি কি আপনার কথা শুনতে এখানে আসি ? আপনাকে ভালবাসি, দেখতে ইচ্ছে করে, তাই আসি।" তাহার এই উত্তরে ঠাকুর খুব খুশী হইলেন এবং বলিলেন, "আমি তোকে পরীক্ষা করে দেখছিলাম—আদর যত্ন না পেলে তুই পালাস কিনা। তোর মত আধারই এতটা (অর্থাৎ, এই অবজ্ঞা ও উপেক্ষা) সহ্য করতে পারে, অপর কেউ হলে এতদিনে কবেও পালিয়ে যেত, এদিক আর মাড়াত না।" (লী)।

৪। ঠাকুরের এই পরীক্ষা সম্পর্কেই আর একটি অদ্ভুত ঘটনাও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঠাকুর একদিন নরেন্দ্রনাথকে পঞ্চবটীতে ডাকিয়া লইয়া বলেন, "দেখ্, তপস্যার ফলে আমার ভিতর অনিমাদি বিভূতিসকল অনেক কাল হয় উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু যার পরার কাপড়ই ঠিক থাকে না, সেই আমি কেমন করে ওগুলির উপযুক্ত ব্যবহার করব ? তাই, ভাবছি মাকে বলে ওগুলি তোকে

দিয়ে দি। মা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন, তোকে তাঁর অনেক কাজ করতে হবে। ঐ সকল শক্তি তোর ভিতর সঞ্চারিত হলে, কাজের সময় ঐ সব ব্যবহার করতে পারবি,—কি বলিস?" নরেন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে ঠাকুরের ভিতর দৈবশক্তির বহু প্রকাশ দেখিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি তাঁহার ঐ কথায় অবিশ্বাস করিলেন না। কিন্তু প্রবল ঈশ্বরানুরাগে তাহার মন এইকালে ছিল মহা বিবেক-বৈরাগ্যযুক্ত। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ সবের দ্বারা কি আমার ঈশ্বরলাভে কোন সাহায্য হবে?" ঠাকুর বলিলেন, "ও বিষয়ে সাহায্য না হলেও যখন কাজ করতে আরম্ভ করবি, তখন ঐগুলি বিশেষ সাহায্য করতে পারবে।" শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "মশাই, আমার ওতে কোন প্রয়োজন নেই। আগে ঈশ্বরলাভ হোক, তারপর ওগুলি গ্রহণ করা না করার বিষয় স্থির করা যাবে। ঐ সব শক্তি এখন পেয়ে যদি উদ্দেশ্য ভুলে যাই, যদি স্বার্থের জন্যে ওগুলির অপপ্রয়োগ করে বসি, তা হলে সর্বনাশ হবে যে!" ঠাকুর এই দিন নরেন্দ্রনাথকে অনিমাদি বিভূতি সকল সত্য সত্যই দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, বা তাহাকে পূর্বোক্তভাবে পরীক্ষা করিতেছিলেন, তাহা জানা যায় না। তবে ইহা জানা যায় যে, নরেন্দ্রনাথ ঐগুলি গ্রহণ করিতে অসম্মত হওয়ায় ঠাকুর বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। (লী)।

যাহা হউক, উপরের দৃষ্টান্তগুলি হইতে বোঝা যায়, দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ঠাকুর কিরূপ যত্ন, আগ্রহ ও দৃঢ়তার সহিত নানা লৌকিক উপায়েও নরেন্দ্রনাথকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া তবে তাহার সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে পারিয়াছেন। পক্ষান্তরে দেখা যায়, নরেন্দ্রনাথও—প্রথম হইতেই ঠাকুরের দৈবশক্তির বহু পরিচয় পাইয়াও—নানা সংশয়-সন্দেহের বশবর্তী হইয়া তাঁহাকেও ঠিক ঐ ভাবেই লৌকিক ভিত্তিতে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। এবং তদ্দ্বারা বুঝিতে চাহিয়াছেন, লোকটি খাঁটি, না তাঁহার কোথাও চুরি, ফাঁকি, বুজরুকি, ভণ্ডামি প্রভৃতি আছে? দৃষ্টান্ত:

১। আমরা দেখিয়াছি নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যখন তখন সুতীক্ষ্ণ

যুক্তিজালে আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার দিব্যদর্শনাদি ও তজ্জনিত মত-বিশ্বাসকে অলীক ও অসত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেন। এবং উহার সর্বক্ষেত্রেই (আমরা দেখিয়াছি ও দেখিব) ঠাকুরের অলৌকিক স্পর্শ বা ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে তিনি নিজেই ক্রমে ক্রমে ঐ সকলের সত্যতা উপলব্ধি করিয়া উহা মানিতে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

২। চরম আন্তরিকতার সহিত ধনৈশ্বর্য ত্যাগ করায়, ঠাকুর টাকা-পয়সা স্পর্শ পর্যন্ত করিতে পারিতেন না। করিলে তাঁহার হাতে এমন ভয়ানক বেদনা উপস্থিত হইত যে তাহাতে তাঁহার হাত বাঁকিয়া যাইত। তাঁহার এই শারীরিক প্রতিক্রিয়া খাঁটি না একটি বুজরুকি মাত্র, ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য নরেন্দ্রনাথ এক সময়ে বিশেষ উদ্‌গ্রীব হইলেন। তখন একদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া দেখিলেন ঠাকুর ঘরে নাই, তাঁহার ঘর খালি। সেই সুযোগে তিনি তাঁহার বিছানার নীচে একটি টাকা রাখিয়া দিয়া পঞ্চবটীতে ধ্যান করিতে গেলেন। ঠাকুর এইদিন কলিকাতায় গিয়াছিলেন। যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন নরেন্দ্রনাথও পঞ্চবটী হইতে তাঁহার ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঠাকুর বসিবার জন্য তাঁহার বিছানা স্পর্শ করিতেই ভীষণ বেদনায় লাফাইয়া উঠিলেন। এবং নির্বাক হইয়া এদিকে-ওদিকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন। একজন সেবক তাঁহার বিছানার চাদরখানা টানিয়া তুলিতেই টাকাটি মাটিতে পড়িয়া গেল। নরেন্দ্রনাথ একটি কথাও না বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ঠাকুর বুঝিলেন যে নরেন্দ্র তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়াছে এবং তাহাতে তিনি খুশীই হইলেন।[১]

১। বস্তুতঃ ঠাকুর নিজেই তাঁহার বালক ভক্তদের তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দিতেন। বলিতেন, "সাধুকে দিনে দেখবি, রাত্রে দেখবি, তবে তাঁকে বিশ্বাস করবি", "সাধু অপরকে যা শিক্ষা দেয়, তা নিজে পালন করে কিনা তা লক্ষ্য করে দেখবি", "যার কথায় ও কাজে, মনে ও মুখে, মিল নেই, তাকে কখন বিশ্বাস করবি না", ইত্যাদি।

৩। ঠাকুর অসচ্চরিত্র লোকের দেওয়া বা ছোঁয়া খাবার খাইতে পারিতেন না। এবং সে লোক অজ্ঞাত বা অপরিচিত হইলেও, তিনি খাবার স্পর্শ করিয়াই টের পাইতেন যে ইহা খারাপ লোকের দেওয়া বা ছোঁয়া খাবার এবং তৎপর তিনি আর তাহা গ্রহণ করিতেন না। একদিন (১৮৮৪, ২৫শে জুন) পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণিকে দর্শন করিবার জন্য কলিকাতার এক বাড়ীতে গিয়া তিনি জল খাইতে চাহিলে, তিলক কণ্ঠী প্রভৃতি ধারী একটি লোক এক গেলাস জল আনিয়া দিলেন। কিন্তু ঠাকুর সে জল খাইতে পারিলেন না ও অন্য এক গেলাস জল আনিতে বলিলেন। এবং তাহা অপর একটি লোক আনিয়া দিলে, তিনি তাহা হইতে কিছু জল পান করিলেন। নরেন্দ্রনাথ কাছে বসিয়াই সব লক্ষ্য করিলেন। এবং পরে ঠাকুরকে রওনা করিয়া দিয়া, তিনি পূর্বোক্ত তিলক-কণ্ঠীধারী লোকটির চরিত্র সম্বন্ধে ঐ বাড়ীর একজন পরিচিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, সে একজন ঘোর ইন্দ্রিয়াসক্ত লোক।

এই প্রকারের আরও কয়েকটি অভিজ্ঞতার পর, নরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন যে এই সকল বিষয়ে ঠাকুর কখন ভুল করেন না। তাই তিনি একদিন অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেদিন আপনি শশধরকে দেখতে গিয়ে, তাদের একটা লোকের ছোঁয়া গ্লাস থেকে জল খেলেন না। আপনি কি করে জানলেন যে সে লোকটার স্বভাব ভাল না ?" প্রশ্ন শুনিয়া ঠাকুর সহাস্যে বলিলেন, "আগে বলতিস্ আমার অবস্থা সব মনের গতিক (hallucination) !" উত্তরে নরেন্দ্রনাথ কহিলেন—"কে জানে! এখন তো অনেক দেখলাম—সব মিলছে!" (১৮৮৪, ৬ই সেপ্টেম্বর)।

এই রকমে ঠাকুরকে নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া ও তাঁহারই কৃপায় নানা দিব্যানুভূতি লাভ করিয়া, নরেন্দ্রনাথ মহাবিস্ময়ের সহিত নিজ অন্তরের সকল সংশয়, সন্দেহ ও বিরুদ্ধভাব পরিত্যাগ করিয়া শুধু যে ক্রমশঃ ঠাকুরের একজন প্রবল সমর্থক হইলেন তাহা নয়। তিনি তাঁহার সান্নিধ্যে থাকিয়া ও তাঁহারই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া নানা শিক্ষা

ও সাধনার দ্বারা ধীরে ধীরে এক অপূর্ব সর্বতোমুখী বিকাশ লাভ করিতে লাগিলেন। এবং পরিশেষে জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত, ব্যথা-বেদনা ও অশ্রুজলের মধ্যে সংসারের সর্ববন্ধন ছিন্ন করিয়া জগৎ-কল্যাণের জন্য নিজেকে তাঁহার চরণে সঁপিয়া দিলেন। তাঁহার এই হর্ষ-বিষাদমাখা ক্রম-পরিণতির ইতিহাস আমরা পরের কয়েকটি অধ্যায়ে অনুসরণ করিব। তৎপূর্বে এখানে আমরা নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাহার কলেজের একজন সমসাময়িক ছাত্র-বন্ধু—স্বনামধন্য মহামনীষী ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল—যে স্মৃতিকথা লিখিয়াছেন, তৎপ্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। উহাতে তিনি তাহার তীক্ষ্ণ, স্বাধীন ও সমসাময়িক দৃষ্টিতে নরেন্দ্রনাথের উল্লিখিত ক্রম-পরিণতির যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক এবং তাহার আলোকে আমাদের বর্ণনার বহু কথার অর্থ ও যাথার্থ্য অধিকতর সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। তাই, আমরা ডঃ শীলের উক্ত (ইংরেজী ভাষায় লিখিত) স্মৃতিকথার মর্ম যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে নিম্নে সন্নিবেশিত করিলাম। ডঃ শীল লিখিয়াছেন—

"১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বিবেকানন্দের সঙ্গে যখন আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন আমরা উভয়েই জেনারেল এসেম্‌ব্লিস কলেজের (পণ্ডিত, কবি ও দার্শনিক) অধ্যক্ষ উইলিয়াম হেষ্টি সাহেবের ছাত্র ছিলাম। যদিও কলেজে আমি তাঁহার এক ক্লাস উপরে পড়িতাম, তিনি বয়সে আমার চাইতে একটু বড় ছিলেন। স্পষ্টতঃ প্রতিভাশালী, সুগায়ক, সামাজিক সম্মেলনের প্রাণকেন্দ্র ও কথোপকথনে অত্যুজ্জ্বল ও কতকটা তিক্ত শ্লেষপরায়ণ,—তিনি তাঁহার তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের দ্বারা জগতের মিথ্যা সাজ-সজ্জা ও ভণ্ডামীকে বিদ্ধ করিতে ভালবাসিতেন। এইজন্য বাহ্য-দৃষ্টিতে মনে হইত তিনি যেন এক কঠোর অবজ্ঞাকারীর আসনে উপবিষ্ট, কিন্তু উহারই অন্তরালে তিনি লুক্কায়িত রাখিতেন তাঁহার কোমলতম হৃদয়। মোটের উপর তিনি ছিলেন যেন একজন বিধি-বাধাহীন, প্রত্যাদিষ্ট স্বেচ্ছাপন্থী, অথচ ঐরূপ লোকের যাহা থাকে না তাহা তাঁহার ছিল—দুর্জয় ইচ্ছাশক্তি। ফলে, তিনি (এক মহামান্য

ব্যক্তির ন্যায়) আদেশ দিতে ও কর্তৃত্বের সুরে কথা বলিতে চিরাভ্যস্ত ছিলেন। আর ঐ সঙ্গে তাঁহার চক্ষুদ্বয়ের ছিল এক অদ্ভুত শক্তি, যাহা তাঁহার শ্রোতাগণকে (ক্রীতদাসের ন্যায়) বাঁধিয়া রাখিতে পারিত।

"তাঁহার এই বাহ্য বৈশিষ্ট্যগুলি সকলেরই চোখে পড়িত। কিন্তু (ঐ গুলির অন্তরালে অবস্থিত) ভিতরের মানুষটি ও তাঁহার (আধ্যাত্মিক ও মানসিক) সংগ্রামের বিষয় খুব কম লোকেই জানিতেন।

"এই সময়টা ছিল তাঁহার মানসিক ইতিহাসের একটা শঙ্কাজনক কালের আরম্ভ সময়। জন স্টুয়ার্ট মিলের 'Three Essays on Religion' পড়িয়া তাঁহার ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে প্রাপ্ত সহজ ঈশ্বরবাদের গোড়া শিথিল হইয়া গিয়াছিল। মানুষের মধ্যে ও বাহ্য প্রকৃতিতে যে পাপ ও অশুভ বর্তমান তাহা তিনি কিছুতেই কোন সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও মঙ্গলময় ঈশ্বরের অস্তিত্বের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে পারিলেন না। একজন বন্ধুর উপদেশে তিনি হিউমের সন্দেহবাদ ও হার্বার্ট স্পেন্সারের অজ্ঞেয়বাদ অধ্যয়ন করেন এবং ফলে তাঁহার মত-বিশ্বাস ধীরে ধীরে কতকটা সন্দেহবাদী দার্শনিকদের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইল।

"ইহার ফলে একটা শুষ্কতা ও আন্তরিকভাবে উপাসনা করিবার অক্ষমতা তাঁহার অন্তরকে পীড়া দিতে লাগিল। কিন্তু উহা তিনি ঠাট্টা-বিদ্রূপ প্রয়োগের দ্বারা লোকের নিকট হইতে গোপন রাখিতেন। তবে এই কালেও সঙ্গীত তাঁহার চিত্তকে প্রবলভাবে আলোড়িত করিত এবং অদৃষ্ট সত্য সকলের একটা অপার্থিব অনুভূতি তাঁহার অন্তরে জাগাইয়া তাঁহার চক্ষু দুইটি হইতে অশ্রু বিগলিত করিত।

"এই সময়েই আমাদের উভয়ের এক বন্ধু—যিনি তাঁহাকে হিউম ও হার্বার্ট স্পেন্সারের বই পড়িতে বলিয়াছিলেন—তাঁহাকে আমার নিকট লইয়া আসিলেন। ইহার পূর্বে তাঁহার সহিত আমার যৎসামান্য পরিচয় ছিল। কিন্তু এখন তিনি তাঁহার অন্তর খুলিয়া তাঁহার দুরপনেয় সন্দেহগুলি ও চরম সত্য সম্বন্ধে নিশ্চয়তা লাভের নৈরাশ্যের কথা বলিলেন। আমি তাঁহাকে কতকগুলি বই পড়িতে বলিলাম।

কিন্তু ঐগুলির অধ্যয়ন শুধু তাঁহার অন্তরের সংশয় ও নৈরাশ্যকেই আরও দৃঢ় করিয়া তুলিল। ইহা ব্যতীত আমি বুঝিয়াছিলাম, ঐকালে কোন নীরস মামুলী ধরনে অধ্যয়নের জন্য আবশ্যকীয় ধৈর্য তাঁহার ছিল না। বস্তুতঃ তিনি তখন বই'এর চাইতে কোন (তত্ত্বজ্ঞ) ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া ও তাঁহার সাহায্যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া (জ্ঞান) আহরণ করিতে অধিক উদগ্রীব ছিলেন। ইহা তাঁহার নিকট ছিল জীবন হইতে জীবন এবং চিন্তা হইতে চিন্তা প্রজ্জ্বলিত করিয়া লওয়ার ন্যায়।

"আমি তাঁহার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হইলাম। কারণ আমি এখন বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি তাঁহার সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য আন্তরিক চেষ্টা করিবেন।

"আমি তাঁহাকে শেলীর কতকগুলি কবিতা পড়িতে বলিলাম। এবং দেখিলাম শেলীর "Hymn to the Spirit of Intellectual Beauty," তাঁহার নৈর্ব্যক্তিক ভালবাসার সর্বময়তা এবং তাঁহার সহস্রবর্ষব্যাপি উন্নততর মানব-সমাজের স্বপ্ন তাঁহাকে যেরূপ আনন্দ দিয়াছে দার্শনিকদের যুক্তি তাঁহাকে তাহা দিতে পারে নাই।

"ইহার পর, আমি তাঁহার নিকট (শেলী যে একত্বের স্বপ্ন দেখিয়াছেন তাহার চাইতেও) একটি উন্নততর একত্বের কথা বলিলাম অর্থাৎ সর্বব্যাপী ও সর্ববিকাশক Universal Reason-স্বরূপ পরব্রহ্মের কথা। ইহার সর্বময় অস্তিত্ব ও পাপপুণ্যের আধার ব্যক্তির অলীকত্ব—এই দুইটি ধারণার দ্বারা তাঁহার মস্তিষ্ক সন্তুষ্ট হইল বটে। কিন্তু তাঁহার হৃদয় সন্তুষ্ট হইল না। তিনি বলিলেন, শুষ্ক প্রাণহীন Reason আমাকে প্রলোভনের হাত হইতে বাঁচাইতে পারে না। তিনি জানিতে চাহিলেন, আমার দর্শনশাস্ত্র আত্মার মুক্তির জন্য বাস্তবভাবে সাহায্য করিতে পারে কিনা? বস্তুতঃ তিনি চাহিতে-ছিলেন এমন একটি বাহ্য শক্তির আশ্রয় যাহা তাঁহাকে রক্ষা ও উন্নীত করিতে পারে, এমন একজন গুরু যিনি তাঁহার নিজ পরিপূর্ণতার দ্বারা তাহার অন্তরের সকল ঝঞ্ঝা শান্ত করিতে পারেন।

"এইকালে তাঁহার এই দাবী আমার নিকট অযুক্তি-প্রসূত দুর্বলতা বলিয়া মনে হইল। এবং আমার তরুণ অনভিজ্ঞ মন ইহা মিটাইবার কোন উপায়ই নির্দেশ করিতে পারিল না। ইহার পর তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্যদের নিকট গিয়া জানিতে চাহিলেন—সত্যকে কি দেখা যায়, মুক্তি দিতে পারে এমন কেহ আছেন কি? কিন্তু এখানে তিনি (ইহা তিনি আমাকে অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিয়াছেন) প্রচুর পরিমাণে নৈতিক বক্তৃতা, তত্বকথা ও মনের স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতির বার্তা পাইলেও, তদতিরিক্ত কিছু পাইলেন না। তাই, তিনি অপর নানা ধর্ম ও মত-বিশ্বাসের প্রচারকদের সঙ্গে দেখা করিতে লাগিলেন। এবং এইভাবে তিনি পরিশেষে দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংসের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং তিনিই বিবেকানন্দের সহিত সর্বপ্রথম সত্যের প্রত্যক্ষদর্শীর ন্যায় কথা বলেন এবং তাঁহার শক্তির দ্বারা তাহার অন্তরে শান্তি স্থাপন ও সেখানকার সকল ক্ষত নিরাময় করিয়া দেন। কিন্তু বিবেকানন্দের বিদ্রোহী মন তখনও তাঁহাকে গুরু-হিসাবে গ্রহণ করে নাই। তিনি সন্দেহ করিতে লাগিলেন রামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে তাহার অন্তরে যে শান্তি উপস্থিত হয়, তাহা হয়তো একটা অস্থায়ী ফাঁকি মাত্র। এবং এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি মানুষটির এইপ্রকার সন্দেহগুলি প্রত্যক্ষ দর্শনের নিশ্চয়তার দ্বারা অতি ধীরে ধীরেই অপসারিত হইয়াছিল।

"আমার চোখের সম্মুখে তাঁহার এই রূপান্তর আমি গভীর আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। আমার মত তরুণ ও অত্যুৎসাহী বেদান্তবাদীর অন্তরে (ঈশ্বরীয়) ভাবাবেশ ও কালীপূজার প্রতি যে মনোভাব থাকিতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। তাই, বিবেকানন্দের ন্যায় একজন মূর্তিপূজাবিরোধী, শাস্ত্রপ্রমাণ অগ্রাহ্য-কারী এবং মহাবুদ্ধি ও প্রভাবসম্পন্ন লোকের এই পরিবর্তন আমার তখন অত্যন্ত উদ্ভট, অবাঞ্ছিত ও রহস্যময় বলিয়া মনে হইল। অবশেষে শুধু বিবেকানন্দের উপর একটা আকর্ষণবশতঃই আমি এক গ্রীষ্মের দিনে তাহার গুরুকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরে গেলাম।

সেদিনটির বেশীর ভাগ সময় আমি মন্দির-উদ্যানের নির্জন ও ছায়াশীতল শান্তিপূর্ণ স্থানে বসিয়া কাটাইলাম। এবং তারপর একটা উন্মত্ত ঝড়-বৃষ্টির অন্ধকারের মধ্যে সূর্যাস্ত হইলে, আমি যখন কতকটা দিশেহারার ন্যায় ফিরিয়া আসি, তখন আমার অন্তরে এই সত্যেরই একটা নিগূঢ় অনুভূতি জাগিতে লাগিল যে, 'নিয়মের শাসনেই বাহ্যতঃ বিশৃঙ্খল ও উদ্ভটের আবির্ভাব হয়, আত্মনিবেদনের মধ্যেই পরিপূর্ণ আত্ম-প্রভুত্ব থাকিতে পারে এবং কোন ত্রাণকর্তাতে বিশ্বাস স্থাপন শুধু একটা মৌলিক আত্ম-সঙ্কল্পেরই অস্ফুট প্রতিচ্ছবি মাত্র।' এবং বিবেকানন্দের পরবর্তী জীবন হইতেই এই সকলের একটা বিশেষ অর্থপূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়। গুরুর শক্তি ও করুণার মধ্যে তাঁহার প্রার্থিত জিনিস লাভ করিবার পর, তিনি বিশ্বমানবতা ও আত্মার পরিপূর্ণ ও অপরিত্যাজ্য প্রভুত্বই প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন।"

দশ

গুরু ও শিষ্য

(১৮৮১-১৮৮৬)

(৩) গুরুর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়া শিষ্যের দিকে দিকে অসাধারণ বৃদ্ধি ও বিকাশ

ইতিপূর্বে আমরা যাহা দেখিয়া আসিয়াছি তাহা হইতে আমরা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারি, নরেন্দ্রনাথ ছিলেন সকল দিক দিয়াই রাজপুত্র বা তৎসম। যে অখণ্ডের রাজ্য হইতে তিনি আগত হইয়াছিলেন, সেখানে তিনি ঈশ্বরের বরপুত্র। ধরাধামে তিনি যাহাদের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা রাজা না হইলেও তাঁহাদের হালচাল, ক্রিয়াকর্ম ইত্যাদি ছিল অনেকটা রাজোচিত। এবং তাঁহাদের ঘরে জন্ম লইয়াই তিনি পাইয়াছিলেন তাহার দেহমনের রাজকীয় রূপ ও ঠাট। আর সর্বশেষে, যিনি ফকির হইয়াও রাজার রাজা ও আজ বিশ্বপূজ্য ও বিশ্বশরণ, সেই রামকৃষ্ণ প্রথম হইতেই তাহাকে তাঁহার প্রিয়তম পুত্র, শিষ্য ও সখা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে (ইহা আমরা পরে দেখিতে পাইব) তাঁহার হইয়া তাহাকে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী লোকশিক্ষা ও ধর্মসংস্থাপনের মহাকার্যে নিযুক্ত করিয়া জগদ্‌গুরুর পদে অভিষিক্ত করেন।

অন্তর-বাহিরে এইরূপ রাজগরিমাসম্পন্ন নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব ঐশীশক্তি ও অধ্যাত্মজ্ঞানের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যখন তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতে আরম্ভ করেন, তখন তিনি আসিয়াই—ইহা আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি—কোন সাধারণ ভক্তের ন্যায় হাত জোড় ও মাথা নত করিয়া গদগদ ভক্তিতে তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়েন নাই। তিনি উন্নতশির ও তীক্ষ্ণধী সত্যান্বেষীর ন্যায় তাঁহার মুখোমুখি দাঁড়াইয়া তাঁহাকে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন এবং তাঁহার শক্তিসম্পন্ন স্পর্শে বার বার অভিভূত ও অলৌকিক

দিব্যানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াও, পুনরায় মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কি হইল ? এ সব কি একটা ফাঁকি—সম্মোহন বিদ্যা, না খাঁটি কিছু ? অন্যদিকে, তাঁহার মহান গুরুও কখন চাহেন নাই যে, নরেন্দ্র স্বপ্নে সন্তুষ্ট হউক এবং দুর্বল ও ক্ষুদ্র আধার ভক্তের ন্যায় একটু-আধটু বিশ্বাস বা ভাবানুভূতি লাভ করিয়াই নিজেকে কৃত-কৃতার্থ মনে করুক। তিনি চাহিয়াছেন নরেন্দ্রকে দিয়া একটি মানুষ তৈয়ারী করিতে,—এমন মানুষ যে তাঁহার হইয়া একাকী পৃথিবী বিজয় করিতে সমর্থ হইবে, যিনি সাক্ষাৎ জগদ্গুরু শিবস্বরূপ হইবেন, যাহাকে দেখিয়া, যাহার (জ্ঞান, ভক্তি, প্রেমের বার্তাপূর্ণ) সিংহ-গর্জন শুনিয়া সমস্ত জগৎ স্তব্ধ, মুগ্ধ ও জাগ্রত হইয়া মহাভয়ের আকর এই কালরূপ মৃত্যুসাগরের মধ্যে অভয় ও আশ্রয়, শান্তি ও অমৃতের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইবে এবং তৎপ্রদর্শিত পথে চলিয়া জগতে শান্তি-সাম্যপূর্ণ এক মহামঙ্গলময় সার্বজনীন ধর্ম, জীবন ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করিবে।

আমরা পরে দেখিতে পাইব, নরেন্দ্রনাথ কালক্রমে সত্যসত্যই এইরূপ এক মহাশক্তিসম্পন্ন মহামানবে পরিণত হইয়া অসাধ্য সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাই এখানে (দক্ষিণেশ্বরের ঘটনাবলী আলোচনা-কালে) আমাদের মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে—তাঁহার ঐরূপ অতি-মানবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ কিভাবে সম্ভব হইয়াছিল ?

এই অতি সমীচীন ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির পরিপূর্ণ জবাব প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের সন্ধানের বাহিরের জিনিস। কারণ দেখা যায়, পরবর্তীকালে নরেন্দ্রনাথ (তখন স্বামী বিবেকানন্দ) যে সর্বতোমুখী জ্ঞান জগতে বিতরণ করিয়াছেন, তাহা স্পষ্টতঃ কোন মানুষের পক্ষেই (সে মানুষ যত দীর্ঘায়ু ও যত বড় মেধাবীই হউন না কেন) এক জীবনে আহরণ করা সম্ভব বলিয়া মনে করা যায় না। আর নরেন্দ্র-নাথের জীবন ছিল অতি স্বল্পকাল স্থায়ী। ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার কার্যারম্ভ করেন ও মাত্র উনচল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহাবসান হয়।

তাই স্বীকার করিতে হইবে, ঠাকুরের কথাই সত্য : 'নরেন্দ্র নিত্য সিদ্ধ, ধ্যানসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি,—তার ভিতর জ্ঞানসূর্য সর্বদা প্রজ্জ্বলিত রয়েছে। তার শিক্ষা, সাধনা ইত্যাদি সবই বাড়ার ভাগ, শুধু লোক শিক্ষা ও আদর্শ স্থাপনের জন্য যা একটু করা।' ইহা হইতে বুঝা যায়, নরেন্দ্রনাথের অসাধারণ বুদ্ধি ও বিকাশের প্রথম ও প্রধান হেতু ছিল তাঁহার ভিতরের (কল্প কল্পান্তরে সঞ্চিত ও জন্মের সঙ্গে বীজাকারে প্রাপ্ত) অমেয় জ্ঞান। তাহার পরিমাপ লওয়া (ঠাকুরের পক্ষে সম্ভব হইলেও) আমাদের পক্ষে অচিন্ত্যনীয়।

তবে লোকশিক্ষা ও ধর্মসংস্থাপনের জন্য দক্ষিণেশ্বরে এই দুই মহাপুরুষের মধ্যে যে আদান-প্রদান (বা তাহার খেলা) চলিয়াছিল, তাহার পর্যালোচনা আমাদের পক্ষে অশেষ কল্যাণকর। এবং তাহা করিলে, নরেন্দ্রনাথের বুদ্ধি ও বিকাশের লৌকিক ধারাগুলি আপনা হইতেই আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। এবং আমরা দেখিতে পাই ঐ বহুমুখী ধারাসমূহ আপনা হইতেই দুইটি প্রধান ধারার অন্তর্গত. (১) একটি পাশ্চাত্য ধারা, (২) অপরটি প্রাচ্য বা প্রাচীন ভারতীয় ধারা। আমরা নিম্নে ইহা বুঝিবার চেষ্টা করিলাম।

১) প্রথমতঃ, পাশ্চাত্য ধারা সম্পর্কে দেখা যায় ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নরেন্দ্রনাথ যখন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট আসেন, তখনই তিনি পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান, যুক্তিশাস্ত্র ও বৈজ্ঞানিক সমালোচনা পদ্ধতির সহিত সুপরিচিত ছিলেন। তৎপর (ঠাকুরের নিকট যাতায়াত করিবার কালে—১৮৮২-৮৬) তিনি তাঁহার ঐ পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদির জ্ঞান আরও বিস্তৃত ও গভীরভাবে আয়ত্ত করিতে প্রবৃত্ত হন। বি এ পড়িবার কালে (১৮৮২-৮৩) হিউমের সন্দেহবাদ, কোঁতের দৃষ্টবাদ এবং স্পেনসারের অজ্ঞেয়বাদ তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ক্রমে তিনি কাণ্ট, হেগেল, ফিক্‌টে, শোপেনহাওয়ার প্রভৃতি বিখ্যাত জার্মান দার্শনিকগণের গ্রন্থ-সকলও অধ্যয়ন করেন। ইহা ব্যতীত, এই কালে তিনি বিজ্ঞান, রসায়ন ও প্রাণীবিদ্যা সম্বন্ধেও কিছু অতিরিক্ত জ্ঞান আহরণ করেন

এবং জানা যায় যে তিনি (বন্ধুদিগের সহিত) মাঝে মাঝে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে গিয়া শরীর-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বক্তৃতা শুনিতেন ও ঐ বিষয়ের গ্রন্থ পড়িতেন। অন্যদিকে, ইংরেজি সাহিত্য, কবিতা ও ইতিহাসও তিনি এইকালে প্রচুর পরিমাণে অধ্যয়ন করেন। এই সুবিস্তৃত ও সর্বতোমুখী অধ্যয়নের ফলে, তিনি একদিকে যেমন পাশ্চাত্যের জ্ঞান, সভ্যতা ও ইতিহাসের সহিত সুপরিচিত হন, অন্য দিকে তেমনি (পৃথিবীর সর্বপ্রধান আন্তর্জাতিক ভাষা) ইংরেজীতে তাঁহার অতি অপূর্ব পারদর্শিতা লাভ হয়। পরবর্তীকালে পৃথিবী-বিজয়ে এই দুইটিই হয় তাঁহার প্রধান সহায়। এবং (সমগ্র মানব-জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত) রামকৃষ্ণের অবদান তিনি ঐ আন্তর্জাতিক ভাষাতেই বিতরণ করেন।[১] কিন্তু ইহা হইলেও, প্রত্যক্ষভাবে চরম সত্য লাভের দিক দিয়া তাঁহার এই বহু পরিশ্রমলব্ধ পাশ্চাত্য দেশীয় জ্ঞান তাঁহাকে পরিশেষে নিরাশই করিল। এবং উহার সাহায্যে তাঁহার হৃদয়ের হাহাকার কিছুমাত্র কমিল না।

(২) দ্বিতীয়তঃ, এইকালে তিনি ছিলেন প্রাচীন ভারতের অফুরন্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহ রামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে ও তাঁহার অপার অহেতুক ভালবাসার দ্বারা দৃঢ়াবদ্ধ। সেখানে তিনি চোখের সম্মুখে দেখিতেছিলেন একজন নিঃসম্বল ও নামমাত্র শিক্ষিত লোক অত্যুচ্চ জ্ঞানের কথা সকল বলিতেছেন, ইচ্ছামাত্রে মুহুর্মুহুঃ অতি বিস্ময়কর দিব্যাবস্থা সকল লাভ করিতেছেন ও সময়ে সময়ে এক অভাবনীয় দিব্যশক্তি প্রকাশের দ্বারা অপরকেও নানা দিব্যানুভূতি

১। এ সম্বন্ধে একটি বিস্ময়ের বিষয় এই, ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে প্রায়ই তাঁহার সম্মুখে (গিরিশবাবু, মাস্টার মহাশয় প্রভৃতি বিদ্বান ভক্তদের সঙ্গে) ইংরেজীতে তর্ক করিতে বলিতেন। ইহা লক্ষ্য করিলে স্বতঃই মনে হয়, ঠাকুর যেন জানিতেন যে নরেন্দ্রনাথ প্রধানতঃ ইংরেজী ভাষাতেই তাঁহার বাণী প্রচার করিবেন। এবং তজ্জন্যই তিনি যেন বুঝিতে চাহিতেন, সে ঐ ভাষায় কিরূপ প্রস্তুত হইয়াছে ও হইতে পারিবে।

দান করিয়া ধন্য করিতেছেন। বহু লোক ভক্তিভরে তাঁহার নিকট যাতায়াত করে এবং তাহাদের মধ্যে অনেক উচ্চ-শিক্ষিত ও পদস্থ লোকদেরও দেখা যায়। এমন কি, বিশ্ববিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেনও তাঁহার পদতলে বসিয়া শিশুর মত তাঁহার কথা শুনেন। নরেন্দ্রনাথ নিজেও তাঁহার এই আশ্চর্য প্রভাব হইতে বাদ পড়িলেন না। এবং তাঁহার হৃদয়ে আশা জাগিল—এই অদ্ভুত লোকটির সাহায্যে হয়তো তাঁহার প্রাণের কাম্য বস্তু মিলিয়া যাইবে। কিন্তু তাহাতে প্রতিবন্ধক হইল তাঁহার পাশ্চাত্য জ্ঞানপুষ্ট ক্ষুরধার মস্তিষ্ক। সেখানে সংশয়, সন্দেহ ও তৎসমর্থক যুক্তিরাজির অন্ত ছিল না। তাই, তিনি প্রথমেই ঠাকুরের নিকট ধরা না দিয়া, তাঁহার কোথাও কোন খুঁত, ফাঁকি বা বুজরুকি আছে কিনা তাহাই জানিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ঠাকুরও তাঁহার এই পরীক্ষার আহ্বান সানন্দে গ্রহণ করিলেন। তখন একটা অপূর্ব সংগ্রাম চলিতে লাগিল—আধ্যাত্মিক জ্ঞানরাজ্যে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংগ্রাম। চরম সত্যলাভে বিফল পাশ্চাত্য জ্ঞান যেন নরেন্দ্রনাথে মূর্ত হইয়া জানিতে চাহিল, ঐ বিষয়ে প্রাচ্যজ্ঞান-মূর্তি রামকৃষ্ণের দাবী কতখানি খাঁটি। আর রামকৃষ্ণ চাহিতেছিলেন ঐ নরেন্দ্রনাথকেই আত্মসাৎ করিয়া তাহারই মাধ্যমে পাশ্চাত্য (তথা সমগ্র পৃথিবী) বিজয় করিতে। এই দুই মহামানবের এই মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংগ্রামের ফল যাহা হইয়াছিল তাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি—নরেন্দ্রনাথের অপূর্ব আধ্যাত্মিক বিকাশ ও ঠাকুরের চরণে তাঁহার পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ।

এই দ্বিতীয় ধারার মহামহিমময় বিকাশ যেভাবে সাধিত হইয়াছিল তাহা আমরা নিম্নে যথাসম্ভব সংক্ষেপে লক্ষ্য করিলাম। নরেন্দ্রনাথ ঠিক কবে যে ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন তাহা সঠিক ভাবে জানা যায় না। তবে ইহা সুস্পষ্ট যে, ঠাকুর তাঁহাকে প্রথম হইতেই প্রিয়তম শিষ্যের ন্যায় দেখিতেন। আর নরেন্দ্রনাথ তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিবার কালেও তাঁহাকে পরিশেষে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে পারিবেন ও তাঁহার নিকট হইতে আধ্যাত্মিক শক্তি ও সাহায্য

পাইবেন এইরূপ একটা আশা পোষণ করিতেন। এবং বস্তুতঃ তাহাই ছিল তাঁহার দক্ষিণেশ্বর যাতায়াতের প্রধান হেতু।

তাই দেখা যায়, ঠাকুর প্রথম হইতেই নরেন্দ্রনাথকে গুরুর ন্যায় উপদেশ দিতেন ও নরেন্দ্রনাথ তাহা শিষ্যের ন্যায় আগ্রহের সহিত শুনিতেন ও শিখিতেন। তবে ঠাকুর ছিলেন উত্তম গুরু। তিনি তাঁহার এই বহু গুণের আধার তেজস্বী শিষ্যটির স্বাধীনতায় কখন হাত দিতেন না, অথচ তাঁহার সমস্ত দিকই যাহাতে সমভাবে সুবিকশিত হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। এমন কি, যে পাশ্চাত্য বিদ্যার দ্বারা নরেন্দ্রনাথ তাঁহার মত-বিশ্বাস ও উপলব্ধি সকল ক্ষতবিক্ষত করিবার প্রয়াস পাইতেন, তিনি চাহিতেন সে ঐ বিদ্যায় সুপারদর্শী হউক। কারণ (তিনি জানিতেন) জগৎ-কল্যাণের জন্য তাঁহার ঐ দেশে গিয়া কাজ করিতে হইবে।

অন্যদিকে, ঠিক এই ভাবেই তিনি নরেন্দ্রনাথের নানা চিত্তরঞ্জিনী ও শক্তি-স্বাস্থ্যরক্ষাকর বৃত্তিগুলিকেও মুক্তভাবে পূর্ণ বিকাশ লাভ করিবার সুযোগ দিয়াছেন ও তদ্বিষয়ে তাঁহাকে সাগ্রহে নানাভাবে উৎসাহিতও করিয়াছেন। ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি, ঠাকুর প্রায়ই কিভাবে নরেন্দ্রনাথের গান, বাজনা ও ক্রীড়াদিতে দক্ষতার উচ্চ-প্রশংসা করিতেন। উহা ব্যতীত, নরেন্দ্রনাথ নিজেই তাঁহার পরবর্তী কালের একটি উক্তিতে বলিয়াছেন, "দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সাধনস্থল নির্জন পঞ্চবটীতলই ছিল আমাদের (অর্থাৎ, নরেন্দ্রনাথ ও ঠাকুরের অপর বালক ভক্তগণের) ধ্যান-ধারণা করবার সর্বোত্তম জায়গা। কিন্তু সেখানে যে আমরা শুধু ধ্যানই করতাম তা নয়। সেখানে আমরা অনেক সময়ে ক্রীড়া-কৌতুকেও মত্ত হতাম। এবং সে সকল সময়ে ঠাকুরও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমাদের আনন্দ বাড়াতেন। সেখানে আমরা দৌড়াদৌড়ি করতাম, গাছে চড়তাম, লম্বমান মাধবী-লতার বন্ধনস্থলের উপর বসে দোল খেতাম এবং সময়ে সময়ে চড়ুইভাতি করতাম। চড়ুইভাতির প্রথম দিন আমি রান্না করেছি দেখে, ঠাকুর ঐ ভাত-বেন্নন খেয়েছিলেন। তাতে আমি আপত্তি

করলে তিনি বলেছিলেন, 'তোর মত শুদ্ধ সত্ত্বগুণীর হাতে ভাত খেলে কোন দোষ হবে না'।"

আবার, এই উক্তিটিরই প্রথমাংশে নরেন্দ্রনাথ আরও বলিয়াছেন, "খেলা, রঙ্গরস ইত্যাদি সামান্য সামান্য দৈনিক ব্যাপারগুলির মধ্য দিয়ে তিনি কিভাবে যে আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করে দিয়েছিলেন তা এখন ভাবলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। তিনি আমাদের প্রত্যেকের আধ্যাত্মিকতার অন্তর্নিহিত বীজ ও ভবিষ্যত পরিণতি ভাবমুখে প্রত্যক্ষ করে আমাদের প্রশংসা করতেন, উৎসাহিত করতেন এবং আমাদের প্রতিটি আচরণ লক্ষ্য করে উপদেশ দিয়ে আমাদের সংযত রাখতেন। এইরকম তন্ন তন্ন করে লক্ষ্য করে তিনি যে আমাদের নিত্য নিয়মিত করছেন, তা আমরা কিছুই জানতে পারতাম না।"

আর শুধু ইহাই নহে। ঠাকুর তাঁহার ঐ সূক্ষ্ম নিয়মনের সহিত যথাসময়ে যোগ করিয়া দিতেন (নিজ অমেয় ভাণ্ডার হইতে) সূক্ষ্মতর আধ্যাত্মিক শক্তি দান। এবং অনেক সময়ে উহা তাঁহার শিষ্যগণের অজ্ঞাতসারেই দিয়াছেন। ইহার ফলে তাঁহাদের সাধনা সংক্ষিপ্ত হইয়াছে, আধ্যাত্মিক উন্নতি-পথের দুরতিক্রম্য বাধা সকল তাঁহারা অতি সহজে অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন এবং অনেক দুর্লভ দিব্যানুভূতি অতি সুলভ বস্তুর ন্যায় লাভ করিয়াছেন। নরেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ইহার বহু নিদর্শন আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি এবং পরে আরও দেখিতে পাইব।

তবে এই সকল ব্যতীত ঠাকুরের সান্নিধ্যে নরেন্দ্রনাথের মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের একটি বিশেষ ব্যাপার এই। আমরা দেখিয়াছি, ঠাকুরের নিকট প্রথম আগমনের পর হইতে প্রায় তিন বৎসরকাল (১৮৮২-৮৪) যাবৎ নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে (পূর্ব-বর্ণিতরূপে) নানা উপায়ে পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও যুক্তির ভিত্তিতে সমালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন। এবং প্রতিক্ষেত্রেই ফল যাহা পাইয়াছেন তাহাতে তিনি স্তম্ভিত হইয়াছেন। তারপর পরিশেষে একদিন তিনি পরাজয়

স্বীকার করিয়া ঠাকুরকে বলেন—"এখন তো অনেক দেখলাম—সব মিলছে।" আমরা দেখিয়াছি ইহা তাঁহার ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের উক্তি।

তবে নরেন্দ্রনাথের বুদ্ধির পরাজয় এইভাবে বিলম্বিত হইলেও, তাঁহার অন্তরের মধ্যে প্রথম হইতেই একটা অপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হইতেছিল। এবং তাহার হেতু এই। ঠাকুরের চারিদিকে তাঁহার দেহ-মন হইতে নিয়ত বিকীর্ণ হইত শান্তি, প্রেম ও পবিত্রতা। আর তাহারই সঙ্গে চলিতে থাকিত তাঁহার অমৃতের ন্যায় উপদেশ, মুহুর্মুহুঃ সমাধি ও অপার্থিব হাসি, আনন্দ ও রঙ্গ-রস। নরেন্দ্রনাথের বিরাট ভাবগ্রাহী হৃদয়ে এ সবই বিপুল প্রভাব বিস্তার করিত। এবং নিজ বিশাল বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব সহায়ে তিনি বাহ্যতঃ অনমনীয় থাকিলেও, তাঁহার হৃদয় প্রথম হইতেই ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার চরণেই নিবেদিত হইয়া আসিতেছিল।

আর ঐ সঙ্গেই ঠাকুরের প্রসাদে তাঁহার মধ্যে সময়ে সময়ে নানা অলৌকিক দিব্যানুভূতিও দেখা দিত। ঐ সকল অনুভূতির অধিকাংশই অপ্রকাশিত থাকিলেও, উহা নরেন্দ্রনাথের অন্তরকে কিভাবে প্রভাবিত ও রূপান্তরিত করিয়াছিল, তাহা আমরা নিম্নের ঘটনাটি হইতে সুস্পষ্ট ভাবে জানিতে পারি।

ঘটনাটি পূজনীয় শরৎ মহারাজের বর্ণিত। তিনি লিখিয়াছেন, "১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের শীতকালে (সম্ভবতঃ পৌষ মাসে) আমি ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ একদিন দুপুরবেলা নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে তাঁদের গৌরমোহন মুখার্জি ষ্ট্রীটের বাড়ীতে গিয়েছিলাম এবং রাত্রি প্রায় ১১টা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ছিলাম। সেদিন নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্বন্ধে যে সকল প্রাণস্পর্শী কথা আমাদের বলেছিলেন, তা আমাদের প্রাণে এক নূতন আলোক এনেছিল।······ঠাকুরের কৃপায় নরেন্দ্রনাথ নিজে যে সকল দিব্যানুভূতি লাভ করেছিলেন, তার কথা বলতে বলতে তিনি সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমাদের হেদুয়া পুকুরের ধারে

বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি মনের আনন্দে তাঁর কিন্নর কণ্ঠে গান ধরলেন—

প্রেমধন বিলায় গোরা রায়! ইত্যাদি।

"গানটি শেষ হলে নরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে বললেন, 'সত্য সত্যই বিলাচ্ছেন। প্রেম বল, ভক্তি বল, জ্ঞান বল, মুক্তি বল, গোরা রায় যাকে যা ইচ্ছা তাকে তাই-ই বিলাচ্ছেন! কি অদ্ভুত শক্তি!' এই বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পুনরায় বললেন, 'রাত্রে ঘরে খিল দিয়ে বিছানায় শুয়ে আছি, হঠাৎ আকর্ষণ করে দক্ষিণেশ্বরে হাজির করালেন—শরীরের ভিতরে যেটা আছে সেইটেকে। পরে কত কথা, কত উপদেশের পর আবার ফিরতে দিলেন। সব করতে পারেন—দক্ষিণেশ্বরের গোরা রায় সব করতে পারেন'!"

উপরের বর্ণনানুসারে এই শেষোক্ত অত্যদ্ভুত ব্যাপারটি নরেন্দ্রনাথ প্রকাশ করেন ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভকালে। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, উহা তাহার কিছু পূর্বে (অর্থাৎ, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে) ঘটিয়াছিল। যাহা হউক, সমগ্র বর্ণনাটি হইতে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, নরেন্দ্রনাথের হৃদয় ঐকালে ঠাকুরের অতিমানবিক আধ্যাত্মিক শক্তিতে একান্ত বিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু তাহা হইলেও আমরা বিস্ময়ের সহিত দেখিতে পাই, তাঁহার মস্তিষ্ক তখন এবং তাহার অনেক কাল পর পর্যন্তও ঠাকুরের নিকট সকল বিষয়েই নতি স্বীকার করে নাই। এবং ঠাকুরের বা উপস্থিত যে কোনও ভক্তের যে সকল উক্তি যুক্তিহীন মনে হইত, তিনি বিনা দ্বিধায় তাহারই তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। ফলে, অনেক কাল পর্যন্ত তাঁহার কথাবার্তা ও যুক্তি-তর্কাদি শুনিয়া লোকে ধারণা করিয়া বসিত, তিনি পাশ্চাত্য মত সকলেরই অধিক পক্ষপাতী।

কিন্তু বাস্তবিক তখন তাঁহার পাশ্চাত্য শিক্ষা এক মহা গৌরবময় সার্থকতার পানে ছুটিয়াছিল। আমরা দেখিয়াছি, পাশ্চাত্য দর্শনের আধ্যাত্মিক মীমাংসাগুলি নরেন্দ্রনাথকে কোন সন্তোষ দিতে পারে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি মনে করিতেন, পাশ্চাত্য জড়-

বিজ্ঞানের আবিষ্কার সমূহ এবং ঐ দেশীয় বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রণালী মানসিক ও আধ্যাত্মিক রাজ্যের তত্ত্বসকল পরীক্ষা করিবার এক অমূল্য মহাস্ত্র। তাই, তিনি ঠাকুরের যে সকল মত বিশ্বাস ও উপলব্ধির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলিতেন, তাহা সবই যে তিনি নির্দিষ্টভাবে অবিশ্বাস করিতেন তাহা নয়। অধিকাংশ স্থলেই বিশ্বাস করিতে আকাঙ্ক্ষিত হইয়াই ঐরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে নিযুক্ত হইতেন। কথামৃতে বর্ণিত একদিনের একটি আলোচনায় নরেন্দ্রনাথ যাহা বলেন, তাহা লক্ষ্য করিলেই কথাগুলি সুস্পষ্ট হইবে।

এইদিন (১৮৮৫, ৯ই মে) অবতারবাদ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে নরেন্দ্রনাথ ও গিরিশ ঘোষ প্রভৃতি ভক্তগণের বিচার চলিতেছিল। তখন নরেন্দ্রনাথ ঐ আলোচ্য বিষয়ের প্রতি তাঁহার ঐকালীন মনোভাব এইরূপে ব্যক্ত করেন, "প্রমাণ না হলে কেমন করে বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর মানুষ হয়ে আসেন। যদি বলেন শাস্ত্রই প্রমাণ, তা হলে বলতে হয় শাস্ত্রই বা কি করে বিশ্বাস করি। শাস্ত্র একবার বলছেন—ব্রহ্মজ্ঞান না হলে নরক হবে, আবার অন্যত্র বলছেন—পার্বতীর উপাসনা ব্যতীত আর উপায় নেই। সাংখ্যদর্শন বলছেন, 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ'। আবার ঐ সঙ্গেই বলা হয়, বেদ মানতে হবে, বেদ নিত্য। তা হলেও, আমি বলছি না যে এ সব মিথ্যা। তবে বুঝতে পারছি না, বুঝিয়ে দাও।"

উক্তিটি হইতে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, নরেন্দ্রনাথ এই সময়ে অবতারবাদ ও সংস্পৃষ্ট শাস্ত্রোক্তি সকল বিশ্বাস করিতে কিরূপ আকাঙ্ক্ষিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু যুক্তির ভিত্তিতে সিদ্ধ বা সমর্থিত না হইলে তাহা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাই, প্রায় প্রথম হইতেই তাঁহার মধ্যে আপনা হইতেই দেখা দিয়াছিল এক অপূর্ব প্রচেষ্টা। ঠাকুরের প্রসাদে যে সকল আধ্যাত্মিক তত্ত্ব তিনি নিজে প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন, অথবা তাঁহার সর্বদা অগ্রগামী হৃদয় সত্য বলিয়া অনুভব করিতে লাগিল, তাহা তিনি পাশ্চাত্য জড়-বিজ্ঞানের আবিষ্কার সমূহ ও ঐ দেশীয় বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির

দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। উহার ফলে তিনি এই কার্যে ক্রমে অতিশয় সুদক্ষ হইয়া উঠিলেন; এবং দেখা যায়, পরবর্তীকালে তিনি যে অপূর্ব কৌশল ও অকাট্য যুক্তির সহিত এই পন্থাতেই ভারতের প্রাচীন অধ্যাত্ম জ্ঞানরাজি পাশ্চাত্যের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার বিশ্ববিজয়ে এক মহাস্ত্রের ন্যায় কার্য করিয়াছে। এবং তাহাই তাঁহার পাশ্চাত্য শিক্ষাকে এক চরম সার্থকতা দান করিয়াছে।

যাহা হউক, নরেন্দ্রনাথের হৃদয় ও মস্তিষ্কের মধ্যে (উপরিবর্ণিত মতে) যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল ঠাকুর তাহা লক্ষ্য করিতেছিলেন এবং উহার অবসান জন্য তিনি তাঁহাকে নানাভাবে সময়োপযোগী সাহায্য করিতে লাগিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ নরেন্দ্রনাথ ঈশ্বরের দর্শন লাভ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াও, তিনি যে সাকার রূপ ধারণ করিয়া মানুষকে দেখা দেন তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। তাই, ঠাকুর তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বলিতেন, "মানুষের কাতর প্রার্থনা তিনি সব সময়েই শুনেন। তুমি আমি একত্রে বসে যেভাবে কথা বলছি, এর চাইতেও স্পষ্টতর ভাবে তাঁকে দেখতে, তাঁর কথা শুনতে ও তাঁকে স্পর্শ করতে পারা যায়, এ আমি শপথ করে বলতে রাজি আছি।" আবার বলিয়াছেন, "যদি শাস্ত্রোক্ত ঈশ্বরীয় রূপ ও ভাবগুলি মানব-কল্পনা প্রসূত বলে না মানতে পার, অথচ জগতের নিয়ামক ঈশ্বর একজন আছেন একথা বিশ্বাস থাকে, তবে 'হে ঈশ্বর, তুমি কেমন আমি জানি না। তুমি যেমন তেমনি ভাবে আমাকে দেখা দাও'—এরূপ কাতর প্রার্থনা করলেও তিনি নিশ্চয়ই কৃপা করবেন।"

ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিবার পর নরেন্দ্রনাথ (সাকার ঈশ্বরের ধ্যান পরিত্যাগ করিয়া) নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের চিন্তাতে মন নিযুক্ত রাখিতেন। কিন্তু ক্রমে ঈশ্বরের ঐরূপ ধারণাও মানবীয় কল্পনাদুষ্ট মনে হওয়ায়, তিনি ধ্যানের ঐ অবলম্বনও পরিত্যাগ করিলেন ও (ঠাকুরের উপদেশানুযায়ী) এক সম্পূর্ণ নূতন পন্থায় ধ্যানাভ্যাস করিতে নিযুক্ত

নরেন্দ্রনাথ কখন গ্রন্থপাঠ পরিত্যাগ করেন নাই। এবং ধ্যান, সঙ্গীত ও গ্রন্থপাঠের কাজ তিনি এক সঙ্গেই চালাইয়া গিয়াছেন।

এইভাবে একই কালে নরেন্দ্রনাথ নানা ধারায় বিকাশ লাভ করেন। একদিকে (গ্রন্থপাঠের) একটি শতমুখী পাশ্চাত্য ধারা তাঁহার মস্তিষ্ককে যেমন সমৃদ্ধ করে, অন্যদিকে তেমনি (ধ্যান, সঙ্গীত, দিব্যানুভূতি ও সদ্‌গুরুর সাহায্য ও সাহচর্যের) একটি অনন্তমুখী প্রাচ্য (ভারতীয়) ধারা তাঁহাকে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক সিদ্ধির অধিকারী করিয়া তুলে। চতুর্দিকে শুধু বৃদ্ধি ও বিকাশ। মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে যেমন, শারীরিক উন্নতি সাধনেও তেমনি। (আমরা দেখিয়াছি) নরেন্দ্রনাথ ছিলেন কুস্তিগির ও ক্রীড়াদিতে সুপটু এবং ভয় কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না। আরও দেখা যায়, পাশ্চাত্য গ্রন্থাদি পড়িয়া তিনি যেমন ইংরেজী ভাষা-ব্যবহারে সুদক্ষ হইয়াছিলেন, তেমনি এই কালেই তিনি গীতা, উপনিষদ্ প্রভৃতি প্রাচ্য ধর্মগ্রন্থ সকল পড়িতে আরম্ভ করিয়া পরে যথা সময়ে ও অতি অল্প আয়াসেই (ইহা আমরা পরে দেখিতে পাইব) সংস্কৃত ভাষাতেও সুপণ্ডিত হন।

কিন্তু বিরাট আধার নরেন্দ্রনাথের সুবিরাট বহুমুখী বিকাশ ইহাতেও সুসাধিত হয় নাই। তাঁহার গভীর অন্তরতলের বহু অমূল্য রত্নরাজির বহির্নিগমনের জন্য প্রয়োজন ছিল বিরাট চাপ, বিরাট পেষণ, চরমতম আঘাত। তাঁহার ভাগ্যবিধাতা এখন (১৮৮৪-৮৫) উপযুক্ত সময় উপস্থিত বুঝিয়া তাহারই ব্যবস্থা করিলেন। পূর্বের ন্যায় এই ঘোর সঙ্কট-কালেও তাঁহার জীবন-কর্ণধার রামকৃষ্ণ তাঁহার পশ্চাতে।

এগার

গুরু ও শিষ্য

(১৮৮৪-১৮৮৫)

(৪) বিকাশ-পথের শেষ ধাপে

গত অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি, নিজের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও শ্রীগুরুর প্রসাদ ও আশীর্বাদে নরেন্দ্রনাথ যে বৃদ্ধি ও বিকাশ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অসাধারণ, সর্বতোমুখী ও (তাঁহার গুরু জানিতেন) যুগান্তকারী। কিন্তু তাহাতেও বিধির অভিপ্রায় পূর্ণ হয় নাই। তাহা পূরণের জন্য প্রয়োজন ছিল নরেন্দ্রনাথকে এমন আঘাত দেওয়া, যাহার সুভীষণ পেষণ-বেদনায় তিনি তাঁহার সকল শক্তি ও সকল সাধনা ও সিদ্ধি লইয়া উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবেন এক মহা সংগ্রামের জন্য। সৃষ্টির বন্ধন ব্যথায় জগৎ জর্জরিত, নিয়মের নাগপাশে মানবকুল অবশ, বিচ্ছিন্ন, ধ্বংসোন্মুখ। তাহাদের ব্যথা-বেদনা ঘুচাইতে, তাহাদের রক্ষা ও মুক্তির উপায় করিতেই না নরেন্দ্রনাথ প্রেরিত? তাই, তাঁহাকে জাগ্রত করিবার জন্য, তুচ্ছ আত্মত্রাণের চিন্তা পরিত্যাগ করাইয়া সমগ্র জগতের হিতে আত্মোৎসর্গ করাইবার নিমিত্ত, বিধাতা এখন সময় বুঝিয়া তাঁহার বুকে হানিলেন এক মহা শেল। নির্ভীক মহাবীর ও আজন্মবিদ্রোহী নরেন্দ্রনাথ সেই নিদারুণ আঘাতের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া সুরু করিলেন তাহা—তাঁহার প্রথম বিপর্যয়ের পরে—তাঁহাকে ধীরে ধীরে এক অটল মহাসঙ্কল্পযুক্ত অপার করুণার আধারে পরিণত করিল। দূরে—বহুদূরে সরিয়া পড়িল তাঁহার সংসার, প্রিয় পরিজন, আত্মসুখ ও আত্মমুক্তি। এবং অকুণ্ঠ চিত্তে তিনি দুঃখ-ভারাক্রান্ত ভারতের জন্য, জগতের জন্য সমগ্র মানবকুলের জন্য নিজেকে পরিপূর্ণরূপে উৎসর্গ করিলেন। ঠিক যেন দ্বিতীয় শ্রীবুদ্ধ। শুধু তফাৎ এই, এবার ঠাটটা যোদ্ধার এবং ভাব এই—গুরু বল, ঈশ্বর বল, আর যেই বল, সকলের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম চালাইব যদি তাঁহারা

মানব মুক্তি ও মানবের দুঃখাপসরণের প্রতিবন্ধক হন। তবে বাস্তবিক তাঁহার এই মনোভাবেও তাঁহার গুরু ও ঈশ্বরই ছিলেন তাঁহার চালক ও সহায়। এবং তাঁহাদেরই আশীর্বাদ শিরে লইয়া তিনি (পরবর্তীকালে) এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যার ন্যায় সারা পৃথিবী ঘুরিয়া মানব কল্যাণে প্রচার করিয়াছেন অভয় এবং বপন করিয়াছেন ত্যাগ, সেবা ও মুক্তির মহাশক্তিপূর্ণ মহাবীজ।

এই মহামহিমময় ইতিহাসই আমরা এখন হইতে ক্রমশঃ ও ধীরে ধীরে লক্ষ্য করিতে থাকিব। উহার সূচনা এইরূপ :

তখন সময় ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভকাল। নরেন্দ্রনাথ সবে বি এ পরীক্ষা দিয়াছেন, ফল তখনও বাহির হয় নাই। এই সময়ে এক-দিন তিনি নিমন্ত্রিত হইয়া বরাহনগরে এক বন্ধুর বাড়ীতে গেলেন। এবং সেখানে রাত্রি এগারটা পর্যন্ত ভজন গান করিয়া, আহারান্তে শয্যায় শুইয়া বন্ধুদের সহিত গল্প করিতে লাগিলেন। রাত্রি দুইটার সময় কলিকাতা হইতে তাঁহার একটি বন্ধু (হেমালী) আসিয়া সংবাদ দিলেন—তাঁহার পিতা (বিশ্বনাথ) ঐ দিন রাত্রি দশটার সময় হঠাৎ দেহত্যাগ করিয়াছেন (১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ, ২৫শে ফেব্রুআরি, শনিবার)।

অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমে বিশ্বনাথের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল। প্রায় একমাস কাল (বহুমূত্র ও হৃদ্‌রোগে) শয্যাশায়ী থাকিয়া তিনি সবে মাত্র একটু সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তারপর মৃত্যুর দিনেই প্রথম অফিসে যান। এবং স্থির ছিল যে পরের দিন তিনি নরেন্দ্র-নাথের জন্য একটি মেয়ে দেখিতে যাইবেন। কিন্তু তাঁহার অকস্মাৎ মৃত্যুতে তাহা ব্যর্থ হইয়া গেল।

ঐ রাত্রেই বাড়ী ফিরিয়া নরেন্দ্রনাথ পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। পরে অনুসন্ধান লইয়া বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থা যার-পর-নাই শোচনীয়। তাঁহার খরচ-প্রিয় পিতা কোন টাকা রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, শুধু কিছু ঋণ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অভাবে সংসারে এখন আর কোন আয় নাই বলিলেই হয়। এবং নরেন্দ্রনাথের খুল্লপিতামহী ও তাঁহার ধনী

পুত্রবধূ (তারকনাথের স্ত্রী) তাঁহাদের কোন সাহায্য করা দূরে থাকুক, এখন সময় বুঝিয়া বসতবাটী হইতেও তাহাদের উচ্ছেদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই অবস্থায়, নরেন্দ্রনাথ মৃতাশৌচের মধ্যেই চাকরির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্তব্ধ ও বিস্মিত হইয়া দেখিলেন সকল দুয়ার বন্ধ, কোথাও তাঁহার চাকরি মিলিল না। এই সময়ের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি তাঁহার গুরুভাইদের নিকট বলিয়াছেন—

"(অশৌচের মধ্যে) অনাহারে, খালি পায়ে, চাকরির দরখাস্ত হাতে করে দুপুরের রোদে অফিস হতে অফিসে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। কোন দিন দু'এক জন নিকট-বন্ধু সঙ্গে থাকত, কোন দিন থাকত না। কিন্তু সর্বত্রই বিফল হলাম। এবং সংসারের নগ্ন বীভৎস মূর্তি সেই প্রথম আমার নিকট ফুটে উঠল। দেখতাম, দুদিন আগে আমাকে যারা একটু সাহায্য করতে পারলে নিজেকে ধন্য বোধ করেছে, তারা এখন বিমুখ—ক্ষমতা থাকলেও সাহায্য করতে অনিচ্ছুক।"

এই নিদারুণ অভিজ্ঞতায় তাঁহার অন্তর এক অপরিসীম দুঃখ ও তিক্ততায় ভরিয়া উঠিল। ইহার বর্ণনায় তিনি বলিয়াছেন, "একদিন রোদে ঘুরতে ঘুরতে পায়ে ফোস্‌কা পড়েছিল এবং ঐ অবস্থায় অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে মনুমেণ্টের ছায়ায় গিয়ে বসে পড়লাম। দু'এক জন বন্ধু সেদিন সঙ্গে ছিল। তাদের মধ্যে একজন আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে গান ধরল—'বহিছে কৃপাঘন ব্রহ্মনিশ্বাস পবনে', ইত্যাদি। শুনে মনে হল সে যেন আমার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করছে। নিতান্ত অসহ্য হওয়ায় তাকে তিরস্কার করে বলে উঠলাম, 'নে, নে, চুপ কর। যাদের মা-ভাইদের খাওয়ার কষ্ট নেই, যাদের কোন অভাব নেই, টানাপাখার হাওয়া খেতে খেতে তাদের ঐ গান মিষ্টি লাগতে পারে, আমারও একদিন লাগত। কিন্তু এখন ও শুধু একটা বিদ্রূপ বলেই মনে হয়।'

"আমার ঐ কথায় বন্ধুটি বোধ হয় খুবই ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। কিন্তু দারিদ্র্যের কি ভীষণ নিষ্পেষণে আমার মুখ দিয়ে ঐ কথা বেরিয়েছিল, তা তার বোঝবার সাধ্য ছিল না। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই

খোঁজ নিয়ে যেদিন বুঝতাম ঘরে সকলের উপযুক্ত আহার্য নেই এবং হাতে পয়সাও নেই, সেদিন মাকে 'আমার নিমন্ত্রণ' আছে বলে বের হতাম এবং কোন দিন সামান্য কিছু খেয়ে, কোন দিন বা একেবারেই উপোস করে কাটিয়ে দিতাম। কিন্তু মনের দুঃখে ও অভিমানে, ঘরে-বাইরে কাউকে তা জানতে দিতাম না। ধনী বন্ধুরা পূর্বের ন্যায় আমাকে তাদের বাড়ীতে বা বাগানে গিয়ে গান করতে অনুরোধ করত। এড়াতে না পারলে মাঝে মাঝে তাদের ওখানে গিয়ে গান করতাম বটে, কিন্তু আমার অবস্থার কথা তাদের কখন বলিনি এবং তারাও কখনও তা জানতে চায়নি। মাত্র একজন আমার অজ্ঞাতে কারও কাছ থেকে আমার অবস্থা জেনে, আমার মাকে মাঝে মাঝে বেনামী পত্রের ভিতর টাকা পাঠিয়ে আমাকে চির-ঋণে আবদ্ধ করে রেখেছে।"

এই আশাহীন, আলোহীন, দুঃসহ দুরবস্থার সকল কষ্টই নরেন্দ্রনাথ নীরবে সহ্য করিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন নিজ জননীর বেদনাক্লিষ্ট মুখের একটি তিরস্কার বাক্য তাঁহার জীবনের সবই যেন ওলটপালট করিয়া দিল। এই বিপর্যয় সম্বন্ধে তাঁহার নিজ মুখের বর্ণনা এইরূপ :

"এত দুঃখকষ্টেও এতদিন ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাইনি। তাই, প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে তাঁর নাম করতে করতে শয্যা ত্যাগ করতাম। একদিন মা তা শুনতে পেয়ে বলে উঠলেন—'চুপ কর ছোঁড়া, ছেলেবেলা থেকে কেবল ভগবান, ভগবান—ভগবান তো সব করলেন!' মার মুখে এই কথাগুলি শুনে স্তব্ধ হয়ে ভাবতে লাগলাম, 'ভগবান কি সত্যিই আছেন,—থাকলেও কি আমাদের কাতর প্রার্থনা শুনে থাকেন? এত যে প্রার্থনা করি, তার কোন উত্তর নেই কেন? মনে পড়ল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা—'ভগবান যদি দয়াময় ও মঙ্গলময়, তবে দুর্ভিক্ষে দুটি অন্ন না খেতে পেয়ে লাখ লাখ লোক মরে কেন?' ঈশ্বরের উপর প্রচণ্ড অভিমানে হৃদয় ভরে গেল। এবং ঐ সঙ্গে বহু সংশয় সন্দেহ এসে মন ছেয়ে ফেলল।

"তাই, ঈশ্বর নেই—এই কথাই এখন হাঁক-ডাকের সঙ্গে লোকের নিকট প্রমাণ করতে প্রবৃত্ত হলাম। ফলে, চারদিকে রটে গেল যে আমি নাস্তিক এবং দুশ্চরিত্র লোকের সঙ্গে মিশে মদ খেতে ও পতিতালয়ে যেতেও আমার কোন কুণ্ঠা নেই। এই মিথ্যা নিন্দায় আমার মন আরও কঠিন হয়ে উঠল এবং নিঃসঙ্কোচে বলে বেড়াতাম, সংসারের দুঃখ-কষ্ট কিছুক্ষণ ভুলে থাকবার জন্য কেউ যদি ও পথে যায়, তা আমি একটুও দোষের মনে করি না। (লী)।[১]

"আমার এই কথাগুলি নানাভাবে বিকৃত হয়ে ক্রমে ঠাকুর ও তাঁর কলকাতার ভক্তদের নিকট পৌঁছল। ভক্তদের কেউ কেউ আমার প্রকৃত অবস্থা জানবার জন্যে আমাকে দেখতে এলেন এবং তাদের ভাব-সাব ও কথাবার্তায় বুঝলাম, যা রটেছে তার অন্ততঃ কিছুটা তারা বিশ্বাস করেছেন। তারা আমাকে এই রকম হীন ভাবতে পারেন জেনে, আমিও উত্তেজিত হয়ে তাদের বললাম—শাস্তি পাবার ভয়ে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা একটা ভীষণ দুর্বলতা এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বের যে কোন প্রমাণ নেই তার সমর্থনে হিউম, বেন, মিল, কোঁতে প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ যা বলেছেন, তা উদ্ধৃত করে তাদের সঙ্গে প্রচণ্ড তর্ক জুড়ে দিলাম। ফলে, আমার যে অধঃপতন হয়েছে, তৎসম্বন্ধে তারা নিঃসন্দেহ হয়েই বিদায় নিলেন। কিন্তু পরে শুনলাম, ঠাকুর তাদের মুখে ঐ সব কথা শুনে প্রথমটা 'হাঁ, না' কিছুই বলেননি। শেষে ভবনাথ যখন কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে গিয়ে বলল,

---

১। নরেন্দ্রনাথের উক্তপ্রকার বাহ্য নাস্তিকতার কোন সুনির্দিষ্ট সময় লীলা-প্রসঙ্গে দেওয়া নাই। তবে সমগ্র বর্ণনাটি হইতে বোঝা যায় যে, ঐ কালে তিনি ঠাকুরের নিকট যাইতেন না। এবং সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া কথামৃতের অধ্যায়গুলি পরীক্ষা করিলে অনুমান হয় যে, নরেন্দ্রনাথের উক্ত অবস্থার সময় হইতেছে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের প্রথম হইতে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যভাগ পর্যন্ত, অথবা (এবং খুব সম্ভবতঃ) উহার অন্তর্বর্তী কোন ক্ষুদ্রতর কাল।

'মশাই, নরেনের এমন হবে তা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল', তখন ঠাকুর অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে তাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'চুপ কর শালারা, —মা বলেছেন সে কখন ওরকম হতে পারে না। তোরা যদি ফের ঐ সব কথা বলিস, তোদের মুখ আর আমি দেখব না'।"

বস্তুতঃ নরেন্দ্রনাথ ছিলেন ঈশ্বর-প্রেরিত ও শ্রীগুরু-আশ্রিত। জীবনের কোন দুর্যোগেরই সাধ্য ছিল না যে তাঁহাকে লক্ষ্যহারা করে। তাই, উপরি-বর্ণিত বিপর্যয় ঈশ্বরেচ্ছায় শুধু তাঁহাকে তাঁহার জীবনোদ্দেশ্য সাধনের জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া দিয়াই আপনি অপসারিত হইল। এই আশ্চর্য পরিণতি যেভাবে সংঘটিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"আমি বাস্তবিক প্রকৃত নাস্তিক কখন হতে পারিনি। ছেলে-বেলা থেকে এবং বিশেষভাবে ঠাকুরের কাছে যাবার পর হতে, আমার যে সকল দৈবানুভূতি হয়েছিল তা মনে উদয় হতেই ভাবতে থাকতাম—ঈশ্বর নিশ্চয়ই আছেন, তাঁকে লাভ করার পথও নিশ্চয় আছে, দুঃখকষ্ট জীবনে যতই আসুক সে পথ খুঁজে বের করতেই হবে।

"এই অবস্থায় একদিন বর্ষাকালে সমস্ত দিন অনশনে থেকে ও বৃষ্টিতে ভিজে রাত্রে অবসন্ন পায়ে বাড়ি ফিরছিলাম, এমন সময়ে শরীর এত ক্লান্ত বোধ হল যে আর এক পাও এগুতে না পেরে রাস্তার পাশের একটা বাড়ীর রকের উপর শুয়ে পড়লাম। তখন কিছুক্ষণের জন্য হয়তো চেতনা ছিল না। হঠাৎ উপলব্ধি করলাম—কোন এক দৈবশক্তিপ্রভাবে একটির পর একটি করে ভিতরের অনেকগুলি পর্দা উঠে গেল এবং শিবের সংসারে অশিব কেন, ঈশ্বরের কঠোর ন্যায়-পরায়ণতা ও অপার করুণার সামঞ্জস্য কোথায়, ইত্যাদি যে সকল বিষয় নির্ণয় করতে না পেরে মন এতদিন সংশয়-সন্দেহে আকুল হয়ে ছিল, সেই সকল বিষয়ের স্থির মীমাংসা অন্তরের নিবিড়তম প্রদেশে দেখতে পেলাম। দেখেই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। এবং তারপর বাড়ী ফিরবার সময় দেখলাম শরীরে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নেই,

মন অমিত বল ও শান্তিতে পূর্ণ এবং রাত্রি শেষ হবার আর সামান্যই বিলম্ব আছে।" (লী)।[১]

এই অপূর্ব দর্শনটির মধ্যে যে আরও নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ছিল, তাহা (নরেন্দ্রনাথ প্রকাশ না করিলেও) অনুমান করিবার যথেষ্ট হেতু পাওয়া যায়। কারণ, ঐ দর্শনটির পর তাঁহার যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল তৎসম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন :

"সংসারের নিন্দা-প্রশংসায় এখন হতে একেবারে উদাসীন হলাম। এবং সাধারণ লোকের ন্যায় অর্থ রোজগার করে পরিবারবর্গের সেবা ও সুখভোগে কালযাপন করবার জন্যে আমার জন্ম হয় নি,—এ কথায় দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে আমার পিতামহের ন্যায় সংসার ত্যাগের জন্য গোপনে প্রস্তুত হতে লাগলাম। যাবার দিন স্থির হলে, সংবাদ পেলাম ঠাকুর ঐ দিন কলকাতায় এক ভক্তের বাড়ীতে আসবেন। ভাবলাম, ভালই হল, গুরুদর্শন করে চিরকালের মত গৃহ ত্যাগ করব।

"কিন্তু ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হতেই তিনি ধরে বসলেন, 'তোকে আমার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর যেতে হবে।' আমি নানা ওজর-আপত্তি করলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই ছাড়লেন না। অগত্যা তাঁর সঙ্গে গেলাম। গাড়ীতে বিশেষ কোন কথা হল না। দক্ষিণেশ্বর পৌঁছে ভক্তদের সঙ্গে বসে আছি, এমন সময়ে তাঁর ভাবাবেশ হল। তখন তিনি হঠাৎ আমার কাছে এসে আমাকে সস্নেহে ধরে সজল নয়নে গাইতে লাগলেন—

১। এই দর্শনটির সময় লীলাপ্রসঙ্গে বর্ষাকাল বলিয়া উল্লিখিত হইলেও, পূর্ববর্তী পাদটীকায় যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে ঘটনাটি ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের পূর্বে কখন ঘটে নাই। তবে স্পষ্টতঃ উহা একটি বৃষ্টির দিনের ঘটনা এবং তজ্জন্যই হয়তো ভ্রমবশতঃ উহার সময়কে বর্ষাকাল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

কথা কহিতে ডরাই,
না কহিতেও ডরাই,
(আমার) মনে সন্দ হয়
বুঝি তোমায় হারাই, হা-রাই !

এতক্ষণ অন্তরের ভাব অন্তরেই চেপে রেখেছিলাম, কিন্তু এখন আর সামলাতে পারলাম না। ঠাকুরের ন্যায় আমার বুকও চোখের জলে ভেসে যেতে লাগল। নিশ্চিতভাবে বুঝলাম ঠাকুর সব জানতে পেরেছেন। আমাদের ঐরূপ আচরণ দেখে অপর সকলে স্তম্ভিত হয়ে রইল। তারপর ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হলে কেউ কেউ তাঁকে ওর কারণ জিজ্ঞাসা করলে, তিনি হেসে বললেন—'ও আমাদের একটা হয়ে গেল।' পরে রাত্রে তিনি অপর সকলকে সরিয়ে দিয়ে আমাকে কাছে ডেকে বললেন—'জানি আমি, তুমি মার কাজের জন্যে এসেছ, সংসারে কখনই থাকতে পারবে না। কিন্তু আমি যতদিন আছি ততদিন আমার জন্যে থাক।' বলেই ঠাকুর হৃদয়ের আবেগে আবার চোখের জল ফেলতে লাগলেন।" (লী)।[১]

ইহার পরের ঘটনাবলী আরও চমকপ্রদ। নরেন্দ্রনাথ তাহা এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন :

"ঠাকুরের নিকট বিদায় নিয়ে পরদিন বাড়ী ফিরলাম। সঙ্গে সঙ্গে সংসারের শত চিন্তা এসে মনকে চেপে ধরল। পূর্বের ন্যায় নানা চেষ্টায় ফিরতে লাগলাম। এবং একটি এটর্নির অফিসে কাজ করে ও কয়েকখানা বই অনুবাদ করে যা সামান্য আয় হত, তাতে কোন মতে

১। এই ঘটনার অনুরূপ একটি ঘটনা ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ তারিখে (দোলপূর্ণিমার দিনে) ঘটিয়াছে বলিয়া রামকৃষ্ণ কথামৃতের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত দেখা যায়। ঐ বর্ণনা ও উপরের (লীলাপ্রসঙ্গ হইতে গৃহীত) বর্ণনাটির মধ্যে সামান্য কিছু পার্থক্য থাকিলেও, মূল ঘটনার বর্ণনা উভয় পুস্তকেই প্রায় এক রকমের। তাই মনে করা যায়, দুইটি বর্ণনাই একই ঘটনার বর্ণনা এবং উহা উপরি-কথিত ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ তারিখে ঘটিয়াছে।

দিন কেটে যেতে লাগল বটে।[1] কিন্তু স্থায়ী কাজ কোথাও জুটল না এবং মা ও ভাইদের ভরণপোষণের কোন সচ্ছল ব্যবস্থাও কিছু হল না। এইভাবে কয়েকদিন গেলে হঠাৎ মনে হল, 'ঠাকুরের কথা তো ঈশ্বর শোনেন, তাঁকে বলে আমার মা-ভাইদের খাওয়া-পরার কষ্ট যাতে দূর হয় সেই প্রার্থনা করিয়ে নেব। আমার জন্যে ঐ প্রার্থনা করতে তিনি কখন অস্বীকার করবেন না।' অল্প পরেই ঐ উদ্দেশ্যে দক্ষিণেশ্বরে ছুটলাম এবং নাছোড়বান্দা হয়ে ঠাকুরকে ধরে বসলাম, 'আমার মা-ভাইদের আর্থিক কষ্ট দূর করবার জন্যে মাকে আপনার বলতে হবে।' ঠাকুর স্নেহের সঙ্গে বললেন, 'ওরে, আমি যে কতবার বলেছি—মা, নরেন্দ্রের দুঃখ-কষ্ট দূর কর।[2] তুই মাকে মানিস না—সেই জন্যই তো মা শোনে না। আচ্ছা, আজ মঙ্গলবার, আমি বলছি—আজ রাত্রে 'কালীঘরে' গিয়ে মাকে প্রণাম করে তুই যা চাইবি, মা তোকে তাই দেবেন। মা আমার চিন্ময়ী ব্রহ্মশক্তি, ইচ্ছায় জগৎ প্রসব করেছেন,—তিনি ইচ্ছা করলে কি না করতে পারেন!'

"দৃঢ় বিশ্বাস হল, ঠাকুর যখন ঐরূপ বললেন, তখন নিশ্চয়ই প্রার্থনা করা মাত্র দুঃখের অবসান হবে। প্রবল উৎকণ্ঠার সঙ্গে রাত্রির জন্যে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। ক্রমে রাত হল এবং এক

১। ইহা ছাড়া জানা যায়, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে নরেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বৌবাজার শাখা স্কুলে দিনকতক অস্থায়ী হেডমাস্টারের কার্য করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার স্নেহশীলা মাতামহী রঘুমণি দেবী তাঁহাদের সকল বিপদ-আপদেই তাঁহাদিগকে সাধ্যানুসারে সাহায্য করিতেন।

২। নরেন্দ্রনাথের পারিবারিক দুঃখকষ্ট দূর করিবার জন্য ঠাকুর কিরূপ ব্যাকুল ছিলেন, তাহা নিম্নের ঘটনাটি হইতে জানা যায়:

ঠাকুর একদিন নরেন্দ্রনাথের সম্মুখে তাঁহার বন্ধু অন্নদা গুহকে বলেন, "নরেন্দ্রের বাবা মারা গেছে, ওদের বড় কষ্ট, এখন বন্ধু-বান্ধবরা সাহায্য করে তো বেশ হয়।" অন্নদা গুহ চলিয়া গেলে তাহাকে ঐ কথা বলার জন্য নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বকিতে লাগিলেন। তখন ঠাকুর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ওরে, আমি তোর জন্যে যে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে পারি।"

প্রহর গত হবার পর ঠাকুর আমাকে শ্রীমন্দিরে যেতে বললেন। যেতে যেতে একটা গাঢ় নেশায় সমাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম, পা টলতে লাগল এবং মাকে সত্যসত্যই দেখতে পাব, তাঁর বাণী শুনতে পাব, এইরকম একটা স্থির বিশ্বাসে মন একাগ্র ও তন্ময় হয়ে শুধু ঐ কথাই ভাবতে লাগল। মন্দিরে উপস্থিত হয়ে দেখলাম—সত্য সত্যই মা চিন্ময়ী, সত্য সত্যই জীবিতা এবং অনন্ত প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রস্রবণস্বরূপিণী। ভক্তি-প্রেমে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হল, বিহ্বল হয়ে বার বার প্রণাম করতে করতে বলতে লাগলাম, 'মা, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, যাতে তোমার অবাধ-দর্শন নিত্য পাই এই রকম করে দাও।' শান্তিতে প্রাণ আপ্লুত হল, জগৎসংসার নিঃশেষে অন্তর্হিত হয়ে একমাত্র মা'ই হৃদয় পূর্ণ করে রইলেন।

"ঠাকুরের নিকট ফিরতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কিরে, মার কাছে সাংসারিক অভাব দূর করবার প্রার্থনা করেছিস তো?' তাঁর প্রশ্নে চমকিত হয়ে বললাম—'না, মশাই, ভুলে গেছি! তাই তো, এখন কি করি?' তিনি বললেন, 'যা, যা, ফের যা, গিয়ে ঐ কথা জানিয়ে আয়।'

"আবার মন্দিরে গেলাম এবং মার সামনে গিয়ে আবার মুগ্ধ হয়ে সব কথা ভুলে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করে শুধু জ্ঞান-ভক্তির জন্য প্রার্থনা করে ফিরলাম। ঠাকুর হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি রে, এবার বলেছিস তো?' আবার চমকিত হয়ে বললাম, 'না মশাই, মাকে দেখেই সব ভুলে কেবল জ্ঞান-ভক্তি লাভের কথাই বলেছি! কি হবে?' শুনে ঠাকুর বললেন, 'দূর ছোঁড়া, নিজেকে সামলে ঐ প্রার্থনাটা করতে পারলি না? পারিস তো আর একবার গিয়ে ঐ কথাগুলো জানিয়ে আয়।' আবার গেলাম, কিন্তু মন্দিরে প্রবেশ করা মাত্র দারুণ লজ্জায় হৃদয় ভরে গেল। ভাবলাম, 'এ কি তুচ্ছ কথা আমি মাকে বলতে এসেছি! ঠাকুর যে বলেন, রাজার প্রসন্নতা লাভ করে তার কাছে লাউ কুমড়ো ভিক্ষা করা, এ যে ঠিক সেই রকম নির্বুদ্ধিতা! এমন হীনবুদ্ধি আমার!' লজ্জায় ঘৃণায় পুনঃ পুনঃ প্রণাম

করতে করতে বলতে লাগলাম, 'আর কিছুই চাই না মা, কেবল জ্ঞান-ভক্তি দাও'।'

মন্দিরের বাইরে এসে মনে হল এ নিশ্চয়ই ঠাকুরের খেলা, নতুবা তিন তিন বার মার কাছে এসেও কথাটা বলা হল না! এর পর তাঁকে ধরে বসলাম, 'আপনিই নিশ্চয় আমাকে ঐভাবে ভুলিয়ে দিয়েছেন, এখন আপনাকেই বলতে হবে—আমার মা-ভাইদের কোন খাওয়ার অভাব থাকবে না।' তিনি বললেন, 'ওরে, আমি যে কখন কারও জন্যে ঐরূপ প্রার্থনা করতে পারি নি, আমার মুখ দিয়ে ও বের হয় না। তোকে বললাম, মার কাছে যা চাইবি তাই পাবি; তা তুই চাইতে পারলি না, তোর অদৃষ্টে সংসারসুখ নেই, তা আমি কি

১। নরেন্দ্রনাথের এইভাবে কালীকে মানিবার ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবার এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটির কোন নির্দিষ্ট সময় উপরের (লীলাপ্রসঙ্গ হইতে গৃহীত) বর্ণনায় নাই। তবে ঐ বর্ণনার সহিত গত দুইটি পাদটীকার পূর্ববর্তী পাদটীকাটি বিবেচনা করিলে ইহা সুস্পষ্ট হয় যে, ঘটনাটি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ তারিখের পরের ঘটনা।

ইহা ছাড়া কথামৃত হইতে দেখা যায়, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ তারিখে গিরিশের বাড়ীতে বসিয়া নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বলিতেছেন—"কৈ কালীর ধ্যান তিন-চার দিন করলাম, কিছুই তো হল না।" তাহাতে ঠাকুর উত্তর দেন—"ক্রমে হবে। ইত্যাদি।" এই প্রশ্নোত্তর হইতে বোঝা যায় যে, যে নরেন্দ্রনাথ কালী মানিতেন না ও তাঁহাকে যাহা মুখে আসিত তাহাই বলিতেন, তিনি এখন ঠাকুরের উপদেশে কালীর ধ্যান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাই সিদ্ধান্ত করা যায়, ঐ ধ্যান তিনি কালীকে মানিবার পরে করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং (তাঁহার উপরের উক্তি অনুসারে) উহা করিবার সময় হইতেছে উক্ত ১১ই মার্চ তারিখের অব্যবহিত পূর্ব তিন-চারি দিন।

সুতরাং উপরের প্যারা দুইটির যুক্তি অনুসারে, নরেন্দ্রনাথের কালীকে মানিবার সময় হইতেছে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ হইতে ৭ই মার্চ তারিখের অন্তর্গত কোন দিন, এবং খুব সম্ভবতঃ ৬ই বা ৭ই মার্চ, কারণ অবস্থানুসারে কালীকে মানিবার পরদিন হইতেই ধ্যানসিদ্ধ নরেন্দ্রনাথের পক্ষে তাঁহার ধ্যানে রত হওয়া অধিক সম্ভব ছিল।

করব ?' আমি বললাম, 'তা হবে না মশাই, আমার জন্যে আপনার ও কথা বলতেই হবে'। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি বললেই তাদের আর কষ্ট থাকবে না।' এইভাবে যখন তাঁকে কিছুতেই ছাড়লাম না, তখন তিনি বললেন, 'আচ্ছা যা, তাদের মোটা ভাত কাপড়ের অভাব কখন হবে না।" (লী)।'

উপরি-বর্ণিত ঘটনাটি একাধিক কারণে নরেন্দ্রনাথের জীবনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ঈশ্বরের মাতৃভাবের এবং প্রতীক ও প্রতিমার উপাসনা করিবার মর্ম তিনি এতদিন বুঝিতেন না। এবং মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর মূর্তিসকলকে ইতিপূর্বে কখন অবজ্ঞা ভিন্ন ভক্তির চক্ষে দেখেন নাই। এখন তাঁহার ঐ উপাসনার পরিপূর্ণ রহস্য উপলব্ধি হওয়ায়, তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন অধিকতর পূর্ণতা ও প্রসন্নতা প্রাপ্তির পথে মোড় ফিরিল। এবং ইহাতে ঠাকুর যে কিরূপ আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার গৃহীভক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যালের একটি বর্ণনা হইতে জানা যায়। তিনি বলিয়াছেন :

"(উক্ত ঘটনার পরের দিন) দুপুরে দক্ষিণেশ্বরে এসে দেখলাম, ঠাকুর একা ঘরে বসে আছেন, আর নরেন্দ্রনাথ বাইরে এক পাশে ঘুমুচ্ছেন। ঠাকুরের মুখ তখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে আছে। কাছে গিয়ে প্রণাম করতেই বললেন, 'ওরে দেখ্, ঐ ছেলেটি বড় ভাল, ওর নাম নরেন্দ্র, আগে মাকে মানত না, কাল মেনেছে। কষ্টে পড়েছে, তাই মার কাছে টাকাকড়ি চাইতে বলে দিয়েছিলাম, কিন্তু তা চাইতে পারলে না, বলে, লজ্জা করলে! মন্দির থেকে এসে আমাকে বললে

১। উপরের বর্ণনা লীলাপ্রসঙ্গ হইতে গৃহীত। এই বিষয়ে কথামৃতে প্রদত্ত নরেন্দ্রনাথের মুখের উক্তি এইরূপ :

"আমার জন্য মার কাছে কত কথা বলেছেন। যখন খেতে পাচ্ছি না—বাবার কাল হয়েছে—বাড়ীতে খুব কষ্ট—তখন আমার জন্য মার কাছে টাকা প্রার্থনা করেছিলেন। তা টাকা হলো না। তিনি বললেন, মা বলেছেন মোটা ভাত, মোটা কাপড় হতে পারে। ভাত ডাল হতে পারে।"

মার গান শিখিয়ে দাও। আমি 'মা, ত্বং হি তারা' গানটি শিখিয়ে দিলাম। কাল সমস্ত রাত্রি ঐ গানটা গেয়েছে। তাই এখন ঘুমুচ্ছে।' তারপর মনের আহ্লাদে হাসতে হাসতে বললেন, 'নরেন্দ্র কালী মেনেছে, বেশ হয়েছে,—না?' তাঁর ঐ কথা নিয়ে বালকের ন্যায় আনন্দ দেখে বললাম, 'হ্যাঁ মশাই, বেশ হয়েছে।' কিছুক্ষণ পরে পুনরায় হাসতে হাসতে বললেন, 'নরেন্দ্র কালী মেনেছে! বেশ হয়েছে —কেমন?' এইভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার ঐ কথা বলে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন।[১]

"বেলা প্রায় ৪টার সময় নরেন্দ্র ঘুম থেকে উঠে ঘরের ভিতর ঠাকুরের কাছে এসে বসলেন। মনে হল এখন তিনি ঠাকুরের কাছে বিদায় নিয়ে কলকাতায় ফিরবেন। ঠাকুর কিন্তু তাকে দেখেই ভাবাবিষ্ট হয়ে তার গা ঘেঁসে কোলের কাছে এসে বসলেন এবং বলতে লাগলেন, '(নিজের ও নরেন্দ্রের শরীর পর পর দেখিয়ে) দেখ্ছি কি —এটা আমি, আবার এটাও আমি। সত্য বলছি—কিছু তফাৎ বুঝতে পারছি না! যেমন গঙ্গার জলে একটা লাঠি ফেলায় দুটো ভাগ দেখাচ্ছে, কিন্তু সত্য সত্য কোন ভাগাভাগি নেই, একটাই রয়েছে! বুঝতে পারছ? তা মা ছাড়া আর কি আছে বল,—কেমন?' এই রকম নানা কথা বলে বললেন, 'তামাক খাব।' আমি ব্যস্ত হয়ে তামাক সেজে তাঁর হাতে হুঁকাটি দিলাম। তিনি দু'এক টান দিয়েই হুঁকাটি ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'কল্কেতে খাব।' এবং কল্কেটি হাতে নিয়ে দুচার টান দিয়েই, ওটা নরেন্দ্রের মুখের কাছে ধরে বললেন—'খা, আমার হাতেই খা।' নরেন্দ্র ঐ কথায় অত্যন্ত

১। ঠাকুরের এই আনন্দের অর্থ সামান্য নয়। এই দিন কালীকে মানায় নরেন্দ্রনাথের মনের যে মুক্তি সাধিত হয়, তাহাই তাঁহাকে সর্বত্র ও সর্বরূপে সত্যকে উপলব্ধি করিবার অধিকারী করে। জানা যায়, (অরূপের ঘরের) যে নরেন্দ্র সাকারোপাসনা ও মূর্তিপূজার ঘোর বিরোধী ছিলেন, তিনি কালীকে মানিবার পর নানা ঈশ্বরীয় রূপ দেখিতে আরম্ভ করেন এবং বাড়ীতে বসিয়া (ধ্যানে) ঠাকুরকেও অনেকবার দেখিতে পান।

সঙ্কুচিত হওয়ায় তিনি বললেন, 'তোর তো ভারি হীনবুদ্ধি, তুই আমি কি আলাদা ? এটাও আমি, ওটাও আমি।' এই কথা বলে তিনি আবার তাঁর হাত দুখানি নরেন্দ্রের মুখের সামনে ধরলেন। অগত্যা নরেন্দ্র তাঁর হাতে মুখ লাগিয়ে দু-তিন বার তামাক টেনে নিরস্ত হলেন। তখন ঠাকুর নিজে পুনরায় তামাক টানতে উদ্যত হলে, নরেন্দ্র ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'মশাই, হাতটা ধুয়ে তামাক খান।' কিন্তু ঠাকুর তার আপত্তি অগ্রাহ্য করে বললেন, 'দূর শালা, তোর তো ভারি ভেদবুদ্ধি!' এবং তাঁর ঐ উচ্ছিষ্ট হস্তেই তামাক টান্তে টান্তে ভাবাবেশে নানা কথা বলতে লাগলেন।

"ক্রমে কথায় কথায় রাত্রি ৮টা বেজে গেল। তখন ঠাকুরের ভাবের উপশম দেখে আমি ও নরেন্দ্র তাঁর নিকট বিদায় নিয়ে হেঁটে কলকাতায় ফিরলাম। এর পরে অনেকদিন নরেন্দ্রনাথকে বলতে শুনেছি, 'এক ঠাকুরই আমাকে প্রথম হতে সব সময়েই সমভাবে বিশ্বাস করে এসেছেন, আর কেউ নয়। তাঁর ঐ বিশ্বাস ও ভালবাসাই আমাকে চিরকালের তরে বেঁধে ফেলেছে। এক তিনিই ভালবাসতে জানতেন ও পারতেন। সংসারের অপর সকলে স্বার্থসিদ্ধির জন্যে শুধু ভালবাসার ভানই করে থাকে'।" (লী)।

যাহা হউক, উপরের বর্ণনা হইতে আমরা দেখিতে পাই, নরেন্দ্রনাথের বিকাশ পথের শেষ ধাপটি কিভাবে দেখা দিয়াছিল। ইহার পরের ঘটনাবলী লক্ষ্য করিলে আমরা সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিব, ঐ দিন তিনি যে শুধু কালীকেই মানিয়াছিলেন তাহা নয়। তিনি পরিপূর্ণভাবে ঠাকুরের হইয়া গিয়াছিলেন এবং তাহার নিজের বলিতে আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। এবং তাঁহারই আশীর্বাদ ও অনুগ্রহে তিনি এখন চলিতে আরম্ভ করিলেন এক মহাবিকাশের পথে—যে বিকাশ কখন শেষ হয় নাই ও তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চলিয়াছে এবং যাহার সীমাহীন বিশালতার সম্মুখে আমরা স্তব্ধ ও মুগ্ধ চিত্তে আপনা হইতেই শির আনত করিতে বাধ্য হই।

বার

গুরু ও শিষ্য

(১৮৮১-১৮৮৬)

(৫) ভক্তসঙ্ঘ ও নরেন্দ্রনাথ

দেখা যায়, ঠাকুরের নিকট যাঁহারা যাতায়াত করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই দল লোক তাঁহার উপর বিশেষভাবে অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহাদের একদলে ছিলেন (১) বলরামবাবু, গিরিশ ঘোষ, রাম দত্ত, সুরেশ মিত্র, নাগ মহাশয় প্রভৃতি গৃহী ভক্তগণ এবং অপর দলে ছিলেন (২) নরেন্দ্রনাথ, রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন প্রভৃতি বালক বা তরুণ ভক্তগণ। এবং ইহাদের সকলকে লইয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল ঠাকুরের (ক্রমবর্ধমান) ভক্তসঙ্ঘ।

এই দুই দল লোকের আরও একটা আশ্চর্য বিশেষত্ব ছিল। ইহারা আসিবার অনেক পূর্বে ঠাকুর যোগদৃষ্টিসহায়ে ইহাদের দেখিতে পাইয়াছিলেন। এবং তৎসম্বন্ধে তিনি সময়ে সময়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে বোঝা যায় যে, মথুরবাবু জীবিত থাকিতেই মা (জগদম্বা) তাঁহাকে দেখাইয়া ও জানাইয়া দিয়াছিলেন যে তাঁহার বহু ভক্ত, পার্ষদ সব আছে ও তাহারা তাঁহার নিকট আসিবে। কিন্তু কবে তাহারা আসিবে ও কে কি করিবে তাহা তিনি তখন জানিতে পারেন নাই। তাহা হইলেও দেখা যায়, তিনি পরে কোন সময়ে তাহাদের দেখিবার জন্য এত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাঁহার ঐ অনাগত ভক্তদের জন্য তাঁহার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইত। এবং অনেক পরে তিনি তাহাদেরই কাহারও কাহারও নিকট বলিয়াছেন, "লোকের সামনে কাঁদতে লজ্জা করত, কোন মতে সামলে থাকতাম। কিন্তু যখন দিন গিয়ে রাত্রি আসতো, মার ঘরে, বিষ্ণুঘরে আরতির বাজনা বেজে উঠত, তখন আর একটি দিন গেল—তবু তোরা এলিনি ভেবে আর সামলাতে পারতাম না। কুঠীর ছাদের উপর উঠে ডাক ছেড়ে

কাঁদতাম, আর চীৎকার করে বলতাম, 'ওরে তোরা কে কোথায় আছিস্, আয়।—তোদের দেখবার জন্যে আমার প্রাণ যায়!' তার কিছুকাল পরে তোরা সব একে একে আসতে আরম্ভ করলি—তখন আমি ঠাণ্ডা হলাম। আর আগে দেখেছি বলে, তোরা যে যখন আসতে লাগলি, অমনি চিনতে পারলাম। তারপর যখন পূর্ণ এল (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ), তখন মা বল্‌লে, এখানে আসবে বলে যাদের দেখেছিলি, এই পূর্ণতে তাঁদের আসা সম্পূর্ণ হল। এরাই সব তোর অন্তরঙ্গ।"

দেখা যায়, এই সকল ভক্তদের সম্বন্ধে ঠাকুর সময়ে সময়ে অতি বিস্ময়কর কথা সকল বলিয়াছেন। একদিন মাস্টার মহাশয়ের নিকট বলেন, "যখন যেরূপ লোক আসবে, (মা) আগে দেখিয়ে দিত। এই চক্ষে—ভাবে নয়—দেখলাম, চৈতন্যদেবের সঙ্কীর্তন বটতলা থেকে বকুলতলার দিকে যাচ্ছে। তাতে বলরামকে দেখলাম, আর তোমায় দেখলাম······শশী ও শরৎকে দেখেছিলাম ঋষি কৃষ্ণের (যীশু খৃষ্ট) দলে ছিল।"

ঠাকুরের এই প্রকার উক্তির আর কয়েকটি দৃষ্টান্ত এইরূপ: "বাবুরামকে দেখলাম—দেবীমূর্তি, গলায় হার, সখী সঙ্গে।" "নিরঞ্জনকে দেখি, একটা জ্যোতির উপর বসে রয়েছে।" "পূর্ণের উঁচু সাকার ঘর—বিষ্ণুর অংশে জন্ম।" আর "সত্ত্বগুণী আধার হিসাবে নরেন্দ্রের নীচেই ওর স্থান।" "ভবনাথ নরেন্দ্রের জুড়ি—দুজনে যেন স্ত্রী পুরুষ।······ওরা দুজনেই অরূপের ঘর।" "রাখাল—ব্রজের রাখাল। সে আসবার কয়েকদিন পূর্বে মা (জগদম্বা) একটি বালককে আমার কোলে বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটি তোমার পুত্র—ত্যাগী মানসপুত্র।' তারপর একদিন ভাবে দেখি, গঙ্গাবক্ষে একটি শতদল কমল ফুটে উঠল, আর তার উপর শ্রীকৃষ্ণের হাত ধরে একটি অপরূপ কিশোর বালক নূপুর পায়ে নৃত্য করছে। ঠিক সেই সময়েই রাখাল কোন্নগর হতে নৌকায় গঙ্গা পার হয়ে দক্ষিণেশ্বরে এল। দেখেই চিনলাম, এ আমার ঐ মানসপুত্র ও কৃষ্ণসখা ব্রজের রাখাল।"

ঠাকুরের এই সকল উক্তি হইতে বোঝা যায়, যাহাদের সম্বন্ধে তিনি এই প্রকার সব কথা বলিয়াছেন, তাহারা সকলেই অসাধারণ ও অতি উচ্চস্তরের লোক। তাহা হইলেও দেখা যায়, তাঁহার বিচারে নরেন্দ্রনাথের স্থান আরও এত উচ্চে যে তাহার সহিত ইহাদের কাহারও তুলনাই হয় না। এই বিষয়েই ঠাকুর একদিন বলেন—

"নরেন্দ্রের খুব উঁচু ঘর—নিরাকারের ঘর। পুরুষের সত্তা।

"এতো ভক্ত আসছে, ওর মত একটিও নেই।

"এক একবার বসে বসে খতাই। তা দেখি, অন্যদের পদ্ম কারুর দশদল, কারুর ষোড়শদল, কারুর শতদল। কিন্তু পদ্মমধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল।

"অন্যেরা কলসী, ঘটী, এ সব হতে পারে,—নরেন্দ্র জালা।

"ডোবা পুষ্করিণী মধ্যে নরেন্দ্র বড় দিঘী,—যেমন হালদার পুকুর।

"মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙ্গাচক্ষু বড় রুই, আর সব নানা রকম মাছ—পোনা, কাঠী, বাটা, এই সব।

"খুব আধার,—অনেক জিনিস ধরে। বড় ফুটোওলা বাঁশ!

"নরেন্দ্র কিছুর বশ নয়। ও আসক্তি, ইন্দ্রিয় সুখের বশ নয়। পুরুষ পায়রা। পুরুষ পায়রার ঠোঁট ধরলে, ঠোঁট টেনে ছিনিয়ে লয় মাদী পায়রা চুপ করে থাকে।"

"নরেন্দ্র সভায় থাকলে আমার বল।"

বস্তুতঃ এই বিরাট ও অতুলনীয় নরেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়াই ছিল ঠাকুরের এবারকার মুখ্য ও বৃহত্তম কাজ। এবং সেই কাজের দিকেই ছিল তাঁহার সদা-জাগ্রত দৃষ্টি ও উহার সফলতার জন্যই চলিত তাঁহার অশ্রান্ত প্রয়াস। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে থাকিতে ইহা তিনি কাহাকেও জানিতে-বুঝিতে দেন নাই। সকলেই মনে করিত, ঠাকুর বালক-স্বভাব দেবশিশু,—তিনি উপদেশ দেন, ভাব-সমাধিতে ডুবিয়া থাকেন, ভক্তদের আপ্রাণ ভালবাসেন ও ভগবান-লাভে সহায়তা করেন, আর তৎসঙ্গে তিনি এমনি নিঃস্বার্থ ও আত্মভোলা যে নিজের খোঁজ নিজে লইতে পারেন না, এমন কি, নিজ পরিধানের কাপড়খানা পর্যন্ত ঠিক

রাখিতে পারেন না। কিন্তু ইহাই যে তাঁহার সবটুকু ছিল তাহা নয়। এই নিঃস্বার্থ ও আত্মভোলা মানুষটির ঐ বাহ্য আবরণের তলেই যে কি বিরাট স্বার্থ লুক্কায়িত ছিল এবং তাহা পূরণের জন্য তিনি অহর্নিশি যে কত চেষ্টা, চিন্তা ও সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলিতেন, তাহা তখন একমাত্র তিনিই জানিতেন।

তবে তিনি নরেন্দ্রের সহায়ে একটা বড় রকমের কিছু করিবেন, ইহার একটা ক্ষীণ আভাস তাঁহার কথাবার্তা হইতে সময়ে সময়ে যে ব্যক্ত না হইত তাহা নয়। কিন্তু তাহা হইতে তাঁহার ভক্তদের ঐ কালে কিছু সুস্পষ্টভাবে বুঝিবার কোন উপায় ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর একদিন (১৮৮৩, ২৪শে ডিসেম্বর) মাস্টার মহাশয় প্রভৃতি ভক্তগণের সমক্ষে বলেন, "নরেন্দ্র স্বতঃসিদ্ধ—নিরাকারে নিষ্ঠা।" ইহাতে মাষ্টার মহাশয় বলেন, "যখন আসে, একটা কাণ্ড সঙ্গে আনে।" শুনিয়া ঠাকুর আনন্দে হাসিতে লাগিলেন ও বলিলেন, "একটা কাণ্ডই বটে!" ঠাকুরের এই উক্তিটি অর্থপূর্ণ হইলেও তাঁহার ভক্তদের উহা হইতে ঐকালে কিছু অনুমান করিয়া লওয়া আদৌ সম্ভব ছিল না। এই রকম তিনি অপর নানা সময়ে বলিয়াছেন, "আমি নরেন্দ্রকে আত্মার স্বরূপ জ্ঞান করি, আর আমি ওর অনুগত"; "নরেন্দ্রকে দেখে আমার মন অখণ্ডে লীন হয়"; "নরেন্দ্র সভায় থাকলে আমার বল"; "(নরেন্দ্রকে দেখাইয়া) যেন খাপ খোলা তরোয়াল নিয়ে বেড়াচ্ছে"; ইত্যাদি। বস্তুতঃ নরেন্দ্রের উপর তাঁহার আস্থা ও নির্ভরের যেন কোন শেষ-সীমা ছিল না। কিন্তু কোন্ উদ্দেশ্য সাধনে বা কিসের সম্পর্কে তাঁহার এই আস্থা ও নির্ভর তাহা তিনি কখন তাঁহার ভক্তদের নিকট খুলিয়া বলেন নাই।

অন্যদিকে দেখা যাইত, নরেন্দ্রনাথের পরেই তাঁহার সর্বাপেক্ষা অধিক টান ছিল তাঁহার অপর বালক ভক্তগণের উপর। নরেন্দ্রনাথের ন্যায়, তাহাদেরও কাছে পাইবার জন্য তিনি সর্বদাই ব্যাকুল বোধ করিতেন ও সময়ে সময়ে কাঁদিয়া আকুল হইতেন। এবং ইহার মূলেও ছিল তাঁহার আগমনোদ্দেশ্য সফল করার প্রয়োজন। তিনি

জানিতেন সমস্ত পৃথিবীব্যাপী যে বিরাট কাজ নরেন্দ্রনাথ তাঁহার হইয়া সুসম্পন্ন করিবেন, তাহার পুণ্যপ্রবাহ (মানবকল্যাণ সাধনার্থে) যুগযুগান্ত ধরিয়া স্থায়ী করার জন্য আবশ্যক হইবে আরও একদল লোক—মহাশক্তিমান অতিমানব সকল, যাহাদের সম্মিলিত কর্ম ও জীবন দিকে দিকে পাষাণ কাটিয়া তাঁহার ও নরেন্দ্রনাথের প্রচারিত ও বিচ্ছুরিত অধ্যাত্ম ভাবরাজির মুক্ত প্রবাহের স্থায়ী পথ রচনা করিয়া দিবে—এমন পথ, যাহা আর কখন রুদ্ধ হইবে না, আপনা হইতেই চিরমুক্ত ও চির-কার্যকরী থাকিবে।

এও কি বিরাট মহাকাজ! কিন্তু ঠাকুর তাঁহার দিব্যদৃষ্টি সহায়ে জানিয়াছিলেন, এই কার্যের ভার লইতে পারে এরূপ লোক একমাত্র তাঁহার বালক ভক্তদিগের মধ্যেই বর্তমান এবং তাহাদের মধ্য হইতেই তাঁহার ঐ জন্য লোক বাছিতে হইবে।[১] তাই, তিনি নিয়ত সেই পরীক্ষাতেই নিযুক্ত থাকিতেন। তাহারা কে কেমন, কে কি করে, কে একটু বিপথে যাইয়া পড়িতেছে, কাহার উন্নতির কি প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়াছে,—এই সকল তাঁহার এক সর্বক্ষণের চিন্তার বিষয় ছিল। ইহা ব্যতীত, এই সকল বালক ভক্তদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তাঁহার কার্য-প্রণালী আমরা নরেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে যেরূপ দেখিয়াছি ঠিক তদনুরূপই দেখা যায়। তিনি তাহাদের প্রত্যেককে সর্বপ্রথম তাঁহার অপার, অপার্থিব ভালবাসার দ্বারা বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন। এবং তারপর উপদেশ, দীক্ষা, প্রভাব, প্রেরণা ও শক্তিসঞ্চারের দ্বারা গভীর সাধনায় নিমগ্ন করিয়া নিজ নিজ পথে পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে সাহায্য করিয়াছেন।

এই সকল বালক ভক্তদের মধ্য হইতে ঠাকুর পরিশেষে যাহাদের তাঁহার পূর্বোক্ত কার্যের জন্য বাছিয়া লইয়াছিলেন, দেখা যায় তাহারা সকলেই পরবর্তীকালে তাঁহার আশা পূর্ণ করিয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যের এক একটি দিকপালে পরিণত হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া আরও

১। ইহাদের সম্বন্ধে ঠাকুর বলরামবাবুকে বলিয়াছিলেন, "এরা সামান্য নয়, এরা ঈশ্বরাংশে জন্মেছে। এদের খাওয়ালে নারায়ণকে খাওয়ানো হয়।"

দেখা যায়, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই ভাব ছিল ভিন্ন এবং কর্মজীবনে প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিশেষ ধরনের সৌন্দর্য-বৈশিষ্ট্যে দীপ্তিমান ছিলেন। তাই, দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ঠাকুর তাঁহার এই অন্তরঙ্গ বালক ভক্তদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "আমার পাঁচফুলের সাজি।" বস্তুতঃ বহুভাবের আধার ঠাকুরের সকল ভাবের লোকেরই প্রয়োজন ছিল। এবং তজ্জন্যই তিনি উহাদের বাঁধিয়া এক করার জন্য ছিলেন ব্যাকুল এবং তিনি তাঁহার অন্তরের এই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিয়াই একদিন (শ্রীশ্রীমায়ের সম্মুখে) বলেন, "ওদের বেঁধে এক করতে পারতাম!" সে এক তিনি করিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার শেষ অসুখের সময়ে,—কাশীপুরে অবস্থানকালে। তাঁহারই শিক্ষা, পরিচালনা ও অমোঘ ইচ্ছায় তাহারা তখন আপনা হইতেই নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্ব মানিয়া লন এবং ক্রমে (তাঁহাদের ঐ নেতারই অনুপ্রেরণায় ও তাঁহার সহিত সংযুক্তভাবে) তাহারা সকলেই একে একে সংসার ত্যাগ করিয়া এমন একটি সুসম্বদ্ধ ও বজ্রদৃঢ় ত্যাগীভক্ত-সঙ্ঘ গঠন করেন যাহাকে আজ নিঃসংশয়ে বলা যায় রামকৃষ্ণ ভক্ত-সম্প্রদায়ের অমর, অক্ষয় শক্তি ও প্রাণকেন্দ্র।

বস্তুতঃ তাঁহারা সকলেই ছিলেন বিরাট, বিশাল, ও মহাশক্তিমান। গগনচুম্বী তাঁহাদের মহিমা। এবং তাঁহারা তাঁহাদের সমগ্র জীবন নিবেদন করিয়া, কোন কিছু আকাঙ্ক্ষা না করিয়া এবং নীরবে মুখ বুজিয়া ও এক রকম অজ্ঞাত অখ্যাত থাকিয়াই যে কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহার ঋণ ভারতবর্ষ ও সমস্ত পৃথিবীও কখন পরিশোধ করিতে সমর্থ হইবে না।

ভবিষ্যতের এই মহাশক্তিসম্পন্ন মহামানবগণের নেতৃত্ব করিবার জন্য (রামকৃষ্ণ-কর্তৃক) নির্বাচিত ছিলেন বালক নরেন্দ্রনাথ। তাই ভবিষ্যতে তিনি নিজে যে আরও কত বড় ও বিশাল হইয়া প্রকাশ পাইবেন, তাহা তখন আর কেহ না জানিলেও ঠাকুরের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু এই মহতের মধ্যে মহৎ, শক্তিমানের মধ্যে শক্তিমান ও সর্ববিষয়ে অতুলনীয় নরেন্দ্রনাথের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ

রকমের দুশ্চিন্তা ঠাকুরের মনকে মাঝে মাঝে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিত। প্রথমতঃ, তাঁহার এক মহা ভয় ছিল, যে উচ্চতম অখণ্ডের রাজ্য হইতে সে আগত হইয়াছে এবং যে নিষ্কলুষ, মহাজ্ঞানজ্যোতিঃ তাহার ভিতর সদা প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে, তাহাতে সে যে-কোনও সময়ে সমাধিস্থ হইয়া দেহত্যাগ করিতে পারে। এ বিষয়ে তিনি একদিন (১৮৮৫, ৯ই আগস্ট) বলেন, "(আমার) আশ্চর্য সব দর্শন হয়েছে। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন। তার ভিতর দেখছি, মাঝে বেড়া দেওয়া দুই থাক। একদিকে কেদার, চুণী ও আর আর অনেক সাকারবাদী ভক্ত। বেড়ার আর এক ধারে টক্‌টকে লাল সুরকির কাঁড়ির মত জ্যোতিঃ। তার মধ্যে বসে নরেন্দ্র—সমাধিস্থ।

"ধ্যানস্থ দেখে বললাম, 'ও নরেন্দ্র'। একটু চোখ চাইলে। বুঝলাম ওই একরূপে সিমলেতে কায়েতের ছেলে হয়ে আছে। তখন (মাকে) বললাম, 'মা, ওকে মায়ায় বদ্ধ কর। তা না হলে সমাধিস্থ হয়ে দেহত্যাগ করবে।' কেদার সাকারবাদী, উঁকি মেরে দেখে শিউরে উঠে পালালো।"

এই বিষয়েই অন্য একদিন ঠাকুর বলেন, "নরেন্দ্রকে চেয়ে দেখ। কি তার অন্তরের জ্ঞানপ্রভা! যেন অনন্ত জ্যোতিঃসাগর। স্বয়ং মহামায়া ওর দশ হাতের মধ্যে আসতে পারেন না। যে গরিমা তিনি ওকে দিয়েছেন, তার দ্বারা তিনি নিজেই আবদ্ধ।" তারপর তিনি জগন্মাতার নিকট প্রার্থনা করিলেন, "মা, ওর জ্ঞানের জ্যোতি কমিয়ে দাও, যাতে ও কাজ করতে পারে। ওর মধ্যে তোমার মায়া একটু দিয়ে দাও।"

এইভাবে একদিকে তিনি যেমন নরেন্দ্রনাথের অন্তরের দুর্নিরীক্ষ্য জ্ঞানজ্যোতিতে শঙ্কিত হইয়া তাহাকে (তাঁহার কাজের জন্য) একটু মায়ার দ্বারা মর্ত্যধামে বাঁধিয়া রাখিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি পাছে সে তাহার জীবনোদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী না হইয়া বিবাহ করিয়া সংসারে আবদ্ধ হয়, এই ভয়েও তিনি বহুদিন পর্যন্ত যারপরনাই চিন্তিত বোধ করিয়াছেন। নিম্নের ঘটনাবলী হইতে আমরা ইহা সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারি।

জানা যায়, নরেন্দ্রনাথ এফ এ পরীক্ষা দিবার পর হইতেই তাহার পিতা তাহাকে বিবাহ দিয়া সংসারী করিতে প্রয়াসী হন। কিন্তু বিবাহে নরেন্দ্রনাথের আপত্তি থাকায় এবং মনোমত পাত্রীও না পাওয়ায়, তাহার পিতার ঐ আশা সফল হইতে বিলম্ব হয়। অন্যদিকে, ঠাকুর যখনই শুনিতেন যে নরেন্দ্রের পিতা তাহার বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতেছেন, তখনই তিনি ব্যাকুল হইয়া জগদম্বার নিকট প্রার্থনা করিতেন, "মা, ও সব ঘুরিয়ে দে মা, নরেন্দ্র যেন ডুবে না!"

ইহা ব্যতীত আরও জানা যায়, বি এ পরীক্ষার কিছু পূর্বে নরেন্দ্রনাথ পড়ার সুবিধার জন্য তাহার মাতামহী রঘুমণি দেবীর রামতনু বসু লেনের বাটীতে গিয়া কিছুকাল ছিলেন। সেখানে তাহার নির্জন পাঠগৃহে ঠাকুর কখন কখন আসিয়া তাহাকে নানা বিষয়ে উপদেশ দিতেন এবং তিনি যাহাতে বিবাহ করিয়া সংসারে আবদ্ধ না হন তদ্বিষয়ে তাহাকে সতর্ক করিয়া ব্রহ্মচর্য পালনে উৎসাহিত করিতেন। নরেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "আমার পড়ার ঘরে বসে ঠাকুর একদিন যখন আমাকে ব্রহ্মচর্য পালন করতে উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন আমার মাতামহী আড়াল হতে সব শুনে আমার মা-বাবাকে বলে দিয়েছিলেন। তাই, সন্ন্যাসীর সঙ্গে মিশে পাছে আমিও সন্ন্যাসী হয়ে যাই, এই ভয়েই তারা ঐ দিন থেকেই আমাকে বিয়ে দেবার জন্যে জোর চেষ্টা করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু করলে কি হবে, ঠাকুরের ইচ্ছায় তাদের সব চেষ্টাই ভেসে গেল। কয়েক জায়গায় সমস্ত কথা স্থির হয়েও, অতি সামান্য সামান্য বিষয়ে মত-পার্থক্য উপস্থিত হয়ে সম্বন্ধগুলি ভেঙ্গে গিয়েছিল।"

এইরূপ অবস্থাতে—নরেন্দ্রনাথ বি এ পরীক্ষা দিবার অল্প পরেই—তাহার পিতার মৃত্যু হয়। এবং তৎসঙ্গে তাঁহার (পুত্রকে বিবাহ দিবার) সকল চেষ্টার অবসান হয়। তাহা হইলেও দেখা যায়, নরেন্দ্রনাথের অপরাপর আত্মীয়গণ তাহাকে বিবাহ দিবার জন্য আরও কিছুকাল চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সবও পরিশেষে (ঠাকুরের ইচ্ছাতেই) ব্যর্থ হয়।

জানা যায়, ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে থাকিতে নরেন্দ্রনাথের একবার ভাবের আবেশে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া থাকিবার আকাঙ্ক্ষা হয়। তিনি দেখিতেন, নিত্যগোপাল, মনোমোহন প্রভৃতি ঠাকুরের কয়েকজন ভক্ত ভগবানের নামগান শুনিয়া ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া মাটিতে পড়িয়া যান। কিন্তু তাহার নিজের ঐরূপ কোন ভাবাবেশ না হওয়ায়, তিনি দুঃখিত বোধ করিয়া ঠাকুরকে তাহার মনোব্যথা জানান। তাহাতে ঠাকুর তাহাকে বলেন, "ওর জন্যে কোন চিন্তা করবি না। ও না হলে কি এসে যায়? হাতী যখন খানা-ডোবায় নামে, তখন সেখানকার জলে একটা তোলপাড় সৃষ্টি হয়। কিন্তু সেই হাতীই যদি গঙ্গায় নামে, তা হলে কোন তোলপাড়ই হয় না। এই সব ভক্তেরা খানা-ডোবার মত, ঈশ্বরের সামান্য একটু প্রেমানুভূতিতেই ওদের মধ্যে একটা তোলপাড় আরম্ভ হয়। কিন্তু তুই হচ্ছিস বিরাট গঙ্গানদীর মত।"

বস্তুতঃ এই বিরাটত্বই ছিল নরেন্দ্রনাথের সর্বপ্রধান বিশেষত্ব। ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন, ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হওয়া, বা অপর কোন প্রকারের কোন অলৌকিক দর্শন বা অনুভূতি, ক্ষুদ্র আধারকে আনন্দে আত্মহারা করিয়া তুলিতে পারে। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের মত বিরাট আধারের পক্ষে ঐ সকল ছিল তাহার সুদীর্ঘ যাত্রাপথের অতি অকিঞ্চিত-কর আনুসঙ্গিক ব্যাপার। ঐ সকলের দর্শন বা অনুভূতি আসিলেই, তিনি স্বভাবতঃ উহার বিশ্লেষণে রত হইতেন, সত্যকারের লাভালাভ খতাইয়া দেখিতেন এবং পরিশেষে অতৃপ্তই থাকিতেন। কারণ, তিনি অল্পে সন্তুষ্ট হইবার লোক ছিলেন না,—তাঁহার সত্যের শেষ চাই, সবটুকু চাই, তার পূর্বে তাঁহার তৃপ্তি নাই। ঠাকুর ইহা জানিতেন। তাই, তিনি তাঁহাকে ঐ সব ক্ষুদ্র লাভালাভে মন না দিয়া, সাধনপথে আরও উন্নত, আরও অগ্রসর হইতে বলিতেন। নরেন্দ্রনাথ তাহাই করিতেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার বিরাট অতুলনীয় মস্তিষ্ক সকল বিষয়েরই সকল দিক এবং তল পর্যন্ত না দেখিয়া কখন সন্তুষ্ট হইতে পারিত না। দেখা যায়, ইহারই ফলে তিনি পরিশেষে ঠাকুরকে

যেমন বুঝিতেন ও ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন, এমন আর কেহ পারিত না। এ বিষয়ে পূজনীয় শরৎ মহারাজ লিখিয়াছেন, "নরেন্দ্রের নিকট ঠাকুরের কথা সকল শুনিয়া আমরা সকলে সময়ে সময়ে স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতাম, তাই তো, ঐ সকল কথা আমরাও ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি, কিন্তু উহাদের ভিতর যে এত গভীর অর্থ রহিয়াছে তাহা তো বুঝিতে পারি নাই!" তাহার এই উক্তির সমর্থনে তিনি একটি অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন :—

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর একদিন (১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে) কথাপ্রসঙ্গে ভক্তগণকে বৈষ্ণবধর্মের সারমর্ম বুঝাইয়া বলেন, "ঐ মত তিনটি বিষয় পালন করতে বিশেষভাবে উপদেশ করে—নামে রুচি, জীবে দয়া ও বৈষ্ণব-পূজন। অর্থাৎ, নাম ও নামী অভেদ জেনে সর্বদা ঈশ্বরের নাম করবে; ভক্ত ও ভগবান, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব অভেদ জেনে সর্বদা সাধু-ভক্তদের শ্রদ্ধা ও পূজা করবে; আর এই জগৎ-সংসার শ্রীকৃষ্ণের এই ধারণা করে সর্বজীবে দয়া—" (করবে)। কিন্তু 'দয়া' পর্যন্ত বলিয়াই তিনি আর বলিতে পারিলেন না, হঠাৎ সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "জীবে দয়া—জীবে দয়া? দূর শালা! কীটানুকীট তুই—জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।"

ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের এই কথা সকলেই শুনিল বটে, কিন্তু উহার গূঢ় মর্ম কেহই তখন বুঝিতে পারিল না। একমাত্র নরেন্দ্রনাথই সেদিন ঠাকুরের ভাবভঙ্গের পরে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "কি অদ্ভুত আলোকই আজ পেলাম! এতকাল শুনেছি অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করতে হলে সংসার, লোকসঙ্গ, ভক্তি, স্নেহ, ভালবাসা ইত্যাদি সকল কোমল ভাব ত্যাগ করে বনে যেতে হবে। কিন্তু ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যা বললেন, তাতে বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায় এবং সংসারের সকল কাজেই ও অবলম্বন করতে পারা যায়। মানুষ যে যা করছে করুক, তাতে ক্ষতি নেই, শুধু প্রাণের সঙ্গে বিশ্বাস ও ধারণা করতে হবে—

ঈশ্বরই জীব ও জগৎরূপে তার সামনে প্রকাশিত রয়েছেন। এইভাবে 'শিবজ্ঞানে জীবের সেবা' করতে করতে মানুষ নিজেকেও ঈশ্বরের অংশ ও চিরমুক্ত বলে ধারণা করতে পারে।

"আবার ভক্তিপথেও ঠাকুরের ঐ কথা থেকে বিশেষ আলোক পাওয়া যায়। শিব বা নারায়ণ জ্ঞানে জীবের সেবা করলে, সাধক ঈশ্বরকে সকলের ভিতর দর্শন করে অতি অল্পকালেই পরাভক্তি লাভে ধন্য হতে পারে।

"আর যে সকল সাধক কর্মযোগী বা রাজযোগী, তারাও শিবজ্ঞানে জীবসেবা-রূপ কর্মের দ্বারাই সত্বর তাদের লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারে। ভগবান যদি কখন দিন দেন তবে আজ যা শুনলাম তা জগতে প্রচার করে সকলকে মুগ্ধ করব।"

যাহা হউক উপরের বর্ণনা হইতে বোঝা যাইবে যে, ঠাকুরের পরিচালনায় নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার ভবিষ্যতের সহকর্মীগণ নিজ নিজ ভাবে প্রস্তুত হইতেছিলেন এবং তৎসঙ্গে তাহাদের দ্বারাই ঠাকুরের ক্রমবর্ধমান ভক্তসঙ্ঘের অন্তঃস্থ প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ একটি মহাশক্তিশালী ত্যাগীভক্তসঙ্ঘও গড়িয়া উঠিতেছিল। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে এই দুইটি কার্য পরিপূর্ণভাবে সুসাধিত হইবার প্রয়োজনীয় সুযোগের অভাব ছিল। কারণ, নরেন্দ্রনাথ ও ঠাকুরের অপর বালক ভক্তগণ নিজ নিজ বাটী হইতে নিজ নিজ সুবিধানুযায়ী সময়েই সেখানে আসিতেন। এই জন্য সেখানে একদিকে যেমন ঠাকুর কর্তৃক তাহাদের তত্ত্বাবধান অপূর্ণ থাকিয়া যাইত, অন্যদিকে তেমনি তাহাদের নিজেদের সকলের সঙ্গে সকলের সব দিন দেখা বা কোন ভাববিনিময় হইত না এবং বস্তুতঃ তাহাদের অধিকাংশই পরস্পরের সহিত সুপরিচিত হইবারও সুযোগ পাইতেন না। তাই উপরি-কথিত কার্য দুইটি সুসাধনের জন্য অবস্থার পরিবর্তনের আবশ্যকতা দেখা দিল। এবং দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ঠাকুর তাহা একান্তভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন। কারণ, তাঁহার মর্ত্য-ধামে অবস্থানের কাল প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিতেছিল।

তাই বিধির ইচ্ছায় চক্র ঘুরিল। এবং অতি অপ্রত্যাশিত ভাবে

এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হইল, যাহা অনিবার্যভাবে ঠাকুরকে ও তাঁহার সকল অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে একস্থানে একত্রিত করিয়া পূর্বোক্ত কার্য দুইটি ও তাঁহার করণীয় বাকী সমস্ত কাজই সুসম্পন্ন করিবার এক হৃদিমন্থনকারী ব্যথা-বেদনার মধ্য দিয়া অপূর্ব সুযোগ আনিয়া দিল।

আগামী অধ্যায়ে আমরা এই সকল বিষয়ই বিবৃত দেখিতে পাইব।

৩ের

গুরু ও শিষ্য

(১৮৮৫-১৮৮৬)

(৬) শেষ পর্ব

(i) শ্যামপুকুর

ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের মিলন-মিশ্রণের শেষ পর্বটি যে ভাবে আরম্ভ হয় তাহা এইরূপ।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল (চৈত্র-বৈশাখ) মাসে ঠাকুরের গলায় একটি বেদনা দেখা দিল। মাসাধিক কালেও উহার উপশম না হওয়ায়, একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ডাকা হইল। তিনি ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া ঠাকুরকে অধিক কথা বলিতে বা বারবার সমাধিস্থ হইতে নিষেধ করিয়া গেলেন। কারণ, দেখা গিয়াছিল যে ঐরূপ করিলেই তাঁহার ঐ বেদনা বাড়িত।

কিন্তু জ্যৈষ্ঠ মাসেই ছিল (অদূরবর্তী) পানিহাটির বিখ্যাত মহোৎসব। ঠাকুর বহু ভক্তসহ ঐ উৎসবে যোগদান করিলেন। এবং সেখানে কীর্তন শুনিতে শুনিতে তিনি ভাবাবেশে প্রায় আধঘণ্টাকাল প্রবল বেগে নৃত্য করিতে ও মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হইতে লাগিলেন। ইহার ফলে তাঁহার গলার বেদনা আরও বাড়িয়া গেল। এবং অনেক চিকিৎসাতেও উহা কিছুমাত্র কমিল না। পরে ১৮৮৫ সনের ভাদ্র মাসে তাঁহার গলা দিয়া একদিন রক্ত পড়িল। তখন তাঁহার ভক্তগণ বিশেষ চিন্তিত হইয়া তাঁহাকে চিকিৎসার্থ কলিকাতায় লইয়া আসিলেন (১৮৮৫, আশ্বিন)। তাহাদের আশঙ্কা হইতেছিল ঠাকুরের রোগ ক্যান্সারে (cancer) পরিণত হইতে পারে।

কলিকাতায় ঠাকুরের জন্য প্রথম যে বাড়িটি ভাড়া করা হইয়াছিল, তাহা অত্যন্ত স্বল্পপরিসর থাকায় ঠাকুর সেখানে না থাকিয়া বলরাম বাবুর বাড়ীতে চলিয়া আসেন। সাত-আট দিন পরে তাঁহার জন্য

শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে গোকুলচন্দ্র ভট্টাচার্যের বৈঠকখানা-বাড়ী ভাড়া লওয়া হয়। এবং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে (আশ্বিন মাসের শেষার্ধে) তিনি ঐ বাড়ীতে যান ও সেখানে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ (হোমিওপ্যাথিক) চিকিৎসক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহার চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন।

যে সকল গৃহীভক্ত ঠাকুরকে কলিকাতায় আনিয়া তাঁহার চিকিৎসাদির ভার লইয়াছিলেন (বলরামবাবু, সুরেশ মিত্র, রামচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র ও মাস্টার মহাশয় প্রভৃতি), তাহারা দেখিলেন বিশেষ সতর্কতার সহিত ঠাকুরের পথ্য প্রস্তুত ও রাত্রিকালে তাঁহার সেবা করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। ইহার প্রথম অভাবটি তাহারা শ্রীশ্রীমাকে[১] দক্ষিণেশ্বর হইতে শ্যামপুকুরের বাটীতে আনাইয়া পূরণ করিয়া লইলেন। কিন্তু দ্বিতীয় অভাবটি পূরণ করা তাহাদের সাধ্যাতীত ছিল। তাই, নরেন্দ্রনাথ ঐ কাজের ভার লইয়া নিজে রাত্রিকালে ঐ বাড়ীতে আসিয়া থাকিতে লাগিলেন[২] এবং তাঁহারই দৃষ্টান্ত ও প্রেরণায় উৎসাহিত হইয়া আরও তিন-চারি জন কর্মঠ যুবক-ভক্ত (কালী, শশী, ছোট গোপাল প্রভৃতি) আসিয়া তাঁহার সহিত ঐ কার্যে যোগদান করিলেন। আমরা পরে দেখিতে পাইব, এই মাত্র চার-পাঁচ জন সেবাব্রতীর অতি ক্ষুদ্র দলটিই ক্রমে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া ঠাকুরের বহু-ঈপ্সিত ও মহাবীর্যশালী ত্যাগীভক্ত-সঙ্ঘে পরিণত হইয়াছিল।

১। শ্রীশ্রীঠাকুরের সহধর্মিণী। ইনি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর নহবতঘরে থাকিয়া ঠাকুরের সেবা করিতেন।

২। বস্তুতঃ, এই জন্য নরেন্দ্রনাথ পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া ছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে ঠাকুরের নিকট হইতে "মোটা ভাত-কাপড়ের" বর লাভ করিবার স্বল্পকাল পরে, তিনি দ্বিতীয়বার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান স্কুলের বৌবাজার (চাঁপাতলা) শাখার প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু মাত্র কয়েক মাস কাজ করিবার পরেই তিনি আগষ্ট মাস (১৮৮৫) অন্তে ঐ কার্য পরিত্যাগ করেন। ইহার প্রধান হেতু ছিল—ঠাকুরের গলরোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁহার চিকিৎসা ও সেবাদির বন্দোবস্ত করার প্রয়োজন।

যাহা হউক ঠাকুর জানিতেন, যে ব্যাধি তাঁহার হইয়াছে তাহা আর সারিবে না। এবং তাঁহার পৃথিবী হইতে বিদায় লইবার দিন অদূরবর্তী। তাই, তিনি চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিয়াও ভক্তদের উপদেশাদি দিবার কাজ কিছুমাত্র কমান নাই। বরং তিনি তাঁহার প্রধান শিষ্যগণের এবং বিশেষভাবে নরেন্দ্রনাথের অন্তরে ভগবান লাভের জন্য তীব্রতম আকাঙ্ক্ষা জাগাইতে অধিকতর সচেষ্ট হন। এ বিষয়ে (কথামৃত হইতে) একদিনকার একটি ঘটনা লক্ষ্য করিলেই অবস্থা সুস্পষ্ট হইবে।

এই দিন সকালবেলায় (২৭শে অক্টোবর, ১৮৮৫, বেলা দশটা) কিছু কথাবার্তার পর, ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে সস্নেহে দেখিলেন। পরে কথাপৃষ্ঠে হাসিয়া বলিলেন, "গোঁসাই লেকচার দিয়েছিল, 'দশ হাজার টাকা হলে ঐ থেকে খাওয়া দাওয়া এই সব হয়,—তখন নিশ্চিন্ত হয়ে ঈশ্বরকে বেশ ডাকা যায়।' কেশব সেনও ঐ রকম বলেছিল, 'মশাই, যদি কেউ বিষয় আশয় ঠিক-ঠাক করে ঈশ্বর চিন্তা করে—তা পারে কিনা? তার তাতে কিছু দোষ হতে পারে কি?'

"আমি বললাম, তীব্র বৈরাগ্য হলে সংসার পাতকুয়া, আত্মীয় কাল সাপের মত, বোধ হয়। তখন, টাকা জমাবো, বিষয় ঠিকঠাক করবো, এ সব হিসাব আসে না।"

এবং তীব্র বৈরাগ্যের অভাবেই যে ঐরূপ হিসাব মনে আসে, তাই বুঝাইবার জন্য তিনি একটি গল্প বলিলেন: "একটি মেয়ের ভারি শোক হয়েছিল। আগে নৎটা খুলে কাপড়ের আঁচলে বাঁধলে, তারপর 'ওগো! আমার কি হলো গো' বলে আছড়ে পড়লো। কিন্তু খুব সাবধান, নৎটা না ভেঙ্গে যায়।"

(মাষ্টার মহাশয় লিখিয়াছেন) ঠাকুরের এই কথাগুলি শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিলেন। কিন্তু যাহাকে লক্ষ্য করিয়া ঐ সব কথা বলা, সেই নরেন্দ্রনাথ উহা শুনিয়া বাণবিদ্ধের ন্যায় কাত হইয়া শুইয়া পড়িলেন।

ইহার হেতু ছিল। যে তীব্র মহাবৈরাগ্যের কথা ঠাকুর বলিতে-ছিলেন, তাহা নরেন্দ্রনাথের নিকট আর কোন দূরের জিনিস ছিল না। উহা এখন তাঁহার অন্তর ভেদ করিয়া নিত্যই জাগিয়া জাগিয়া উঠিতে-ছিল। কিন্তু তাঁহার অসহায় মা ও ছোট ভাইদের ভরণ-পোষণের একটা স্থায়ী ব্যবস্থা না করিয়া তিনি উহার (সর্বস্ব ত্যাগের) দাবী মিটাইতে পারিতেছিলেন না। এই ক্রটি, এই স্নেহ, কর্তব্য ও বিচার-বিবেচনার বাধা—তাঁহাকে কম পীড়া দিতেছিল না। তাই, উহার মধ্যে ঠাকুরের কথাগুলি সুতীক্ষ্ণ ছুরিকার মত তাঁহার অন্তর্বিদ্ধ করিল।

এবং তাহা করিবে বলিয়াই ঠাকুর তাঁহার আঘাত হানিয়াছিলেন। কারণ, এখন প্রয়োজন জরুরী। অদূরভবিষ্যতে নরেন্দ্রকে সর্বত্যাগী হইয়া তাঁহার সকল কাজের ভার মাথায় তুলিয়া লইতে হইবে।

বস্তুতঃ ঠাকুর শ্যামপুকুরের বাটীতে আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই নরেন্দ্রনাথ আপনা হইতেই তাঁহার অভিপ্রেত কিছু কিছু কার্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। দেখা যায়, ঠাকুর শ্যামপুকুরের বাটীতে আসিলে, তিনি একদিকে যেমন অগ্রণী হইয়া তাঁহার সেবার ভার লইয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনি তাঁহার যুবক ভক্তগণকে নেতার ন্যায় চালিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এইকালে তিনি অবসর পাইলেই এই সকল যুবকগণকে দলবদ্ধ করিয়া তাহাদের সহিত একত্রে জ্ঞান-ভক্তিমূলক সঙ্গীত ও স্তবাদি গাহিয়া তাহাদের প্রাণে ত্যাগ-বৈরাগ্যের ভাব অনুক্ষণ প্রদীপ্ত রাখিতেন। তিনি ঠাকুরের গভীর ঈশ্বরানুরাগ ও অত্যদ্ভুত সাধনার কথা সকল বর্ণনা করিয়া তাহাদের মুগ্ধ ও স্তম্ভিত করিতেন। এবং 'ঈশানুসরণ' (Imitation of Christ) হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিতেন, "প্রভুকে যে ঠিক ঠিক ভালবাসবে, তার প্রভুর জীবনের মতই জীবন গড়ে উঠবে। তাই, ঠাকুরকে আমরা ঠিক ঠিক ভালবাসি কিনা তার প্রমাণ ও থেকেই পাওয়া যাবে।" আবার, 'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছে তাই কর'—ঠাকুরের এই উপদেশটি তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়া

বুঝাইয়া দিতেন, তাঁহার সকল ভাবই ঐ জ্ঞানকে ভিত্ত করিয়াই উত্থিত। তাই ঐ জ্ঞান যাহাতে সর্বাগ্রে লাভ হয়, সেই চেষ্টাই তাহাদের করিতে হইবে।

এই সকল ব্যতীত দেখা যায়, নরেন্দ্রনাথ এই যুবকদিগকে সকল প্রকার ভ্রম, সঙ্কীর্ণতা ও দুর্বলতা-জনক প্রভাব হইতেও মুক্ত রাখিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। ইহার কয়েকটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়:

১। ঠাকুর শ্যামপুকুরের বাটীতে আসার পর, তাঁহার ভক্তগণ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই পরস্পরের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট ও সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া উঠেন। এবং তাহার ফলে (তাহাদের নিজেদের লইয়াই রচিত) রামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘের একটি বিশিষ্ট রূপ তাহাদের চোখের সামনে সর্বপ্রথম ফুটিয়া উঠে। তাই, একটা অপরিসীম বিস্ময় ও আনন্দের সহিত তাহারা অনেকে মনে করিতে আরম্ভ করিলেন যে, এই সঙ্ঘকে গঠন করিবার আবশ্যকতাই ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধির একটা অন্যতম কারণ।

এবং ইহারই কল্পনা-জল্পনা লইয়া তাঁহার ভক্তগণ তিনটি পৃথক দলে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। (i) ইহাদের একদল মনে করিতেন, 'ঠাকুরের রোগ একটা মিথ্যা ভান মাত্র। তিনি কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত উহা অবলম্বন করিয়াছেন এবং যখনই ইচ্ছা হইবে তখনই তিনি পুনরায় সুস্থভাব ধারণ করিবেন।' এই দলের নেতা ছিলেন ঠাকুরের বীরভক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ। (ii) অন্য একদল বলিতেন, 'যে জগন্মাতা (বা বিরাট ঈশ্বরের) অনুগত থাকিয়া ঠাকুর তাঁহার সমস্ত কার্য করেন, তিনিই জনকল্যাণকর কোনও গূঢ় অভিপ্রায় সিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাকে কিছুকালের জন্য ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাঁহার ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই ঠাকুর পুনরায় সুস্থ হইবেন।' (iii) আর এই দুই দলকেই অগ্রাহ্য করিয়া সতেজে দাঁড়াইলেন নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার নেতৃত্বে ঠাকুরের অপর যুবক ভক্তগণ। তাঁহারা প্রচার করিতেন, 'জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু শরীরের ধর্ম। শরীর থাকিলেই

ঐ সকল আসিয়া উপস্থিত হয়। এবং ঠাকুরের ব্যাধিও ঐরূপেই উপস্থিত হইয়াছে। কাজেই উহার কোন গূঢ় হেতু আছে, ইহা মনে করা একেবারেই অনাবশ্যক। তিনি প্রকৃতই অসুস্থ এবং আমরা তাঁহাকে আরোগ্য করিবার জন্য প্রাণপণে সেবা করিব।' আমরা দেখিয়াছি, যুক্তি-সিদ্ধ বা প্রত্যক্ষ দর্শনের দ্বারা সমর্থিত না হইলে, নরেন্দ্রনাথ কোন কিছুই বিশ্বাস করিতেন না। এবং তিনি চাহিতেন, ঠাকুরের অপর যুবক ভক্তগণও ঐ ভাবে চলিয়া তাহাদের মনের স্বাস্থ্য ও সবলতা রক্ষা করিয়া সাধনক্ষেত্রে অগ্রসর হউক।

২। ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে, তাঁহার মুখে ভাব-ভক্তির প্রশংসা শুনিয়া ও তাঁহার দুই-একজন ভক্তের ভাবাবেশে বাহ্য-চৈতন্য লোপ হইতে দেখিয়া, তাঁহার অপর অনেক ভক্ত (ত্যাগ ও সংযম অপেক্ষা) ভাবের উচ্ছ্বাসের প্রতিই অধিকতর আকৃষ্ট বোধ করেন। আবার ঠিক ঐ সময়েই, গিরিশবাবু ও (তাহার দৃষ্টান্তে) রামবাবু ঠাকুরকে প্রকাশ্যে অবতার বলিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করায়, ঐ সকল ভক্তের ভাবুকতার উচ্ছ্বাস আরও বৃদ্ধি পাইল। তদুপরি, ঐ কালে একদিন (১৮৮৫, ২৬শে অক্টোবর) শ্রীযুক্ত বিজয়-কৃষ্ণ গোস্বামী (ঢাকা হইতে) ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়া সকলের সমক্ষে প্রকাশ করিলেন যে, তিনি একদিন ঢাকায় দরজায় খিল দিয়া ঘরের ভিতর বসিয়া ধ্যান করিবার কালে ঠাকুর তাঁহার সম্মুখে সশরীরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং উহা তাঁহার মাথার খেয়াল কিনা তাহা বুঝিবার জন্য তিনি তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বহুক্ষণ ধরিয়া টিপিয়া দেখিয়াছিলেন। এই সংবাদে পূর্বোক্ত ভক্তগণের ভাবের উচ্ছ্বাস চরমে উঠিল এবং ফলে তাহাদের মধ্যে পাঁচ-সাত জনের ভজন-সঙ্গীতাদি শুনিবামাত্রই বাহ্যসংজ্ঞার আংশিক লোপ ও নানা রকম শারীরিক বিকৃতি উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিল। (লী)।

রামকৃষ্ণ কথামৃত হইতে জানা যায়, শ্রদ্ধেয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর উপরি-বর্ণিত উক্তি শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন--"আমিও এঁকে (ঠাকুরকে) নিজে অনেকবার (ঐভাবে) দেখে'ছি।

তাই, কি করে বলব—আপনার কথা বিশ্বাস করি না।" তাহা হইলেও, তিনি ছিলেন অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী। উপরি-বর্ণিত ভক্তগণ যে ভাবুকতার বৃদ্ধিটাকেই ধর্মের চূড়ান্ত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, ইহা তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না এবং উহার অবাধ প্রশ্রয়ে যে বিষম বিপদের সম্ভাবনা আছে তাঁহাও তাঁহার অবিদিত ছিল না। তাই, তিনি তাঁহার চালিত যুবক ভক্তগণকে উহার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।

তিনি তাহাদের বুঝাইতে লাগিলেন, "যে ভাবোচ্ছ্বাস মানুষের জীবনে কোন স্থায়ী উন্নতি সাধন করতে পারে না, তা অসার—মূল্যহীন। তার প্রভাবে (অশ্রুপুলকাদি) শারীরিক বিকৃতি বা বাহ্যসংজ্ঞার আংশিক লোপ হলেও, তা নিঃসন্দেহে স্নায়ুদৌর্বল্য-প্রসূত। মনের বলে ও দমন করতে না পারলে, পুষ্টিকর খাদ্য ও ডাক্তারের সাহায্য গ্রহণ করা কর্তব্য।"

তিনি তাহাদের আরও বলিতেন, "ও রকম অঙ্গবিকার ও বাহ্যসংজ্ঞা লোপের ভিতর অনেকটা কৃত্রিমতাও আছে। কচিৎ কোন কোন লোকের গভীর আধ্যাত্মিক ভাবরাশি সময়ে সময়ে প্রবল তরঙ্গের আকার ধারণ করে ঐভাবে বাহ্য প্রকাশ লাভ করে। কিন্তু তা না বুঝতে পেরে মানুষ নির্বোধের মত মনে করে, ঐরূপ অঙ্গবিকৃতি ও সংজ্ঞাবিলুপ্তির ফলেই বুঝি ভাব গভীর হয়ে ওঠে। তাই, সে ইচ্ছাপূর্বক ঐ সব তার নিজের মধ্যে আনবার চেষ্টা করতে থাকে। ফলে, তার স্নায়ু সকল ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে অতি সামান্য মাত্র ভাবের উদয়েই ঐ সকল বিকৃতি আনতে আরম্ভ করে। ইহার অবাধ প্রশ্রয়ে মানুষ চিররুগ্ন অথবা পাগল হয়ে যায়।"

পূজনীয় শরৎ মহারাজ লিখিয়াছেন, 'নরেন্দ্রনাথের এই সকল কথা আমরা প্রথম প্রথম বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। কিন্তু অল্প পরেই জানা গেল যে, কয়েকজন ভক্ত উক্তপ্রকার অঙ্গ-বিকৃতি সকল নিজেদের মধ্যে আনিবার জন্য নির্জনে সত্য সত্যই চেষ্টা করিয়া থাকে। তৎপর অন্য একজন ভক্তের পূর্বাপেক্ষা ঘন ঘন ভাবাবেশ

হইতে দেখিয়া, নরেন্দ্রনাথ তাহাকে পুষ্টিকর খাদ্য আহার করিতে অনুরোধ করেন। এবং তদনুসারে মাত্র এক পক্ষকাল কার্য করিয়াই ঐ ভক্তটি সুস্থ ও সংযত হইয়া উঠে। এই সমস্ত দেখিয়া আমরা পরিশেষে নরেন্দ্রনাথের কথার সত্যতা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।'

৩। অন্যদিকে দেখা যাইত, নরেন্দ্রনাথ এই সকল যুবক ভক্ত-গণকে সকল প্রকার সঙ্কীর্ণ ও একদেশদর্শী মতের প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিতে ও সকল ধর্মের উপর সমভাবে শ্রদ্ধাসম্পন্ন করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। তাহাদিগকে বলিতেন, "সকল ধর্ম ও সকল সম্প্রদায়ের সাধকদের সমান শ্রদ্ধা না করলে, ঠাকুরের 'যত মত, তত পথ' এই মতকে, সুতরাং ঠাকুরকেই, অশ্রদ্ধা করা হয়।"

যাহা হউক, এই সকল হইতে বোঝা যায়, নরেন্দ্রনাথ এই কালে ঠাকুরের কাজ ও মতামতকে কিভাবে কতটা আপন বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আমরা দেখিয়াছি, ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে থাকিতেই তিনি তাঁহাকে প্রায় সকল বিষয়েই মানিয়া লইয়াছিলেন, শুধু অবতার বলিয়া স্বীকার করেন নাই। এই বিষয়ে ঠাকুরের প্রতি তাহার মনোভাব শ্যামপুকুরের বাটীতে কি আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা নিম্নের ঘটনাটি হইতে জানা যায়।

ঠাকুরের চিকিৎসার ভার লইয়া, ডাক্তার সরকার অতি অল্পেই তাঁহার প্রতি বিশেষ প্রীতি ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠেন। এবং প্রথম দিন ব্যতীত তিনি তাঁহাকে দেখিয়া আর কখন ফি গ্রহণ করেন নাই। তাহা হইলেও, তিনি ছিলেন বিজ্ঞানসেবী ও যুক্তিবাদী। তাই তিনি ঠাকুরকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিলেও, তাঁহাকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরাবতার বলিয়া মানিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই জন্য তিনি একদিন (ঠাকুরের অবতারত্বে বিশ্বাসী) গিরিশবাবুকে বলেন, "আর সব কর, But do not worship him as God (কিন্তু ওঁকে ঈশ্বর বলে পূজা ক'রো না)। এমন ভাল লোকটার মাথা খাচ্ছ?"

ইহার জবাবে নরেন্দ্রনাথ ডাক্তারকে সেদিন (১৮৮৫, ২৭শে অক্টোবর) যাহা বলেন তাহার মর্ম এই :—"এঁকে আমরা ঈশ্বরের

মত মনে করি। God (ঈশ্বর) বলছি না, God-like man (ঈশ্বর-তুল্য ব্যক্তি) বলছি। We offer to him worship bordering on Divine worship (এঁকে আমরা যে পূজা করি, তা ঈশ্বরের পূজার প্রায় কাছাকাছি)।"

এই কথাগুলি হইতে বোঝা যায়, নরেন্দ্রনাথ এইকালে অন্তরের অন্তরে ঠাকুরকে ঈশ্বর-তুল্য উপাস্যের ন্যায়ই গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর ঠাকুরও তাহার অন্তরের এই পরিণতির জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। এবং তিনি এখন আনন্দের সহিত আশা করিতেছিলেন যে, তিনি অচিরেই তাঁহার ভবিষ্যৎ কার্যের সকল ভার নরেন্দ্রনাথের উপর সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে ইহধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে পারিবেন। তাঁহার অন্তরের এই গোপন আশা-আনন্দ তিনি একদিন অতি অপ্রত্যাশিতভাবে ও সুস্পষ্ট ভাষায় ডাক্তার সরকারের একটি কথার উত্তরে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করেন। ঘটনাটি এইরূপ :

নরেন্দ্রনাথের সহিত আলাপ করিয়া ডাক্তার সরকার বিশেষ মুগ্ধ হন। এবং পরে তিনি একদিন তাহার ভজন গান শুনিয়া এত খুশী হইয়াছিলেন যে, যাইবার পূর্বে তিনি তাহাকে পুত্রের ন্যায় সস্নেহে আশীর্বাদ, আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া ঠাকুরকে বলেন, "এর মত ছেলে ধর্মলাভ করতে এসেছে দেখে আমি বিশেষ আনন্দিত। এ একটি রত্ন, যাতে হাত দেবে তাতেই উন্নতি করবে।" শুনিয়া ঠাকুর বলেন, "কথায় বলে অদ্বৈতের হুঙ্কারেই গৌর নদেয় (নদীয়ায়) এসেছিলেন, —সেইরকম ওর (নরেন্দ্রের) জন্যেই তো সব গো।"

যাহা হউক, ঠাকুর শ্যামপুকুরের বাড়ীতে কিছুদিন থাকিবার পর, ডাক্তার সরকার দেখিলেন তাঁহার অসুখ বাড়িয়া চলিয়াছে এবং তিনি পূর্বে যে সকল ঔষধ দিয়া কিছু ফল পাইয়াছিলেন, এখন তাহাতে আর কোন উপকার হইতেছে না। কলিকাতার দূষিত বায়ুর জন্যই ঐরূপ হইতেছে মনে করিয়া, তিনি ঠাকুরকে শহরের বাহিরে কোন বাগানবাড়ীতে রাখিতে পরামর্শ দিলেন। তদনুসারে ভক্তগণ ৺গোপালচন্দ্র ঘোষের কাশীপুরস্থ প্রশস্ত উদ্যানবাটী মাসিক ৮০৲

টাকায় ঠাকুরের জন্য ভাড়া লইলেন। এবং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে (২৭শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার) তাঁহাকে সেখানে লইয়া আসিলেন।

শ্যামপুকুরের বাটীতে ঠাকুর কিঞ্চিদধিক দুই মাস এবং কাশীপুরের বাটীতে পূর্ণ আট মাস কাল ছিলেন।

(ii) কাশীপুর

উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত কাশীপুরের উদ্যানবাটী ছিল সুপ্রশস্ত ও অতীব রমণীয়। উহা আয়তনে চৌদ্দ বিঘা এবং উহার চারিদিকেই শ্যামল তৃণ, নানারকমের পুষ্প ও আম্র, লিচু প্রভৃতি ফলবৃক্ষের প্রাণস্নিগ্ধকর শোভা। দ্বিতল বাসগৃহখানিও সুবৃহৎ না হইলেও বেশ প্রশস্ত ও নির্জন।

এই গৃহের নীচের তলায় চারখানি ও উপরের তলায় দুইখানি ঘর ছিল। উপরের বড় ঘরখানিতে ঠাকুর ও নীচের পূব দিকের ঘরখানিতে মা থাকিতেন। নীচের তলার অন্য দুইখানি ঘর সেবকগণ (ও সমাগত গৃহী-ভক্তেরা)[১] ব্যবহার করিতেন।

শ্যামপুকুরের ন্যায় কাশীপুরেও ঠাকুরের জন্য আবশ্যকীয় ব্যয় গৃহী-ভক্তগণই নিবাহ করিতেন। জানা যায়, সুরেশ মিত্র বাড়ীভাড়া, বলরামবাবু ঠাকুরের পথ্য খরচ এবং রামবাবু সেবকদের খরচ দিতেন। সম্ভবতঃ গিরিশবাবু, মাষ্টার মহাশয় প্রভৃতিও কিছু কিছু ব্যয় বহন করিতেন।

ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে, নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সেবকগণ নিজ নিজ বাটী হইতে আহারাদি করিয়া রাত্রে ঠাকুরের কাছে আসিয়া থাকিতেন। কিন্তু কাশীপুরের বাড়ীর দূরত্বের জন্য এখন আর তাহা

১। ইহাদের সম্বন্ধে পূজনীয় শরৎ মহারাজ লিখিয়াছেন, "গৃহী ভক্তেরা বিষয়-কর্মাদিতে নিযুক্ত থাকায় সবদা ঠাকুরের নিকটে থাকিতে পারেন না। সুবিধা পাইলেই আসা যাওয়া করেন, কখন কখন এক আধ দিন থাকিয়াও যান।"

সম্ভব ছিল না। তাই নরেন্দ্রনাথ স্থির করিলেন, তিনি এখন হইতে ঠাকুরের সেবার জন্য কাশীপুরের বাড়ীতে আসিয়া থাকিবেন। এই বৎসর তিনি আইন (বি এল) পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। ঐ জন্য এবং বসতবাটী-সংক্রান্ত হাইকোর্টের বণ্টন-মোকদ্দমার তদ্বিরের জন্য, তাঁহার এই সময়ে কলিকাতায় থাকা একান্ত আবশ্যক ছিল। তাহা হইলেও তিনি ঠিক করিলেন যে, আইন পরীক্ষার বইগুলি কাশীপুরের বাড়ীতে আনিয়া অবসর মত সেখানে বসিয়াই পড়িবেন এবং মোকদ্দমা তদ্বিরের কাজ আবশ্যকানুসারে মাঝে মাঝে কলিকাতায় গিয়া করিয়া আসিবেন। এইকালে তাঁহার সঙ্কল্প ছিল যে, আইন পরীক্ষা পাশ করিয়া কয়েক বৎসর মধ্যে মা-ভাইদের আহারের সংস্থান করিয়া দিয়া তিনি সংসার হইতে অবসর লইয়া ঈশ্বর-সাধনায় ডুবিয়া যাইবেন।

যাহা হউক, তাঁহার দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া অপর কয়েকটি যুবক ভক্তও একে একে আসিয়া কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। আমরা দেখিয়াছি, শ্যামপুকুরে সেবকদিগের সংখ্যা মাত্র চার-পাঁচ জন ছিল। কিন্তু কাশীপুরের বাটীতে তাঁহারা ক্রমে সংখ্যায় বারো জন হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম—নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন, যোগীন্দ্র, লাটু, তারক, শরৎ, শশী, কালী, গোপাল দাদা ও ছুটকো গোপাল। ইহাদের মধ্যে একমাত্র গোপাল দাদাই (বুড়ো গোপাল, পরে স্বামী অদ্বৈতানন্দ) বৃদ্ধ ছিলেন, অপর সকলেই যুবক।[১]

বাড়ীর দুরবস্থার জন্য নরেন্দ্রনাথ সেখানকার চিন্তা একেবারে না

১। বস্তুতঃ ইহাদের দলে আরও কয়েকজন যুবক ভক্ত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সারদা পিতার নির্যাতনের জন্য মাঝে মাঝে আসিয়া দুই একদিন মাত্র থাকিতেন। হরি, তুলসী ও গঙ্গাধর বাড়ীতে থাকিয়া তপস্যা ও মাঝে মাঝে আসা যাওয়া করিতেন। সুবোধ ও হরিপ্রসন্নও মাঝে মাঝে আসিতেন। ঠাকুরের দেহ রক্ষার পর, ইঁহারা সকলেই একে একে সংসার ত্যাগ করিয়া নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির বলিষ্ঠ ত্যাগী ভক্ত-সঙ্ঘকে আরও পরিপুষ্ট করেন।

টাকায় ঠাকুরের জন্য ভাড়া লইলেন। এবং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে (২৭শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার) তাঁহাকে সেখানে লইয়া আসিলেন।

শ্যামপুকুরের বাটীতে ঠাকুর কিঞ্চিদধিক দুই মাস এবং কাশীপুরের বাটীতে পূর্ণ আট মাস কাল ছিলেন।

(ii) কাশীপুর

উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত কাশীপুরের উদ্যানবাটী ছিল সুপ্রশস্ত ও অতীব রমণীয়। উহা আয়তনে চৌদ্দ বিঘা এবং উহার চারিদিকেই শ্যামল তৃণ, নানারকমের পুষ্প ও আম্র, লিচু প্রভৃতি ফলবৃক্ষের প্রাণ-স্নিগ্ধকর শোভা। দ্বিতল বাসগৃহখানিও সুবৃহৎ না হইলেও বেশ প্রশস্ত ও নির্জন।

এই গৃহের নীচের তলায় চারখানি ও উপরের তলায় দুইখানি ঘর ছিল। উপরের বড় ঘরখানিতে ঠাকুর ও নীচের পূর্ব দিকের ঘর-খানিতে মা থাকিতেন। নীচের তলার অন্য দুইখানি ঘর সেবকগণ (ও সমাগত গৃহী-ভক্তেরা)[১] ব্যবহার করিতেন।

শ্যামপুকুরের ন্যায় কাশীপুরেও ঠাকুরের জন্য আবশ্যকীয় ব্যয় গৃহী-ভক্তগণই নির্বাহ করিতেন। জানা যায়, সুরেশ মিত্র বাড়ীভাড়া, বলরামবাবু ঠাকুরের পথ্য খরচ এবং রামবাবু সেবকদের খরচ দিতেন। সম্ভবতঃ গিরিশবাবু, মাষ্টার মহাশয় প্রভৃতিও কিছু কিছু ব্যয় বহন করিতেন।

ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে, নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সেবকগণ নিজ নিজ বাটী হইতে আহারাদি করিয়া রাত্রে ঠাকুরের কাছে আসিয়া থাকিতেন। কিন্তু কাশীপুরের বাড়ীর দূরত্বের জন্য এখন আর তাহা

১। ইহাদের সম্বন্ধে পূজনীয় শরৎ মহারাজ লিখিয়াছেন, "গৃহী ভক্তেরা বিষয়-কর্মাদিতে নিযুক্ত থাকায় সবদা ঠাকুরের নিকটে থাকিতে পারেন না। সুবিধা পাইলেই আসা যাওয়া করেন, কখন কখন এক আধ দিন থাকিয়াও যান।"

সম্ভব ছিল না। তাই নরেন্দ্রনাথ স্থির করিলেন, তিনি এখন হইতে ঠাকুরের সেবার জন্য কাশীপুরের বাড়ীতে আসিয়া থাকিবেন। এই বৎসর তিনি আইন (বি এল) পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে-ছিলেন। ঐ জন্য এবং বসতবাটী-সংক্রান্ত হাইকোর্টের বণ্টন-মোকর্দমার তদ্বিরের জন্য, তাঁহার এই সময়ে কলিকাতায় থাকা একান্ত আবশ্যক ছিল। তাহা হইলেও তিনি ঠিক করিলেন যে, আইন পরীক্ষার বইগুলি কাশীপুরের বাড়ীতে আনিয়া অবসর মত সেখানে বসিয়াই পড়িবেন এবং মোকদমা তদ্বিরের কাজ আবশ্যকানুসারে মাঝে মাঝে কলিকাতায় গিয়া করিয়া আসিবেন। এইকালে তাঁহার সঙ্কল্প ছিল যে, আইন পরীক্ষা পাশ করিয়া কয়েক বৎসর মধ্যে মা-ভাইদের আহারের সংস্থান করিয়া দিয়া তিনি সংসার হইতে অবসর লইয়া ঈশ্বর-সাধনায় ডুবিয়া যাইবেন।

যাহা হউক, তাঁহার দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া অপর কয়েকটি যুবক ভক্তও একে একে আসিয়া কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। আমরা দেখিয়াছি, শ্যামপুকুরে সেবকদিগের সংখ্যা মাত্র চার-পাঁচ জন ছিল। কিন্তু কাশীপুরের বাটীতে তাঁহারা ক্রমে সংখ্যায় বারো জন হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম—নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন, যোগীন্দ্র, লাটু, তারক, শরৎ, শশী, কালী, গোপাল দাদা ও হুটকো গোপাল। ইহাদের মধ্যে একমাত্র গোপাল দাদাই (বুড়ো গোপাল, পরে স্বামী অদ্বৈতানন্দ) বৃদ্ধ ছিলেন, অপর সকলেই যুবক।[১]

বাড়ীর দুরবস্থার জন্য নরেন্দ্রনাথ সেখানকার চিন্তা একেবারে না

১। বস্তুতঃ ইহাদের দলে আরও কয়েকজন যুবক ভক্ত ছিলেন। তাহাদের মধ্যে সারদা পিতার নির্যাতনের জন্য মাঝে মাঝে আসিয়া দুই একদিন মাত্র থাকিতেন। হরি, তুলসী ও গঙ্গাধর বাড়ীতে থাকিয়া তপস্যা ও মাঝে মাঝে আসা যাওয়া করিতেন। সুবোধ ও হরিপ্রসন্নও মাঝে মাঝে আসিতেন। ঠাকুরের দেহ রক্ষার পর, ইঁহারা সকলেই একে একে সংসার ত্যাগ করিয়া নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির বলিষ্ঠ ত্যাগীভক্ত-সঙ্ঘকে আরও পরিপুষ্ট করেন।

ছাড়িতে পারিলেও, তিনি এখন (অন্তরের তীব্র ত্যাগ-বৈরাগ্যের ফলে) অতি আশ্চর্য ভাবে রূপান্তরিত হইতেছিলেন। পূর্বের সন্দেহ-বাদী, বিদ্রোহী নরেন্দ্রনাথ আর নাই। এখন তিনি ঠাকুরের সেবক ও রক্ষক এবং বহু বিষয়ে ঠিক যেন তাঁহার প্রতিনিধি। কবে ও কিভাবে তিনি এই পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, কাশীপুরে আসিয়াই তিনি সেবারত যুবক ভক্তগণকে ঠিক গুরুর ন্যায় পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

পূজনীয় শরৎ মহারাজ লিখিয়াছেন, "ঠাকুরের সেবার সময়ে ব্যতীত, অন্য সকল সময়েই নরেন্দ্রনাথ তাহাদিগকে ধ্যান, ভজন, পাঠ, সদালাপ ও শাস্ত্রচর্চা ইত্যাদিতে এমন ভাবে নিযুক্ত রাখিতে লাগিলেন যে, অন্তরের পরম আনন্দে তাঁহারা বুঝিতেও পারিলেন না যে দিন-গুলি কোথা দিয়া কিভাবে কাটিয়া যাইতে লাগিল। ঠাকুরের প্রবল আকর্ষণ এবং নরেন্দ্রনাথের অপূর্ব সখ্যভাব ও উন্নত সঙ্গ তাহাদিগকে এমন ভাবে বাঁধিয়া ফেলিল যে, তাহাদের মনে হইতে লাগিল তাহারা যেন এক পরিবারস্থ লোকদিগের চাইতেও পরস্পরের অধিক আপন।"

জানা যায়, কাশীপুরের বাড়ীর সকল কার্যে শৃঙ্খলা স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত, এই সকল যুবক-ভক্তদের অধিকাংশই স্বল্পকালের জন্যও বাড়ীতে যান নাই। যাহাদের কোন গুরুতর প্রয়োজনবশতঃ যাইতে হইয়াছিল, তাহারাও মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাদেই ফিরিয়া আসিয়াছেন। ক্রমে সকল কার্য সুশৃঙ্খলতার সহিত চলিতে আরম্ভ করিলে, নরেন্দ্র-নাথ দুই-এক দিনের জন্য বাড়ী যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। এবং এক-দিন রাত্রে ঐ বিষয় অপর সেবকদিগকে জানাইয়া শয়ন করিলেন। কিন্তু ঘুম আসিল না। কিছুক্ষণ পরেই উঠিয়া পড়িলেন এবং শরৎ ও ছোট গোপালকে জাগ্রত দেখিয়া বলিলেন, "চল্, বাইরে গিয়ে একটু বেড়াই ও তামাক খাই।" তারপর তাহাদের লইয়া উদ্যানপথে বেড়াইতে বেড়াইতে বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুরের যে ভীষণ অসুখ হয়েছে, তাতে মনে হয় তিনি দেহরক্ষার সঙ্কল্প করেছেন। এখনও সময়

থাকতে তাঁর সেবা ও ধ্যান-ভজন করে যে যতটা পারিস (আধ্যাত্মিক) উন্নতি করে নে। অন্যথায়, তিনি সরে গেলে পরিতাপের আর সীমা থাকবে না। এটা করবার পর ভগবানকে ডাকব, ওটা করবার পর সাধন-ভজনে লাগব, এইভাবেই দিনগুলি যাচ্ছে ও বাসনাজালে জড়িয়ে পড়ছি। ঐ বাসনাতেই সর্বনাশ, মৃত্যু—বাসনা ত্যাগ কর্, ত্যাগ কর্।"

তখন পৌষ মাস, শীতের নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি। নরেন্দ্রনাথ কথা বলিতে বলিতে (অন্তরের উদ্দীপ্ত ভাববশতঃ) একটি বৃক্ষের তলায় বসিয়া পড়িলেন। এবং নিকটে তৃণ, পাতা ও গাছের ভাঙ্গা ডাল ইত্যাদির একটা শুক্না স্তূপ দেখিয়া বলিলেন, "দে ওতে আগুন ধরিয়ে। সাধুরা এই সময়ে গাছের তলায় ধুনি জ্বালে, আমরাও ঐ রকম ধুনি জ্বেলে অন্তরের গোপন বাসনা সকল পুড়িয়ে ফেলি।" আগুন জ্বালা হইল এবং চারিদিকের ঐরূপ আরও কয়েকটি স্তূপ হইতে ডাল, পাতা, তৃণ প্রভৃতি টানিয়া আনিয়া ঐ আগুনে নিক্ষেপ করিতে করিতে, তাঁহারা নিজ নিজ বাসনা সকল আহুতি দিয়া ভস্মীভূত করিতেছি এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। দুই-তিন ঘণ্টা এইভাবে কাটিবার পর যখন আর জ্বালানি পাওয়া গেল না, তখন তাঁহারা আগুন নিবাইয়া ঘরে আসিয়া পুনরায় শয়ন করিলেন। তখন রাত্রি ৪টা বাজিয়া গিয়াছে। সেদিন ধুনি জ্বালাইয়া তাঁহাদের এত আনন্দ হইয়াছিল যে, তাঁহারা (অপর সেবকগণ সহ) স্থির করিলেন, ইহার পর সুবিধা পাইলেই তাঁহারা ধুনি জ্বালাইবেন।

পরদিন সকাল বেলায় নরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় চলিয়া গেলেন এবং মাত্র একদিন পরেই কয়েকখানি আইনের বই লইয়া কাশীপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

বইগুলি আনিলেন বটে, কিন্তু তাহা আর তাঁহার পড়া হইল না। তাহার কারণ তাঁহার ও মাষ্টার মহাশয়ের (কয়েকদিন পরের) নিম্ন কথোপকথন হইতে সুস্পষ্ট হইবে।

সেদিন ৪ঠা জানুয়ারী, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ, বাংলা ২১শে পৌষ,

সোমবার। সন্ধ্যাবেলায় নরেন্দ্রনাথ কাশীপুরের বাটীর নীচের তলায় বসিয়া মাষ্টার মহাশয়ের নিকট নিজের প্রাণের ব্যাকুলতার কথা বলিতেছিলেন। কহিলেন "গত শনিবার (২রা জানুয়ারী) এখানে ধ্যান করছিলাম। হঠাৎ বুকের ভিতর কি রকম করে এলো!"

মাষ্টার মহাশয়—কুণ্ডলিনী জাগরণ।

নরেন্দ্র—তাই হবে, বেশ বোধ হলো—ইড়া পিঙ্গলা। হাজরাকে বললাম, বুকে হাত দিয়ে দেখতে। কাল রবিবার, (৩রা জানুয়ারি) উপরে গিয়ে এঁর (ঠাকুরের) সঙ্গে দেখা করলাম,—ওঁকে সব বললাম। আর বললাম, আমায় কিছু দিন। সব্বাই'এর হলো, আমার হবে না!

মাষ্টার মহাশয়—তিনি কি বললেন?

নরেন্দ্র—তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তুই কি চাস?" আমি বললাম, "আমার ইচ্ছা (একসঙ্গে) তিন-চার দিন সমাধিস্থ হয়ে থাকব। কখন কখন এক একবার খেতে উঠবো।" তিনি বললেন, "তুই তো বড় হীনবুদ্ধি! ও অবস্থার চেয়েও উচু অবস্থা আছে। তুই তো গান গাস্, 'যো কুচ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়'।"

মাষ্টার মহাশয়—হাঁ, উনি সর্বদাই বলেন যে সমাধি থেকে নেমে এসে ছাখে—তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন। এ অবস্থা (শুধু) ঈশ্বরকোটিরই হতে পারে। উনি বলেন, জীবকোটি সমাধি অবস্থা লাভ করলেও, তা থেকে আর নামতে পারে না।

নরেন্দ্র—উনি বললেন, "তুই বাড়ীর একটা ঠিক করে আয়, সমাধি অবস্থার চেয়েও অনেক উঁচু অবস্থা হতে পারবে।"

ইহার পর নরেন্দ্রনাথ বলিতে লাগিলেন—'আজ (৪ঠা জানুয়ারি) সকালে বাড়ী গেলাম। সকলে বক্‌তে লাগলো,—আর বললে, "কি হো হো করে বেড়াচ্ছিস্? আইন একজামিন (বি এল্) এত নিকটে, পড়াশুনা নেই, হো হো করে বেড়াচ্ছ!"

মাষ্টার মহাশয়—তোমার মা কিছু বললেন?

নরেন্দ্র—না, তিনি খাওয়াবার জন্যে ব্যস্ত। হরিণের মাংস ছিল, খেলুম,—কিন্তু খেতে ইচ্ছা ছিল না।

মাষ্টার মহাশয়—তারপর ?

নরেন্দ্র—"দিদিমার বাড়ীতে সেই পড়বার ঘরে পড়তে গেলাম। পড়তে গিয়ে পড়াতে একটা ভয়ানক আতঙ্ক এলো,—পড়াটা যেন কি ভয়ের জিনিস! বুক আঁকুপাঁকু করতে লাগল,—অমন কান্না কখন কাঁদি নি!

"তারপর বই-টই ফেলে দৌড়,—রাস্তা দিয়ে ছুট! জুতো-টুতো রাস্তায় কোথায় এক দিকে পড়ে রইলো! খড়ের গাদার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম, গাময় খড়, আমি দৌড়চ্ছি,—কাশীপুরের রাস্তায়!"

ইহার পর নরেন্দ্রনাথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন,

"বিবেক চূড়ামণি শুনে আরও মন খারাপ হয়েছে! শঙ্করাচার্য বলেন, তিনটি জিনিস অনেক তপস্যায়, অনেক ভাগ্যে মেলে—মনুষ্যত্বং মুমুক্ষত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ। ভাবলাম, আমার তো এ তিনটিই হয়েছে! অনেক তপস্যার ফলে মানুষ জন্ম হয়েছে, অনেক তপস্যার ফলে মুক্তির ইচ্ছা হয়েছে,—আর অনেক তপস্যার ফলে এরূপ মহাপুরুষের সঙ্গ লাভ হয়েছে।"

"সংসার আর ভালো লাগে না। সংসারে যারা আছে তাদেরও ভাল লাগে না—দুই একজন ভক্ত ছাড়া।"

"আপনাদের শান্তি হয়েছে, আমার প্রাণ অস্থির হচ্ছে! আপনারাই ধন্য!"

এইভাবে তীব্র বৈরাগ্যের চাপে নরেন্দ্রনাথের আইন পড়া এই দিনই (৪ঠা জানুয়ারি, ১৮৮৬) সাঙ্গ হয়।[১] এবং ঠাকুরের সম্মতি-ক্রমে তিনি সেদিন রাত্রে ধুনি জ্বালাইয়া তপস্যা করিবার জন্য দুই-

১। জানা যায়, এই দিন (সন্ধ্যাকালের উপরি-বর্ণিত কথোপকথনের পূর্বে) নরেন্দ্রনাথ বিকাল ৪টার পর ঠাকুরের সহিত দেখা করিতে গেলে ঠাকুর তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আর পড়বি না?" নরেন্দ্রনাথ উত্তর দেন, "একটা ঔষধ পেলে বাঁচি, যাতে পড়া-টড়া যা হয়েছে সব ভুলে যাই।"

একটি ভক্ত সঙ্গে করিয়া পৌষের দুরন্ত শীত ও অমাবস্যার গভীর অন্ধকারের মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া গেলেন।

দেখা যায়, ঠিক এই সময় হইতেই নরেন্দ্রনাথের ত্যাগ ও সাধনা, এ দুইই বিশেষ উগ্রমূর্তি ধারণ করিতে আরম্ভ করে। জানা যায়, এইকালে ঠাকুর একদিন তাহাকে রাম নামে দীক্ষিত করিয়া বলেন, 'এ মন্ত্রটি আমি আমার গুরুর কাছে পেয়েছিলাম।' কথাটি শুনিবামাত্র নরেন্দ্রনাথের মধ্যে এক প্রবল ভাবোন্মাদনা দেখা দিল। এবং সন্ধ্যার দিকে তিনি উচ্চৈঃস্বরে 'রাম, রাম' বলিতে বলিতে উত্তেজিত ভাবে বাটীর চারিপাশ দিয়া ঘুরিতে লাগিলেন। তাঁহার এইরূপ বাহ্যজ্ঞানশূন্য উন্মত্তের ন্যায় অবস্থা দেখিয়া, কেহ কেহ ছুটিয়া গিয়া ঠাকুরকে সংবাদ দিলে তিনি বলেন, "থাক্ ঐ ভাবে। ও আপনিই ঠিক হয়ে যাবে।" কয়েক ঘণ্টা বাদে নরেন্দ্রনাথের ঐ উত্তেজনার ঘোর কাটিয়া যায় এবং তিনি তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হন।

বস্তুতঃ যে কঠোর ত্যাগ-তপস্যার ভাব এইকালে নরেন্দ্রনাথের উপর চাপিয়া আসিতেছিল, তাহার তুলনা ছিল না। এবং আমরা দেখিতে পাই, স্বয়ং ঠাকুর একদিন (১৫ই মার্চ, ১৮৮৬) তাহাকে সস্নেহে দেখিতে দেখিতে আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া ভক্তদের দিকে চাহিয়া বলেন, "খুব!" ইহাতে নরেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেন, "খুব কি?" ঠাকুর হাসিয়া বলেন, "(তোর) খুব ত্যাগ হয়ে আসছে।"

মনের এই মহা ত্যাগবৈরাগ্যের বশে, নরেন্দ্রনাথের তপস্যার কোন বিরাম ছিল না। এইকালে তিনি ঠাকুরের সেবারত অপর যুবক ভক্তগণকে লইয়া কাশীপুরের উদ্যানবাটীকে একটি অনুক্ষণের সাধনক্ষেত্র করিয়া তুলিয়াছিলেন। কখন ধ্যান, কখন জপ, কখন ভজন-গান, কখনও বা নানা ধর্ম্মমতের দর্শনশাস্ত্র পাঠ ও তাহার উদ্দাম আলোচনা, এই সকল লইয়াই তাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত অবসর সময় অতিবাহিত করিতেন। ইহা ভিন্ন, নরেন্দ্রনাথ এই কালে ঠাকুরের উপদেশে নানা প্রকার সাধনায় ব্রতী হইতেন। এবং কাশীপুর

উদ্যানের গাছতলায় ধুনি জ্বালাইয়া সমস্ত রাত্রি তপস্যায় কাটাইতেন। শরৎ, কালী ও ছোট গোপাল প্রভৃতি কয়েকজন যুবক ভক্ত তাঁহার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনিতেন এবং নিজেরাও যথাসাধ্য ধ্যান-ভজনাদি করিতেন।

এইরূপ তীব্র সাধনার ফলে, নরেন্দ্রনাথ এইকালে সময়ে সময়ে নিজের ভিতর এক আশ্চর্য আধ্যাত্মিক শক্তির আবির্ভাব অনুভব করিতেন। তাঁহার মনে হইত, ঐ শক্তির দ্বারা তিনি স্পর্শমাত্রে অপরের শরীরমনে আধ্যাত্মিকতা সংক্রামিত করিতে পারেন। এবং দেখা যায়, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে শিবরাত্রির দিন রাত্রে তিনি তাঁহার ঐ শক্তি কার্যকরী কিনা তাহা অপর একজনের উপর পরীক্ষা করিয়া দেখেন। ঘটনাটি নরেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক বিকাশ ও বিশালতার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তাই উহা একটু বিস্তৃতভাবেই নিম্নে বর্ণিত হইল।

এই দিন নরেন্দ্রনাথ ও অপর তিন-চারি জন যুবকভক্ত শিবরাত্রির উপবাস করিয়া সমস্ত রাত্রি পূজা ও জাগরণে কাটাইতে সংকল্প করেন। যাহাতে উহার কোন গোলমালে ঠাকুরের আরামের ব্যাঘাত না হয়, তজ্জন্য বসতবাটীর পূর্বদিকে একটু দূরে অবস্থিত (রন্ধনশালার জন্য নির্মিত) একটি গৃহে পূজার আয়োজন করা হয়।

রাত্রি দশটার পর প্রথম প্রহরের পূজা, জপ ও ধ্যান শেষ করিয়া, নরেন্দ্রনাথ পূজার আসনে বসিয়াই বিশ্রাম করিতে করিতে সঙ্গীদের সহিত কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। তখন একজন সঙ্গী তাঁহার জন্য তামাক সাজিতে বাহিরে গেলেন এবং অপর একজন নিজের কোন প্রয়োজন সারিয়া আসিতে বসতবাটীর দিকে চলিয়া গেলেন। এই সময়ে হঠাৎ নরেন্দ্রনাথের ভিতর পূর্বোক্ত বিভূতির একটা তীব্র অনুভবের উদয় হইল এবং তিনি তাহা তখনই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে উদ্‌গ্রীব হইলেন। তখন একমাত্র কালীই (পরে স্বামী অভেদানন্দ) নিকটে থাকায়, তিনি তাহাকে বলিলেন, "আমাকে খানিকক্ষণ ছুঁয়ে থাক্ তো।" ইহার পর তামাক লইয়া ফিরিয়া প্রথম সঙ্গীটি দেখিলেন,

নরেন্দ্রনাথ ধ্যানস্থ এবং কালী চোখ বুজিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাঁহার দক্ষিণ জানু স্পর্শ করিয়া আছে ও তাহার ঐ হস্ত ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে। দুই এক মিনিট ঐ ভাবে কাটিবার পর নরেন্দ্রনাথ চক্ষু মেলিয়া বলিলেন, "বস্, হয়েছে। কি রকম অনুভব করলি?" কালী বলিলেন, "ইলেক্‌ট্রিক ব্যাটারি ধরলে যে রকম সক্ (shock) লাগতে থাকে, সেই রকম বোধ হচ্ছিল।" যে সঙ্গীটি তামাক লইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি কালীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার হাত কি আপনা থেকেই কাঁপছিল?" উত্তরে কালী বলিলেন, "আমি চেষ্টা করেও হাত স্থির রাখতে পারছিলাম না।"

পরে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূজা ও ধ্যানের সময়ে, কালী সেদিন গভীর ধ্যানমগ্ন হইয়া পড়িলেন। ঐরূপ ধ্যান তাহাকে পূর্বে আর কখন করিতে দেখা যায় নাই। এই দিনকার গভীর ধ্যানে তাহার সর্বশরীর আড়ষ্ট হইয়া গ্রীবা ও মস্তক বাঁকিয়া গেল এবং কিছুক্ষণের জন্য বাহ্যসংজ্ঞা একেবারেই লোপ পাইল। তখন উপস্থিত সকলেরই মনে হইল, নরেন্দ্রনাথকে উক্তরূপে স্পর্শ করার ফলেই তাহার ঐরূপ গভীর ধ্যান উপস্থিত হইয়াছে। নরেন্দ্রনাথও উহা লক্ষ্য করিয়া একজন সঙ্গীকে ইঙ্গিত দ্বারা উহা দেখাইলেন।

ইহার পর রাত্রি চারিটার সময় চতুর্থ প্রহরের পূজা শেষ হইলে, শশী (পরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) আসিয়া নরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "ঠাকুর ডাকছেন।" নরেন্দ্রনাথ উঠিয়া ঠাকুরের কাছে যাইতেই তিনি বলিলেন, "কি রে? একটু জমতে না জমতেই খরচ! আগে নিজের ভিতর ভাল করে জমতে দে, তখন কোথায় কি ভাবে খরচ করতে হবে তা বুঝতে পারবি,—মা-ই বুঝিয়ে দেবেন। ওর ভেতর তোর ভাব ঢুকিয়ে ওর কি অপকারটা করলি বল দেখি? ও এতদিন একভাবে চলছিল, সেটা সব নষ্ট হয়ে গেল!—যেন ছয় মাসের গর্ভ নষ্ট হল! যা হবার হয়েছে, এখন হতে আর অমনটা করিস নি। যা হোক, ছোঁড়াটার অদেষ্ট ভাল।" ঠাকুরের কথা শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ স্তব্ধ হইলেন। বুঝিলেন, দূরে পূজার স্থানে বসিয়া তাঁহারা যাহা

করিয়াছেন ঠাকুর তাহা সবই জানিতে পারিয়াছেন। তাই, তাঁহার কথার উত্তরে তিনি আর কিছু বলিলেন না।

তবে চরম সত্যাকাঙ্ক্ষী অতুলনীয় বিরাট আধার নরেন্দ্রনাথের নিকট এই প্রকারের শক্তি বা বিভূতি লাভ খুব বড় জিনিস ছিল না। তাই, সত্যের জন্য তাঁহার সাধন, ভজন ও শাস্ত্রাধ্যয়নাদি পূর্বের ন্যায় সমভাবেই চলিতে লাগিল। জানা যায়, এই কালে (মার্চ, ১৮৮৬) নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার প্রেরণায় অপর যুবক ভক্তগণ দিবারাত্রি ভগবান বুদ্ধদেবের অপূর্ব জীবন ও ত্যাগ তপস্যাদির বিষয় আলোচনা করিতেন। এবং তাঁহার আদর্শে সত্যলাভের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া তাহারা বসতবাটীর নীচের তলার ছোট ঘরটির দেয়ালে 'ললিত-বিস্তরের' নিম্ন শ্লোকটি লিখিয়া রাখেন :

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে ॥[1]

এইভাবে শ্রীবুদ্ধের ত্যাগ, তপস্যা ও উপরি-উদ্ধৃত শ্লোকোক্ত সুভীষণ সাধন-সঙ্কল্পের বিষয় আলোচনা করিতে করিতে, নরেন্দ্রনাথ হঠাৎ একদিন (১৮৮৬, এপ্রিল মাসের প্রারম্ভ) কাহাকেও কিছু না বলিয়া, শুধু তারক ও কালীকে লইয়া সন্ন্যাসীর বেশে বুদ্ধগয়ায় চলিয়া গেলেন। তাহারা তিনজনে গয়া স্টেশন হইতে সাত মাইল হাঁটিয়া বুদ্ধগয়ায় পৌঁছেন ও সেখানে বৌদ্ধমন্দিরের মোহন্তের অতিথিরূপে তিন-চার দিন থাকেন। এই তিন-চারি দিন তাহারা (বুদ্ধের সিদ্ধিস্থান) পবিত্র বোধিদ্রুমতলে বসিয়া ধ্যান করেন। একদিন রাত্রে যখন চারিদিক নির্জন ও নিস্তব্ধ, ঐ স্থানে ধ্যান করিবার কালে নরেন্দ্রনাথ হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠেন ও পার্শ্বে উপবিষ্ট তারকনাথকে জড়াইয়া ধরেন। ধ্যানরত তারক চমকিত হইয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, "বুদ্ধদেবের মহান চরিত্র, অপার

১। বঙ্গানুবাদ—'এই আসনে আমার শরীর শুকাইয়া যাউক ; এবং উহার ত্বক্, মাংস ও অস্থি ধ্বংসপ্রাপ্ত হউক ; (তথাপি) যে জ্ঞানালোক বহু কল্পেও দুর্লভ, তাহা লাভ না করিয়া এই শরীর এই আসন ত্যাগ করিবে না।'

করুণা ও অতুলনীয় শিক্ষা প্রভৃতি চিন্তা করতে করতে মনে হ্‌ল, সবই তো রয়েছে, কিন্তু তিনি কোথায়? তখন তাঁর জন্যে বুকে এমন একটা উদ্বেল ব্যথা বোধ হতে লাগল যে আর সামলাতে পারলাম না। তাই, কেঁদে উঠে আপনাকে জড়িয়ে ধরেছি।"

এদিকে কাশীপুরে অন্যান্য যুবক ভক্তগণ নরেন্দ্রনাথের অদর্শনে যারপরনাই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। এবং পরে যখন সংবাদ পাওয়া গেল যে তিনি গৈরিক ধারণ করিয়া বুদ্ধগয়ায় গিয়াছেন, তখন তাহাদের কেহ কেহ সেখানে তাঁহার কাছে যাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন। তখন রাখাল এই বিষয় ঠাকুরকে জানাইলে তিনি বলিলেন, "কেন ভাবছিস? কোথায় যাবে সে (নরেন্দ্রনাথ)? ক'দিন বাইরে থাকতে পারবে? দেখ না এল বলে?" তারপর হাসিতে হাসিতে পুনরায় বলিলেন, "চার খুঁট ঘুরে আয়, দেখবি কোথাও কিছু (যথার্থ ধর্ম) নেই, যা কিছু আছে সব (নিজের শরীর দেখাইয়া) এইখানে।"

যাহা হউক, দেখা যায় বুদ্ধগয়ায় তিন-চারি দিন থাকিবার পরেই নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গীগণ ঠাকুরকে পুনরায় দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। এবং তাহারা (১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল) তারিখের দুই-চারি দিন পূর্বে কাশীপুরে ফিরিয়া আসেন।

নরেন্দ্রনাথ এইভাবে ফিরিলেন বটে। কিন্তু বুদ্ধদেবের ত্যাগ, তপস্যা ও নির্বাণ লাভের আকাঙ্ক্ষা তাহাকে ছাড়িল না। এবং দেখা যায়, ১৩ই এপ্রিল তারিখে (১৮৮৬, ১লা বৈশাখে) তিনি (ঠিক বুদ্ধের ভাবেই) ঠাকুরকে বলিতেছেন—"আমি চাই শান্তি, আমি ঈশ্বর পর্যন্ত চাই না।" বলিয়া তিনি মাঝে মাঝে সুর করিয়া বলিতে লাগিলেন—"সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম্।"

ইহার পর আমরা দেখিতে পাই, তিনি ১৪ই/১৫ই এপ্রিল হইতে কিছু দিন ধরিয়া প্রায় প্রত্যহই দক্ষিণেশ্বরে গিয়া সেখানকার পঞ্চবটী-তলে বসিয়া তীব্র তপস্যা করিতেছেন। কোন কোন দিন একসঙ্গে প্রায় ২৪ ঘণ্টাকাল সেখানে কাটাইয়া আসেন। কিন্তু তাহা

হইলেও আমরা বিস্ময়ের সহিত দেখিতে পাই, এই উগ্র ত্যাগ, তপস্যা ও নানা দিব্যানুভূতির মধ্যেও, তিনি তাহার যুক্তি-বিচার পরিত্যাগ করেন নাই। এবং ঐ ভিত্তিতে তিনি ঠাকুরকে অপর সকল বিষয়ে মানিয়াও, অবতার বলিয়া মানিতে পারেন নাই। এই সম্পর্কে দেখা যায়, ২১শে এপ্রিল তারিখে (১৮৮৬) তিনি মাষ্টার মহাশয়কে বলিতেছেন, "আমি Truth চাই। সেদিন পরমহংস মশায়ের সঙ্গেই খুব তর্ক করলাম। উনি আমায় বলেছিলেন, 'আমাকে কেউ কেউ ঈশ্বর বলে।' আমি বললাম, 'হাজার লোকে ঈশ্বর বলুক, আমার যতক্ষণ সত্য বলে বোধ না হয়, ততক্ষণ বলবো না'।"

আবার ঐ যুক্তি-বিচারের ভিত্তিতেই তিনি, অন্তরের প্রবল ত্যাগ-বৈরাগ্যের প্রজ্বলিত অগ্নি বুকে ধারণ করিয়াও, বাড়ীর চিন্তা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। এবং উক্ত ২১শে এপ্রিল তারিখেই তিনি (কাশীপুরবাটীর) উদ্যানপথে বেড়াইতে বেড়াইতে মাষ্টার মহাশয়কে বলেন, "গয়াতে যাব মনে করেছি। একটা জমিদারীর ম্যানেজারের কাজের কথা একজন বলেছে। ঈশ্বর টীশ্বর নেই।"

নরেন্দ্রনাথের মুখের এইকালের এই নাস্তিক্যভাবের কথা যে তাঁহার কোন প্রাণের কথা ছিল তাহা নয়। বস্তুতঃ তিনি এখন তীব্রভাবে চাহিতেছিলেন তাঁহার অন্তরের সকল প্রশ্নের চরম সমাধান। এবং তাহা এখন তাঁহার নিকট একটি যুক্তিসংগত সত্য-বস্তুই ছিল। শুধু সে সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির অভাবই তাঁহাকে মাঝে মাঝে অবিশ্বাসীর ন্যায় এক একটি প্রতিক্রিয়া করিতে প্ররোচিত করিত। নিম্নের ঘটনাটি হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইবে।

উক্ত ২১শে এপ্রিলের পরের দিন (২২শে এপ্রিল, ১৮৮৬) ঠাকুরের সিন্ধুদেশীয় ভক্ত (অতি মিষ্টভাষী ও শান্তস্বভাব) হীরানন্দ তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়া নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা, ভক্তের দুঃখ কেন?" উত্তরে নরেন্দ্রনাথ বলেন, "The scheme of the universe is devilish! I could have created

a better world (অর্থাৎ, এই বিশ্বের ব্যবস্থাসকল শয়তানীপূর্ণ। আমি এর চেয়ে ভাল জগৎ সৃষ্টি করতে পারতাম) !"

কিন্তু ইহার একটু পরেই তিনি (যুক্তির ভিত্তি রক্ষা করিয়াই) পুনরায় বলেন, "তবে একটা বিশ্বাস করলে সব চুকে যায়। Our only refuge is in Pantheism : সবই ঈশ্বর—এই বিশ্বাস হলেই চুকে যায়। আমিই সব করছি।" ইহার উত্তরে হীরানন্দ যখন বলিলেন, "ও কথা বলা সোজা," তখন নরেন্দ্রনাথ শঙ্করাচার্যের সুবিখ্যাত নির্বাণষটক (ওঁ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং, ইত্যাদি), কৌপীনপঞ্চক প্রভৃতি স্তব ও একটি গান গাহিয়া তাঁহার জবাব দিলেন। এবং পরে বলিলেন, "Give me one and I will give you a million (অর্থাৎ, আমি যদি এক পাই, তাহলে তাকে আমি—ঐ ১'এর পরে শুধু শূন্য বসিয়েই—নিযুত, কোটি অনায়াসে করতে পারি)। তুমিও আমি, আমিও তুমি। আমি বই আর কিছু নেই।" তখন ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে দেখাইয়া হীরানন্দকে বলিলেন, "যেন খাপখোলা তরোয়াল নিয়ে বেড়াচ্ছে।"

বস্তুতঃ নরেন্দ্রনাথের হস্তের ঐ উন্মুক্ত জ্ঞান-তরবারিই যেন ছিল তাঁহার এখনকার সত্যকারের রূপ। মনের অজ্ঞান-বন্ধন সবই প্রায় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছে। যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহার উপরেও তিনি তাঁহার শেষ চরম আঘাতে উত্তোলন করিয়াছেন। আর দেরী অসহ। তিনি এখন প্রতিক্ষণই কামনা করিতেছেন—উপনিষদুক্ত চরমসত্যের প্রলয়ঙ্কর উপলব্ধি, যাহার আবির্ভাবমাত্রে সৃষ্টির অনুভূতি বিলুপ্ত হয়, এবং 'আমিই ব্রহ্ম' এই জাগ্রত বোধের মধ্যে 'আমিও' মিলাইয়া যায় ও পরিশেষে শুধু বাক্য-মনের অতীত বোধস্বরূপ (অব্যক্ত) ব্রহ্মই বিরাজিত থাকেন। এই প্রচণ্ড চরম অনুভূতির জন্য তিনি এখন ঠাকুরের নিকট নিয়ত প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন।

অন্ততঃ বারেকের জন্য তাহাকে এই অনুভূতি দিতে ঠাকুরও বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন। কারণ, আমরা দেখিয়াছি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে (নরেন্দ্রনাথের দক্ষিণেশ্বরে দ্বিতীয়বার আগমনের দিনে) তিনি

তাহাকে নিজ হইতে (একেবারে সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে) শুধু স্পর্শ দ্বারা ঐ অনুভূতি লাভ করাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ উহার সূচনাতেই ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠায়, তিনি তখন ঐ কার্য হইতে বিরত হইয়া বলেন, "এখন থাক,—কালে (অর্থাৎ, বিধিনির্দিষ্ট সময়ে) হবে।" সেই কাল এখন আগত। তাই নরেন্দ্রনাথ ঐ অনুভূতি পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও দেখা যায়, ঠাকুর সম্ভবতঃ উপযুক্ত ক্ষণের জন্য, অথবা অন্য যে কারণেই হউক, উহা এখন তাহাকে দিতে একটু বিলম্ব করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ঠাকুরের দিক্‌কার ইতিহাস এইরূপ :

কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে আসিবার অল্প পরে, প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ ডাঃ রাজেন্দ্রনাথ দত্ত (ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের সম্মতি লইয়া) নিজ হইতে উদ্যোগী হইয়া ঠাকুরকে একটি ঔষধ দেন। ঐ ঔষধ ব্যবহারে ঠাকুর পক্ষাধিক কাল একটু ভাল বোধ করেন। কিন্তু তাহার পর ঐ ঔষধে বা অপর কোনও ঔষধেই আর কোন উপকার পাওয়া গেল না। এবং ঠাকুরের ব্যাধি অবিরাম গতিতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার দীর্ঘ বলিষ্ঠ শরীরকে এক জীর্ণ, ভগ্ন, কঙ্কালে পরিণত করিল।

কিন্তু এই ঘোর কাল ব্যাধির মধ্যেই তিনি ধীরে ধীরে ও সকলের অলক্ষ্যে কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সুসম্পন্ন করেন। দেখা যায়, তাঁহার এই অসুখের উপলক্ষ্যে তাঁহার ভক্তগণ প্রথমে শ্যামপুকুরে, তৎপর কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে একত্র হন। এবং এই শেষোক্ত বাটীতে তাহারা পরস্পরের সহিত মিলিবার, মিশিবার ও সহযোগীতা করিবার এরূপ সুযোগ পান যে, শুধু তাহারই দ্বারা তাহারা এক সুগঠিত ভক্তসঙ্ঘে পরিণত হন। শুধু ইহাই নয়। ঐ বৃহৎ ভক্ত-সঙ্ঘের ভিতর হইতেই আরও গড়িয়া উঠিল (উহা হইতে বহুগুণে অধিক গুরুত্বপূর্ণ) ঠাকুরের ভবিষ্যতের অপূর্ব কর্মযন্ত্র—তাঁহার মহাশক্তিশালী ত্যাগীভক্তসঙ্ঘ। নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ঠাকুরের সেবারত যুবকভক্তগণকে লইয়া ইহা গড়িয়া উঠে।

এই দুইটি মহা গঠন কার্যের মূলে ছিল ঠাকুরেরই চেষ্টা, ইচ্ছা ও আকর্ষণ। বিশেষভাবে, তাঁহার উক্ত ত্যাগীভক্ত-সঙ্ঘটি স্থায়ী ও সুগঠিত করিবার জন্য তিনি ছিলেন যারপরনাই ব্যগ্র ও যত্নবান। এবং পরে যথাসময়ে তিনি একদিন নরেন্দ্রনাথের উপর এই কার্যের ভবিষ্যৎ-ভার অর্পণ করিয়া বলেন, "ছোকরা ভক্তদের সকল ভার তোমার উপর রইল। আমার দেহত্যাগের পরেও ওরা যাতে সাধন-ভজন করে ও বাড়ীতে না ফেরে, তা তুমি দেখবে।" ইহার পর, তিনি ঐ যুবক ভক্তগণকে বলেন, "নরেন তোমাদের নেতা"। এবং তৎসঙ্গে তাহাদের বুঝাইয়া দেন যে ভবিষ্যতে নরেন্দ্রকে দিশারী করিয়া চলাই তাহাদের কর্তব্য ও তাহাতেই তাহাদের কল্যাণ। জানা যায়, শেষের দিকে ঠাকুর প্রতিদিন সন্ধ্যার পর নরেন্দ্রনাথকে কাছে ডাকাইয়া আনিয়া দুই-তিন ঘণ্টাকাল তাহার সহিত একান্তে ত্যাগীভক্তদের ভাবী সন্ন্যাসী-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার বিষয় আলোচনা করিতেন এবং ঐ সকল ভক্তদের একত্রে রাখিয়া কিভাবে পরিচালিত করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে তাঁহার শেষ উপদেশ সকল দিতেন। এই সম্পর্কে একদিন তিনি নরেন্দ্রনাথকে বলেন, "রাখালের রাজবুদ্ধি আছে, ইচ্ছা করলে সে একটা রাজ্য চালাতে পারে।" তীক্ষ্ণবুদ্ধি নরেন্দ্রনাথ তখনই বুঝিয়া লইলেন যে রাখালকেই ভাবী ত্যাগীভক্ত-সঙ্ঘের সঙ্ঘ-নায়ক করা ঠাকুরের ইচ্ছা। এবং পরবর্তীকালে তিনি ঠাকুরের এই উপদেশ অনুসারেই কার্য করেন ও তদ্দ্বারা অশেষ সুফল প্রাপ্ত হন।

ইহা ব্যতীত দেখা যায়, এই সকল যুবক ভক্তদের আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের জন্য ঠাকুর তাঁহার অসুখের মধ্যেও অনুক্ষণ চেষ্টিত থাকিতেন। কাহার কি ভাবে চলিতে ও সাধন করিতে হইবে, কাহার সাধন-পথের বিঘ্ন সকল কি ভাবে দূর করিতে হইবে এবং উন্নতির জন্য কাহার কখন কি প্রয়োজন দেখা যাইতেছে, ইত্যাদি বিষয়ে তিনি প্রত্যেককে পৃথকভাবে আবশ্যকানুযায়ী উপদেশ দিয়াছেন। অসুখ বৃদ্ধির ফলে তিনি যখন অত্যন্ত দুর্বল, এমন কি কথা বলিতেও কষ্ট বোধ করেন, তখনও তিনি অনুচ্চস্বরে স্বল্পকথায়

এবং কখনও বা শুধুই আকার-ইঙ্গিতের দ্বারা তাহাদিগকে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। আর প্রত্যেককে আবশ্যকীয় শক্তিও দিয়াছেন। এই সকলের ফলে তাহারা কি অপূর্বভাবে গড়িয়া উঠিতেছিলেন, তাহা আমরা তাহাদের পরবর্তীকালের পবিত্র, নিঃস্বার্থ ও মহাগৌরবময় জীবন দেখিয়া বুঝিতে পারি। তাহাদের জীবনের এই মহাপরিণতির কারণস্বরূপ তাহারা প্রত্যেকেই ঠাকুরের কাছে তাহাদের ঋণ সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

অবশ্য কাশীপুরে ঠাকুর যে এইভাবে শুধু তাঁহার যুবক ভক্তগণকেই সাহায্য করিয়াছেন তাহা নয়। তাঁহার গৃহীভক্তগণও নিজ নিজ আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তাঁহার নিকট হইতে যথাসময়ে আবশ্যকীয় সকল প্রকার সাহায্যই পাইয়াছেন।[১] তবে তাঁহার সেবারত যুবক-ভক্তগণকে লইয়াই ছিল তাঁহার প্রধানতম কাজ এবং তিনি তাহাদের কিভাবে দেখিতেন ও কোন পথে চালিত করিতেছিলেন, তাহা নিম্নের ঘটনা দুইটি হইতে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়:

১। ঠাকুর হঠাৎ একদিন তাহাদিগকে পাড়ার উপর গিয়া (সাধুদের ন্যায়) দ্বারে দ্বারে খাদ্য ভিক্ষা করিয়া আনিতে বলিলেন। ইহাতে তাঁহারা উৎসাহের সহিত রাজি হইয়া ভগবানের নাম লইয়া ভিক্ষায় বাহির হইলেন। তাঁহাদের ভিক্ষা করিতে দেখিয়া কেহ গালি দিলেন, কেহ বা সাগ্রহে ভিক্ষা দিলেন এবং কোন কোন মায়েরা চোখের জল ফেলিলেন। এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার সহিত তাঁহারা যে খাদ্য সংগ্রহ করিলেন, তাহা উদ্যানবাটীতে রন্ধন করা হইল। ঠাকুর তাহা হইতে এক দানা ভাত গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "ভিক্ষান্ন বড়ই পবিত্র।" তিনি জানিতেন এই সকল যুবকগণ আর অতি অল্পকাল পরেই গেরুয়া ধারণ করিয়া নিঃসম্বল অবস্থায় এইভাবে ভিক্ষার সাহায্যে জীবন যাপন করিবেন।

১। এই সম্পর্কে গৃহীভক্তগণের সম্বন্ধে ঠাকুরের ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে 'কল্পতরু হওয়ার' ঘটনাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় (লীলাপ্রসঙ্গ, দিব্যভাব)।

২। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে (সম্ভবতঃ জুন মাসের শেষ-ভাগে) বুড়ো গোপাল কেদার-বদ্রী দর্শনান্তে কাশীপুরে ফিরিয়া ঠাকুরের নিকট সাধু-ভোজন করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন, "কোথায় সাধু খুঁজবি? - এখানেই সব রয়েছে। এই ছোকরাদের চাইতে ভাল সাধু কোথাও পাবি না। এদের খাওয়ালেই হবে।" গোপাল তাহারই ব্যবস্থা করিলেন। এবং তৎসঙ্গে (ঠাকুরেরই পূর্ব-প্রদত্ত উপদেশে) মালা, চন্দন ও কয়েকখানি গেরুয়া বস্ত্র তাঁহার সম্মুখে আনিয়া রাখিলেন। ঠাকুর তাহা হইতে (বুড়ো গোপাল সহ) ঐ সকল ছোকরা ভক্তদের প্রত্যেককে মালা, চন্দন ও একখানি করিয়া গেরুয়া বস্ত্র দান করিলেন এবং উদ্বৃত্ত একখানি বস্ত্র গিরিশচন্দ্রের জন্য রাখিয়া দিলেন। এই ভাবে ঠাকুর নিজে সেদিন যে এগার জনকে সন্ন্যাস দিয়াছিলেন, তাহাদের নাম—নরেন্দ্র, রাখাল, যোগীন, বাবুরাম, নিরঞ্জন, তারক, শরৎ, শশী, কালী, লাটু ও বুড়ো গোপাল।[১]

উক্তরূপে ঠাকুরের নিকট হইতে গেরুয়া প্রাপ্তির পর, নরেন্দ্রনাথ হঠাৎ একদিন (ঠাকুরের কৃপায়) তাঁহার বহু-প্রার্থিত অদ্বয় তত্ত্বের উপলব্ধি লাভ করিলেন। এইদিন সন্ধ্যাকালে কাশীপুর বাটীর নীচের একটি ঘরে বসিয়া নরেন্দ্রনাথ ও বুড়ো গোপাল ধ্যান করিতেছিলেন। তখন নরেন্দ্রনাথ হঠাৎ অনুভব করিলেন, তাঁহার মাথার পশ্চাৎদিকে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিঃপিণ্ড এবং উহা ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর ও বৃহত্তর হইতে হইতে ফাটিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে উহারই মধ্যে তাঁহার মনের লয় হইল। তখন (তাঁহার আত্মচৈতন্যে) যাহা অনুভূত হইতে লাগিল তাহা অবাঙ্‌মনসোগোচরম্, অর্থাৎ বাক্য-মনের অতীত, সুতরাং অবর্ণনীয়।[২] এই অবস্থায়, গোপাল হঠাৎ শুনিলেন, নরেন্দ্র চীৎকার করিয়া বলিতেছেন—"গোপালদা, গোপালদা, আমার শরীরটা

১। সন্ন্যাস গ্রহণে আবশ্যকীয় বিরজা হোমাদি ইহারা ঠাকুরের দেহরক্ষার পরে করিয়াছিলেন।

২। এই নির্বিকল্প সমাধির সময়ে নরেন্দ্রনাথ যেরূপ অনুভব করিয়াছিলেন,

কোথায় ?"[১] গোপাল চমকিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কেন, এই তো—এই তো তোমার শরীর।" কিন্তু দেখিলেন তাঁহার শরীর যেন শক্ত কাঠ, কোনও সাড়া নাই। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া গোপাল ভীত হইয়া ছুটিয়া ঠাকুরের নিকট গিয়া সব নিবেদন করিলেন। ঠাকুর তখন অত্যন্ত গম্ভীর ও নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিলেন, যেন নরেন্দ্রের যাহা হইতেছে তাহা সবই জানিতে পারিতেছেন। গোপালের কথার উত্তরে তিনি শুধু বলিলেন, "ও ঐ অবস্থায় কিছুক্ষণ থাক্। এর জন্যে ও আমাকে অনেক খুঁচিয়েছে।"

রাত্রি প্রায় ৯টার সময় নরেন্দ্রনাথের বাহ্যজ্ঞান ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিবার লক্ষণ দেখা গেল। ক্রমে তাঁহার যখন পূর্ণ জ্ঞান হইল, তখন তিনি দেখিলেন তাঁহার চিন্তাগ্রস্ত গুরুভাইগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। পরে তিনি ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলে ঠাকুর বলিলেন, "মা তোকে এখন সবই দেখিয়ে দিয়েছেন। তোর এই অনুভূতি এখন বাক্সবন্ধ থাকবে, চাবি আমার কাছে রইল। তোকে এখন অনেক কাজ করতে হবে। আমার ঐ কাজ শেষ হলে, ঐ বাক্স আবার খুলে দেওয়া হবে এবং তুই আবার এই অনুভূতি পেতে পারবি।" ইহা বলিয়া তিনি তাহাকে কিছুদিনের জন্য শরীরের বিশেষ যত্ন লইতে, সাত্ত্বিক খাদ্য আহার করিতে ও সৎসঙ্গে থাকিতে উপদেশ দিলেন।

পরে তিনি তাঁহার অপর শিষ্যদের বলিলেন, "নরেন্দ্রের ইচ্ছামৃত্যু। ও যখন জানতে পারবে ও কে, তখন ও আর দেহ রাখবে না। আমি ওকে ভুলিয়ে রেখেছি। সময় আসবে, যখন সে তার মেধা ও অধ্যাত্ম শক্তি বলে সমগ্র জগৎ কাঁপিয়ে তুলবে। আমি মার কাছে প্রার্থনা করেছি, তিনি যেন এই (নির্বিকল্প) অদ্বয় তত্ত্বের

তাহার বর্ণনা তিনি পরে তাঁহার স্বরচিত নিম্ন গানটিতে ব্যক্ত করিয়াছেন : "নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর," ইত্যাদি।

১। এই সময়ে মনের আংশিক নিম্নাবতরণে নরেন্দ্রনাথের মনে হইতেছিল (ইহা তিনি পরে বলিয়াছেন) শুধু তাঁহার মুখটি আছে, শরীর যেন নাই।

অনুভূতি তার কাছ থেকে মায়ার দ্বারা ঢেকে রাখেন। ওর অনেক কাজ করতে হবে। তবে এই মায়ার আবরণ এত পাতলা যে, তা যে-কোনও সময়ে ছিঁড়ে যেতে পারে।"

যাহা হউক, এই সর্বোচ্চ অনুভূতি লাভের সঙ্গেই যে নরেন্দ্রনাথের সাধনার প্রয়োজন শেষ হইল তাহা নয়। ঠাকুরের যে কাজ তিনি করিবেন, তাহাতে চাই অন্তহীন দুর্বার আধ্যাত্মিক শক্তি, বহু মত-পথের জ্ঞান, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ও বহুমুখী অভিজ্ঞতা। বস্তুতঃ ইহার জন্য প্রস্তুতির কোন অন্ত ছিল না। তাই, ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে (ও তাঁহার সকল যুবক ভক্তগণকেই) আরও তপস্যা করিতে উপদেশ দেন।

এই সকল ব্যতীত, ঠাকুর কাশীপুরে আরও একটি বড় কর্তব্য সুসাধিত করেন। আমরা দেখিয়াছি, কাশীপুর উদ্যানবাটীর নীচের তলার দুইটি ঘরে যুবকভক্তগণ থাকিতেন ও উহার পূর্বদিকের একটি ঘরে অবস্থান করিতেন ঠাকুরের সহধর্মিণী ও সাক্ষাৎ শক্তিস্বরূপিণী শ্রীশ্রীমা। দক্ষিণেশ্বর থাকিতে উক্ত যুবক ভক্তগণের দুই-এক জন ব্যতীত অপর কেহই এই মহামায়ের দর্শনও পান নাই। কিন্তু কাশীপুরের বাটীতে তাঁহার একান্ত সান্নিধ্যে থাকিয়া ও তাঁহারই ন্যায় ঠাকুরের সেবায় রত থাকিয়া, তাহারা তাঁহার সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হন। আর এইখানেই ঠাকুর তাহাদের জানাইয়া দেন, মা কে ও তাঁহার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ কি। এবং বিশেষভাবে ঠাকুরের কার্য সম্পাদনের ব্যবস্থায়, তিনি নিজে যাহা করিয়াছেন তাহার বক্রী অংশ যে এক অপূর্ব মাতৃভাব প্রকাশে শ্রীশ্রীমা করিবেন, ইহা তিনি তাহাদের কাহারও কাহারও নিকট সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন।[১] তাই আমরা দেখিতে পাই, পরবর্তীকালে তাহারা ঠাকুরের সহিত মাকেও সমসম্মানে মাথায় রাখিয়া তাহাদের কর্তব্য সকল সম্পাদন করিয়া যাইতেছেন। বিশেষতঃ নরেন্দ্রনাথ মাকে কি অসীম বিস্ময়কর ভক্তি

১। ঠাকুরের একটি ভক্ত (শ্রীযুত মনীন্দ্র গুপ্ত) বলিয়াছেন যে, তিনি ঠাকুরকে বলিতে শুনিয়াছেন—"আমার কাজ অর্ধেক করা হয়েছে, জগতের কল্যাণের জন্য বাকী কাজ ও (শ্রীশ্রীমা) করবে।"

ও ভরসার চক্ষে দেখিতেন তাহার পরিচয় আমরা পরে যথাস্থান সকলে দেখিতে পাইব।

এইভাবে দুরন্ত ব্যাধি-যন্ত্রণা ও নানা আবশ্যকীয় কর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া ঠাকুরের কাশীপুরের দিনগুলি ধীরে ধীরে শেষ হইয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে জুলাই মাস (১৮৮৬) পড়িতে তিনি যার-পর-নাই দুর্বল হইয়া পড়িলেন এবং দেখা যায় ঐ মাসের শেষের দিকে তিনি ফিস্ ফিস্ করিয়া ছাড়া কথা বলিতে পারিতেন না। কিন্তু এই কালেও তিনি তাঁহার আবশ্যকীয় কর্ম সম্পাদনে বিরত হন নাই। জানা যায়, এই সময়ে তিনি একদিন একখানা কাগজে লিখেন, "নরেন্দ্র লোকশিক্ষা দেবে।" উহা দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ বলেন, "আমি ও সব পারব না।" প্রত্যুত্তরে ঠাকুর বলেন, "তোর হাড় করবে।"

এই মহাকার্যটি যাহাতে সুসম্পাদিত হয়, তজ্জন্য ঠাকুর নরেন্দ্রনাথের শক্তি বৃদ্ধি করিতে চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। জানা যায়, উপরি-বর্ণিত ঘটনার কিছু পূর্বে, তিনি একদিন নরেন্দ্রনাথকে বলেন, "আমার সিদ্ধাই সকল কালে তোর ভিতর দিয়ে প্রকাশ পাবে।" তারপর তাঁহার মহাসমাধির মাত্র তিন-চারি দিন পূর্বে, শরীরের অতি দুর্বল, কষ্টদায়ক অবস্থায়, তিনি এক অত্যাশ্চর্য ও মর্মস্পর্শী কর্ম সম্পাদন করিলেন। তিনি সেদিন নরেন্দ্রনাথকে ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিতে বলিলেন। নরেন্দ্রনাথ বসিলে, তিনি তাহার দিকে স্থিরভাবে একদৃষ্টে চাহিয়া গভীর সমাধিমগ্ন হইয়া পড়িলেন। নরেন্দ্রনাথের তখন মনে হইতে লাগিল, ইলেকট্রিক সকের (shock) মত একটা সূক্ষ্ম শক্তি তাহার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং ক্রমে তাহার বাহ্যসংজ্ঞাও বিলুপ্ত হইল। যখন তাহার জ্ঞান ফিরিল, তখন তিনি দেখিলেন ঠাকুর কাঁদিতেছেন। নরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "নরেন, আজ তোকে আমার যথাসর্বস্ব দিয়ে ফকির হলাম। যে শক্তি তোকে আজ আমি দিলাম, তার সাহায্যে তোর দ্বারা অতি মহান কাজ সকল সম্পন্ন

হবে। সেই কাজ যখন শেষ হবে, মাত্র তখনই তুই যেখান থেকে এসেছিস সেখানে ফিরে যেতে পারবি।"

এই ঘটনার পর, ঠাকুরের দেহত্যাগের মাত্র দুইদিন পূর্বে, নরেন্দ্রনাথ যখন তাঁহার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তখন তাহার হঠাৎ মনে হইল "ঠাকুর যদি এখন তাঁর এই অসহ্য মৃত্যু-যন্ত্রণার মধ্যে বলতে পারেন 'আমি অবতার', তা হলে আমি তাঁর সে কথা বিশ্বাস করব।" ঠিক সেই মুহূর্তেই ঠাকুর তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "নরেন, এখনও তোর অবিশ্বাস! যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই এখন রামকৃষ্ণ। এবং তা তোর বেদান্ত ভাবের (অর্থাৎ, সবই ঈশ্বর এই ভাবের) কথা নয়।" শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ স্তম্ভিত হইলেন। মনে প্রচুর লজ্জা-দুঃখও অনুভব করিলেন। এত দিব্যদর্শন ও দিব্যানুভূতির পরেও, এই অবিশ্বাস! ইহাই এখন তাহার নিকট অতি অযুক্তিকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

ক্রমে শেষের দিনটি আসিয়া উপস্থিত হইল। সেদিন ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ৩১শে শ্রাবণ (১৫ই-১৬ই আগস্ট)। ঠাকুর পাঁচ-ছয়টি বালিশের উপর ঠেস দিয়া নীরবে বসিয়া আছেন। সকলেই মনে করিতেছেন তাঁহার কথা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু শ্রীশ্রীমা সেখানে আসিতেই তিনি আস্তে আস্তে বলিলেন, "এসেছ? ত্যাখো, আমি যেন কোথায় যাচ্ছি। জলের ভেতর দিয়ে অনেক দূর।" শুনিয়া মা কাঁদিতে লাগিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "তোমার ভাবনা কি? যেমন ছিলে, তেমনি থাকবে। আর এরা (নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি) আমার যেমন করেছে, তোমারও তেমনি করবে।"

ইহার পর ক্রমে দিন শেষ হইল। রাত্রি আসিল। দুপুর রাত্রির পর, ঠাকুর নরেন্দ্রের সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করিয়া দুই-চারিটি কথা বলিলেন। তারপর তিনবার মা-কালীর নাম উচ্চারণ করিয়া শুইয়া পড়িলেন। এবং রাত্রি ১টা ২ মিনিটের সময় (ইংরেজি মতে ১৬ই আগষ্ট) একটা প্রবল আনন্দ-শিহরণে তাঁহার সারা গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল, এমন কি, মাথার চুলগুলি পর্যন্ত খাড়া হইয়া দাঁড়াইল এবং

সমস্ত মুখখানি এক দিব্য হাসিতে উদ্ভাসিত হইল। তিনি মহাসমাধি-মগ্ন হইলেন। তাঁহার ঐ সমাধি আর ভাঙ্গিল না। পরদিন দ্বিপ্রহরে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহার শরীর পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, মাত্র আধঘণ্টা পূর্বে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

বেলা পাঁচটার সময় ভক্তগণ ঠাকুরের দেহ গেরুয়া কাপড় ও পুষ্প-চন্দনে সুসজ্জিত করিয়া কীর্তন করিতে করিতে বরাহনগরের শ্মশান-ঘাটে লইয়া ভস্মীভূত করিলেন। এবং তৎপর তাহারা তাঁহার অস্থি ও চিতাভস্ম সযত্নে সংগ্রহ করিয়া একটি কলসে ভরিলেন ও তাহা লইয়া 'জয় রামকৃষ্ণ', 'জয় রামকৃষ্ণ' বলিতে বলিতে কাশীপুর উদ্যান-বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন।

এবং সেখানে গভীর রজনীর নিস্তব্ধতার মধ্যে দাঁড়াইয়া নরেন্দ্রনাথ অনুভব করিলেন, 'হৃদয় শূন্য, শিরে শ্রীগুরু-অর্পিত গুরুদায়, পথ অপরিজ্ঞাত—শুধু গুরুরই কতকগুলি বিচ্ছিন্ন আদেশ, ইঙ্গিত ও ইশারা ব্যতীত তাহা নির্দেশ করিবার আর কিছুই নাই।'

তৃতীয় স্তর

চৌদ্দ

বরাহনগর মঠ

(১৮৮৬-১৮৮৯)

ঠাকুরের অদর্শনের পর, তাঁহার ত্যাগী ও গৃহীভক্তগণ আরও কয়েক দিন পূর্বের ন্যায় কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে সম্মিলিত হইয়া তাঁহার পুণ্যকথা আলোচনা করিলেন। তারপর একদিন বৈকালে রামবাবু ও সুরেশবাবু ঐ বাটীতে আসিয়া উহা আগস্ট মাস অন্তে (১৮৮৬) ছাড়িয়া দিবার আবশ্যকতা জানাইয়া, গৃহত্যাগী সেবকদিগকে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিলেন। ঐ দিন রাত্রেই এই সংবাদ পাইয়া, ঠাকুরের পরমভক্ত বলরামবাবু পরদিন স্বয়ং কাশীপুরে আসিয়া শ্রীশ্রীমাকে তাহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন (৬ই ভাদ্র, ১৮৮৬)। অনেক আলোচনা ও পরামর্শের পর, ঠাকুরের ত্যাগী ভক্তগণ তাঁহার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ও তাঁহার পবিত্র ভস্মাস্থিপূর্ণ একটি তাম্রকৌটা[১] বলরামবাবুর বাড়িতে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া, তাহাদের প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন। শুধু তারক, লাটু ও বুড়ো গোপাল পূর্বেই সংসার ত্যাগ করায়, তাহাদের বাড়ী ফিরিবার কোন উপায় ছিল না।

১। এই তাম্রকৌটাটির ইতিহাস এই। রামবাবু প্রভৃতি কয়েকজন গৃহী-ভক্ত ঠাকুরের ভস্মাস্থি রামবাবুর কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে প্রোথিত করিতে চাহেন। ত্যাগীভক্তগণ ইহাতে আপত্তি করায়, গৃহীভক্তগণ নরেন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হন। তখন তাঁহার উপদেশে ত্যাগীভক্তগণ ভস্মাস্থির পাত্র হইতে বড় বড় অস্থি সকল বাহির করিয়া নিজেদের জন্য উক্ত তাম্রকৌটায় রাখিয়া দেন। এবং ভস্মাস্থির বক্রী অংশ পাত্রসহ গৃহীভক্তদের দেওয়া হয় ও তাহা সকলে মিলিয়া উক্ত যোগোদ্যানে প্রোথিত করেন।

ঠাকুরের ভক্তগণের এইকালের মানসিক অবস্থা মাস্টার মহাশয় তাঁহার কথামৃতে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন :

'শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাকালে তাঁহার গৃহী ও বালক ভক্তগণ পরস্পরের সহিত যে স্নেহসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা আর ছিন্ন হইল না। সকলেই যেন এক প্রাণ, পরস্পরকে না দেখিয়া আর থাকিতে পারেন না। অন্যলোকের সঙ্গে আলাপ আর তাহাদের ভাল লাগে না। ঠাকুরের কথা ছাড়া আর সবই বিস্বাদ মনে হয়। সকলেই ভাবেন, তাঁকে কি আর দেখতে পাব না? যখন নির্জনে থাকেন, তখন তাঁহার সেই আনন্দময় মূর্তি মনে পড়ে। যখন রাস্তায় চলেন, তখন উদ্দেশ্যহীন, একাকী কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়ান। কেউ কেউ ভাবেন, তিনি চলে গেলেন, আর আমি এখনও বেঁচে রয়েছি। কই, প্রাণত্যাগ করতে ইচ্ছা হচ্ছে কই? ইত্যাদি।'

মাষ্টার মহাশয় সকল ভক্তদের সম্বন্ধে সাধারণভাবে এইরূপ বর্ণনা দিলেও, ঠাকুরের ত্যাগী ভক্তদের মনের অবস্থা প্রকৃতপক্ষে ছিল আরও গুরুতর। তাহাদের তিনি অন্তরের অন্তরে ত্যাগী করিয়া গিয়াছেন, নিজ হাতে গেরুয়া দান করিয়াছেন, আর তাহারাও ঐ আদর্শে জীবন গঠন করিবার জন্য সর্বস্ব পণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। তাই, এখন গৃহ ও গৃহজীবনে তাহাদের শান্তির আশা কোথায়? এখন তাহাদের অন্তর শুধু চাহিতেছিল—ভগবানের জন্য উদ্দাম তপস্যা ও তাঁহার আশু দর্শন লাভ। আর কিছু নয়—আর কিছু নয়।

আবার তাহাদের মধ্যে, নরেন্দ্রনাথের অবস্থা ছিল আরও দুঃসহ, আরও করুণ এবং ঘোর জটিলতা পূর্ণ। একদিকে অন্তরের মহা ত্যাগ-বৈরাগ্য ও ঠাকুরের বিরহ-ব্যথা, অন্যদিকে পৈতৃক বসতবাটী ও প্রিয় পরিজনদিগকে রক্ষা করিবার দুষ্পরিহার্য দায়িত্ব। আর উহারই মধ্যে তাঁহার অনুক্ষণের চিন্তা—কি উপায়ে ঠাকুরের ত্যাগী ভক্তগণকে আবার একত্র করিয়া একস্থানে সঙ্ঘবদ্ধ জীবন যাপনের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। সম্বলহীন তিনি। অথচ, উহাদের সকলের ভার

ঠাকুর তাঁহার উপরই অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। এখন উপায় কি? পথ কি? তিনি চিন্তায় দিশেহারা হইলেন।

এইভাবে দুই-তিন মাস গত হইলে, হঠাৎ একদিন একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটিল। ঠাকুরের মহাপ্রাণ ভক্ত সুরেশচন্দ্র মিত্র ঐ দিন অফিস হইতে ফিরিয়া, সন্ধ্যাকালে তাঁহার ঠাকুর ঘরে বসিয়া ধ্যান-জপ করিতেছিলেন। এমন সময়ে ঠাকুর তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, "তুই করছিস কি? আমার ছেলেরা সব পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে,—তুই তাদের জন্যে একটা স্থান করতে পারলি নি?" বলিয়াই তিনি অন্তর্হিত হইলেন। অশ্রুসিক্ত নয়নে সুরেশবাবু তখনই ছুটিয়া (প্রতিবেশী) নরেন্দ্রনাথের নিকট গিয়া ঘটনাটি বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "ভাই, একটা বাসা ঠিক কর। সেখানে তোমরাও থাকবে, আমাদেরও জুড়াবার একটা জায়গা হবে। আমি কাশীপুরে ঠাকুরের সেবার জন্য যা মাসে মাসে দিতাম, তা এখন তোমাদের জন্যও দেব।"

সুরেশবাবুর কথা শুনিতে শুনিতে নরেন্দ্রনাথের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। এবং পরদিন হইতেই তিনি কলিকাতার উপকণ্ঠে কোন নির্জন স্থানে একটি বাড়ী খুঁজিতে লাগিলেন ও ভবনাথ প্রভৃতি বন্ধুগণকেও ঐ কার্যে নিযুক্ত করিলেন। শীঘ্রই বরাহনগরে গঙ্গার সন্নিকটে (ট্যাক্স সহ) মাসিক ১১ টাকা ভাড়ায় একটি অতি পুরাতন জীর্ণ বাগানবাড়ী পাওয়া গেল এবং তাহাই নানা বিবেচনায় ঠাকুরের প্রথম মঠ-বাড়ী হিসাবে ভাড়া লওয়া হইল।[১]

এই সময়ে যুবক ভক্তগণের মধ্যে, রাখাল মুঙ্গেরে ছিলেন। যোগীন, লাটু ও কালী (১৮৮৬, ১৫ই ভাদ্র তারিখে) শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে বৃন্দাবন গিয়া সেখানেই অবস্থান করিতেছিলেন। তারক ও বুড়ো গোপাল আগস্ট (১৮৮৬) মাসের শেষ দিন পর্যন্ত কাশীপুর বাগানেই ছিলেন। তৎপর ঐ দিন অন্তে ঐ বাড়ী ছাড়িয়া দেওয়া

১। জানা যায়, নরেন্দ্রনাথের (বরাহনগর নিবাসী) বন্ধু ভবনাথ এই বাড়ীটি খুঁজিয়া বাহির করেন।

হইলে, তারক বৃন্দাবন চলিয়া যান ও সেখানে মাসখানেক থাকিয়া ৺কাশীধামে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। যুবক ভক্তগণের মধ্যে যাহাদের বাড়ী ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অভিভাবকদের পীড়াপীড়িতে পূর্বের অসমাপ্ত পাঠ সমাপনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহাদের সকলকে পুনরায় গৃহের বাহির করা বা নানাস্থান হইতে একস্থানে আনিয়া একত্র করা সহজ ব্যাপার ছিল না।

কিন্তু নরেন্দ্রনাথও দমিবার পাত্র ছিলেন না। তারক পূর্ব হইতেই গৃহত্যাগী থাকায়, তিনি সর্বপ্রথম তাহাকে তার করিয়া কাশীধাম হইতে কলিকাতায় আনাইলেন। তারক স্টেশন হইতে যে ঘোড়ার গাড়ী করিয়া বলরামবাবুর বাড়ীতে আসিলেন, নরেন্দ্রনাথ সেই গাড়ীতেই তাহাকে লইয়া বরাহনগরে রওনা হইলেন এবং সেই দিন হইতেই তারক ও বুড়ো গোপাল সেখানকার নূতন মঠ-বাড়ীতে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন (১৮৮৬, নভেম্বর-ডিসেম্বর)।[১] তখন নরেন্দ্রনাথও প্রায় প্রতিদিনই বাড়ী হইতে সেখানে আসিতেন এবং বিশেষভাবে রাত্রিকালে সেখানে থাকিয়াই জপ-ধ্যান করিতেন। তবে বাড়ীর মকদ্দমা প্রভৃতি গণ্ডগোলের জন্য তাঁহাকে রোজই কলিকাতায় ফিরিতে হইত।

ইহারা ব্যতীত, নরেন্দ্রনাথের আহ্বানে অন্যান্য যুবক ভক্তগণও এই সময়ে যথাসম্ভব ঘন ঘন মঠে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করেন। ফলে, মঠের প্রতি তাঁহারাও অতি অল্পেই বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া উঠেন। এবং তৎসঙ্গে নরেন্দ্রনাথ সুযোগমত তাঁহার অতুলনীয় সঙ্গীত ও প্রাণোন্মাদনকারী বাক্যাবলীর দ্বারা তাহাদের অন্তরে ত্যাগ-বৈরাগ্যের যে অত্যুচ্চ ভাব জাগরিত করিতেন, তাহাতে তাহাদের মন সত্বর মঠে যোগদান করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আবার ঠিক এই সময়েই, তাহাদের অন্তরের এই প্রজ্জলিত ত্যাগ-বহ্নির উপর

১। ইহার পূর্বেই হটকো গোপাল ও ভবনাথ বাড়ীখানি পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিলেন।

ঘৃতাহুতির ন্যায় আসিয়া পড়িল আর একটি অপূর্ব ঘটনা ও তাহার অভিজ্ঞতা। ঘটনাটি এই :

উক্তরূপে বরাহনগর মঠ স্থাপিত হওয়ার অল্প কিছুদিন পরে, বাবুরামের পুণ্যময়ী জননী নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ঠাকুরের যুবক ভক্তগণকে তাঁহার (স্বগ্রাম) আঁটপুরের বাড়ীতে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। নরেন্দ্রনাথ তাহাদের অনেককে লইয়া সেখানে গেলেন।[১] বাবুরামের মা তাহাদের সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া প্রচুর আদর-যত্ন করিতে লাগিলেন। এবং ঐ পুণ্যময়ীর স্নেহাদরে ও আঁটপুরের স্বচ্ছ, নির্মল গ্রাম্য পরিবেশে তাঁহাদের সকলের অন্তরই যুগপৎ আবার এক মহান ঐক্যবোধ ও আধ্যাত্মিক উন্মাদনায় জাগিয়া উঠিল। ঠিক যেন কাশীপুরের অবস্থা আবার ফিরিয়া আসিল। তাঁহারা আবার অনুভব করিতে লাগিলেন -- তাঁহারা এক, তাঁহারা ঠাকুরের, তাঁহারা অবিচ্ছেদ্য। আর তাহারই সঙ্গে চলিল (সেই কাশীপুরের ন্যায়) অবিশ্রান্ত ধ্যান, জপ, ভজন, শাস্ত্রপাঠ ও রাত্রিকালে প্রজ্জ্বলিত ধুনির[২] পার্শ্বে বসিয়া তপস্যা। আর এই সকলের মধ্যে নরেন্দ্রনাথই ছিলেন অপর সকলের চালক, দিশারী, উপদেষ্টা। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে তাহাদের বলিতে লাগিলেন, "আমরা মানুষ হব। আমরা ভগবানকে লাভ করে ধন্য হব। অসার পাণ্ডিত্য বা ক্ষণস্থায়ী ধন-মান-যশের আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। ঠাকুর

১। জানা যায়, নরেন্দ্রনাথের সহিত যাঁহারা আঁটপুরে গিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম—তারক, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, কালী, সারদা ও গঙ্গাধর। রওনা হইবার সময় তাঁহারা বাঁয়া, তবলা ও তানপুরা সঙ্গে লইয়া যান। হাওড়া স্টেশনে গাড়ীতে উঠিয়াই নরেন্দ্রনাথ গান ধরেন, 'শিব শঙ্কর বোম্ বোম্ ভোলা।' এবং ঐভাবে সমস্ত পথ গীতবাদ্য ও হাস্য-আনন্দ করিতে করিতে তাহারা আঁটপুরে পৌছেন। সম্ভবতঃ বাবুরাম তখন সেখানেই নিজ বাটীতে ছিলেন।

২। বাবুরাম মহারাজদের বাড়ীর উদ্যানের একটি বৃক্ষতলে এই ধুনি জ্বালা হইত।

আমাদের যে পথে চালিত করেছেন, আমরা সেই পথে চলব। নিজের মুক্তি ও জগতের কল্যাণ, ইহাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।" যে আবেগ ও উন্মাদনার সহিত নরেন্দ্রনাথ এই সকল কথা বলিতেন, তাহাতে তাহাদের মনে হইত ঠাকুরই যেন তাহার মুখ দিয়া তাহাদিগকে ঐ সকল কথা বলিতেছেন। আবার কখন কখন, গীতা, উপনিষদ্ প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়া, নরেন্দ্রনাথ তাঁহার জ্বালাময়ী ভাষায় তাহাদের নিকট ত্যাগ-বৈরাগ্যের মহিমা এমন ভাবে কীর্তন করিতেন যে তাহাদের ইচ্ছা হইত, এখনই—এই মুহূর্তেই—ঐ চরম কল্যাণের পথে ঝাঁপাইয়া পড়ি, আর ক্ষণিকের বিলম্বও যেন নিষ্প্রয়োজন—অসহ্য।

তাহাদের এই মনোভাব একরাত্রে চরমে উঠিল। সে দিন একটু অধিক রাত্রে একটা প্রকাণ্ড প্রজ্জ্বলিত ধুনির পার্শ্বে আসিয়া সকলে একত্র হইলেন। তখন চারিদিক নিস্তব্ধ, উপরে শীতের মৌন আকাশ। ঐ শান্ত, গম্ভীর পরিবেশে সকলেই নীরবে বহুক্ষণ ধ্যান-মগ্ন হইয়া রহিলেন। তারপর ভাবাবিষ্ট নরেন্দ্রনাথ ঐ গভীর নিশীথের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া যীশুখ্রীষ্টের অত্যদ্ভুত জন্ম, জীবন ও পুনরুত্থানের মহামহিমময় ইতিহাস কীর্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাবময় বাক্যচ্ছটায় সকলেই যেন যীশু ও তাঁহার অনুচরবর্গের সেই প্রাচীন গৌরবময় কালে উপনীত হইলেন এবং তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কার্য সকল স্বচক্ষে দেখিতে লাগিলেন। ঐ পবিত্র প্রাণস্পর্শী কাহিনী বর্ণনা করিতে করিতে নরেন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত ভাবে বলিতে লাগিলেন, "আমাদের প্রত্যেকেরই যীশুর মত হতে হবে। যীশুর মত ভগবানকে উপলব্ধি করে, সকল স্বার্থ ও সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে, জগতের পরিত্রাণের জন্য জীবনোৎসর্গ করতে হবে। এই জন্যই আমরা জন্মেছি, আমাদের জীবনের অন্য দ্বিতীয় লক্ষ্য নেই।" কথাগুলি শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই এক মহা ভাবের প্রেরণায় ঐ ধুনির পার্শ্বে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং অগ্নি ও পরস্পরের সম্মুখে সন্ন্যাসব্রত অবলম্বনের মহা শপথ গ্রহণ করিলেন। পরে তাঁহারা বিস্ময়ের সহিত জানিতে পারিলেন,

ঐ শুভরাত্রিটি ছিল যীশুখ্রীষ্টের জন্মরাত্রি। এবং তাঁহাদের বিশ্বাস হইল ঠাকুরের ইচ্ছাতেই উক্ত ঘটনাটি ঐ রাত্রে সংঘটিত হইয়াছে এবং খ্রীষ্ট-শিষ্যগণের ন্যায় তাঁহাদেরও একদিন ঠাকুরের বার্তা জগতে প্রচার করিতে হইবে। পরবর্তীকালে আঁটপুরের ঘটনাবলী স্মরণ করিয়া তারকনাথ (পরে স্বামী শিবানন্দ) বলিয়াছেন, "আঁটপুরেই আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে যাবার সঙ্কল্প দৃঢ় হল। ঠাকুর তো আমাদের সন্ন্যাসী করে দিয়েছিলেনই—ঐ ভাব আরও পাকা হল আঁটপুরে।"

যাহা হউক, উক্তরূপে সাত-আট দিন মহানন্দে আঁটপুরে কাটাইয়া, সকলে তারকেশ্বরে গেলেন এবং সেখানে ত্যাগীশ্বর শিবের চরণে পূজা-প্রণাম নিবেদন করিয়া বরাহনগরে ফিরিয়া আসিলেন।

ইহার অব্যবহিত পরেই শরৎ ও শশী সংসার ত্যাগ করিয়া বরাহনগর মঠে আসিয়া যোগ দিলেন। তৎপর ক্রমান্বয়ে আসিলেন রাখাল, নিরঞ্জন, বাবুরাম ও কালী। ইহাদের পরে আসেন সুবোধ, সারদা ও গঙ্গাধর। তারপর আসিলেন লাটু, হরি ও তুলসী। সর্বশেষে মঠে যোগ দেন যোগীন।[১] এইভাবে এক একদিন এক এক-জন আসিয়া যখন উপস্থিত হইতে লাগিলেন, তখন মঠবাসীরা সোল্লাসে "জয়, গুরু মহারাজজীকী জয়" ধ্বনির সহিত নবাগত গুরু-ভাইকে সাদরে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া তাঁহাদের দলভুক্ত করিয়া লইতে লাগিলেন।

আর যিনি ছিলেন তাহাদের সকলের নেতা প্রেরণা-দাতা ও মঠে আসিবার প্রধান আকর্ষণ, সেই নরেন্দ্রনাথ প্রথম দিকে ছিলেন (ইহা আমরা দেখিয়া আসিয়াছি) মঠের অর্ধ (বা অস্থায়ী) অধিবাসী। বাড়ীর মকদ্দমা প্রভৃতি নানা গণ্ডোগোলের জন্য অনেক দিন পর্যন্ত উঁহার স্থায়ী অধিবাসী হইতে পারেন নাই। তারপর যখন বাড়ীর মকদ্দমায় জয়লাভ হইল এবং অন্য সকল অসুবিধারও একটা কিনারা

১। যোগীন বৃন্দাবনে বরাবর মার সঙ্গে থাকিয়া এক বৎসর পরে তাঁহাকে লইয়া কলিকাতায় ফিরেন (১৮৮৭, ভাদ্র) ও তাহার অল্প পরেই মঠে যোগ দেন।

করা সম্ভব হইল, তখনই তিনি আসিয়া মঠের স্থায়ী বা পূর্ণ অধিবাসী হইলেন (১৮৮৭, মে-জুন)।১

দেখা যায়, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগে (অর্থাৎ, নরেন্দ্রনাথ মঠের স্থায়ী অধিবাসী হইবার কয়েক মাস পূর্বে), তিনি, রাখাল, নিরঞ্জন, বাবুরাম, তারক, শরৎ, শশী, কালী, সুবোধ, বুড়ো গোপাল ও গঙ্গাধর শাস্ত্রমতে বিরজাহোম করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইহার পরে যাহারা মঠে আসিয়াছেন, তাহারাও তাহাদের আগমনের পর যথাসত্বর ঐ হোম করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন।

এইভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ কালে (রীতি অনুসারে) ইহারা সকলেই পূর্ব নাম পরিত্যাগ করিয়া নূতন নাম গ্রহণ করেন। তদনুসারে সন্ন্যাসাশ্রমে যাহার যে নাম হইল তাহা এই: রাখাল—ব্রহ্মানন্দ, যোগীন—যোগানন্দ, বাবুরাম—প্রেমানন্দ, নিরঞ্জন—নিরঞ্জনানন্দ, তারক—শিবানন্দ, শরৎ—সারদানন্দ, শশী—রামকৃষ্ণানন্দ, কালী—অভেদানন্দ, লাটু—অদ্ভুতানন্দ, সুবোধ—সুবোধানন্দ, সারদা—ত্রিগুণাতীত, গঙ্গাধর—অখণ্ডানন্দ, হরি—তুরীয়ানন্দ, তুলসী—নির্মলানন্দ, বুড়ো গোপাল—অদ্বৈতানন্দ। কয়েক বৎসর পরে হরিপ্রসন্ন চাকরি পরিত্যাগপূর্বক মঠে যোগদান করিয়া বিজ্ঞানানন্দ নাম গ্রহণ করেন এবং তৎসঙ্গে ঠাকুরের ত্যাগী ভক্তগণের তালিকা সম্পূর্ণ হয়। সন্ন্যাস গ্রহণকালে নরেন্দ্রনাথ কি নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। তবে পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরূপে ভারত

১। এই সময়টি লাটু মহারাজের স্মৃতি-কথার দ্বারা সমর্থিত। ইহা স্থির করিবার প্রধান সূত্র এই। নরেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা (ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত) লিখিয়াছেন, 'নরেন্দ্রনাথ সংসার ত্যাগ করিয়া সাধু হইলে, আমাদের মাতামহী রঘুমণি দেবীই ছিলেন আমাদের প্রধান ভরসাস্থল। (ঐ সময় হইতে) তাঁহার সহিত আমরা ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাস করি।' এবং এই বিষয়েই নরেন্দ্রনাথের মধ্যম ভ্রাতা (মহেন্দ্রনাথ দত্ত) লিখিয়াছেন, 'আমরা ১৮৮৭ খৃস্টাব্দের জুন মাসে আমাদের মাতামহীর ৭নং রামতনু বসু লেনের বাড়ীতে যাইয়া বাস করিতে থাকি।'

ভ্রমণকালে (নিজ পরিচয় ও অবস্থানক্ষেত্র গোপন রাখিবার জন্য) তিনি কখন বিবিদিষানন্দ, কখন সচ্চিদানন্দ, কখন বা অন্য কোন নাম গ্রহণ করিয়াছেন। আমেরিকা যাত্রা করিবার কিছু পূর্বে তিনি খেতড়ির মহারাজার অনুরোধে বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করেন। এবং পরে তিনি এই নামেই জগদ্‌-বিখ্যাত হন। তবে তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ (তাঁহার প্রতি তাহাদের অন্তরের অপরিসীম ভক্তি-শ্রদ্ধাবশতঃ) তাঁহাকে বুঝাইতে কখন তাঁহার নামোচ্চারণ করিতেন না। তাহারা তাঁহাকে সর্বদাই সম্মান প্রদর্শনপূর্বক 'স্বামীজী' নামে অভিহিত করিতেন। তাই, যদিও 'স্বামী' পদবী সকল সন্ন্যাসীর নামের সঙ্গেই ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলেও রামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘে 'স্বামীজী' বলিতে নরেন্দ্রনাথ বা স্বামী বিবেকানন্দকেই বুঝাইয়া থাকে।

যাহা হউক, উপরের বিবরণ হইতে দেখা যায়, বরাহনগর মঠ মাত্র দুই জন স্থায়ী অধিবাসী লইয়া আরম্ভ হইলেও, উহা ক্রমশঃ বড় হইয়া ষোল-সতর জন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মঠ হয়। এই জন্য মঠের (খাওয়া-থাকার) খরচও ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠে। কিন্তু উহার প্রায় সমস্ত দায়িত্বই সুরেশ মিত্র একাকী বহন করিতেন। এ বিষয়ে মাস্টার মহাশয় লিখিয়াছেন—

"সুরেশ প্রথম প্রথম দুই-এক মাস ত্রিশ টাকা করিয়া দিতেন। ক্রমে যেমন মঠে অন্যান্য ভাইরা যোগ দিতে লাগিলেন, তিনিও ঐ টাকা বাড়াইয়া পঞ্চাশ, ষাট ও শেষে একশত টাকা পর্যন্ত দিতে লাগিলেন। বাড়ী ভাড়া ও ট্যাক্স ১১৲ টাকা, পাচক ব্রাহ্মণের মাহিয়ানা ৬৲ টাকা, আর বাকী ডাল-ভাতের খরচ।"

এই বিষয়ে স্বয়ং স্বামীজী (নরেন্দ্রনাথ) বলিয়াছেন, "মঠ-ফট্ যা দেখছিস সব ঐ সুরেশ মিত্তিরের জন্য হল।" "আমাদের যা কিছু দরকার হত তিনি যোগাতেন। তার মত ভক্তি-বিশ্বাস আর কার আছে?" তবে জানা যায়, মঠ জমিয়া উঠিলে বলরামবাবুও মঠে সাহায্য করিতে আরম্ভ করেন। এবং মাস্টার মহাশয়ও মাঝে মাঝে কিছু দিতেন।

তাহা হইলেও দেখা যায়, এই সকল পরিমিত সাহায্যের দ্বারা মঠ যে সচ্ছলভাবে চলিতে পারিত তাহা নয়। মঠবাসীদের খাওয়া-থাকা ব্যতীত, মঠে আরও বহু রকমের ব্যয়ের প্রয়োজন দেখা দিত। ঠাকুরের ভোগ, পূজা ও আরতি ইত্যাদি মঠে চলিত। মঠবাসীগণের প্রায়ই কলিকাতা ও অপর নানা স্থানে যাতায়াত করিতে হইত। এবং পরিচিত-অপরিচিত নানা অতিথি-অভ্যাগতগণও মঠে মাঝে মাঝে আসা-যাওয়া করিতেন এবং তজ্জন্যও কখন কখন মঠের কিছু ব্যয় হওয়া অনিবার্য হইয়া পড়িত। এই সকলের উপর আবার সময়ে সময়ে দেখা দিত অসুখ-বিসুখের চাপ।[১] এইরূপ ছোট-বড় বহু জ্ঞাত-অজ্ঞাত কারণে মঠবাসীগণ প্রায় সময়েই একটা দারুণ অভাব ও তজ্জনিত কষ্টের মধ্যে কালাতিপাত করিতেন।

জানা যায়, অর্থাভাবে মঠের পাচককে অল্প কিছুদিন পরেই উঠাইয়া দিতে হয়। তখন রামকৃষ্ণানন্দ স্বহস্তে রাঁধিয়া ঠাকুরের ভোগ দিতেন। যেদিন টাকা বা খাদ্য কিছুই থাকিত না, সেদিন তাঁহারা তিন-চারজনে মিলিয়া ভিক্ষায় বাহির হইতেন। কোন কোন দিন ভিক্ষা জুটিত, কোন কোন দিন জুটিত না। যেদিন জুটিত না, সেদিন তাঁহারা জপ, ধ্যান, কীর্তন বা ভগবদ্‌প্রসঙ্গে দিন কাটাইয়া দিতেন। ফলে অনাহারের ক্লেশ আর ক্লেশ বলিয়া তাঁহাদের মনে হইত না।

মঠের এই অবস্থা সম্বন্ধে পরবর্তীকালে স্বামীজী বলিয়াছেন, "বরাহনগরে এমন কতদিন গিয়েছে যে খাবার কিছু নেই, ভাত জোটে তো নুন জোটে না। কয়েকদিন হয়তো শুধু নুন-ভাতই চললো, কিন্তু কারুর তাতে গ্রাহ্য নেই। জপধ্যানের প্রবল তোড়ে তখন আমরা ভাসছি। কখন কখন শুধু তেলাকুচো পাতা সিদ্ধ ও নুন-

১। বরাহনগর মঠে সময়ে সময়ে কাহারও কাহারও খুব কঠিন অসুখও হইয়াছে। জানা যায়, একবার (১৮৮৭, গ্রীষ্মের প্রারম্ভে) নরেন্দ্রনাথের জ্বর-বিকার ও অপর একবার (১৮৮৮, শীতকালে) লাটু মহারাজের নিউমোনিয়া হয়।

ভাত—এই মাসাবধি চলছে। আহা, সে সব কি দিনই গেছে! সে কঠোরতা দেখলে ভূত পালিয়ে যেত, মানুষের আর কথা কি?" এই বিষয়ে স্বামী প্রেমানন্দ বলিয়াছেন, "একবেলা ভাত কোনদিন জুটতো, কোনদিন জুটতো না। থালা-বাসন তো কিছু নেই, বাড়ীর সংলগ্ন বাগানে লাউ গাছ, কলাগাছ ঢের ছিল। দুটো লাউপাতা কি একখানা কলাপাতা কাটতে গেলে, উড়ে মালী যা তা বলে গাল দিত। শেষে মানকচুর পাতায় ভাত ঢেলে তাই খেতে হত। তেলাকুচো পাতা সিদ্ধ আর ভাত—তা আবার মানপাতায় ঢালা। কিছু খেলেই গলা কুটকুট করতো। এত যে কষ্ট, ভ্রূক্ষেপ ছিল না। পূজা, ধ্যান, জপ, কীর্তন সর্বক্ষণ চল্‌ছে।"

আর এই খাওয়া-থাকার কষ্টের মধ্যে, মঠের সমস্ত আবশ্যকীয় কাজ তাঁহাদের নিজেদেরই করিতে হইত। কুটনা-কোটা, জলতোলা, বাসন মাজা, ঘরবাড়ী ঝাঁট দেওয়া, এমন কি, পায়খানা পর্যন্ত পরিষ্কার করা তাঁহাদের নিত্যকর্ম ছিল। এবং যদিও তাঁহাদের প্রায় সকলেই বিশেষ শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবার হইতে আগত ছিলেন, তাহা হইলেও তাঁহারা এই সকল কাজ করিতেন প্রবল উদ্যম ও আনন্দের সহিত। বস্তুতঃ তাঁহাদের এই অপূর্ব ভাবটির পশ্চাতে ছিল তাহাদের নেতা নরেন্দ্রনাথেরই প্রেরণা। তিনি তাহাদের মর্মে আঘাত করিয়া বলিতেন, "ঠাকুর ষোল আনা কঠোর করেছিলেন, আমরা কি তার এক আনাও করতে পারব না? তিনি অপরের পায়খানা ধুয়ে দিয়ে এসেছিলেন, আমরা তাঁর নাম করে কি কিছুই করতে পারব না?" শুনিয়া সকলের অন্তরেই জাগিয়া উঠিত এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা এবং মঠের কাজ লইয়া একটা কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত। যখন যাহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে, তিনিই অগ্রে গিয়া কাজে হাত দিয়াছেন।

আবার এই সকল ব্যতীত, একটা অনাবশ্যক মানসিক পীড়নও তাঁহাদের মাঝে মাঝে সহ্য করিতে হইত। ভিক্ষায় বাহির হইলে অনেকে ভিক্ষার পরিবর্তে তাঁহাদের শুধু কটু কথা শুনাইয়া বা উপহাস

করিয়াই বিদায় করিতেন। পাড়ার দুষ্ট লোকেরা তাঁহাদের উপর নানা উৎপাত-অত্যাচার করিয়া আমোদ অনুভব করিত। কেহ কেহ তাহাদের নামে মিথ্যা কুৎসাও রটনা করিত। কিন্তু তাঁহারা ঐ সব গায়ে লাগিতে দিতেন না। বরং অনেক সময়েই উহা প্রচুর রঙ্গরস ও আনন্দের সহিত উপভোগ করিয়াছেন।[১]

বস্তুতঃ এইকালে তাঁহারা সকলেই ভাসিতেছিলেন এক তীব্র বৈরাগ্যের খরস্রোতে এবং তজ্জন্য তাঁহাদের মন ছিল জাগতিক সুখ-দুঃখের বহু উর্ধ্বে। জানা যায়, এই সময়ে বরাহনগর মঠে চলিতেছিল এই তরুণ সন্ন্যাসীদের বিরামহীন অত্যুগ্র সাধনা,—বাহ্যতঃ জপ, ধ্যান, কীর্তন, পাঠ ও ভগবৎপ্রসঙ্গ। কিন্তু সবই অসাধারণ—অত্যদ্ভুত। দেখা যাইত, কেহ ধ্যান বা জপে বসিলে তিনি আর উঠেন না, দিন গড়াইয়া যায়, হুঁস নাই। তখন বাধ্য হইয়া আহারের জন্য তাঁহাকে টানিয়া তুলিতে হয়। তারপর হয়তো তাঁহার সেদিনকার বিনিদ্র রজনীও কাটে ঐ ধ্যান বা জপে। যখন কীর্তন আরম্ভ হয়, তখন তাহার প্রচণ্ড নর্তন-কুর্দনে পুরাতন মঠবাড়ী কাঁপিতে থাকে, আগন্তুক শ্রোতাদের ভয় হয় বুঝি বা বাড়ি ধ্বসিয়া যায়। এবং সারাদিন ঐ ভাবে কাটাইয়াও কাহারও খেয়াল হয় না যে স্নানাহার আছে, শ্রমের পর বিরাম-বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। ঐ রকম, পাঠ ও ভগবৎপ্রসঙ্গ তাঁহারা যাহা করেন—তাহাও উদ্দাম, উন্মত্ত। পাঠে রত হইলে, অবিরামভাবে দিনের পর দিন যায় ঐ একই কাজে—কখনও প্রাচীন শাস্ত্রাদির, কখনও বা আধুনিক দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদির অধ্যয়ন-আলোচনায়। উহার ইতি

১। জানা যায়, নরেন্দ্রনাথ, যোগীন, তারক প্রভৃতি কয়েকজন রঙ্গরসে বিশেষ পটু ছিলেন। মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন, "যোগীন মহারাজ সর্বদা হাস্যমুখ, কৌতুক ও রহস্যপ্রিয় এবং (অপরকে) নকল করিতে অতি সুদক্ষ ছিলেন।" তারকের বিষয়ে লাটু মহারাজ বলিয়াছেন, "হামাদের মধ্যে তারকদাদা ছিল ভারি আমুদে, কেবল লোকদের নকল করত।"

যেন আর নাই। আবার যখন ভগবৎপ্রসঙ্গ আরম্ভ হয়, তখনও ঐ একই অবস্থা—সারাদিন ঐ প্রসঙ্গ চলিতেছে। উহার অধিকাংশেরই বক্তা থাকিতেন নরেন্দ্রনাথ। এবং তিনি এক একদিন ঠাকুরের এক একটি বাণী লইয়া (প্রাচীন শাস্ত্র ও আধুনিক দর্শন-বিজ্ঞানের আলোকে) এমনভাবে ব্যাখ্যা করিতেন যে, সকলেই অবাক হইয়া ভাবিতেন ও বুঝিতে পারিতেন ঠাকুরের সামান্য সামান্য কথার মধ্যে কি গভীর জ্ঞান ও তত্ত্ব সকল নিহিত আছে।

এই সকল সংবাদের সহিত আরও জানা যায়, উপরিকথিত ধ্যান-জপাদি মঠবাসীগণ শুধু যে মঠে বসিয়াই করিতেন তাহা নয়। অনেক সময়ে তাঁহারা মঠের বাহিরে গিয়া কখন নির্জন বৃক্ষতলে, কখন গঙ্গাতীরে, কখন বা শ্মশান-মধ্যে—যে যখন যেখানে সুবিধা বোধ করিতেন, পাগলের মত সেইখানেই তপস্যায় বসিতেন। এবং ঐ ভাবে কখন দিন, কখন রাত্রি, কখন বা দিন-রাত্রি দুই-ই বা তদধিক সময় বাহিরের তপস্যাস্থলে কাটাইয়া আসিতেন। ঈশ্বর-লাভের জন্য সকলেই ব্যাকুল—উন্মত্ত, আর কোন দিকে দৃষ্টি নাই।

আর সর্বক্ষণ এইরূপ উদ্দাম সাধনায় মত্ত থাকায় কাহারও খেয়াল হইত না যে, এই কাজের জন্যও শরীররক্ষা ও কিছু শারীরিক যত্নের প্রয়োজন, অন্যথায় (উদ্দেশ্য সিদ্ধির পূর্বেই) মৃত্যু, মস্তিস্ক-বিকৃতি, অথবা অপর কোন দুরারোগ্য ব্যাধির আক্রমণে সাধকের সকল শ্রম পণ্ড হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা থাকে। তাই, উক্তরূপে অবিশ্রান্ত সাধনা-স্রোতে ভাসিয়া, মঠের আত্মভোলা তরুণ সন্ন্যাসীগণ এক মহাবিপদের মুখে প্রবিষ্ট হইতেছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় (এবং ঠাকুরেরই ইচ্ছায়) ইঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন যিনি ঠাকুরের ও তাহার এই সাধনোন্মত্ত গুরুভাইদের সেবাকেই নিজ সাধন করিয়া লইয়াছিলেন। তাহার নাম শশী মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ)। বস্তুতঃ তিনিই তাঁহার অপূর্ব ভক্তি, নিষ্ঠা ও সেবার দ্বারা মঠ ও উহার তপস্যারত তরুণ সন্ন্যাসীগণের জীবন রক্ষা করেন।

জানা যায়, শশী মহারাজের একান্ত আগ্রহে মঠে যখন ঠাকুর

প্রতিষ্ঠা ও পূজার ব্যবস্থা হয়, তখন নরেন্দ্রনাথ তাহাকে বলিয়াছিলেন, "ছাখ্, আমরা সন্ন্যাসী, কোথায় থাকি, কি খাই, কিছু ঠিক নেই। তাই, ঠাকুর-ঘর করে (সকলকে) মিছে বিব্রত করিস নে। তার চেয়ে ঠাকুরের আদর্শ সামনে রেখে সাধনায় লেগে যা।" কিন্তু গুরুগতপ্রাণ শশী মহারাজ ঠাকুর সেবার সকল দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে লইয়া, একমনে ও প্রগাঢ় ভক্তির সহিত দিনের পর দিন ঠাকুরের পূজা, ভোগ, আরতি ইত্যাদি এমন নিখুঁত ও পরিপাটীরূপে চালাইয়া যাইতে লাগিলেন যে, তাহাতে কাহারও আর কিছু বলিবার রহিল না। তাহা ছাড়া, একটি দিনের তরেও তিনি তাঁহার ঐ কার্যে সামান্যমাত্র খুঁতও প্রবেশ করিতে দেন নাই। এবং তাঁহার পূজাদি দেখিলে মনে হইত তিনি সত্যই যেন এক জীবন্ত ঠাকুরের সেবাপূজা করিতেছেন।[১] লাটু মহারাজ বলিয়াছেন, "আমাদের কোন আয় ছিল না, কিন্তু ঠাকুরের ভোগে সব ভাল ভাল ফল দেওয়া হত। ······সর্বক্ষণ শশীভাই'এর চিন্তা ছিল ঠাকুরের সেবা কেমন করে চলবে, কি কি দেওয়া হবে, আর কখন কোনটা দেওয়া হবে। তাঁর পূজার সব কাজ সে নিজ হাতে করত। আমাদের বলত—তোদের কোন ভাবনা নেই, তোরা সাধন-ভজন নিয়ে পড়ে থাক। এঁর (অর্থাৎ ঠাকুরের) দৌলতে সব জুটে যাবে।"

ইহা ব্যতীত দেখা যায়, মঠের ঠাকুর সেবার ভার লইয়া শশী মহারাজ আপনা হইতেই মঠবাসীদের জননীস্বরূপ হইয়া বসিয়াছিলেন। তাহাদের কেহ যদি ধ্যানজপে নিমগ্ন হইয়া স্নানাহার করিতে বিরত থাকিতেন, তখন ঠিক গৃহ-জননীর ন্যায় তিনি তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া তুলিয়া স্নানাহার করিতে বাধ্য করিতেন। এ

১। এ বিষয়ে পূজনীয় মাস্টার মহাশয় লিখিয়াছেন, "মঠে আসা অবধি শশী একমনে দিনরাত ঠাকুরের পূজাদি সেবা করেন। তাহার সেবা দেখিয়া সকলে অবাক হইয়াছে। ঠাকুরের অসুখের সময় তিনি রাতদিন যেরূপ তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন, আজও সেইরূপ অনন্যমন, একভক্তি হইয়া সেবা করিতেছেন।"

বিষয়ে স্বয়ং স্বামীজী বলিয়াছেন, "শশী আমাদের মায়ের মত ছিল। সে আমাদের খাওয়া-দাওয়ার সব ব্যবস্থা করত। আমরা রাত তিনটের সময় উঠে—কেউ বা স্নান করে, কেউ বা তা না করেই—ধ্যান-জপে ডুবে যেতাম এবং কখন কখন ঐ ধ্যান জপ বিকাল ৪টা-৫টা পর্যন্ত চলতে থাকত। তখন শশী আমাদের ভাত নিয়ে বসে থাকত, আর দরকার হলে বল প্রয়োগের দ্বারা আমাদের ধ্যান-জপ থেকে টেনে তুলত। তখন আমাদের অবস্থা এমন যে জগৎ থাকল কি গেল তা আমাদের কোন গ্রাহ্যের বিষয় ছিল না।"

বস্তুতঃ ঐকালে ভজন-সাধন ব্যাপারে এক শশী মহারাজ ব্যতীত মঠের অপর সকলেই ছিলেন উন্মত্ত। আবার তাহাদের মধ্যে নেতা নরেন্দ্রনাথের সাধনা ছিল সর্বাপেক্ষা উগ্র। জানা যায়, নিয়ত ধ্যান, জপ ও উচ্চ চিন্তা করিবার ফলে, তিনি একদিন ভাবে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া বাঘের মত সতেজে মঠের লম্বা বারান্দায় পায়চারি করিতে আরম্ভ করেন। তখন তাঁহার চক্ষু স্থির, দৃষ্টি উধ্বর্, মুখমণ্ডল শান্ত ও ভয়ঙ্কর তেজপূর্ণ। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া রাখাল মহারাজ প্রভৃতি সকলেই যারপরনাই ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।[১] কিন্তু ভয়ে তাঁহার কাছে যাইতে কাহারও সাহস হইল না। বেলা দুইটা হইতে প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁহার এই ভাবে কাটিল। পরিশেষে তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত (ইনি সেদিন বেলা চারটার সময় মঠে আসিয়াছিলেন) রাখাল মহারাজের উপদেশে তাঁহার নিকট গিয়া চীৎকার করিয়া তাঁহাকে ডাকিতে ও গালি দিতে আরম্ভ করিলেন। সাত-আট মিনিট ঐরূপ করিবার পর নরেন্দ্রনাথের মন ধীরে ধীরে নীচে নামিল ও তিনি পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন।

বরাহনগর মঠে থাকাকালীন নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই প্রকারের নানা কাহিনী পাওয়া যায়। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা (উক্ত মহেন্দ্রনাথ

১। কারণ ঠাকুর তাহাদের বলিতেন, নরেন্দ্রের মন এইরূপ উচ্চাবস্থায় উঠলে সে (ঐ অবস্থাতেই) স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করতে পারে।

দত্ত) লিখিয়াছেন, "নরেন্দ্রনাথ একদিন (১৮৮৮) শিবানন্দ স্বামী প্রভৃতি কয়েকজনকে সঙ্গে করিয়া তাঁহাদের ৭নং রামতনু বসু লেনের বাড়ীতে আসেন। তখন (দীর্ঘকাল নানা কৃচ্ছ্রসাধনার ফলে) তাঁহার পায়ের গোড়ালী ফাটিয়া গিয়াছে, গায়ে প্রচুর মাটি পড়িয়াছে, মাথায় তাম্রবর্ণ ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। এই সময়ে তাঁহার চেহারা অতি বিকট হইয়াছিল।"

যাহা হউক, দেখা যায় এইরূপ অত্যুগ্র সাধনায় ডুবিয়া থাকিলেও নরেন্দ্রনাথের শিরেই ছিল মঠ-সংক্রান্ত সর্বপ্রকার ঝঞ্ঝাট পোহাইবার দায়িত্ব। তিনি রাখাল মহারাজকে মঠের কর্তা করিয়া দিয়া, তাহাকে 'রাজা' বলিয়া ডাকিতেন এবং তাঁহারই নির্দেশে কেহ তাহাকে কোন কাজ করিতে বলিতেন না। কিন্তু মঠ পরিচালনায় কোন দোষ বা ত্রুটি দেখিলে, তিনি (নরেন্দ্রনাথ) তাহাকেই দায়ী করিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নরেন্দ্রনাথ একদিন (১৮৮৮, ৭ই মে) কলিকাতা হইতে ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার অনুপস্থিতির অবসরে সারদাপ্রসন্ন (তীব্র বৈরাগ্যের বশে) মঠ হইতে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। সমস্ত শুনিয়া তিনি বলিলেন, "রাজা আসুক, একবার বোক্‌বো। কেন তারে যেতে দিলে?" রাখাল মহারাজ এই সময়ে মঠে ছিলেন না, দক্ষিণেশ্বরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তাই, নরেন্দ্রনাথ অপর একজনকে বকিয়া মাস্টার মহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন "দেখুন, আমার বিষম মুস্কিল! এখানেও এক মায়ার সংসারে পড়েছি! আবার ছোঁড়াটা কোথায় গেল!"

যাহা হউক, মাত্র একদিন পরেই ছেলেটি মঠে ফিরিয়া আসায় (১৮৮৭, ৮ই মে) নরেন্দ্রনাথ তাহার সম্বন্ধে সেবার অল্পেই নিশ্চিন্ত হইলেন বটে। কিন্তু ঐকালে মঠের ছেলেদের সম্পর্কে প্রায়ই একটা না একটা ঝামেলা উত্থিত হইয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। একদিকে তাহাদের সকলের ত্যাগ-তপস্যা রক্ষা করা ও সংযত পথে চালিত করা যেমন প্রয়োজন ছিল, অন্যদিকে তেমনি তাহাদের অনেকের অভিভাবকগণ মাঝে মাঝে মঠে আসিয়া তাঁহাদের ছেলেদের

গৃহত্যাগের জন্য নরেন্দ্রনাথকেই দোষী সাব্যস্ত করিতেন ও তাহাদের গৃহে ফিরাইয়া লইবার প্রয়াস পাইতেন। অভিভাবকদের অনেকেই বলিতেন, "এই নরেন্দ্রই যত নষ্টের গোড়া। ওরা তো বেশ বাড়ীতে ফিরে গিছিল। পড়াশুনাও আবার করছিল।" ঐ সঙ্গে কেহ কেহ তাঁহাকে প্রচুর গালাগালিও করিতেন। উত্তরে নরেন্দ্রনাথ শুধু বলিতেন, "আমাকে দোষী করছেন কেন? আপনি আপনার ছেলেকে নিয়ে যান না। আমি কি তাকে আটকে রেখেছি?" জানা যায়, রাখাল মহারাজ, শরৎ মহারাজ, শশী মহারাজ, সারদা মহারাজ প্রভৃতির অভিভাবকগণ তাহাদের বাড়ী ফিরাইয়া লইবার চেষ্টায় অনেকবার মঠে আসিয়াছেন। এই অবস্থায় রাখাল মহারাজ পরিশেষে তাহার পিতাকে একদিন বলেন, "কেন আপনারা কষ্ট করে আসেন? আমি এখানে বেশ আছি। এখন আশীর্বাদ করুন, যেন আপনারা আমায় ভুলে যান, আর আমিও আপনাদের ভুলে যাই।" শেষের দিকে পিতা মঠে আসিলেই শশী মহারাজ মঠ হইতে পলাইয়া যাইতেন, তাঁহার সহিত আর দেখা করিতেন না। সারদা মহারাজ ঐরূপ অবস্থাতেই (উপরি-বর্ণিতরূপে) মঠ হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন। একমাত্র শরৎ মহারাজের পিতাই পুত্রের দৃঢ়সঙ্কল্প দেখিয়া একদিন সস্ত্রীক মঠে আসিয়া তাহার সংসার ত্যাগে সম্মতি দিয়া বলেন, "আশীর্বাদ করি তোমার যেন পদস্খলন না হয় এবং তুমি অচিরেই ইষ্ট লাভ করে পরমানন্দের অধিকারী হও।"

এইভাবে এই ঝামেলাগুলি ধীরে মিটিয়া যায় বটে। কিন্তু ঐকালে এই তরুণ সন্ন্যাসীগণের নিজ নিজ মানসিক অবস্থাই ছিল অত্যন্ত জটিল ও অশান্ত। প্রচুর তপস্যা, অতি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ও নানা আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ইত্যাদির কোন কিছুতেই তাঁহাদের মনে শান্তি আসিতেছিল না। কি চাই—কি চাই, কিসে শান্তি লাভ হইবে—অন্তর তৃপ্ত হইবে, ইহা যেন তাঁহারা আর বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। তাই মঠে সকলেই ছিলেন অতৃপ্ত এবং সকলের মনেই কোন না কোন হেতুতে তীর্থে গিয়া তপস্যা করিবার আকাঙ্ক্ষা

জাগিয়া উঠিতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ ইহার জন্যও সময়ে সময়ে বিশেষ বিব্রত বোধ করিতেন। কিন্তু তিনি নিজেও পরিশেষে এই মানসিক চাঞ্চল্য হইতে রেহাই পাইলেন না। এবং দেখা যায়, ক্রমে ক্রমে, এক শশী মহারাজ ব্যতীত, অপর সকলেই একে একে মঠ ছাড়িয়া তপস্যা ও তীর্থ ভ্রমণ করিবার জন্য বাহির হইয়া যাইতে লাগিলেন। এবং তারপর মাঝে মাঝে মঠে ফিরিয়া আসিয়াও আবার যাইতে লাগিলেন।

এই বিষয়ের সমস্ত ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে মনে হয়, ঠাকুরের কার্য সম্পাদনের জন্য ঐকালে তাহাদের যে শিক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও আধ্যাত্মিক প্রসারতা লাভের প্রয়োজন ছিল, যেন ঠিক তাহা অর্জনের জন্যই তাহাদের অন্তরে (ঠাকুরেরই ইচ্ছায়) ঐ অশান্তি জাগিয়াছে এবং তাহারই চাপে তাহারা ভারতের দিকে দিকে ছুটিয়া গিয়া নানাস্থানে তপস্যা, অথবা নিছক ভ্রমণেই রত হইয়াছেন। ইহারই ফলে ক্রমে ভারতের সমস্ত তীর্থ ও গোটা ভারতবর্ষই তাহাদের বিশেষ পরিচিত ও আপন হইয়া উঠিয়াছে। এবং আমরা দেখিতে পাই, পরবর্তীকালে ভারত ও সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ঠাকুরের বিরাট কর্মানুষ্ঠানকালে তাঁহারা সকলেই তাহা অশেষ প্রীতি, শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সহিত সুসম্পন্ন করিয়া যাইতেছেন। যেন উহাই ছিল তাঁহাদের চরম তপস্যা ও পরম লক্ষ্য—ভারতের জন্য, জগতের জন্য, সমস্ত মানবকুলের জন্য, সর্বস্ব অর্পণ। প্রকৃতপক্ষে এই মহাবদান করিবার যোগ্যতা অর্জনের জন্যই তাঁহাদের পূর্বোক্তরূপ অশান্তি ও মানসিক চাঞ্চল্য। নতুবা তাঁহাদের নিজেদের জন্য আর কি তপস্যা বা কোন তীর্থভ্রমণের আবশ্যকতা ছিল? তাঁহারা সকলেই যে ছিলেন জন্মসিদ্ধ—পূর্ণকাম।

এই সকল কথা নরেন্দ্রনাথের জীবন আলোচনা করিলে আপনিই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ইহা আমরা ক্রমে বুঝিতে পারিব। উপস্থিত বরাহনগর মঠে থাকাকালে তাঁহার উক্তরূপ অস্থির, অশান্ত ও জটিল মানসিক অবস্থার কিছু পরিচয় আমরা নিম্নে দিবার চেষ্টা করিলাম।

কথামৃত হইতে দেখা যায়, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল তারিখে নরেন্দ্রনাথ মাস্টার মহাশয়কে বলিতেছেন, "আমার সম্বন্ধে এত তিনি (ঠাকুর) বললেন, কই আমার কি হলো!" শুনিয়া মাস্টার মহাশয় বলিলেন, "এখন শিব সেজেছ, পয়সা নেবার জো নেই। তোমার উপর সব ভার। তুমি মঠের ভাইদের মানুষ করবে।" তখন নরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "সাধন-টাধন আমরা যা করছি, এ সব তাঁর কথায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রামবাবু এই সাধন নিয়ে খোঁটা দেন। বলেন, তাঁকে দর্শন করেছি, আবার সাধন কি? কিন্তু আমাদের যে তিনি সাধন করতে বলেছেন।" পরে তিনি পুনরায় বলিলেন, "এক একবার খুব অবিশ্বাস আসে। যেন ঈশ্বর-টীশ্বর কিছুই নেই।" শুনিয়া মাস্টার মহাশয় কহিলেন, "ঠাকুর তো বলতেন, তাঁরও এরূপ অবস্থা এক একবার হতো।" তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন, "ধন্য তোমরা! রাত-দিন তাঁকে চিন্তা করছ!" ইহাতে নরেন্দ্রনাথ অশান্তভাবে উত্তর দিলেন, "কই? তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না বলে শরীর ত্যাগ করতে ইচ্ছা হচ্ছে কই?"

উক্ত বিষয়ে কথামৃতের (১৮৮৭, ৭ই মে তারিখের) আর একটি বর্ণনা এইরূপ। "নরেন্দ্রনাথ এখন ভক্তদের নেতা। ভগবান দর্শনের জন্য সকলেই ছট্‌ফট্ করিতেছেন। নরেন্দ্র (মাস্টার মহাশয়কে) বলিলেন, 'আমার কিছু ভাল লাগছে না। এই আপনার সঙ্গে কথা কচ্ছি, ইচ্ছা হয় এখুনি উঠে যাই।' কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, 'প্রায়োপবেশন করব।' 'ভগবান নেই বোধ হচ্ছে! যত প্রার্থনা করেছি, একবারও জবাব পাইনি।' 'কত দেখলাম, মন্ত্র সোনার অক্ষরে জ্বল জ্বল করছে।' 'কত কালীরূপ, আরও অন্যান্য রূপ দেখলাম! তবু শান্তি হচ্ছে না'।"

কথামৃতে প্রদত্ত (ঐ ৭ই মে তারিখেই) আরও একটি কথোপকথন এই। রাখাল (নরেন্দ্রকে) বলিলেন, "এখানে থেকে তো কিছু হলো না। চল, নর্মদায় বেরিয়ে পড়ি।" নরেন্দ্র জবাব দিলেন,

"বেরিয়ে কি হবে? জ্ঞান কি হয়? তাই জ্ঞান জ্ঞান করছিস।" শুনিয়া একজন ভক্ত বলিলেন, "(জ্ঞান যদি নাই হবে) তা হলে সংসার ত্যাগ করলে কেন?" নরেন্দ্র উত্তর দিলেন, "রামকে পেলাম না বলে শ্যামের সঙ্গে থাকবো—আর ছেলে মেয়ের বাপ হবো, এমন কি কথা!"

মনের উক্তরূপ ঘোর অশান্তি ও নৈরাশ্যের মধ্যে এই অটল নিষ্ঠা ও কৃচ্ছ্রসাধনের আকাঙ্ক্ষা—ইহাই নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার গুরুভাইদের যারপরনাই চঞ্চল ও অন্বেষণ-পরায়ণ করিয়া সারা ভারতের উপর ছড়াইয়া পড়িতে বাধ্য করিয়াছিল। পরবর্তী কয়েক অধ্যায়ে নরেন্দ্রনাথের ভারত ভ্রমণ কাহিনী লক্ষ্য করিবার কালে, আমরা এই বিষয়ের একটি পরিপূর্ণ ধারণা পাইব। এখন এখানে আমরা বরাহনগর মঠ সম্পর্কিত কয়েকটি অবশিষ্ট সংবাদ দিয়া বর্তমান অধ্যায়টি শেষ করিব।

১। বরাহনগরের জীর্ণ মঠবাড়ীটি কিরূপ ছিল, তৎসম্বন্ধে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ এইরূপ। বাড়ীটি একটি অতি পুরাতন ও ভগ্ন দ্বিতল বাড়ী। উহার নীচের তলা সাপ ও শৃগালের আবাসস্থল। উপরে উঠিবার সিঁড়ির ধাপগুলির খানিক আছে, খানিক পড়িয়া গিয়াছে। দোতলায় পাঁচ-ছয়খানি ঘর ও একটি বারান্দা—সবই জরাজীর্ণ। মেঝের খোয়া স্থানে স্থানে উঠিয়া গিয়াছে। দরজা-জানালাগুলির তক্তা কতক আছে, কতক নাই। ছাদের বরগাগুলি পড়িয়া গিয়াছে, বাঁশ চিরিয়া ইটগুলি কোনমতে রক্ষা করা হইয়াছে। বাড়ীর পশ্চাতে সবুজ শেওলাপূর্ণ একটি পচা পুকুর ও চতুর্দিকে জঙ্গল। এই বাড়ীটিকে লোকে মুন্সীদের ভূতের বাড়ী বলিত।

২। এই জীর্ণ সর্পসঙ্কুল বাড়ীটিতে নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সন্ন্যাসীগণ যে সম্বল লইয়া বাস করিতেন তাহা এই: (১) কৌপীন ও কয়েক খণ্ড গেরুয়া বস্ত্র; (২) থাকিবার লম্বা বড় ঘরটিতে বিস্তৃত দুই-তিনখানা মাদুর ও একখানি শতচ্ছিন্ন শতরঞ্চি; (৩) জপমালা, কয়েকখানা দেবদেবীর ছবি ও দেওয়ালে টাঙ্গানো একটি তানপুরা;

(৪) প্রায় একশত বই; এবং (৫) একখানা আস্ত কাপড় ও একখানা চাদর। কাহারও কোথাও যাইতে হইলে তিনি উহা পরিয়া যাইতেন। ইহা ব্যতীত, স্বামীজীর মধ্যম ভ্রাতা (মহেন্দ্রনাথ দত্ত) লিখিয়াছেন, 'এইকালে মঠবাসীদের মাথার বালিশ ছিল—চেটাইয়ে ঢাকা নরম নরম ইট। শীত করিলে তাঁহারা পরস্পরের গায়ে গা লাগাইয়া শুইতেন। অথবা তাহাতে শীত না গেলে, রাত্রিতে উঠিয়া একবার কুস্তি করিয়া শরীর গরম করিয়া লইতেন।'

৩। এই নিদারুণ অবস্থায় ঐ জীর্ণ ভাঙ্গা বাড়ীতে মঠবাসীগণ যে উদ্দাম ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনা করিতেন, তাহা আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। আবার ঐ সাধনারই অঙ্গস্বরূপ তাঁহারা সুযোগ ও অবসর মত নানা বিষয়ে শিক্ষাও লইতেন। এবং তাহাতে নরেন্দ্রনাথই ছিলেন অপর সকলের গুরু ও পরিচালক। জানা যায়, তিনি শরৎ মহারাজ ও অপর কয়েকজনকে গান শিখাইতেন এবং কালী মহারাজ তাঁহার নিকট বাজনা শিখিতেন। এইভাবে কেহ কেহ তাঁহার সাহায্যে কলাবিদ্যার চর্চাও করিতেন। এবং অনেকেই তাঁহার প্রেরণা ও পরিচালনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিতে রত হন। তিনি তাহাদিগকে ঐ সকলের প্রত্যেকটির সহিত অপরগুলির তুলনা করিয়া উহাদের ঐক্য ও পার্থক্য বুঝাইয়া দিতেন। আর বিশেষভাবে এইকালে তিনি বৌদ্ধ দর্শনের সহিত বেদান্ত দর্শনের তুলনা করিতে ও উহাদের মিল-অমিল নির্ধারণ করিতে নিযুক্ত হইয়া, অপর সকলকেও তাঁহার ঐ বিষয়ের আলোচনা-অনুসন্ধানের সঙ্গী করেন। ইহা ছাড়া আরও জানা যায়, খৃষ্টান মিশনারীগণ কখন কখন তাহাদের সহিত তর্ক করিতে মঠে আসিয়াছেন। তখন নরেন্দ্রনাথ ঐ মিশনারীদের তর্কের প্রত্যেক বিষয়ে পরাজিত করিয়া তাহাদের ও অপর সকলের নিকট ভগবান খৃষ্টের অপূর্ব মাহাত্ম্য কীর্তন ও ব্যাখ্যা করিতেন। তাঁহার এই প্রকারের সুযুক্তিপূর্ণ তর্ক-আলোচনা হইতেও তাঁহার গুরুভাইগণ অনেক মূল্যবান শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন।

৪। মঠে বাসকালে নরেন্দ্রনাথ যে পরিশ্রম করিতেন তাহা

অমানুষিক। তাঁহার প্রথম শিষ্য স্বামী সদানন্দ (ইহার কথা আমরা আগামী অধ্যায়ে পাইব) বলিয়াছেন, "এইকালে (১৮৮৮-৮৯) স্বামীজী সময়ে সময়ে একসঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টাকাল কাজ করিতেন। কর্মানুষ্ঠানে তিনি ছিলেন উদ্দাম—উন্মত্তপ্রায়। ভোরবেলা অন্ধকার থাকিতেই শয্যা ত্যাগ করিয়া তিনি গান গাহিয়া সকলকে আহ্বান করিতেন—'যারা অমৃত পান করিতে চাও তারা ওঠো—জাগো।' আবার দেখা যাইত, (সারাদিনের তপস্যাদি নিরবচ্ছিন্ন কর্মান্তে) তিনি দুপুররাত্রির পরেও তাঁহার গুরুভাইদের সহিত ছাদে বসিয়া ভগবৎসঙ্গীত গাহিতেছেন, অথবা সীতারাম বা রাধাকৃষ্ণের নাম কীর্তন করিতেছেন। (বস্তুতঃ) এই দিনগুলি ছিল তাঁহার পক্ষে বহু আয়াস-পরিশ্রমের দিন। বাহিরের লোক আসা-যাওয়া করিত, পণ্ডিতগণ তর্ক বিচার করিতেন,—নরেন্দ্রনাথ তাহাদের সকলের সঙ্গে কথা বলিতেন ও কখন ক্লান্তি বোধ করিতেন না।"

৫। আমরা দেখিয়াছি নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার দৃষ্টান্তে মঠের অপর সকলেই উন্মত্তের ন্যায় বেপরোয়াভাবে নিয়ত তপস্যাদি কর্মে নিযুক্ত থাকিতেন। ঐ প্রচণ্ড কর্মোন্মাদনা সর্বদা হৃদয়ে জাগরুক রাখিবার জন্য নরেন্দ্রনাথ নিজেকে ও মঠের অপর সকলকেই দানা-দৈত্য বলিতেন। এবং যে লম্বা বড় ঘরখানিতে তাঁহারা থাকিতেন, সেই ঘরটির নাম তাঁহারা রাখেন—"দানাদের ঘর"। এবং ঐভাবেই তাঁহারা মঠের সর্বদক্ষিণের ঘরটির নাম রাখেন—"কালী তপস্বীর ঘর"। যাঁহারা নির্জনে ধ্যান, ধারণা ও পাঠাদি করিতেন, তাঁহারা ঐ ঘরে গিয়া থাকিতেন। অধিকাংশ সময় কালী মহারাজ ঐ ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকিতেন বলিয়া উহার ঐ নাম রাখা হয়।

৬। বরাহনগর মঠ স্থাপিত হইলে, ঠাকুরের ব্যবহৃত কাপড়, জামা, বিছানা ও অপরাপর জিনিস-পত্র বলরামবাবুর বাড়ী হইতে সেখানে আনিয়া রাখা হয়। ঠাকুরের অস্থিপূর্ণ তাম্রকৌটাটি শ্রীশ্রীমা বৃন্দাবন যাইবার সময় সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি উহার নিত্য পূজা করিতেন। এক বৎসর পরে বৃন্দাবন হইতে

কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি উহা নরেন্দ্রনাথের হাতে দেন (১৮৮৮, ভাদ্র)। এবং তখন উহাও বরাহনগর মঠে রক্ষিত হয়।

৭। ঐকালে মঠে ঠাকুরের নিত্যপূজা ব্যতীত, তাঁহার জন্মতিথি পূজাও হইত। ঐ উপলক্ষ্যে সাধারণ উৎসব ঠাকুরের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তগণ সকলে মিলিয়া দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে করিতেন।

৮। মঠে ঠাকুরের পূজা ব্যতীত, হিন্দুদিগের প্রায় সমস্ত বার্ষিক পূজাই অনুষ্ঠিত হইত। এবং সময়ে সময়ে দুই-একটি বিশেষ পূজাও হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই মে তারিখে নরেন্দ্রনাথের আগ্রহে মঠে ৺কালীপূজা হয়। ঐ পূজায় বলিও হয়। এবং উহার সমস্ত খরচ সুরেশ মিত্র দেন। বাৎসরিক পূজোৎসবের মধ্যে, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মঠে যে শিবরাত্রির উৎসব হয়, তাহার একটি বিস্তৃত বিবরণ কথামৃতে পাওয়া যায়। এবং তাহা এইরূপ :

'আজ শিবরাত্রি। মঠের ভাইরা সকলেই উপবাস করিয়া আছেন। সকাল নয়টার সময় মাস্টার মহাশয় মঠে আসিয়া দানাদের ঘরে গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তারক (স্বামী শিবানন্দ) আনন্দে শিবের গান ধরিলেন—'তাথেইয়া তাথেইয়া নাচে ভোলা'। তখন তাঁহার সহিত রাখালও (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) যোগ দিয়া দুইজনে নৃত্য করিতে করিতে সম্পূর্ণ গানটি গাহিলেন।

'এই গানটি নরেন্দ্রনাথ (এই উপলক্ষ্যে) সবে বাঁধিয়াছেন। এইভাবে সেদিনকার সমস্ত দিবাভাগ শিবসঙ্গীত ও ধ্যান-জপাদিতে কাটিল। রাত্রে মঠের বেলতলায় শিবপূজার আয়োজন হইল। সেখানে মঠের ভাইদের একজন রাত্রি নয়টা হইতে প্রহরে প্রহরে পূজা করিতে লাগিলেন। চার প্রহরে চার পূজা। গভীর রাত্রে নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলে দাঁড়াইয়া নৃত্যগীত করিতে করিতে বার বার বিল্বমূল পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন ও মাঝে মাঝে সমস্বরে 'শিব গুরু! শিব গুরু!' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তখন চারিদিক অন্ধকার, জীবজন্তু সবই নিস্তব্ধ। ঐ নীরব গভীর নিশীথে গৈরিক বস্ত্রধারী

তরুণ তেজস্বী সন্ন্যাসীগণের কণ্ঠ-নিসৃত ঐ মহাধ্বনি মেঘগম্ভীররবে অনন্ত আকাশে উঠিয়া অখণ্ড সচ্চিদানন্দে লীন হইতে লাগিল। অরুণোদয়ের অল্পপূর্বে পূজা শেষ হইল। নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ব্রাহ্মমুহূর্তে গঙ্গাস্নান করিলেন। এবং তারপর সকলে মঠের ঠাকুর ঘরে গিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া দানাদের ঘরে আসিয়া বসিলেন।'

এই সময়ে নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া মাস্টার মহাশয় তাঁহার রূপের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য :

"নরেন্দ্র সুন্দর নব গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিয়াছেন। বসনের সৌন্দর্যের সঙ্গে তাঁহার মুখের ও দেহের তপস্যাসম্ভূত অপূর্ব স্বর্গীয় পবিত্র জ্যোতিঃ মিশিয়াছে। বদনমণ্ডল তেজঃপরিপূর্ণ, আবার প্রেমানুরঞ্জিত। যেন অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সাগরের একটি ফুট জ্ঞানভক্তি শিখাইবার জন্য দেব-দেহ ধারণ করিয়াছেন—অবতার লীলায় সহায়তার জন্য। যে দেখিতেছে, সে আর চক্ষু ফিরাইতে পারিতেছে না। নরেন্দ্রের বয়ঃক্রম ঠিক চতুর্বিংশতি বৎসর। ঠিক এই বয়সে শ্রীচৈতন্য সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন।"

আগামী অধ্যায়ে আমরা এই অপূর্ব-দর্শন মহাতেজস্বী তরুণ সন্ন্যাসীকে পরিব্রাজক সাধুরূপে তাঁহার প্রথম অভিযান উত্তর ভারত পরিক্রমায় নিযুক্ত দেখিতে পাইব।

পনর

ভারত পরিক্রমা

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যাত্রা

(১৮৮৮-৮৯)

(পরিব্রাজক বেশে—উত্তর ভারতে)

দেখা যায়, বরাহনগর মঠের তরুণ সন্ন্যাসীগণের তীর্থ-ভ্রমণের একটা মানসিক ঝোঁক প্রথম হইতেই প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করে। আমরা দেখিয়াছি ঠাকুরের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে, যোগীন মহারাজ, লাটু মহারাজ ও কালী মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে (১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ভাদ্র তারিখে) বৃন্দাবন যাত্রা করেন। সেখানে কালী মহারাজ দুই-তিন মাস, লাটু মহারাজ ছয়-সাত মাস এবং যোগীন মহারাজ পূর্ণ এক বৎসর বাস করেন।

ইঁহাদের পর তীর্থ ভ্রমণে বাহির হন (ইহাও আমরা দেখিয়া আসিয়াছি) স্বামী শিবানন্দ। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাস অন্তে কাশীপুরের বাগানবাড়ী ছাড়িয়া দেওয়া হইলে, তিনি বৃন্দাবন গিয়া মাসখানেক থাকেন ও তৎপর ৺কাশীধামে আসিয়া প্রায় দুই মাস কাল বাস করেন। তাহার পর স্বামীজীর আহ্বানে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া (বুড়োগোপালের সহিত) বরাহনগর মঠের প্রথম অধিবাসী হন।

উহার দুই-তিন মাস পরে, গঙ্গাধর মহারাজ (স্বামী অখণ্ডানন্দ) সর্বপ্রথম মঠ হইতে (সন্ন্যাসীর বেশে) তীর্থ ভ্রমণে বাহির হন (১৮৮৭, ফেব্রুয়ারী)। তিনি প্রথম বুদ্ধগয়া হইয়া কাশী যান। এবং তৎপর কাশী হইতে অযোধ্যা, নৈমিষারণ্য ও হরিদ্বার হইয়া হৃষীকেশ পৌঁছেন। সেখান হইতে তিনি পদব্রজে ও নিঃসম্বল অবস্থায় ডেরাডুন, মুসৌরী, টিহিরি, যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, চন্দ্রবন্দনী মহাপীঠ প্রভৃতি হইয়া কেদারনাথ ও বদ্রীনারায়ণ দর্শন করেন। বদ্রীনারায়ণ

হইতে তিনি মানা পাস দিয়া তিব্বতে প্রবেশ করেন ও সেখানে প্রায় তিন বৎসর থাকেন। মাত্র মাঝে দুইবার নিতি পাস দিয়া ভারতে আসিয়া হরিদ্বার কেদারবদ্রী, আলমোড়া, নৈনিতাল, রানীক্ষেত ইত্যাদি স্থান ঘুরিয়া তিব্বতে ফিরিয়া যান। পরিশেষে তিনি লাডাক হইয়া কাশ্মীরে আসেন। এবং সেখান হইতে (স্বামীজীর দর্শনার্থ) গাজীপুর ও কাশী হইয়া বরাহনগরে মঠে ফিরিয়া আসেন (১৮৯০, জুন)। এবং সেখানে মাত্র মাস দেড়েক থাকিয়া তিনি স্বামীজীর সহিত পুনরায় হিমালয় ভ্রমণে যাত্রা করেন (১৮৯০ জুলাই)। এই ভ্রমণের বিস্তৃত বিবরণ আমরা আগামী অধ্যায়ে পাইব।

গঙ্গাধর মহারাজের পর প্রথম যাঁহারা মঠ হইতে তীর্থভ্রমণে বাহির হন, তাঁহাদের নাম—নিরঞ্জন মহারাজ (পুরী, ১৮৮৭, অবস্থান কাল ফেব্রুআরি হইতে এপ্রিল), বাবুরাম মহারাজ, শরৎ মহারাজ ও কালী মহারাজ (পুরী, ১৮৮৭, অবস্থান কাল ফেব্রুআরি হইতে জুলাই)। এইভাবে ক্রমে ক্রমে, এক স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ব্যতীত, অপর সকলেই মঠ হইতে বাহির হইয়া ভারত-তীর্থের নানা দিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিলেন। তবে (ঠাকুরের ইচ্ছায়) মঠ তাঁহারা কখন একেবারে ছাড়েন নাই। কিছুকাল তপস্যা ও তীর্থভ্রমণের পর তাঁহারা আবার মঠে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এবং ঐভাবে তাঁহারা নিজেদের ঐক্য ও মঠের প্রতি আনুগত্য সযত্নে রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। পুনঃ পুনঃ বাহির হইয়াও কেহ ইহার অন্যথা করেন নাই।

আর ঐসঙ্গে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ (শশী মহারাজ) মঠের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরকে ছাড়িয়া কোথাও—কোনও তীর্থেই—যাইতে ইচ্ছা করেন নাই। এবং তিনি নিজে অত্যন্ত ধ্যান-পরায়ণ হইয়াও, একদিনের তরেও ঠাকুরের সেবার বিরতি বা অনিয়ম হইতে দেন নাই। তাঁহার এই অটল, অতুলনীয় নিষ্ঠার বলেই, তিনি নিশ্চল মহীরুহের ন্যায় নিরবচ্ছিন্নভাবে মঠে থাকিয়া মঠের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন ও প্রত্যাগত গুরুভাইদের আদর-অভ্যর্থনা করিয়াছেন। ইহা স্মরণ করিয়াই স্বামীজী

পরবর্তীকালে বলিয়াছেন, "শশীকে আমাদের মঠের central figure (কেন্দ্রস্বরূপ) বলে জানবি।" বাস্তবিক তাহার উপর তিনি অনেক ভরসা রাখিতেন। এবং তাহার দ্বারাই মঠ রক্ষা হইবে জানিয়াই, তিনি নিজে পরিশেষে দূর দিগন্তের অকূল জলরাশির অপর পারের অজানা কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিয়াছিলেন।

সেই অত্যদ্ভুত কাহিনীই এখন আমরা অনুসরণ করিব। স্বামীজী অন্তরের যে প্রেরণায় মঠ হইতে বাহির হন, তাহার মূলে ছিল (ইহা আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি) একটা দুর্নিবার অশান্তি ও অতৃপ্তি। তিনি প্রথম প্রথম মনে করিয়াছেন মঠের কর্ম-কোলাহল হইতে কোন সুদূর নির্জন স্থানে গিয়া অশ্রান্ত তপস্যা ও তৎপ্রসূত উপলব্ধির দ্বারা উহা তিনি দূর করিতে পারিবেন। কিন্তু আমরা দেখিতে পাইব তিনি তাহা পারেন নাই। যে নিবিষ্ট ও অবিশ্রান্ত তপস্যায় নিযুক্ত হইতে তিনি বারবার প্রয়াস পাইয়াছেন, একটা না একটা বাধা আসিয়া তাঁহাকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে। ক্রমে তিনি নিজেই পরিবর্তিত হইয়াছেন। অন্তরের গভীর হইতে গভীরে ডুবিয়া যাহা তিনি খুঁজিয়াছেন, তাহা রূপ হইতে রূপান্তর গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে পরিশেষে এক অনন্তবাধাপূর্ণ সুদুশ্চর বিরাট কর্মক্ষেত্রে ঠেলিয়া দিয়াছে। বস্তুতঃ সেই প্রসারিত অনন্ত কর্মক্ষেত্র হইতেই আহ্বান আসিতেছিল : 'তুমি এসো—তুমি এসো,—তোমার দেশ অধঃপতিত, জগৎ অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত, তুমি সিংহবিক্রমে তোমার নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়।' যে ভারতমাতার বক্ষ হইতে তিনি উত্থিত হইয়াছিলেন ঠাকুর উত্থিত হইয়াছিলেন, সেই মহামায়েরই এই নীরব অশ্রান্ত আহ্বান তাহার অন্তরে বাজিয়া বাজিয়া তাহাকে চঞ্চল ও অশান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কি চাই—কি চাই, কোথায় যাই—কি করি—কিসে শান্তি, নিশিদিন এই চিন্তা। তারপর (ঐ মায়েরই ইচ্ছায়) পরিব্রাজকরূপে ভারতবক্ষে ঘুরিতে ঘুরিতে এই আহ্বান যখন তাঁহার নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, তখন তিনি উহা আর অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই। বরং উহার সহিত মিশিয়া এক হইয়াছেন। ভারত

ও বিবেকানন্দ পৃথক নয়, একই। নূতন, জাগ্রত, উত্থিত ভারতের ঘনীভূত মূর্তিই হইতেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। ইহা আমরা ক্রমে বুঝিব।

এই আশ্চর্য পরিণতির নানা দিকের নানা খুঁটিনাটি আমরা পরে যথাস্থানসকলে দেখিতে পাইব। কিন্তু এখানে এখন প্রশ্ন এই: নিয়ত অধ্যাত্ম সাধনায় নিযুক্ত ও সর্বদা চরম অধ্যাত্ম উপলব্ধির জন্য ব্যাকুল স্বামীজীর জীবনে এই অপূর্ব ও অত্যাজ্য দেশাত্মবোধের বিকাশ কিভাবে সম্ভব হইয়াছিল? ইহার জন্য তিনি কবে, কোথায়, কি প্রস্তুতি লইয়াছিলেন? এই প্রশ্নের জবাবে যে সকল বাহ্য হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তাহা এই:

১। স্বামীজী যখন ছাত্র ছিলেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের অমর লেখনীতে দেশভক্তির যে অপূর্ব রূপ ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহা তিনি সাগ্রহেই আত্মস্থ করিয়াছিলেন।[১] বঙ্কিমের দৃষ্টিতে দেশ প্রকট জগন্মাতা, তাঁহার সেবা ঐ মহামায়েরই আরাধনা এবং তাঁহার জন্য প্রাণবিসর্জন ঐ মায়ের চরণেই আত্মবলিদান। স্বামীজীর দেশপ্রেমে আমরা বঙ্কিমের এই ভাব পূর্ণ বিকশিত দেখিতে পাই।

২। দ্বিতীয়তঃ, স্বামীজীর বিরাট সুকোমল হৃদয়ে সকলের ব্যথা-বেদনাই আপনা হইতেই প্রতিফলিত হইয়া উঠিত। তাই, ভারত ভ্রমণকালে তিনি ভারতবর্ষের অধিবাসীগণের—বিশেষতঃ নিম্ন শ্রেণীর লোকদের—যে দুঃখ-দুর্দশা দেখিয়াছেন, তাহা তাঁহার হৃদয়ে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। তিনি তখন হইতেই ভারতের সেবা ও

১। প্রসিদ্ধ বিপ্লবী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ লিখিয়াছেন, "১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী যখন ঢাকায় আসিয়াছিলেন, তখন আমরা ঢাকার কতিপয় যুবক তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। এবং তখন তিনি আমাদের বলিয়াছিলেন, 'বঙ্কিমচন্দ্র খুব ভাল করে পড়বে (Read Bankimchandra and Bankimchandra) ও তাঁহার প্রচারিত দেশভক্তির ভাব গ্রহণ করবে। তোমাদের কর্তব্য দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করা। ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম দরকার রাজনৈতিক স্বাধীনতা।' ইত্যাদি।"

কল্যাণসাধন তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠতম ব্রতরূপে গ্রহণ করেন এবং অপর সকলকেও ঐ ব্রত গ্রহণ করিতে আহ্বান করিতে থাকেন।

৩। তৃতীয়তঃ, ব্রহ্মজ্ঞ স্বামীজী সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করিয়া জীবের সেবা ও জীবকল্যাণ-সাধন ধর্মের একটা বড় দিক বলিয়া মনে করিতেন। এবং তৎসঙ্গে তিনি আরও বুঝিয়াছিলেন, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের প্রয়োজন জরুরী ও তাহার পুনরভ্যুত্থানেই জগতের কল্যাণ। ভারতের সনাতন ধর্ম, পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিকতা ও সর্বতোমুখী শান্তি-সমন্বয়ের বাণীই জগৎকে তাহার সমূহ ধ্বংসপথ হইতে রক্ষা করিতে পারে। তাই, সেজন্যও ভারতের নামে তাঁহার প্রাণ উথলিয়া উঠিত।

৪। পরিশেষে, আমরা দেখিয়াছি প্রাচীন ভারতের মূর্ত বিগ্রহ ঠাকুর স্বামীজীকে একান্তে ও অপর সকলের অজ্ঞাতে নানা উপদেশ ও শিক্ষা দিতেন। অনুমান করা যায়, তাহার ভিতরও সম্ভবতঃ এমন কিছু থাকিত যাহার অনিবার্য পরিণতি ছিল ভারতের সেবায় তাঁহার জীবনোৎসর্গ।

তবে শুধু যে এই সকল বাহ্য সহায়ের দ্বারাই স্বামীজীর অন্তরে ঐ অদৃষ্টপূর্ব দেশপ্রেম জাগিয়া উঠিয়াছিল, (খুব সম্ভবতঃ) ঠিক তাহাই নয়। কারণ দেখা যায়, তাঁহার ঐ প্রেম ছিল অপার্থিব ও অহেতুক। উহা তাঁহার আধ্যাত্মিক বিকাশের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক বিকাশ যখন চরমে উঠিয়াছে, তখন তাঁহার এই দেশপ্রীতিও তাঁহার ভিতর পূর্ণমাত্রায় দেখা দিয়াছে। তাই মনে হয়, তিনি ভারত ও জগৎ-কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত যে সকল শক্তি ও ভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তাঁহার জন্মভূমি ভারতের প্রতি এক অত্যাজ্য মমতার বীজও নিহিত ছিল। এবং তাহাই যথাসময়ে স্বাভাবিক ভাবেই বিকাশ লাভ করিয়াছে।[১]

১। এইরূপ অনুমান করিবার বিশেষ হেতু দেখা যায়। প্রাচীনতম বৈদিক যুগ হইতে ভারতের বক্ষে যে সকল ঋষি, মহাপুরুষ ও অবতারগণ নিরবচ্ছিন্ন ধারায় আসা যাওয়া করিয়াছেন এবং যাহাদের সহস্র সহস্র বর্ষব্যাপী

যাহা হউক, মুখবন্ধস্বরূপ এই কয়টি প্রাথমিক কথা বলিয়া, আমরা নিম্নে (যথাসম্ভব সংক্ষেপে) স্বামীজীর অপূর্ব ভারত-ভ্রমণ কাহিনী বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

১। প্রথম যাত্রা—উত্তর ভারত (১৮৮৮, ১ম ভাগ) :

তীর্থ দর্শনের উদ্দেশ্যে স্বামীজী বরাহনগর মঠ হইতে সর্বপ্রথম যাত্রা করেন ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে। সঙ্গে স্বামী প্রেমানন্দ ও (ঠাকুরের গৃহীভক্ত) ফকিরবাবু। এইবার তিনি কেবলমাত্র ৺কাশীধামে যান ও সেখানে দ্বারকাদাসের আশ্রমে প্রায় সাত দিন থাকেন।

আধ্যাত্মিক ভারতের হৃদ্‌পিণ্ডস্বরূপ ৺কাশীধামে বাঙ্গালী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, দক্ষিণী, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি সারা ভারতের লোক বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণার চরণে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই মহামানব-সঙ্গমে স্বামীজী (নানা দেশীয়) অগণিত ভক্ত ও সাধুসন্ন্যাসীগণের মধ্যে থাকিয়া গঙ্গাস্নান, দেবমন্দির দর্শন, সাধুসঙ্গ, এবং ধ্যান, জপ, ও শাস্ত্রচর্চাদিতে দিন কাটাইতে লাগিলেন। এখানে তিনি ভিক্ষান্নে উদর পূরণ করিতেন এবং দিনান্তে গঙ্গাতীরের সোপানোপরি বসিয়া কথকের মুখে শাস্ত্রব্যাখ্যা ও (বহু দেবদেবীর মন্দির হইতে আগত) সায়ংকালীন শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি শুনিতে শুনিতে সারাভারতের স্পর্শ অনুভব করিতেন ও ভক্তি-দ্রব চিত্তে তাহার চিন্তায় বিভোর হইতেন।

তপস্যার ফলে স্বয়ং জগন্মাতা ভারতের অন্তরাত্মারূপে অবস্থিতা (এ বিষয়ে গোড়ার দিকের "ভারতের আত্মা" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য), স্বামীজী তাহাদেরই একজন নিত্যমুক্ত অন্যতম ঋষি। বিধাতার ইচ্ছায় বহুবার ভারতে অবতীর্ণ হইয়া তপস্যা করিয়াছেন ও তাহার কল্যাণ-সাধনে জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন। তাই, ভারত-প্রীতির বীজ তাঁহার আধ্যাত্মিক সত্তার সহিত চির-বিজড়িত এবং যখনই প্রয়োজন হইয়াছে তখনই তাহা তাঁহার ভিতর বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। আবার প্রয়োজনমাত্রে তাঁহার মন ঐ অবস্থা অতিক্রম করিয়া এত ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে—যেখানে সবই এক।

এইবার কাশীতে স্বামীজী সুবিখ্যাত সাধু ত্রৈলঙ্গ স্বামী ও ভাস্করানন্দ স্বামীকে দর্শন করেন। এবং একটি ভদ্রলোকের দ্বারা বাংলার প্রসিদ্ধ মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সহিত পরিচিত হন। স্বামীজীর সহিত ধর্ম, সমাজনীতি ও ভারতের উন্নতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলাপ করিয়া ভূদেববাবু বিশেষ মুগ্ধ হন এবং উক্ত ভদ্রলোকটির দিকে চাহিয়া বলেন, "আমি অবাক হচ্ছি, এই অল্প বয়সে ইনি কি করে এত অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করলেন! ইনি নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতে একজন মহৎ ব্যক্তি হবেন।"

কাশীতে এইবারের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই। স্বামীজী একদিন দুর্গাবাড়ী গিয়া মা-দুর্গাকে দর্শন করিয়া যখন ফিরিতেছিলেন, তখন একদল বানর তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করে। ভয়ে তিনি দৌড়াইতে আরম্ভ করেন। ঐ সময়ে একটি বৃদ্ধ সাধু তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, "থামো, জানোয়ারগুলোর দিকে রুখে দাঁড়াও!" শুনিয়া স্বামীজী ফিরিয়া রুখিয়া দাঁড়াইতেই বানরগুলি পলাইয়া গেল। পরবর্তীকালে তিনি আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে তাঁহার এক বক্তৃতায় এই ঘটনাটি বর্ণনা করিয়া বলেন, "(এইভাবে) প্রকৃতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও! অজ্ঞানের বিরুদ্ধে, মায়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও! আর কখন পালাবে না।"

যাহা হউক, উক্তরূপে প্রায় এক সপ্তাহকাল কাশীতে বাস করিয়া স্বামীজী বরাহনগর মঠে ফিরিয়া আসিলেন। এবং সেখানে তিনি পূর্বের ন্যায় ধ্যান, জপ, পূজা, পাঠ, সঙ্গীত ও আলোচনায় দিন কাটাইতে লাগিলেন। তবে কাশী দর্শন করিয়া তাঁহার দৃষ্টি-পরিধি অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল। এবং তাঁহার গুরুভাইদের দৃষ্টিও ঐরূপ উদার ও সুপ্রসারিত হউক, এই ইচ্ছা তাঁহার হইতে লাগিল। এখন তিনি ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থার একটু আভাস পাইয়াছেন। এবং তাহা হইতেই ঐকালে তাঁহার মনে কখন কখন আপনা হইতেই মহাদুঃখ-সাগরে নিমগ্ন নিম্নশ্রেণীর ভারতবাসীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে আকাঙ্ক্ষা জাগিত। এবং তিনি তাঁহার গুরুভাইদিগকেও

অস্পৃশ্যদের গ্রামে গিয়া নারায়ণ-জ্ঞানে তাহাদের সেবা করিতে ও তাহাদের নিকট বেদান্তের অভয়বাণী প্রচার করিতে বলিতেন!

২। দ্বিতীয় যাত্রা—উত্তর ভারত (১৮৮৮, জুলাই-আগস্ট) :

এইকালে স্বামীজীর মনে উক্ত প্রকার ভাব সকল মাঝে মাঝে জাগরিত হইলেও, নিঃসঙ্গ ও তপস্যাপরায়ণ পরিব্রাজক জীবনের জন্য তাঁহার প্রাণ ছিল যারপরনাই ব্যাকুল। তাই, তিনি এইবার মঠে অল্প কিছুদিন থাকিয়াই পুনরায় তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইলেন (১৮৮৮, জুলাই-আগস্ট)।

মঠ হইতে যাত্রা করিয়া স্বামীজী সর্বপ্রথম পুনর্বার ৺কাশী দর্শন করিলেন। এইবার সেখানে তাঁহার শ্রীযুত প্রমদাদাস মিত্রের সহিত পরিচয় হয়। প্রমদাবাবু সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রাদিতে সুপণ্ডিত ছিলেন। এবং স্বামীজীর কথা তিনি পূর্বেই স্বামী অখণ্ডানন্দের নিকট শুনিয়াছিলেন। প্রথম সাক্ষাতের পর তাঁহারা উভয়েই অতি অল্পেই পরস্পরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল হইয়া উঠিলেন। এবং দেখা যায়, তীর্থ ভ্রমণকালে স্বামীজী প্রমদাবাবুকে পরমহিতৈষী জ্ঞানে তাঁহার সহিত নানাস্থান হইতে নানাবিষয়ে পত্রালাপ করিয়াছেন এবং কখন কখন শাস্ত্রার্থ-ব্যাখ্যায় তাঁহার মত ও উপদেশ চাহিয়াছেন।

কাশী হইতে স্বামীজী অযোধ্যায় যান। সেখানে তিনি কয়েক দিন থাকিয়া বিভোর চিত্তে রামসীতার অনুধ্যান করেন ও রামাইত সন্ন্যাসীগণের মুখে তাঁহাদের মধুর নামকীর্তন শুনিয়া বিশেষ মুগ্ধ ও আনন্দিত হন।

অযোধ্যা হইতে স্বামীজী লক্ষ্ণৌ ও আগ্রা হইয়া বৃন্দাবন যান। লক্ষ্ণৌয়ে তিনি তথাকার বিখ্যাত উদ্যান, মসজিদ ও (অযোধ্যার নবাবদিগের) প্রাসাদাবলী দেখিয়া ঐ সকলের বিশেষ প্রশংসা করেন। আগ্রায় তাজমহল দেখিয়া তিনি উচ্ছ্বসিত হন। উহা তিনি কয়েকবার দর্শন করেন এবং উহার সম্বন্ধে বলেন, "এই অদ্ভুত স্মৃতিসমাধিটির প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চির ভাব-বিকাশক সৌন্দর্য

বুঝিতে একটি পূর্ণ দিনের আবশ্যক এবং অন্ততঃ ছয় মাসের কমে সম্পূর্ণ সৌধটির অধ্যয়ন-কার্য শেষ করা অসম্ভব।" তাজমহল ব্যতীত, আগ্রার বিরাট দুর্গ, প্রাসাদ ও কবরাদিও তিনি দর্শন করেন। ফলে, আগ্রায় থাকাকালে মুসলমান রাজত্বের সমগ্র ইতিহাস তাঁহার মনের মধ্যে খেলা করিতে থাকে।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের প্রথম দিকে স্বামীজী পদব্রজে আগ্রা হইতে (ত্রিশ মাইল দূরবর্তী) বৃন্দাবন অভিমুখে রওনা হন। তখন তাঁহার সম্বল মাত্র দণ্ড, কমণ্ডলু ও দুই-একখানা বই। যখন বৃন্দাবন পৌঁছিতে আর মাত্র মাইল দুই বাকী, তখন তিনি একস্থানে দেখিলেন একটি লোক বেশ আরামের সহিত তামাক খাইতেছে। পথশ্রান্ত স্বামীজীর ইচ্ছা হইল লোকটির নিকট হইতে কলিকাটি চাহিয়া লইয়া দুই-এক টান তামাক খান। কিন্তু উহা চাহিতেই সে বলিল, "মহারাজ, মঁয় ভাঙ্গী (মেথর) হ্যায়।" শুনিয়া স্বামীজীও সংস্কারবশে পিছাইয়া আসিলেন ও তামাক না খাইয়াই পুনরায় পথ চলিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তাঁহার মনে হইল, "এ কি করলাম! আমি জাত, কুল, মান সব ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছি, আর ও নিজেকে ভাঙ্গী বলে পরিচয় দিতেই আমি সরে এলাম! এ আমার পূর্ব-সংস্কারের ফল।" এইরূপ চিন্তা করিয়াই তিনি ফিরিলেন এবং দ্রুতপদে পুনরায় ঐ ভাঙ্গীর নিকট গিয়া তাহাকে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া দিতে বলিলেন। ভাঙ্গী পূর্বের ন্যায় আপত্তি করিল। কিন্তু স্বামীজী এইবার আর তাহা শুনিলেন না। এবং তাহার দ্বারা এক কলিকা তামাক সাজাইয়া সাগ্রহে ধূমপান করিলেন ও তৎপর পুনরায় বৃন্দাবনের দিকে চলিতে লাগিলেন।

বৃন্দাবন পৌঁছিয়া স্বামীজী বলরামবাবুদের কালাবাবুর কুঞ্জে উঠিলেন। রাধাকৃষ্ণের স্মৃতিপূতঃ বৃন্দাবনধামে তাঁহার মন ভাব-ভক্তিতে ভরিয়া উঠিলেও, শহরটি তাঁহার তত ভাল লাগিল না। তাই, তিনি সত্বরই শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত কৃষ্ণরাধার লীলাস্থানগুলি দর্শন করিতে ছুটিলেন। ঐ দর্শনকালের দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই :

(১) গিরি গোবর্ধন পরিক্রমণকালে স্বামীজী সঙ্কল্প করিলেন যে, অযাচিতভাবে যে আহার জুটিবে মাত্র তাহাই তিনি গ্রহণ করিবেন। পথ চলিতে চলিতে প্রথম দিন দুপুর বেলাতেই তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত বোধ করিতে লাগিলেন। তাহারই মধ্যে আবার প্রবল বৃষ্টি আসিয়া তাঁহার কষ্ট আরও বাড়াইয়া তুলিল। তাহা হইলেও তিনি কিছু গ্রাহ্য না করিয়া নীরবে পথ চলিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় তিনি একস্থানে হঠাৎ শুনিতে পাইলেন, পিছন হইতে কে যেন তাঁহাকে ডাকিতেছে। কিন্তু সে দিকে না তাকাইয়া তিনি আপন মনে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। এদিকে পিছনের লোকটি ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিল যে, সে তাঁহার জন্য খাবার লইয়া আসিয়াছে। শুনিয়া স্বামীজী দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন। উদ্দেশ্য, তিনি বুঝিয়া লইবেন ঐ খাবার ঈশ্বরের প্রেরিত কিনা? যাহা হউক, তাঁহাকে দৌড়াইতে দেখিয়া, ঐ লোকটিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইতে লাগিল। এবং ঐভাবে প্রায় এক মাইল পথ আসিয়া সে স্বামীজীকে ধরিল ও তাঁহাকে ঐ খাবার খাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। পরিশেষে স্বামীজী উহা গ্রহণ করিলেন। দেখিয়া লোকটি আর একটি কথাও না বলিয়া চলিয়া গেল। তখন স্বামীজীও বিহ্বল হইলেন। জনমানবহীন পাহাড়-জঙ্গলেও ভগবান কিভাবে তাঁহার ভক্তকে রক্ষা করেন তাহার এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া তিনি অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

(২) গোবর্ধন পর্বত হইতে স্বামীজী রাধাকুণ্ডে যান এবং দ্বিতীয় ঘটনাটি সেখানেই ঘটে। স্বামীজীর এই সময়ে এক কৌপীন ব্যতীত অপর কোন পরিধেয় ছিল না। তাই, তিনি উহা ধুইয়া রাধাকুণ্ডের পাড়ে শুকাইতে দিয়া কুণ্ডে স্নান করিতে নামিলেন। স্নানান্তে তিনি দেখিলেন তাঁহার কৌপীন সেখানে নাই। তখন এদিক-ওদিক খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন একটি বানর উহা লইয়া একটি গাছের উপর বসিয়া আছে। তিনি অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেও বানর উহা ফিরাইয়া দিল না। সম্পূর্ণ নগ্নাবস্থায় কি করিয়া লোকালয়ে

ভ্রমণ করিবেন, ইহা ভাবিয়া তিনি আকুল হইলেন। এই অবস্থায় শ্রীশ্রীরাধারাণীর উপর তাঁহার অত্যন্ত রাগ ও অভিমান হইল। কারণ, (ভক্তদের দৃষ্টিতে) রাধাকুণ্ড এবং সমগ্র বৃন্দাবনই রাধারাণীর এলাকা। সেখানে তিনি যাহা করেন বা করান তাহাই হয়। এই বিশ্বাসে স্বামীজী অভিমানভরে প্রতিজ্ঞা করিলেন, তিনি গভীর জঙ্গলে গিয়া পরিধানের বস্ত্র না পাওয়া পর্যন্ত প্রায়োপবেশন করিয়া থাকিবেন। এবং কোনরূপ বিলম্ব না করিয়া তিনি তখনই নিকটবর্তী এক নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন একটি লোক একখানি নূতন গেরুয়া বস্ত্র ও কিছু খাবার লইয়া দ্রুতপদে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং তাঁহার অনুরোধে স্বামীজী ঐ সব দ্রব্য গ্রহণ করিলে, তিনি ঘন বনের মধ্যে অদৃশ্য হইলেন। স্তব্ধ ও বিস্মিত স্বামীজী ঐ নূতন গৈরিক বস্ত্র পরিয়া রাধাকুণ্ডের পারে ফিরিয়া আসিলেন এবং সেখানেও আশ্চর্য হইয়া দেখিলেন তাঁহার অপহৃত কৌপীন তিনি যেখানে শুকাইতে দিয়াছিলেন সেইখানেই রহিয়াছে। (তখন ভক্তি-উথলিত চিত্তে) বুঝিলেন এই ক্ষুদ্র ঘটনাটির দ্বারা স্বয়ং রাধারাণীই তাহাকে তাঁহার মাহাত্ম্য দর্শাইয়া দিলেন।

বৃন্দাবন হইতে স্বামীজী হরিদ্বার যাইবার পথে হাতরাস রেল স্টেশনে আসেন। সেখানে ভোর বেলায় তিনি একটি বৃক্ষতলে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে সেখানকার স্টেশন মাস্টার শরচ্চন্দ্র গুপ্ত তাঁহার জ্যোতির্ময় চেহারায় আকৃষ্ট হইয়া নিকটে আসিয়া তাঁহার পায়ের ধূলি লইলেন ও তিনি অত্যন্ত শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত জানিয়া তাঁহাকে তাহার বাসায় (রেলকর্মচারীর কোয়ার্টার্স) আসিয়া স্নানাহার করিতে অনুরোধ করিলেন। স্বামীজী সম্মত হইয়া তাহার সহিত তাহার বাসায় গেলেন। শরচ্চন্দ্র ছিলেন জৌনপুরী বাঙ্গালী, মাতৃভাষা বাংলার চাইতে হিন্দীই ভাল বলিতেন। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অধরচন্দ্র গুপ্ত অনেক পূর্বে সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছিলেন। এবং তিনি নিজেও অত্যন্ত তেজস্বী, বৈরাগ্যপরায়ণ ও মিষ্টস্বভাবের লোক

ছিলেন। স্বামীজীকে দেখিয়া ও তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া তিনি যারপরনাই মুগ্ধ হইলেন। তাই স্বামীজী আহারাদি করিয়া ও বিশ্রাম লইয়া সুস্থ হইলে, তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি আমাকে শিষ্য করে সঙ্গে নিয়ে চলুন"। শুনিয়া স্বামীজী কোন সিধা উত্তর না দিয়া আপন মনে একটি গান গাহিতে লাগিলেন।১ উহার ভাবার্থ এই—'আমার ভালবাসা যদি পেতে চাও, তা হলে তোমার সুন্দর মুখখানিতে ছাই মেখে এস।' গানটি শুনিয়া শরচ্চন্দ্র তখনই ভিতরে গিয়া উনুন হইতে কিছু ছাই লইয়া মুখে মাখিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার আন্তরিকতা দেখিয়া স্বামীজী বিস্মিত হইলেন। কিন্তু তখন মুখে আর কিছু বলিলেন না।

ইহার পর শরচ্চন্দ্রের সহিত কথাবার্তা হইতে স্বামীজী জানিতে পারিলেন যে, ব্রজেনবাবু নামে তাঁহার একজন পূর্বপরিচিত লোক নিকটেই থাকেন। সংবাদটি পাইয়া তিনি তখনই তাহার সহিত দেখা করিতে গেলেন। ব্রজেনবাবু তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন ও তাহার কাছে থাকিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। স্বামীজী পরিশেষে তাহার বাড়ীতেই রহিয়া গেলেন। সেখানে তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রতিদিন হাতরাসের সমস্ত বাঙ্গালী অধিবাসী যেন ভাঙ্গিয়া পড়িত। শরচ্চন্দ্র ও তাহার বন্ধু নটকৃষ্ণ নিয়ত সেখানে যাইতেন। ঐ সময়ের অবস্থা সম্পর্কে নটকৃষ্ণ লিখিয়াছেন, "এইরূপে অপর সকলের সহিত আমরা তাঁহার সঙ্গে আধ্যাত্মিক কথাবার্তায় আমাদের জীবনের সর্বাপেক্ষা আনন্দের দিনগুলি কাটাইয়াছি। তাঁহার পবিত্র সংসর্গ-প্রভাবে এখানকার বাঙ্গালীদের মধ্যে সর্বপ্রকার দলাদলি রেষারেষির অবসান হয়। যাহারা বয়স্ক বা পদস্থ লোক তাহারাও এই তরুণ সন্ন্যাসীর নিকটে বসিয়া শিশুর মত তাঁহার কথা শুনিতেন ও ধর্মবিষয়ে নানা প্রশ্ন করিতেন। সায়ংকালটি সাধারণতঃ গানেই অতিবাহিত হইত এবং সমাগত ভদ্রলোকগণ

১। গানটি এই—"বিদ্যা পেতে চাও যদি চাঁদ, চাঁদমুখে ছাই মাখ, নইলে এই বেলা পথ দেখ।" (বিদ্যাসুন্দর)

মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহার অপূর্ব কণ্ঠের সঙ্গীত শুনিতেন। এবং যত শুনিতেন তত তাহাদের আরও শুনিতে ইচ্ছা হইত।"

হাতরাসে শরচ্চন্দ্র একদিন স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনাকে আজ এত বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন?" উত্তরে স্বামীজী বলেন, "বাছা, আমার একটা খুব বড় কর্তব্য সম্পন্ন করতে হবে, কিন্তু আমার শক্তির স্বল্পতার জন্য আমি হতাশ বোধ করছি। এই কাজ করবার জন্যে আমার গুরু আমাকে আদেশ করেছেন। এবং সে কাজ হচ্ছে আমার মাতৃভূমির পুনরুত্থান-সাধন। দেশে আধ্যাত্মিকতার চরম অবনতি ঘটেছে, আর সর্বত্রই লোকে অনাহারে কষ্ট পাচ্ছে। তাই, ভারতবর্ষকে এখন গতিশীল (dynamic) হতে হবে এবং তার আধ্যাত্মিকতার দ্বারা সমগ্র পৃথিবী জয় করতে হবে।" শরচ্চন্দ্র মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার এই কথাগুলি শুনিয়া আবেগের সহিত বলিলেন, "স্বামীজী, আমি আপনার কাজের সহায় হব। কি করতে হবে বলুন?" স্বামীজী কঠিন হইয়া জানিতে চাহিলেন, "তুমি ভিক্ষাপাত্র ও কমণ্ডলু মাত্র সম্বল করে এই মহৎ কাজের জন্য খাটতে রাজি আছ কি? তুমি দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা করতে পার কি?" নির্ভীক শরচ্চন্দ্র বলিলেন, "পারি।" এবং বলিয়াই তিনি একটি ভিক্ষাপাত্র লইয়া স্টেশনের কুলীদের নিকট ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়া গেলেন।

ইহার পর একদিন সকালবেলায় স্বামীজী হাতরাস ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া শরচ্চন্দ্র ও নটকৃষ্ণকে বলিলেন, "এখানে আমি আর থাকতে পারছি না। সন্ন্যাসীদের এক জায়গায় বেশীদিন থাকতে নেই। তা ছাড়া, তোমাদের উপর আমার মনে একটা টান বোধ করছি। আধ্যাত্মিক জীবনে এও এক বন্ধন। আমাকে থাকার জন্যে আর বলো না।" স্বামীজীকে তাঁহার সঙ্কল্প হইতে আর টলান যাইবে না বুঝিয়া, শরচ্চন্দ্র ও নটকৃষ্ণ অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং যাইবার পূর্বে তাহাদিগকে শিষ্য করিয়া লইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ

করিলেন। উত্তরে স্বামীজী বলিলেন, "আমার শিষ্য হলেই যে সব লাভ হবে তা নয়। সকল বিষয়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করে চললেই তোমাদের উন্নতি হবে। তোমরা দুঃখিত হয়ো না। আমি উপস্থিত কেদার-বদ্রী যেতে ইচ্ছা করেছি। সেখান থেকে ফিরে আমি আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা করব।" কিন্তু শরচ্চন্দ্র কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না। তাই, স্বামীজী পরিশেষে তাহাকে দীক্ষা দিতে বাধ্য হইলেন।

দীক্ষার পর শরচ্চন্দ্র তাহার স্টেশন মাস্টারের কাজের ভার অপর একজনের উপর দিয়া, স্বামীজীর সহিত সন্ন্যাসীর বেশে হৃষীকেশ যাত্রা করিলেন। সাহারানপুর পর্যন্ত রেল গাড়িতে গিয়া, তাঁহারা সেখান হইতে হাঁটিয়া চলিলেন। দুইজনেই তরুণ, স্বাস্থ্যবান ও সমবয়সী। কিন্তু শরচ্চন্দ্র চিরদিন আরামে থাকিতেই অভ্যস্ত ছিলেন। তাই, সন্ন্যাসী-জীবনের নিরবচ্ছিন্ন কষ্ট ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ভ্রমণ করা তাহার পক্ষে খুবই ক্লেশকর হইল। ফলে দেখা যায়, এইকালে তাহার গুরুকেই মাঝে মাঝে তাহার সেবায় নিযুক্ত হইতে হইয়াছে। পরবর্তীকালে এই বিষয়ে শরচ্চন্দ্র অসীম কৃতজ্ঞতার সহিত নিজেই বলিয়াছেন, "হিমালয়ের সন্নিকটস্থ স্থান-সমূহে ভ্রমণকালে আমি একদিন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলাম। তখন স্বামীজীই আমার যত্ন নিয়ে আমার জীবন রক্ষা করেন। আর একবার তিনি সহিসের মত ঘোড়ার লাগাম ধরে আমাকে একটা খরস্রোতা পার্বত্য নদী পার করে দেন। আমার জন্য কয়েকবার তিনি নিজ জীবন বিপন্ন করেন। বস্তুতঃ তিনি যেন মূর্তিমান ভালবাসাস্বরূপ ছিলেন। একবার পথের মাঝে অসুস্থতার জন্য আমি কিছু বইতে অসমর্থ হলে, তিনি আমার জুতা সহ সমস্ত জিনিস নিজে বয়ে নিয়েছিলেন।"

তাঁহাদের এই ভ্রমণকালের আর একটি কাহিনী এই। একদিন জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে তাঁহারা দেখিলেন, সামনে কয়েকখানা রক্তমাখা মানুষের হাড় ও এখানে সেখানে ছড়ান কতকগুলি গেরুয়া কাপড়ের টুকরা। দেখিয়াই স্বামীজী বলিলেন, "দেখ, এখানে

একটি সন্ন্যাসীকে বাঘে খেয়েছে! তোমার কি ভয় হচ্ছে?" শরচ্চন্দ্র কোন ইতস্ততঃ না করিয়া উত্তর দিলেন, "না স্বামীজী, আপনি সঙ্গে থাকতে আবার ভয় কি?" বস্তুতঃ উত্তম গুরুর ন্যায় চির-নির্ভীক স্বামীজী যেমন তাঁহার শিষ্যের জন্য সব কিছু করিতে প্রস্তুত ছিলেন, শরচ্চন্দ্রও তেমনি শিষ্য হিসাবে ছিলেন অনুপম—একটি নির্মল, নিখুঁত নিবেদিত কুসুমের মত। স্বামীজীর উপর তাহার আস্থা ও ভালবাসার কোন সীমা ছিল না। এবং পরবর্তীকালে তিনি দৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন, "আমি জন্মেছি স্বামীজীর সেবা করবার জন্যে। আমি জগতে আর কিছু জানি না।"

যাহা হউক, হৃষীকেশ পৌঁছিয়া গুরু ও শিষ্য উভয়েই কঠোর তপস্যায় দিন কাটাইতে লাগিলেন। স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল তিনি হৃষীকেশে কিছুদিন থাকিয়া কেদার-বদ্রী যাইবেন। কিন্তু তাহা আর হইল না। শিষ্য শরচ্চন্দ্র অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ায়, তিনি বাধ্য হইয়া তাহাকে লইয়া হাতরাসে ফিরিয়া আসিলেন। এবং সেখানে আসিয়া তিনি নিজেও ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। সংবাদ পাইয়া বরাহনগর মঠ হইতে তাঁহার গুরুভাইগণ তাঁহাকে অবিলম্বে মঠে ফিরিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তাই, তিনি একটু সুস্থ হইয়াই হাতরাস হইতে বরাহনগর মঠের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। এবং শিষ্য শরচ্চন্দ্রকেও আরোগ্য লাভ করিয়া সেখানে যাইতে উপদেশ দিয়া গেলেন (১৮৮৮, নভেম্বর)।

কয়েকমাস পরে শরচ্চন্দ্র সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইলেন। তখন তিনি তাহার চাকরিতে ইস্তফা দিয়া বরাহনগর মঠে আসিয়া গুরুর সহিত মিলিত হইলেন। সেখানে তাহার সন্ন্যাস নাম হইল স্বামী সদানন্দ।

এইবার স্বামীজী মঠে ফিরিলে (১৮৮৮, নভেম্বর), তাঁহার গুরুভাইগণ অনেক দিন পরে তাঁহাকে পাইয়া এক আনন্দোৎসবের দ্বারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। ঐ সময়ে মঠের অধিকাংশ সাধু তীর্থ ভ্রমণে বাহিরে থাকিলেও, গৃহীভক্তগণের প্রায় সকলেই উপস্থিত

ছিলেন। ইহার পর স্বামীজী কিঞ্চিদধিক এক বৎসর কাল মঠে থাকেন (১৮৮৮, নভেম্বর হইতে ১৮৮৯, ডিসেম্বর পর্যন্ত)।[১] এবং তখন পূর্বের ন্যায় তাঁহার নেতৃত্বে মঠের দিনগুলি ধ্যান, জপ, পূজা, পাঠ ও সঙ্গীত ইত্যাদিতে কাটিতে লাগিল। তবে এইবার তিনি হিন্দুশাস্ত্র সমূহের এবং বিশেষভাবে উপনিষদ্ ও উহার শঙ্কর-ভাষ্যের অতি নিবিষ্ট অধ্যয়ন-আলোচনায় নিযুক্ত হইলেন। এবং তজ্জন্য (বই কিনিবার অর্থাভাবে প্রার্থনা জানাইয়া) তিনি কাশীর প্রমদাবাবুর নিকট হইতে বেদান্ত ও বেদ অধ্যয়নের নিমিত্ত পানিনি ব্যাকরণ দানস্বরূপ প্রাপ্ত হন। ইহা ব্যতীত, তিনি এইকালে হিন্দু-সমাজের জাতিভেদ, শূদ্রদিগের বেদপাঠের অধিকার ও অপর কয়েকটি বিষয়ে শাস্ত্রের অযৌক্তিক বা পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তিসকল সম্বন্ধেও একটি যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে আসিতে প্রয়াস পান। ইহার হেতু এই। উত্তর ভারতের যে অংশ তিনি ইতিপূর্বে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি দেখিতে পান, বিরাট ও কোন নির্দিষ্ট সীমাহীন হিন্দুসমাজের বিভিন্ন স্থানের লোকদের ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি ও অনুষ্ঠানাদি শুধু যে বিভিন্ন, ভেদ-বৈষম্যপূর্ণ ও নানা বিষয়ে পরস্পর বিরোধী, তাহা নয়। এই সমাজের বিশাল জনসমষ্টি (যাহাদের আমরা অস্পৃশ্য ও নিম্নশ্রেণীর লোক বলি) সমাজের নানা অন্যায় ও আত্মঘাতী ব্যবস্থার ফলে নিষ্পিষ্ট, অজ্ঞানে নিমজ্জিত ও সকল দিক দিয়াই চির-বঞ্চিত। দেখিয়া তাঁহার উদার, বিশাল, দয়াঘন হৃদয়ে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সুতীব্র প্রতিবাদ উত্থিত হয়। এবং তিনি উহার আমূল প্রতিকারে বদ্ধপরিকর হন। ধীরভাবে সকল দিক বিচার-বিবেচনা করিয়া তিনি বুঝিলেন যে, একমাত্র গীতা-উপনিষদের

১। জানা যায়, ১৮৮৯ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বামীজী শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের জন্মভূমি জয়রামবাটী দর্শনে যান। এবং ঐ সনের গ্রীষ্মকালে তিনি স্বাস্থ্যোদ্ধার ও আত্মীয় দর্শনের জন্য কিছুদিন শিমুলতলায় থাকিয়া আসেন। ইহা ব্যতীত, তিনি (সম্ভবতঃ নিজ বাড়ীর কাজে) কিছুদিন কলিকাতায় বলরাম বাবুর বাড়ীতেও ছিলেন।

অজ্ঞানবিনাশী ও মহাবীর্যপ্রদ সত্যসকল ভারতের উচ্চ-নীচ সর্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে অবাধ প্রচারের দ্বারাই এই অন্ধ, ভ্রান্ত, তন্দ্রাচ্ছন্ন, আত্মঘাতী সমাজকে রক্ষা করা যাইতে পারে। এবং প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রস্তুতি হিসাবেই তিনি উক্তরূপে বেদান্ত-দর্শন প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রসকল অধ্যয়ন করিতে রত হন। এবং এই কার্যে তিনি আবশ্যক হইলেই নানা বিষয়ে সংস্কৃতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত প্রমদাবাবুর মত, ব্যাখ্যা ও উপদেশ চাহিয়া পাঠাইতেন।

তবে স্বামীজী ছিলেন বহুভাবের মানুষ। এবং কর্ম ও তপস্যা এই দুই'এর দ্বন্দ্ব বহুকাল তাঁহার অন্তর আলোড়িত করিতে থাকে। আলোচ্যকালে তাঁহার মনের অবস্থার কিছু আভাস প্রমদাবাবুর নিকট লিখিত তাঁহার কয়েকখানি পত্র হইতে পাওয়া যায়। একখানি পত্রে (৪ঠা জুলাই, ১৮৮৯) তিনি তাঁহাকে লিখেন, "নানাপ্রকার অভিনব মত মস্তিষ্কে ধারণ জন্য যে সময়ে সময়ে ভুগিতে হয়, ইহা অতি যথার্থ এবং অনেক সময়ে দেখিয়াছি।

"কিন্তু এবার অন্য প্রকার রোগ। ঈশ্বরের মঙ্গলহস্তে বিশ্বাস আমার যায় নাই, যাইবারও নহে,—শাস্ত্রে বিশ্বাস টলে নাই। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় গত ৬।৭ বৎসর আমার জীবন ক্রমাগত নানাপ্রকার বিঘ্নবাধার সহিত সংগ্রামে পরিপূর্ণ। আমি আদর্শ শাস্ত্র পাইয়াছি, আদর্শ মনুষ্য চক্ষে দেখিয়াছি, অথচ পূর্ণভাবে নিজে কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, ইহাই অত্যন্ত কষ্ট।

"বিশেষ, কলিকাতার নিকট থাকিলে হইবারও কোন উপায় দেখি না। আমার মাতা এবং দুইটি ভ্রাতা কলিকাতায় থাকে। আমি জ্যেষ্ঠ, মধ্যমটি এইবার ফার্ষ্ট আর্টস পড়িতেছে, আর একটি ছোট। ইহাদের অবস্থা পূর্বে অনেক ভাল ছিল, কিন্তু আমার পিতার মৃত্যু পর্যন্ত বড়ই দুঃস্থ, এমন কি, কখন কখন উপবাসে দিন যায়। তাহার উপর জ্ঞাতিরা দুর্বল দেখিয়া পৈতৃক বাসভূমি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল—হাইকোর্টে মকদ্দমা করিয়া যদিও সেই বাটীর অংশ পাইয়াছেন—কিন্তু সর্বস্বান্ত হইয়াছেন—যে প্রকার মকদ্দমার দস্তুর।

"কখন কখন কলিকাতার নিকট থাকিলে তাঁহাদের দুরবস্থা দেখিয়া রজোগুণের প্রাবল্যে অহঙ্কারের বিকার-স্বরূপ কার্যকরী বাসনার উদয় হয়, সেই সময়ে মনের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ বাধে, তাহাতেই লিখিয়াছিলাম মনের অবস্থা বড়ই ভয়ঙ্কর। এবার তাঁহাদের মকদ্দমা শেষ হইয়াছে। কিছুদিন কলিকাতায় থাকিয়া তাঁহাদের সমস্ত মিটাইয়া এদেশ হইতে চিরদিনের মত বিদায় হইতে পারি, আপনি আশীর্বাদ করুন। ···আশীর্বাদ করুন যেন আমার হৃদয় মহা ঐশবলে বলীয়ান হয় এবং সকল প্রকার মায়া আমা হইতে দূরপরাহত হইয়া যায়।"

ইহার পর স্বামীজী ১৪ই জুলাই (১৮৮৯) তারিখের এক পত্রে প্রমদাবাবুকে লিখেন, "আমার এ স্থানের গোলযোগ প্রায় সমস্ত মিটিয়াছে—কেবল একটি জমি বিক্রয় করিবার জন্য দালাল নিযুক্ত করিয়াছি—অতি শীঘ্রই বিক্রয় হইবার আশা আছে। তাহা হইলেই নিশ্চিন্ত হইয়া একেবারে ৺কাশীধামে মহাশয়ের সন্নিকট যাইতেছি।" সুতরাং বুঝা যায়, স্বামীজী পরিশেষে তাঁহার বাড়ীর একটা মোটামুটি সুব্যবস্থা করিয়া উহার দায় হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন।

৩। তৃতীয় যাত্রা—উত্তর ভারত (১৮৮৯, ডিসেম্বর):

যাহা হউক, দেখা যায় উক্ত ১৪ই জুলাই তারিখের পরেও স্বামীজী প্রায় আর পাঁচমাস কাল বরাহনগর মঠে ছিলেন। ঐ সময়ে (স্বামী অখণ্ডানন্দ সহ) তাঁহার পাঁচ জন গুরুভাই হিমালয়ে ছিলেন। তাই, তিনিও ঐ দিকে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া, ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগে বৈদ্যনাথধাম রওনা হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল তিনি ঐ স্থান হইতে কাশী গিয়া কিছুদিন থাকিবেন এবং তারপর সেখান হইতে হিমালয়ে যাইবেন। এ বিষয়ে এইবার তাঁহার সঙ্কল্প ছিল—'হয় উদ্দেশ্য সাধন করব, না হয় (ঐ চেষ্টাতেই) শরীর পাত করব।'

কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। বৈদ্যনাথে কয়েক দিন থাকিবার পর স্বামীজী সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার গুরুভাই স্বামী যোগানন্দ এলাহাবাদে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। খবরটি পাইয়া তিনি অবিলম্বে সেখানে গেলেন। কিন্তু যাইয়া দেখিলেন যোগানন্দের পানিবসন্ত হইয়াছিল এবং তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

এলাহাবাদের কয়েকজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক[১] স্বামীজীর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং তাঁহার অপূর্ব চরিত্র ও পাণ্ডিত্যে যারপরনাই মুগ্ধ বোধ করেন। এখানে একটি মুসলমান ফকিরকে দেখিয়া স্বামীজী বলেন, "উনি যে একজন পরমহংস তাহা উঁহার মুখের প্রতিটি রেখাতেই সুব্যক্ত।" পরে তিনি গাজীপুরের সুবিখ্যাত সাধু পওহারী বাবার কথা শুনেন এবং তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের ২০।২১ তারিখে (এলাহাবাদ হইতে) গাজীপুর রওনা হন।

গাজীপুরে স্বামীজী প্রথমে তাঁহার বাল্যবন্ধু সতীশচন্দ্র মুখার্জীর বাসাতে এবং তৎপর রায় বাহাদুর গগনচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে থাকেন। পওহারী বাবার বাসস্থান ছিল গাজীপুর হইতে প্রায় দুই মাইল উত্তরে। সেখানে গঙ্গার তীরে উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত একখণ্ড জমিতে, মাটীর নীচে একটি গুহা প্রস্তুত করিয়া তিনি তাহার মধ্যে সমাধিমগ্ন

১। ইহাদের সম্বন্ধে স্বামীজী একখানি পত্রে লিখেন, "এখানের (এলাহাবাদের) কয়েকটি বাঙ্গালীবাবু অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ ও অনুরাগী, তাঁহারা আমাকে অত্যন্ত যত্ন করিতেছেন এবং তাঁহাদের বিশেষ আগ্রহ যে, আমি এই স্থানে মাঘ মাসে 'কল্পবাস' করি।" তবে এই পত্র হইতেই জানা যায়, স্বামীজীর কল্পবাসে কোনও আগ্রহ ছিল না এবং তিনি (হিমালয়ের দিকে যাত্রা করিবার পূর্বে) একবার কাশী যাইবার জন্যই অধিক আগ্রহশীল ছিলেন। এলাহাবাদের অপর একখানি পত্রে তিনি (কল্পবাস সম্পর্কে) লিখেন, "গোলাপমা, যোগীনমা এখানে কল্পবাস করিবেন, নিরঞ্জনও বোধ হয় থাকিবে, যোগেন কি করিবে জানি না।"

থাকিতেন। যখন তিনি ধ্যান করিতেন না, তখন তিনি গুহা হইতে বাহির হইতেন এবং ঐ গুহার মুখে অবস্থিত একটি ঘরে সমাগত দর্শকগণের সহিত কথাবার্তা বলিতেন। শেষের দিকে (স্বামীজী এইকালেই তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান) তিনি আর কাহারও সম্মুখে বাহির হইতেন না, ঐ ঘরের একটি দরজার আড়ালে থাকিয়া সকলের সঙ্গে কথা কহিতেন।

কয়েকদিন চেষ্টার পর স্বামীজী বাবাজীর দর্শন পাইলেন ও তাঁহার সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা লইয়া ফিরিলেন। তৎপর তিনি প্রায় প্রতিদিনই তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন এবং তিনি রাজযোগের উত্তম গুরু জানিয়া তাঁহার নিকট হইতে রাজযোগ শিক্ষা করিতে ইচ্ছুক হন। বাবাজীও এ বিষয়ে তাঁহাকে আশা দিয়া কিছু সময় অপেক্ষা করিতে বলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কথা পূর্ব হইতেই অবগত ছিলেন এবং স্বামীজী তাঁহার শিষ্য জানিয়া তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করেন ও তাঁহার নিকট হইতে কিছু শিক্ষা করিবার বাসনাও প্রকাশ করেন। ইহার অল্প পরে স্বামীজীর কোমরে বাত (lumbago) দেখা দেয়। এবং তজ্জন্য তিনি আর পূর্বের ন্যায় রোজই বাবাজীর নিকট যাইতে পারিতেন না। কিন্তু স্বামীজী একদিন না গেলেই বাবাজী লোক পাঠাইয়া তাঁহার সংবাদ লইতেন। স্বামীজী এই সময়ে পওহারী বাবার আশ্রম হইতে অনতিদূরে অবস্থিত গগনবাবুর নির্জন বাগানবাড়ীতে থাকিয়া তপস্যা করিতেন।

যাহা হউক, দেখা যায় স্বামীজী অনেক অপেক্ষা করিয়াও বাবাজীর নিকট হইতে রাজযোগ-শিক্ষা আদায় করিতে পারিলেন না। বাবাজী কেবল তাঁহাকে ঐ জন্য আরও অপেক্ষা করিতে বলিতে লাগিলেন। শুধু তাহাই নহে। তিনি (শিষ্যের ন্যায়) স্বামীজীর নিকট হইতে নানা বিষয় জানিতে-বুঝিতেও লাগিলেন। ইহাতে নিরাশ হইয়া স্বামীজী গাজীপুর ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন।[1] কিন্তু বাবাজী বা গগনবাবু ইহারা কেহই তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিলেন না।

১। দেখা যায়, এই সময়ে পওহারী বাবার সম্বন্ধে স্বামীজীর প্রথম দিকের

বাবাজীর স্বামীজীকে ছাড়িতে না চাওয়ার হেতু আমরা উপরে দেখিয়াছি : তিনি তাঁহার নিকট হইতে কিছু শিখিতে চাহিতেছিলেন। আর গগনবাবুর তাঁহাকে না ছাড়িতে চাওয়ার হেতু ছিল তাঁহার সঙ্গ-সুখের একান্ত আকাঙ্ক্ষা। স্বামীজী গাজীপুর আসার পর হইতেই, প্রতি রবিবারে তাহার বাড়ীতে স্থানীয় শিক্ষিত লোকদিগের একটি আসর বসিত। সেখানে তাহারা স্বামীজীর নিকট হইতে গান এবং ধর্ম ও সামাজিক বিষয়ে নানা কথা, উপদেশ ও সমালোচনা শুনিতেন। শুনিয়া তাহারা এরূপ মুগ্ধ হন যে, (গগনবাবু সহ) তাহারা সকলেই তাঁহাকে আরও কিছুকাল কাছে রাখিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়া উঠেন।

জানা যায়, এইকালে গগনবাবুর মাধ্যমে গাজীপুরের কয়েকজন ইওরোপীয় রাজকর্মচারীর সহিত স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি তাহাদের নিকট হিন্দুধর্ম ও সামাজিক রীতি-নীতি ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার ঐ ব্যাখ্যা শুনিয়া তাহারা সকলেই বিশেষ প্রীত ও মুগ্ধ হন এবং ওখানকার জিলা জজ মিঃ পেনিঙ্গটন তাঁহাকে ইংলণ্ডে গিয়া ঐ সকল তত্ত্ব প্রচার করিতে অনুরোধ করেন।

যাহা হউক, উপরিবর্ণিত অবস্থার মধ্যেই প্রায় দুই মাস কাল (ফেব্রুআরি-মার্চ, ১৮৯০) ধরিয়া স্বামীজী তাঁহার কোমরের বাত ও উহার বেদনায় কষ্ট পান। তাই, ঐ সময়ে (তাঁহার বহু-ঈপ্সিত) পর্বতময় হিমালয় প্রদেশে ভ্রমণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল। এই

উচ্চ-ধারণার কিছু পরিবর্তন ঘটে। এবং তাঁহার মনে সন্দেহ জাগে বাবাজী হয়তো সে রকম উন্নত নন। কিন্তু তাঁহার এই সন্দেহ সত্বরই দূর হয়। এবং তিনি তাঁহার নিকট হইতে (রাজযোগের শিক্ষা না পাইলেও) নানা অমূল্য সত্যের সন্ধান পান। এবং তাহা স্মরণ করিয়াই তিনি (পওহারী বাবার তিরোধানের পর) একটি প্রবন্ধে লিখেন, "আমি এই পরলোকগত সাধুটির নিকট গভীরভাবে কৃতজ্ঞ এবং যে সকল মহত্তম মানব-গুরুকে আমি ভালবাসিয়াছি ও সেবাশ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছি তিনি তাঁহাদেরই একজন এবং তাঁহার স্মরণেই আমি এই প্রবন্ধটি উৎসর্গ করিলাম।"

জন্য রাজযোগ শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে বাবাজী শেষ পর্যন্ত কি করেন তাহা দেখিবার জন্য তিনি পরিশেষে গাজীপুরে অপেক্ষা করাই শ্রেয় বলিয়া স্থির করিলেন।

দেখা যায় স্বামীজী ইতিপূর্বে পওহারী বাবার উপর তাঁহার ভক্তি-শ্রদ্ধার বিষয় প্রমদাবাবুর ও অপর দুই-একজনকে পত্রে জানাইয়াছিলেন। তাহাদের নিকট এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহার গুরুভাইদের কেহ কেহ তাঁহার জন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়েন—পাছে পওহারী বাবার টানে তিনি তাঁহার নিজ গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের উপর ভক্তি-শ্রদ্ধা হারাইয়া বসেন। এই ভয়ে স্বামী প্রেমানন্দ গাজীপুরে আসিয়া তাঁহাকে তাহার সহিত অবিলম্বে কাশী যাইতে অনুরোধ করেন। তাঁহাকে এইরূপ দুর্বল মনে করায়, স্বামীজী প্রেমানন্দ স্বামীর উপর যারপরনাই রুষ্ট হন ও তাহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়া ফিরাইয়া দেন। এবং তিনি নিজেও (গুরুভাইদের নিকট হইতে নিজ বাসস্থান গোপন রাখিবার জন্য) কিছুদিনের জন্য গাজীপুর হইতে কিছু দূরে একটি গ্রামে গিয়া কঠোর ধ্যানে রত হন।

এই ঘটনাটি ঘটে মার্চ মাসের মধ্যভাগে (১৮৯০)। খুব সম্ভবতঃ ইহার পূর্বেই, গাজীপুরে আর একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে। স্বামীজী পওহারী বাবার নিকট হইতে রাজযোগ শিক্ষা করিতে অভিলাষী হইয়া, তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা লওয়া স্থির করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য হইয়াও, একটি বিশেষ বিষয় শিক্ষার নিমিত্ত পওহারী বাবাকে গুরু বরণ করা তিনি দোষের কিছু মনে করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ, তাহার নিজ গুরু শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁহার বিভিন্ন সাধনকালে বিভিন্ন গুরু গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু যে কারণেই হউক, এই বিষয়ে তাঁহার ক্ষেত্রে একটি অত্যদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। যেদিন দীক্ষা লইতে যাইবেন, তাহার পূর্ব রাত্রিতে তিনি খাটিয়ায় শুইয়া এই বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ দেখিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া—নীরবে একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন। দেখিয়াই তাহার চোখে

জল দেখা দিল এবং তাহার উক্তরূপে দীক্ষা লওয়ার সঙ্কল্পে তিনি যার-পর-নাই লজ্জিত ও ব্যথিত বোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুই-এক দিন বাদেই তাঁহার মনে হইল তাঁহার ঐ দর্শন মনের দুর্বলতা-প্রসূত। তাই, তিনি পুনরায় দীক্ষার জন্য পওহারী বাবার নিকট যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু সেদিন রাত্রিতেও তাঁহার আবার ঐরূপ দর্শন হইল। এইভাবে পর পর একুশ দিন ধরিয়া ঐ একই রকমের সঙ্কল্প ও তাহার ফলে ঐ একই রকমের দর্শনলাভ করিয়া, তিনি পরিশেষে পওহারী বাবার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা চূড়ান্ত-ভাবে পরিত্যাগ করিলেন। অনেক পরে স্বামীজী তাঁহার এই দর্শন-সংক্রান্ত কিছু তথ্য তাঁহার "গাই গীত শুনাতে তোমায়" কবিতাটিতে প্রকাশ করিয়াছেন।

যাহা হউক, দেখা যায় স্বামীজী উক্তরূপে বাবাজীর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেও, তাঁহার নিকট হইতে (দীক্ষা না লইয়া) রাজযোগ শিক্ষা করিবার বাসনা একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। তাই, তিনি উপরি-কথিত দর্শনের পরেও আরও কিছু কাল গাজীপুরে থাকাই স্থির করেন।

কিন্তু কিছু দিন পরে কাশীধাম হইতে স্বামী অভেদানন্দের পীড়ার[১] সংবাদ পাইয়া, তিনি গাজীপুর ত্যাগ করিয়া সেখানে যাইতে বাধ্য হইলেন (এপ্রিল, ১৮৯০)।

কাশীতে পৌঁছিয়া স্বামী অভেদানন্দের সেবা-শুশ্রূষার সুব্যবস্থা করিয়া, স্বামীজী প্রমদাবাবুর বাগানবাড়ীতে গিয়া তপস্যায় রত হন। কিন্তু ইহার অল্প পরেই তিনি সংবাদ পাইলেন যে বলরামবাবু কলিকাতায় ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন (১৮৯০, ১লা বৈশাখ)। সংবাদটি পাইয়া স্বামীজীর শোক-দুঃখের আর অবধি

১। স্বামী অভেদানন্দ প্রথমে হৃষীকেশে জ্বরে আক্রান্ত হন। ঐ সংবাদ পাইয়া স্বামীজী গাজীপুর হইতে পত্র দ্বারা তাহাকে অবিলম্বে কাশী যাইতে লিখেন। তদনুসারে স্বামী অভেদানন্দ কাশী যান ও সেখানে কঠিন আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন।

রহিল না। এবং অতীত দিনের কথা সকল স্মরণ করিয়া তিনি অজস্র বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে এইভাবে শোক করিতে দেখিয়া প্রমদাবাবু বলিলেন, "স্বামীজী, আপনি সন্ন্যাসী, আপনার এইরূপ শোকার্ত হওয়া উচিত নয়।" বেদনা-তপ্ত স্বামীজী উত্তর দিলেন, "আপনি কি মনে করেন, মানুষ সন্ন্যাসী হলেই তার হৃদয় বলে আর কিছু থাকে না?" এবং বলরামবাবুর পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দিবার জন্য ও তৎসহ মঠেরও একটা সুব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি অবিলম্বে কাশী হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন (এপ্রিল-মে, ১৮৯০)।

ষোল

ভারত পরিক্রমা

চতুর্থ যাত্রা (১৮৯০-৯৩)—প্রথমাংশ

(পরিব্রাজক বেশে—উত্তর ভারতে)

(কলিকাতা হইয়া) বরাহনগর মঠে পৌঁছিয়া (১৮৯০, এপ্রিল-মে), স্বামীজী পূর্বের ন্যায় ধ্যান-জপাদি তপস্যায় দিন কাটাইতে লাগিলেন। এবং তৎসঙ্গে ঠিক পূর্বের ন্যায়ই তিনি তাঁহার গুরুভাইগণের মনের উদারতা ও চিন্তা-পরিধির বিস্তার সাধনে সচেষ্ট হইলেন। এজন্য তিনি তাহাদের উপদেশ দিতেন, শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেন এবং তাঁহার নিজ মনের সর্বমুখী ও সর্বসমন্বয়কারী অপূর্ব চিন্তা ও সিদ্ধান্ত সকল তাহাদের সম্মুখে মেলিয়া ধরিতেন।[১] আর তাহারাও তাহাদের এই সর্বজ্ঞানাধার নেতার নিকট হইতে নানা বিষয়ে নূতন আলোক পাইবার জন্য সর্বদাই উদ্‌গ্রীব থাকিতেন ও সুযোগ পাইলেই তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার কথা শুনিতেন।

তবে এইকালে স্বামীজী (কতকটা তাঁহার অলক্ষিতেই) তাঁহার নির্দিষ্ট কর্মপথের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিলেন। তাই, অন্তরে তিনি এখন (একটা আশু, অথচ অজ্ঞাত পরিণতি বা সমাপ্তির জন্য) সর্বদাই গম্ভীর ও চিন্তাকুল থাকিতেন। মঠে তাঁহার মন টিকিতেছিল না। ভারতের তীর্থ সকলের আকর্ষণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। বস্তুতঃ তিনি এইবার তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই কলিকাতায়

১। জানা যায়, স্বামীজী পরবর্তীকালে যে সকল মহান ভাব ও ধারণা জগতে প্রচার করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই তাঁহার গুরুভাইগণ বরাহনগর মঠেই তাঁহার মুখে শ্রবণ করিয়াছেন।

ফিরিয়াছিলেন। প্রিয় গুরুভাই ও মঠের একান্ত হিতৈষী ও সাহায্যকারী বলরামবাবুর মৃত্যুই তাঁহাকে সেখানে টানিয়া আনিয়াছিল। তাই, অল্প কিছুদিন পরেই তিনি পুনরায় তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু ঠিক এই সময়েই আর একটি আরও গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটিল। মঠের প্রধান ধারক, পোষক ও সহায় শ্রীসুরেশচন্দ্র মিত্র ২৫শে মে (১৮৯০) তারিখে পরলোক গমন করিলেন। এই ঘটনা স্বামীজীর নিজের পক্ষে যেমন দুঃসহ ছিল, তেমনি মঠের পক্ষে উহা মারাত্মক হইল। বলরামবাবু ও সুরেশবাবুর অভাবে মঠ যেন আর টিকে না। খাওয়া, পরা সব কিছুরই দারুণ অভাব। মঠ কি তবে উঠিয়া যাইবে?

এই দুশ্চিন্তার চাপেই মঠ রক্ষার একটা স্থায়ী উপায় করিবার জন্য, এই সময়ে স্বামীজীর মনে ঠাকুরের একটি স্মৃতি-মন্দির তুলিবার বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল। কারণ, মঠ না টিকিলে ঠাকুরের জামা, কাপড়, ভস্ম, অস্থি ইত্যাদি স্মৃতি-চিহ্ন সকল কোথায় থাকিবে? আর তাঁহার বহু আয়াস-সৃষ্ট সন্ন্যাসী-সঙ্ঘই বা দাঁড়াইবে কোথায়? অবশ্য পূর্বেও তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল, গঙ্গাতীরে একখণ্ড জমি কিনিয়া তদুপরি একটি মন্দির তুলিয়া তন্মধ্যে ঠাকুরের স্মৃতি-চিহ্ন সকল সংরক্ষিত করিবেন এবং ঠাকুরের ত্যাগীসন্তানগণ সেখানেই বাস করিবেন। এখন—মঠের অতীব দুর্দিনে—তাঁহার ঐ বাসনা সফল করিবার জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু আবশ্যকীয় অর্থ কোথায় পাওয়া যাইবে? ঐরূপ একটি স্মৃতি-মন্দির নির্মাণে বলরামবাবু ও সুরেশচন্দ্র মিত্রেরও বিশেষ সমর্থন ছিল। এবং ঐ কার্যের জন্য সুরেশবাবু অবিলম্বে ১০০০৲ টাকা ও পরে আরও কিছু দিতে চাহিয়াছিলেন। বলরামবাবুও ঐ প্রকার সাহায্য করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের অকস্মাৎ মৃত্যুতে উহাও আর পাইবার কোন আশা রহিল না। এই সকল কথা বিবৃত করিয়া স্বামীজী মনের আবেগে ও অতি কাতরভাবে এই সময়ে (১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মে তারিখের) একখানি পত্রে কাশীর প্রমদাবাবুকে উক্ত স্মৃতি-

মন্দির নির্মাণের সাহায্যে কিছু চাঁদা তুলিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

এই পত্রখানিতে তিনি তাঁহার মনের কয়েকটি গোপন কথাও সুস্পষ্ট করেন। তিনি লিখেন, 'আমি শ্রীরামকৃষ্ণের গোলাম—আমার এই দেহ (তিল তুলসী দিয়া) তাঁহার চরণে সমর্পণ করিয়াছি। এবং তাঁহার আদেশ অমান্য করিতে বা তাঁহার কথা অবিশ্বাস করিতে আমি অক্ষম।

'আমার প্রতি তাঁহার এই আদেশ আছে যে, তাঁহার ত্যাগী ভক্তদিগের কল্যাণ-সাধনে আমার নিযুক্ত হইতে হইবে।

'তাঁহার আরও একটি আদেশ এই যে, তাঁহার ত্যাগী ভক্তগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইবেন এবং আমাকে ঐ কার্য-সাধনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।'

এই সকল কথা হইতে বোঝা যায়, তিনি যে-কোনও উপায়ে মঠটিকে রক্ষা করিতে কিরূপ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহা হইলেও দেখা যায়, এই সময়ে ঠাকুরের স্মৃতি-মন্দির নির্মাণের কোন ব্যবস্থাই তিনি করিতে পারেন নাই। তবে মঠ-রক্ষার উপায় একটা হইল। বলরামবাবু ও সুরেশবাবুর অভাবে, ঠাকুরের বীরভক্ত গিরিশবাবু মঠের সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। এবং তাহার ফলে বরাহনগর মঠ পূর্বের ন্যায় (কষ্টে ও কোনমতে) টিকিয়া থাকিতে সক্ষম হইল।

এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া, স্বামীজী (যেভাবে তিনি তাঁহার দুঃস্থ মা-ভাইদের ছাড়িয়া গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই অভাব-পীড়িত) মঠ ছাড়িয়া হিমালয়ের ক্রোড়ে গিয়া কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এইজন্য একটি প্রয়াস তিনি অনেকদিন হইতেই করিতেছিলেন। তিনি যখন গাজীপুরে, তখন স্বামী অখণ্ডানন্দ তিব্বত হইতে কাশ্মীরে আসিয়া পৌঁছেন ও সেখান হইতে তাঁহার সহিত নিয়মিত পত্রালাপ করিতে থাকেন। তাহার হিমালয় প্রদেশের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার জন্য স্বামীজী তাহাকে লইয়া

হিমালয় ভ্রমণে বাহির হইতে ইচ্ছা করেন এবং তজ্জন্য তাহাকে গাজীপুরে আসিতে লিখেন। তদনুসারে স্বামী অখণ্ডানন্দ গাজীপুর আসেন। কিন্তু সেখানে আসিয়া দেখেন, স্বামীজী কাশী চলিয়া গিয়াছেন। তাই, তিনিও তাঁহার অনুসরণে গাজীপুর হইতে কাশী গেলেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছিয়া তিনি শুনিলেন, স্বামীজী তথা হইতে বরাহনগর মঠে ফিরিয়াছেন। তখন তিনি (যে কারণেই হউক) পুনরায় গাজীপুর যান ও তথা হইতে স্বামীজীর দর্শনার্থ বরাহনগর মঠে গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন (১৮৯০, জুন)। তৎপর তাহাকে সঙ্গে করিয়াই স্বামীজী ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তাঁহার বিখ্যাত ও পূর্ণ তিন বৎসর ব্যাপী সুদীর্ঘ ভারত-ভ্রমণে বাহির হইলেন।

স্বামীজীর এইবার সঙ্কল্প ছিল তিনি তপস্যা ও শ্রীগুরু-কথিত কর্ম সমাপন দ্বারা শান্তি অর্জন না করিয়া আর মঠে ফিরিবেন না। বাস্তবিক তৎপূর্বে তিনি আর ফিরেনও নাই। পূর্ণ তিন বৎসর কাল ভারত পরিক্রমায় অতিবাহিত করিয়া, তিনি (অন্তরের এক মহা আহ্বানে) একাকী ও নিঃসম্বল অবস্থায় বোম্বাই হইতে জাহাজে চড়িয়া (ঐহিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শক্তি-সম্পদে সমুজ্জ্বল পাশ্চাত্য জগতের শিরোভূষণ) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অভিমুখে যাত্রা করেন (১৮৯৩, ৩১শে মে)। উদ্দেশ্য—মানব-কল্যাণে ভারতের অধ্যাত্ম জ্ঞানের দ্বারা পৃথিবী বিজয় এবং পরিবর্তে ভারতের জন্য সম্মান ও ঐহিক সাহায্য আহরণ।

স্বামীজীর এইবারকার এই ঐতিহাসিক ভারত ভ্রমণের (১৮৯০, জুলাই হইতে ১৮৯৩, মে) কাহিনী সুদীর্ঘ—উপন্যাসসম—রোমাঞ্চকর। উহার পরিপূর্ণ বিবরণ একখানি পৃথক সুবৃহৎ পুস্তকেও সম্পূর্ণ করা সুকঠিন। তাই, আমরা এই গ্রন্থে সে চেষ্টা না করিয়া শুধু উহার মূল ধারাটিই সংক্ষেপে লক্ষ্য করিয়া যাইবার চেষ্টা করিলাম। আশা করি, আমরা তাহা হইতেই উহার একটি সুস্পষ্ট ও সন্তোষজনক ধারণা পাইব।

তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে স্বামীজীর প্রথম তিন যাত্রার বিবরণ আমরা গত অধ্যায়ে পাইয়াছি। তাই, তাঁহার এবারকার যাত্রা হইতেছে চতুর্থ যাত্রা। উহার প্রথমাংশ—অর্থাৎ, স্বামীজীর উত্তর ভারত ভ্রমণের কাহিনী—আমরা নিম্নে এই অধ্যায়ে যথাসম্ভব সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম। উহার দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অংশ—অর্থাৎ, স্বামীজীর মধ্য, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের ইতিবৃত্ত—আমরা পরবর্তী তিন অধ্যায়ে পাইব।

চতুর্থ যাত্রা—প্রথমাংশ—উত্তর ভারত (১৮৯০, জুলাই):

এইবার বরাহনগর মঠ ত্যাগ করিবার পূর্বে স্বামীজী তাঁহার গুরুভাইদের নিকট বলেন, "যতদিন না আমার এমন উপলব্ধি লাভ হয় যার ফলে আমি স্পর্শমাত্রেই মানুষকে পরিবর্তিত করে দিতে পারব, ততদিন আমি ফিরব না।" পরে তিনি তাঁহার হিমালয় ভ্রমণের সঙ্গী স্বামী অখণ্ডানন্দকে সঙ্গে করিয়া গঙ্গার অপর পারস্থিত ঘুসুড়ী গ্রামে গিয়া শ্রীশ্রীমায়ের[১] আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন ও বলেন, "মা, আমি এবার সর্বোচ্চ জ্ঞান লাভ না করে আর ফিরব না।" মা তাহাকে আশীর্বাদ করেন এবং তিনিও মাকে তাহার অনিন্দ্য কণ্ঠের গান শুনাইয়া আনন্দ দান করেন। যাত্রাকালে মা অখণ্ডানন্দকে বলেন, "বাবা, তোমার হাতে আমাদের সর্বস্ব দিলাম। তুমি পাহাড়ের সকল অবস্থা জান, দেখো যেন নরেনের খাওয়ার কষ্ট না হয়।"

স্বামীজীর এবারকার এই সুদীর্ঘ ভ্রমণের প্রথম পর্যায়ের ক্রম ও কাহিনী এইরূপ:

(১) ভাগলপুর, বৈদ্যনাথ, কাশী, অযোধ্যা, নৈনিতাল ও আলমোড়ায়:

শ্রীশ্রীমার ঘুসুড়ীর বাড়ী হইতে রওনা হইয়া স্বামীজী ও অখণ্ডানন্দ সর্বপ্রথম ভাগলপুরে গেলেন। তারপর সেখান হইতে তাঁহারা

১। শ্রীশ্রীমা এই সময়ে ঘুসুড়ী গ্রামে একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন।

ক্রমান্বয়ে বৈদ্যনাথ, কাশী, অযোধ্যা ও নৈনিতাল হইয়া আলমোড়ায় পৌঁছেন।[১]

ভাগলপুরে তাঁহারা প্রথমে কুমার নিত্যানন্দ সিংহের অতিথি হন। তৎপর প্রায় সাত দিন তাঁহারা শ্রীযুত মন্মথনাথ চৌধুরীর বাড়ীতে থাকেন। সেখানে যাহারা স্বামীজীকে দর্শন করেন, তাহারা সকলেই তাঁহার সর্বতোমুখী পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞান দেখিয়া স্তব্ধ হন। এবং একদিন তিনি ঐ বাড়ীতে সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দুইটা-তিনটা পর্যন্ত গান গাহিয়া ওখানকার ওস্তাদগণকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেন। এই সকল সংবাদ দানাপুরের উকীল মথুরানাথ সিংহের (তিনি এই সময়ে ভাগলপুরে আসিয়াছিলেন) ও উক্ত মন্মথবাবুর বিবরণ হইতে জানা যায়। মন্মথবাবু নিজে ব্রাহ্ম হইয়াও স্বামীজীর এমন ভক্ত হইয়া উঠেন যে তিনি আর তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িতে চাহিলেন না এবং তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন যে, "চলুন, আমরা বৃন্দাবন গিয়ে থাকি। সেখানে গোবিন্দজীর মন্দিরে প্রত্যেকের জন্য ৩০০৲ টাকা করে জমা দিলে আমরা আমাদের বাকী জীবনের জন্য আহার্য-স্বরূপ গোবিন্দজীর প্রসাদ পাব।" যাহা হউক, মন্মথবাবু তাঁহাকে সহজে যাইতে দিবেন না বুঝিয়া, স্বামীজী একদিন তাহার অনুপস্থিতি-কালে বাড়ীর অপর লোকদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া ভাগলপুর ত্যাগ করিলেন। বাড়ী ফিরিয়া মন্মথবাবু তাঁহার অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন খোঁজ পাইলেন না। তবে তাহার স্মরণ হইল স্বামীজী তাহাকে একদিন বলিয়াছিলেন যে, তিনি আলমোড়া হইয়া বদরিকাশ্রমে যাইবেন। তাই, পরিশেষে তিনি তাঁহার অনুসন্ধানে আলমোড়া পর্যন্ত গেলেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছিয়া তিনি লালা বদ্রী সার নিকট হইতে জানিতে পারিলেন যে, স্বামীজী কিছুদিন পূর্বে

১। স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁহার 'স্মৃতিকথায়' লিখিয়াছেন যে তাঁহারা কাশী যাইবার পূর্বে গাজীপুর গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কোন বিশেষ তথ্য বা অপর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

কেদার-বদ্রীর দিকে চলিয়া গিয়াছেন। কাজেই তাহার তাঁহাকে অনুসরণ করা ঐখানেই শেষ হয়।

দেখা যায়, ভাগলপুর হইতে স্বামীজী অখণ্ডানন্দের সহিত বৈদ্যনাথ যান। সেখানে তিনি সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম মনীষী রাজনারায়ণ বসুকে দর্শন করেন ও তাঁহার সহিত নানা বিষয় আলোচনা করেন। তাঁহার বাসায় একরাত্রি থাকিয়া তাঁহারা পরদিন কাশী রওনা হন।

কাশীতে স্বামীজী প্রমদাবাবুর বাড়ীতে থাকেন ও তাঁহার সহিত নানা শাস্ত্রীয় বিষয় আলোচনা করেন। তবে এবার তিনি হিমালয় ভ্রমণের জন্য ব্যগ্র থাকায়, কাশীতে বেশী দিন অপেক্ষা করেন নাই। জানা যায়, প্রমদাবাবুর নিকট হইতে বিদায়-গ্রহণকালে তিনি তাঁহাকে বলেন, "এর পরের বার আমি যখন এখানে আসব, তখন আমি সমাজের উপর একটা বোমার মত ফেটে পড়ব, আর সমাজ (কুকুরের মত) আমার অনুবর্তী হতে বাধ্য হবে।"

অখণ্ডানন্দের ইচ্ছায়, স্বামীজী কাশী হইতে অযোধ্যায় যান। সেখানে তিনি (একটি স্থানীয় দেবমন্দিরের অধ্যক্ষ) জানকীবর সরনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইনি সংস্কৃত ও ফার্সিতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও আধ্যাত্মিক তেজ-নিষ্ঠায় স্বামীজী মুগ্ধ হন এবং বলেন, "আমি সত্যিই একটি মানুষের মত মানুষ—একটি খাঁটি সাধুপুরুষ, দেখলাম।"

অযোধ্যা হইতে স্বামীজী ও অখণ্ডানন্দ নৈনিতাল যান। সেখানে তাঁহারা শ্রীযুত রামপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের বাড়ীতে প্রায় এক পক্ষকাল থাকেন। তৎপর তাঁহারা পদব্রজে ও ইচ্ছাপূর্বক একটি পয়সাও সঙ্গে না লইয়া আলমোড়ার দিকে রওনা হন।

পথে স্বামীজী একদিন অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু নিকটে কোন বাড়ী ছিল না, শুধু একটি মুসলমান ফকিরের আস্তানা ছিল। তাঁহার কাছে ভিক্ষা চাহিলে তিনি বলেন, "বাবাজী, শুধু একটি শশা দিতে পারি।" সেই শশাটি খাইয়া স্বামীজী সেদিন তাঁহার ক্ষুধা নিবৃত্তি করেন।

আলমোড়ার পথে আর একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই। পথভ্রমণের তৃতীয় দিন স্বামীজী একস্থানে (একটি পার্বত্য নদীর জল-চালিত একটি কলের সন্নিকটে) রাত্রি যাপন করা স্থির করেন। স্নানান্তে তিনি ঐ নদীতীরবর্তী একটি পুরাতন অশ্বত্থ গাছের নীচে বসিয়া গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। পরে তিনি অখণ্ডানন্দকে বলেন, "গঙ্গাধর, আজ এই অশ্বত্থ গাছের তলে আমার জীবনের একটা বড় সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।" বলিয়া তিনি মানুষ ও বিরাট বিশ্বের একত্বের যে অদ্ভুত দর্শন লাভ করিয়াছেন তাহা তাহাকে বলিলেন। এবং তৎসম্বন্ধে তিনি ঐদিনই তাঁহার নোটবুকে নিম্ন কয়েকটি টুকরা কথা লিখিয়া রাখেন :—

"আদিতে শব্দ ছিল, ইত্যাদি।

"মানুষ ও বিরাট বিশ্ব একই নিয়মে গঠিত। যেমন ব্যক্তির আত্মা তাহার জীবন্ত দেহকোষের দ্বারা আবৃত, তেমনি সার্বজনীন বিশ্বাত্মাও জীবন্ত প্রকৃতির (বিরাট বিশ্বের) দ্বারা আবৃত। শিবা (কালী) শিবকে আলিঙ্গন করিয়া আছে। ইহা কল্পনা নয়। এই একটির (বিশ্বাত্মার) অপরটির (প্রকৃতির) দ্বারা আচ্ছাদন, (ঠিক) ভাব ও তৎপ্রকাশক শব্দের সম্পর্কের ন্যায় : উহারা উভয়েই এক, শুধু মনের চিন্তাতেই পৃথক বলিয়া অনুভূত হয়। শব্দ ব্যতীত চিন্তা অসম্ভব। সুতরাং আদিতে শব্দ ছিল, ইত্যাদি।

"বিশ্বাত্মার এই দ্বৈতরূপে প্রকাশ শাশ্বত। তাই, আমরা যাহা অনুভব করি তাহা হইতেছে এই চির রূপায়িত ও চির অরূপের সম্মিলন।"

স্বামীজী যখন আলমোড়ায় পৌঁছেন, তাহার অনেক পূর্ব হইতেই তাঁহার দুইটি গুরুভাই, স্বামী সারদানন্দ ও বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল, ঐ স্থানের ভক্ত ব্যবসায়ী লালা বদ্রী সার বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। তাই স্বামী অখণ্ডানন্দ স্বামীজীকে অম্বা দত্তের বাগান-বাড়ীতে রাখিয়া তাহাদিগকে তাঁহার আগমন-সংবাদ দিতে গেলেন। সংবাদ পাইয়াই তাঁহাদের সহিত লালা বদ্রী সাও ছুটিয়া

আসিয়া স্বামীজীকে নিজ বাটীতে লইয়া আসিলেন। বদ্রী সা স্বামীজীকে বিশেষ যত্ন করেন এবং তাহার ভক্তি ও আতিথ্যে মুগ্ধ হইয়া স্বামীজী বলেন, "এ রকম ভক্ত ক্বচিৎ দেখেছি।" তাহার বাড়ীতে সংসারত্যাগের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে (স্থানীয় আদালতের সেরেস্তাদার) কৃষ্ণ যোশীর সহিত স্বামীজীর একদিন সুদীর্ঘ আলোচনা হয় এবং তখন তাঁহার পাণ্ডিত্য ও বক্তৃতাশক্তি দর্শনে কৃষ্ণ যোশী যার-পর-নাই বিস্মিত হন। আলমোড়ায় অবস্থানকালে স্বামীজী তাঁহার ভ্রাতার প্রেরিত একখানি টেলিগ্রাম হইতে জানিতে পারেন যে তাঁহার একটি ভগিনী আত্মহত্যা করিয়াছে। এই দুঃসংবাদে তিনি মর্মাগত ও অত্যন্ত বিচলিত হন। এবং অনেকে অনুমান করেন, এই মর্মভেদী আঘাতই তাঁহাকে ভারতের নারীদিগের সমস্যাসকলের সমাধানে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।

(11) হিমালয় অঞ্চলের কর্ণপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, শ্রীনগর, টিহিরি, দেরাদুন, হৃষীকেশ ও হরিদ্বারে এবং তৎপর সাহারাণপুর হইয়া মীরাটে :

যাহা হউক, উক্ত দুঃসংবাদটি পাইবার অল্প পরেই, স্বামীজী সারদানন্দ, অখণ্ডানন্দ ও বৈকুণ্ঠনাথের সহিত আলমোড়া ত্যাগ করিয়া হিমালয়ের গাড়োয়াল অঞ্চলের দিকে রওনা হইলেন। একটি কুলি তাঁহাদের মোট লইয়া চলিল।

বদরিকাশ্রমে যাইবার পথে তাঁহারা কর্ণপ্রয়াগে পৌঁছিয়া জানিতে পারিলেন যে, দুর্ভিক্ষের জন্য গবর্ণমেণ্ট বদরিকাশ্রমে যাইবার রাস্তা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাই, তাঁহারা কর্ণপ্রয়াগ হইতে রুদ্রপ্রয়াগের দিকে চলিলেন। পথে এক চটিতে স্বামীজী ও অখণ্ডানন্দ জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। কিছু সুস্থ হইয়া তাঁহারা পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন এবং রুদ্রপ্রয়াগে পৌঁছিয়া পূর্ণানন্দ নামে একজন বাঙ্গালী সাধুর সহিত রাত্রি কাটাইলেন। তৎপর তাঁহারা রুদ্রপ্রয়াগ হইতে অল্প দূরে একটি ধর্মশালায় গিয়া উঠিলেন। সেখানে স্বামীজী ও অখণ্ডানন্দ পুনরায় জ্বরে পড়িলেন। এবং জ্বর অত্যধিক হওয়ায় তাঁহারা আর পথ চলিতে পারিলেন না। সৌভাগ্যবশতঃ

এই সময়ে গাড়োয়াল জেলার সদর আমিন বদ্রী দত্ত যোশী সেখানে তাঁবু ফেলিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি স্বামীজী ও অখণ্ডানন্দকে আয়ুর্বেদীয় ঔষধ দিলেন এবং তাহাতে তাঁহারা আরোগ্য লাভ করিলে তাঁহাদের ডাণ্ডি করিয়া শ্রীনগরে পাঠাইয়া দিলেন।

শ্রীনগর গাড়োয়াল জেলার একটি প্রসিদ্ধ নগর। সেখানে পৌঁছিয়া স্বামীজী তাঁহাদের সঙ্গের কুলিটিকে বিদায় দিলেন। এই স্থানে অলকানন্দা নদীর তীরবর্তী একটি নির্জন কুটিরে স্বামী তুরীয়ানন্দ কিছুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। সেই কুটিরে স্বামীজী প্রভৃতি প্রায় এক মাস কাল বাস করেন। সেখানে ও তৎপূর্বে পথে স্বামীজী তাঁহার গুরুভাইদের (দুই একখানি ব্যতীত) সমস্ত প্রধান উপনিষদ-গুলি পড়ান। ইহা ব্যতীত জানা যায়, তাঁহারা এই কালে মাধুকরী করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিতেন, পথ চলিতে চলিতে কখন ধ্যান, কখন বা ধর্মালোচনায় রত হইতেন এবং শ্রীনগরে বাসকালে নিয়মিত তপস্যায় নিযুক্ত হন।

শ্রীনগরে স্বামীজীর একটি স্কুল-মাস্টারের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি অল্প দিন পূর্বে খ্রীস্টান হইয়াছিলেন। স্বামীজীর মুখে হিন্দু-ধর্মের ব্যাখ্যা শুনিয়া তিনি পুনরায় স্বধর্মে ফিরিয়া আসেন। এবং স্বামীজী ও তাঁহার গুরুভাইগণের বিশেষ অনুরক্ত ভক্ত হন।

মাসখানেক শ্রীনগরে থাকিয়া স্বামীজী গঙ্গা দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইলেন। তাই, তাঁহারা সকলে শ্রীনগর হইতে পদব্রজে টিহিরি গেলেন। সেখানে তাঁহারা গঙ্গাতীরে (সাধুদের থাকিবার জন্য নির্দিষ্ট) দুইখানি নির্জন ঘরে থাকিয়া তপস্যায় রত হইলেন ও মাধুকরী করিয়া জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে স্বামীজী টিহিরি-রাজের দেওয়ান রঘুনাথ ভট্টাচার্যের সহিত পরিচিত হইলেন। তিনি কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বড় ভাই ছিলেন। স্বামীজী কয়েক দিন তাঁহার কাছে রহিলেন এবং তাঁহার সাহায্যে (গঙ্গা ও ভিল গঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থল) গণেশপ্রয়াগে কুটির নির্মাণ করিয়া তপস্যা করা স্থির

করিলেন। কিন্তু সেখানে যাইবার পূর্বেই স্বামী অখণ্ডানন্দ সর্দিকাশিতে পুনরায় অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং স্থানীয় ডাক্তার তাহার বুক পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, শীতকাল সামনে, এই শীতের মধ্যে তাহার পাহাড়ে থাকা বিপজ্জনক হইবে এবং তাহার অবিলম্বে plains'এ (সমতল প্রদেশে) গিয়া চিকিৎসা করান কর্তব্য।

এই কথা শুনিয়া স্বামীজী তাঁহার তপস্যা করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। এবং (টিহিরিতে মোট প্রায় একমাস কাল অবস্থানের পর) স্বামী অখণ্ডানন্দকে লইয়া মুসৌরী ও রাজপুর হইয়া দেরাদুন আসিলেন। রাজপুরে তাঁহাদের স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং তখন তিনিও তাঁহাদের সহিত দেরাদুন আসেন।

টিহিরি হইতে আসিবার সময়, দেওয়ান রঘুনাথবাবু স্বামীজী ও অখণ্ডানন্দকে মুসৌরী যাইবার জন্য দুইটি ঘোড়া ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন এবং পথের আবশ্যকীয় খরচ সহ দেরাদুনের সিভিল সার্জেন ডাঃ ম্যাক্লারেনের নিকট একখানি পরিচয়-পত্রও দেন। ঐ পরিচয়-পত্র দেখাইয়া উক্ত সিভিল সার্জেনের দ্বারা অখণ্ডানন্দের বুক পরীক্ষা করান হইল। তিনি বলিলেন, রোগী ব্রঙ্কাইটিস রোগে ভুগিতেছেন এবং তাহাকে পাহাড়ে যাইতে নিষেধ করিয়া সমতল স্থানে থাকিয়া চিকিৎসা করাইতে উপদেশ দিলেন। তখন তাহাকে দেরাদুনে রাখিয়া চিকিৎসা করাইবার জন্য স্বামীজী ওখানকার সমস্ত বড় বড় বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু কেহই রাজি হইলেন না। পরিশেষে ওখানকার উকিল (ও জাতিতে কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ) পণ্ডিত আনন্দ নারায়ণ অখণ্ডানন্দের চিকিৎসার সকল ভার গ্রহণ করিলেন। এবং তাহাকে থাকিবার জায়গা, উপযুক্ত পথ্য ও গরম জামা-কাপড়াদি দিয়া সকল রকমে সাহায্য করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে প্রায় তিন সপ্তাহ দেরাদুনে কাটাইয়া এবং অখণ্ডানন্দকে পণ্ডিত আনন্দ নারায়ণের নিকট রাখিয়া স্বামীজী অপর সকলকে (অর্থাৎ সারদানন্দ, তুরীয়ানন্দ ও সান্ন্যাল মহাশয়কে) লইয়া হৃষীকেশ চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় তিনি অখণ্ডানন্দকে কিছু

সুস্থ হইয়া এলাহবাদে এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়া থাকিতে বলিয়াছিলেন। তদনুসারে অখণ্ডানন্দ যথাসময়ে এলাহবাদের উদ্দেশ্যে রওনা হইয়া সাহারানপুরে আসিলেন। কিন্তু সেখানকার উকীল (ও বন্ধু) বঙ্কুবিহারী চ্যাটার্জী তাঁহাকে বলিলেন, "এলাহবাদ তত ভাল জায়গা নয়, আপনি মীরাটে যান। সেখানে আমার পরিচিত লোক আছে।" তদনুসারে তিনি তাহার চিঠি লইয়া মীরাটে গেলেন এবং (প্রায় দেড়মাস কাল) সেখানকার এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জেন ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের বাসায় থাকিয়া তাহার দ্বারা চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন।

এদিকে স্বামীজী হৃষীকেশ পৌঁছিয়া তাঁহার গুরুভাইগণ সহ এক পর্ণকুটিরে আশ্রয় লইলেন। তখন ঐ স্থান জঙ্গলাকীর্ণ ছিল এবং তাহারই মধ্যে এখানে সেখানে কুটির নির্মাণ করিয়া সাধুগণ তপস্যা করিতেন। (গুরুভাইগণ সহ) স্বামীজীও ঐরূপ এক কুটিরে থাকিয়া ও মাধুকরী ভিক্ষায় জীবন যাপন করিয়া ধ্যান, জপ ও শাস্ত্রাধ্যয়নে কিছুদিন কাটাইলেন। তারপর তাঁহার ইচ্ছা হইল, গঙ্গা ও বন-জঙ্গলময় পাহাড়ে বেষ্টিত এই অতি পবিত্র ও অতি মনোরম স্থানটিতে তিনি আরও গভীর তপস্যায় নিমগ্ন হইবেন। কিন্তু শুধু ইচ্ছাই করিলেন, সফল হইতে পারিলেন না। কারণ, এই সময়ে তিনি হঠাৎ একদিন প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইলেন এবং তাঁহার অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইয়া চলিল। পরিশেষে তিনি একদিন অজ্ঞান ও হিমাঙ্গ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার গুরুভাইগণ ভয় ও দুশ্চিন্তায় একেবারে দিশেহারা হইলেন। নিকটে কোথাও চিকিৎসক পাওয়া সম্ভব ছিল না। এবং যখন তাহাদের মনে হইল যে স্বামীজীর জীবনের আর কোন আশা নাই, তখন তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন ও তাঁহার নিকট তাঁহার প্রাণভিক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে একটি সাধু কম্বল মুড়ি দিয়া সেখানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রোতে হো কাহে?" এবং রোগীকে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া এক মোড়া ঔষধ দিয়া তাহা তাঁহাকে মধু দিয়া

খাওয়াইতে বলিয়া চলিয়া গেলেন। ইহার পর সাধুটির আর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। কিন্তু তাঁহার ঐ ঔষধ খাওয়াইবার একটু পরেই স্বামীজির জ্ঞান হইল, গা গরম হইয়া উঠিল এবং তিনি কথা বলিতে সক্ষম হইলেন।

এই সময়ে টিহিরির দেওয়ান পূর্বোক্ত রঘুনাথ ভট্টাচার্য তথাকার রাজাকে লইয়া আজমীঢ় যাইতেছিলেন। পথে হৃষীকেশ আসিয়া তিনি শুনিলেন, এক মহাপণ্ডিত বাঙ্গালী সাধু মরণাপন্ন পীড়াগ্রস্ত হইয়া এক পর্ণকুটিরে পড়িয়া আছেন। রঘুনাথবাবু অনুমান করিলেন, এই সাধুটি নিশ্চয়ই স্বামীজী হইবেন। তাই, তিনি তাঁহাকে দেখিতে গেলেন এবং দিল্লীর এক চিকিৎসকের নিকট একখানি পত্র দিয়া তাঁহাকে সেখানে যাইতে উপদেশ দিলেন।

কিছুদিন পরে স্বামীজী কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া তাঁহার গুরুভাইদের সঙ্গে দিল্লী রওনা হইলেন। তাঁহারা হরিদ্বার পৌঁছিলে, স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। তিনি এই সময়ে কণ্খলে থাকিয়া তপস্যা করিতেছিলেন। তারপর তাঁহারা সকলে মিলিয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন। পথে সাহারাণপুরে আসিয়া তাঁহারা পূর্বোক্ত উকীল বন্ধু চ্যাটার্জির নিকট শুনিলেন যে, অখণ্ডানন্দ মীরাটে আছেন। তখন তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত তাঁহারা সকলেই মীরাটে গেলেন।

সেখানে পৌঁছিয়া তাঁহারা ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের বাড়ীতে অখণ্ডানন্দের দেখা পাইলেন। স্বামীজীর রুগ্ন, শীর্ণ, চেহারা দেখিয়া অখণ্ডানন্দ স্তব্ধ হইলেন। তিনি বলিয়াছেন, "স্বামীজীকে ওরূপ শীর্ণ কখন দেখিনি—ঠিক যেন একটি ছায়ামূর্তি।" যাহা হউক, তাঁহারা দুইজন প্রায় পনর দিন উক্ত ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে রহিলেন, অপর সকলে যজ্ঞেশ্বরবাবু[১] নামে একটি ভদ্রলোকের বাড়ীতে আশ্রয় পাইলেন। পরে তাঁহারা সকলে মিলিয়া যজ্ঞেশ্বর বাবুর একটি বন্ধুর বাগানে গিয়া আড্ডা গাড়িলেন। এই বাগানটি শেঠজীর বাগান নামে

১। যজ্ঞেশ্বরবাবু পরে সন্ন্যাসী হইয়া স্বামী জ্ঞানানন্দ নাম গ্রহণ করেন ও ভারত ধর্ম মহামণ্ডলের একজন নেতা হন।

খ্যাত ছিল। এখানেও স্বামীজী ঔষধ খাইতে থাকেন এবং ক্রমশঃ সুস্থ ও সবল হন।

শেঠজীর বাগানে থাকাকালে, অখণ্ডানন্দ একদিন তাহার পূর্ব-পরিচিত এক আফগান সর্দারকে স্বামীজীর নিকট লইয়া আসেন। তিনি কাবুলের আমীরের আত্মীয় ছিলেন এবং হিন্দু সাধুদিগকে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। স্বামীজীকে দর্শন করিতে আসিবার পূর্বে তিনি উজু করিয়া (হাত-পা ধুইয়া) নিজেকে শুদ্ধ করিয়া লন এবং স্বামীজীকে উপঢৌকন দিবার জন্য এক বাক্স মিষ্টি এক হিন্দু চাকরের দ্বারা সঙ্গে করিয়া আনেন। এইভাবে ক্রমে ক্রমে বহুলোক স্বামীজীকে দর্শন করিতে আসিতে লাগিলেন। এবং মীরাটের শেঠজীর বাগান সত্বরই ঠিক যেন একটি ক্ষুদ্র বরাহনগর মঠে পরিণত হইল। এই সময়ে সেখানে ছিলেন স্বামীজী, ব্রহ্মানন্দ, অখণ্ডানন্দ, তুরীয়ানন্দ, সারদানন্দ ও বৈকুণ্ঠনাথ এবং পরে হঠাৎ একদিন স্বামী অদ্বৈতানন্দও আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। তখন স্বামীজী পরিপূর্ণভাবেই সুস্থ হইয়াছেন। এবং তিনি প্রতিদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিশ্রামকালে গুরুভাইদের নিকট মৃচ্ছকটিক, অভিজ্ঞান শকুন্তলা, কুমারসম্ভব, মেঘদূত এবং বিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তক পড়িয়া ও ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেন। ইহা ব্যতীত, ধ্যান, জপ ও ভজনাদি ঠিক বরাহনগর মঠের মতই চলিত। বৈকালে তাঁহারা প্যারেড গ্রাউণ্ডে গিয়া সৈন্যদের ক্রীড়াদি দেখিতেন। বস্তুতঃ মীরাটের এই দিনগুলি ছিল তাঁহাদের জীবনের এক অতি অপূর্ব আনন্দের দিন।

মীরাটের একটি বিশেষ কৌতুককর ঘটনা এই। একদিন স্বামীজী অধ্যয়নের জন্য অখণ্ডানন্দের দ্বারা স্থানীয় লাইব্রেরী হইতে স্যর জন লাবকের গ্রন্থাবলী আনাইলেন। কিন্তু পরের দিনই তাহা ফেরত দেওয়ায়, লাইব্রেরীয়ানের মনে সন্দেহ হইল যে স্বামীজী উহা না পড়িয়াই ফেরত দিয়াছেন এবং তজ্জন্য তিনি অখণ্ডানন্দের নিকট (অযথা বই লওয়ার জন্য) কিছু বিরক্তিও প্রকাশ করিলেন। শুনিয়া

স্বামীজী নিজেই উক্ত লাইব্রেরীতে উপস্থিত হইয়া লাইব্রেরীয়ানকে বলিলেন, "মহাশয়, ঐ পুস্তকগুলি সবই আমি পড়িয়াছি আপনি ইচ্ছা করিলে আমাকে প্রশ্ন করিয়া দেখিতে পারেন।" তখন লাইব্রেরীয়ান তাঁহাকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন এবং তাহার উত্তর শুনিয়া তিনি যারপরনাই বিস্মিত হন ও নিজের ভুল বুঝিতে পারেন।

যাহা হউক, এইরূপ নানা কর্ম, বিশ্রাম ও আনন্দের মধ্যে থাকিয়া স্বামীজী পূর্বের ন্যায় সবল ও কষ্টসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন। এবং মীরাটে মোট তিন-চার মাস অবস্থানের পর, তিনি পুনরায় পরিব্রাজক জীবনের জন্য চঞ্চল হইলেন। বিশেষ, হৃষীকেশের সর্বসম্বলত্যাগী নিঃসঙ্গ সাধুদিগের স্মৃতি তাঁহাকে আরও উদ্বেল করিয়া তুলিল। পরবর্তীকালে তিনি বলিয়াছেন, "হৃষীকেশে আমি অনেক মহাপুরুষ দেখিয়াছি। একজনের কথা আমার মনে আছে। তিনি পাগলের ন্যায় থাকিতেন। একদিন তিনি নগ্নাবস্থায় রাস্তা দিয়া আসিতেছিলেন, আর ছেলেরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া তাঁহার দিকে পাথরের ঢিল ছুড়িয়া মারিতেছিল। ফলে, তাঁহার মুখ ও ঘাড় বহিয়া রক্ত পড়িতেছিল,—কিন্তু তিনি হাসিয়া কুটিপাটি। আমি তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া তাঁহার ক্ষত স্থানগুলি ধুইয়া দিলাম এবং রক্ত বন্ধ করিবার জন্য ন্যাকড়া পোড়াইয়া তাহার ছাই উহার উপর দিয়া দিলাম। কিন্তু ঐ সময়ে তিনি আগাগোড়াই উচ্চ হাসির সহিত আমাকে বলিতে লাগিলেন, 'ছেলেদের নিয়ে খুব মজার খেলা খেলা গেল! কি আনন্দ! বাবা এইভাবেই খেলেন!' ১

"এইরূপ সব মহাপুরুষগণের অনেকেই (নির্ঝঞ্ঝাটে তপস্যাদি করিবার জন্য) গোপনে থাকিতে ইচ্ছা করেন। এই জন্য তাঁহারা নানা কৌশল অবলম্বন করেন। একজনকে দেখিয়াছি, তিনি তাঁহার গুহার চারিপার্শ্বে মানুষের হাড় ছড়াইয়া রাখিয়া রটাইয়া দিয়াছিলেন যে তিনি মরা মানুষের মাংস খাইয়া জীবন ধারণ করেন। আর

১। "কেয়া মজেদার খেল, হ্যায়! বিলকুল বাবাকা খেল! কেয়া আনন্দ!"

একজন লোক দেখিলেই পাথর ছুড়িতেন। এই সব সন্ন্যাসীদের নিজেদের জন্য পূজা, তপস্যা বা তীর্থভ্রমণের কোন আবশ্যকতা থাকে না। তথাপি তাঁহারা যে এই সকল করেন তাহার হেতু—তাঁহারা ঐ সকলের দ্বারা পুণ্যসঞ্চয় করিয়া তাহা জগতের হিতে দান করেন।"

বস্তুতঃ এইরূপ একটি জীবন যাপনের জন্য স্বামীজী উন্মুখ হইয়া উঠিলেন। তাঁহারও প্রকৃতপক্ষে নিজের জন্য কোন তপস্যা, উপাসনা বা তীর্থভ্রমণের কোন প্রয়োজন ছিল না। শুধু জগতের হিত সাধনের নিমিত্তই তাঁহার জন্ম। তাই, তাঁহার সামনে ছিল—তাঁহার শ্রীগুরু-কথিত বিপুল কর্মরাশি। তাহা তাঁহার সমগ্র জীবন ও সব কিছু দিয়াই সুসাধিত করিতে হইবে। এবং তাহারই আহ্বান তাঁহার অন্তরে অনেকদিন হইতে বাজিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এখন মীরাটে তাহার অশ্রান্ত ধ্বনি তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল। তিনি তাঁহার গুরুভাইদের বলিলেন, "জীবনে যে কাজ আমার করতে হবে তা আমি জানতে পেরেছি। এবং আমার ভবিষ্যতের পথ সম্বন্ধেও আমি ভগবানের আদেশ লাভ করেছি। আমি এখন সত্বরই তোমাদের ছেড়ে একা সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকতে চাই।" ঐ সময়ে অখণ্ডানন্দ তাঁহার সহিত যাইবার অনুমতি চাহিলে তিনি বলেন, "গুরুভাইদের সঙ্গে থাকলে সাধনার বিশেষ বিঘ্ন হয়। দেখ না, তোমার ব্যারামে টিহিরিতে তপস্যা করতে পারলাম না। গুরুভাই'এর মায়া না কাটালে সাধন-ভজন হবে না। যখনই তপস্যা করব মনে করি, তখনই ঠাকুর একটা বাগড়া দেন। আমি এবার একলা বেরুব। কোথায় থাকব, কাউকে সন্ধান দেব না।" উত্তরে অখণ্ডানন্দ বলেন, "তুমি যদি পাতালেও যাও, সেখান থেকে যদি খুঁজে তোমায় বার করতে না পারি, আমার নাম গঙ্গাধর নয়।" ইহার অল্প পরেই, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের জানুআরি মাসের এক সকালবেলায় স্বামীজী তাঁহার গুরুভাইদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া একাকী দিল্লী চলিয়া গেলেন।

সতর

ভারত পরিক্রমা

চতুর্থ যাত্রা (১৮৯০-৯৩)—দ্বিতীয়াংশ

(পরিব্রাজক বেশে—রাজপুতানায়)

চতুর্থ যাত্রা—দ্বিতীয়াংশ—রাজপুতানায় :

দিল্লী হইয়া রাজপুতানার আলোয়ার, জয়পুর, আজমীঢ়, আবু পাহাড় ও খেতড়িতে :

দিল্লী পৌঁছিয়া স্বামীজী শ্যামলদাস শেঠের বাড়ীতে উঠিলেন। এবং দিল্লীর পুরাতন মুসলমান রাজত্বের স্মৃতিচিহ্ন সকল (কেল্লা, রাজপ্রাসাদ ও কবরখানা প্রভৃতি) বিশেষ যত্নের সহিত দেখিলেন।

তিনি মীরাট হইতে চলিয়া আসার অল্প কয়েকদিন পরে, তাঁহার গুরুভাইগণও দিল্লী আসিলেন। তাহাদের আগমনের উদ্দেশ্যও ছিল ঐ পুরাতন রাজধানীর স্মৃতি-সৌধ সকল দর্শন করা। কিন্তু তাহারা আসিয়া শুনিলেন যে, বিবিদিষানন্দ নামে একজন ইংরেজী-জানা সাধু সেখানে আছেন। এবং কৌতুহলবশতঃ তাঁহাকে দেখিতে গিয়া তাহারা দেখিলেন তিনিই স্বামীজী! ইহাতে স্বামীজী বিরক্ত হইলেন এবং বলিলেন, "আমি তোমাদের বলেছি, আমি একা থাকতে চাই। আমার পিছন নিও না, এই আমার আদেশ। আমি আজই দিল্লী ছেড়ে যাব।"

স্বামীজী মুখে এইরূপ বলিলেও, আরও কয়েকদিন দিল্লী রহিলেন। তখন দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হেমচন্দ্র সেনের সহিত তাঁহার আলাপ হয় এবং তাহার বাড়ীতে একদিন এক বৈঠকে তিনি তাহার ও স্থানীয় কলেজের অধ্যাপকগণের বহু প্রশ্নের জবাব দেন ও তাহাদের সহিত নানা বিষয় আলোচনা করেন। সেদিন তাহারা সকলেই স্বামীজীর অগাধ পাণ্ডিত্য দেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হন। হেমবাবু তাঁহার ও

তাঁহার গুরুভাইগণের বিশেষ ভক্ত হইয়া উঠেন ও একদিন তাঁহাদের তাহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া আহার করান।

দিল্লী হইতে সারদানন্দ ও সান্ন্যাল মহাশয় এটাওয়ায়, ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দ পাঞ্জাবে এবং অখণ্ডানন্দ বৃন্দাবনে যান। সর্বশেষে স্বামীজী একাকী রাজপুতানার অভিমুখে রওনা হইলেন।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাসের প্রথমভাগে তিনি একদিন সকালবেলায় রেলগাড়ী হইতে আলোয়ার স্টেশনে অবতরণ করিলেন। এবং তথাকার রাজপথ বাহিয়া পার্শ্বস্থ বহু উদ্যান, সবুজ ক্ষেত্র ও অট্টালিকাদি অতিক্রম করিয়া পরিশেষে স্থানীয় সরকারী চিকিৎসালয়ের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোককে দণ্ডায়মান দেখিয়া তিনি তাহাকে বাংলা ভাষাতেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, এখানে সন্ন্যাসীদের থাকবার কোন জায়গা আছে কি?" ঐ ভদ্রলোক উক্ত চিকিৎসালয়ের ডাক্তার ছিলেন, নাম গুরুচরণ লস্কর। তিনি স্বামীজীর তেজপূর্ণ অপূর্ব চেহারায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আনত হইয়া প্রণাম করিলেন ও তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বাজারে গিয়া একটি দোকানের দ্বিতলস্থিত একখানি ঘর দেখাইয়া বলিলেন, "এখানে সন্ন্যাসীরা থাকেন। আপনি আপাততঃ এখানে থাকতে পারবেন কি?" স্বামীজী সম্মতি জানাইলে তিনি তাঁহাকে সেখানে রাখিয়া, তাহার এক মুসলমান বন্ধুর নিকট গিয়া বলিলেন, "মৌলবী সাহেব! এইমাত্র একজন বাঙ্গালী দরবেশ এখানে এসেছেন। এমন মহাত্মা পূর্বে কখন দেখিনি! আপনি আসুন, তাঁর সঙ্গে কথা বলুন, আমি আমার কাজ সেরে আবার এখনই আসব।" মৌলবী সাহেব স্থানীয় হাইস্কুলের উর্দু ও ফার্সির শিক্ষক ছিলেন। তিনি জুতা খুলিয়া গুরুচরণ বাবুর সহিত স্বামীজীর ঘরে গিয়া তাঁহাকে সেলাম করিলেন। তখন স্বামীজীর সঙ্গে ছিল মাত্র একখানি গেরুয়া কাপড়, একটি দণ্ড, একটি কমণ্ডলু ও কম্বলে জড়ান কয়েকখানি বই।

তিনি গুরুচরণবাবু ও মৌলবীসাহেবকে নিকটে বসাইয়া ধর্মবিষয়ে

নানা আলাপ করিতে লাগিলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "কোরাণের একটা বিশেষত্ব এই যে, উহা এগারশত বৎসর পূর্বে যেমন ছিল, এখনও ঠিক তেমনিই আছে। উহার মৌলিক বিশুদ্ধতা আজও অক্ষুন্ন —কেউ ওর ভিতর কিছু প্রক্ষেপ করতে পারে নি।" তাঁহার কথা-বার্তায় দুইজনেই বিশেষ মুগ্ধ হইলেন। গুরুচরণবাবু তাঁহার ডাক্তার-খানায় ফিরিয়া সমাগত লোকদের প্রত্যেককেই বলিলেন যে, একজন খুব বড় সাধু এখানে আসিয়াছেন। মৌলবীসাহেবও তাহার মুসলমান বন্ধুদের ঐ সংবাদ দিলেন। ফলে, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অনেক লোক স্বামীজীর নিকট যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বামীজী তাহাদের ধর্মোপদেশ দিতে দিতে মাঝে মাঝে উর্দু গান, হিন্দী ভজন এবং বাঙ্গালা কীর্তন ও চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ প্রভৃতি বড় বড় সাধকদের রচিত সঙ্গীত গাহিয়া শুনাইতেন। আবার কখন কখন তিনি বেদ, উপনিষদ্, বাইবেল ও পুরাণ ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়া এবং বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, নানক, চৈতন্য, তুলসীদাস, কবীর, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের জীবনের নানা ঘটনা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করিয়া তাঁহার ধর্মব্যাখ্যা সরস ও সহজ-বোধ্য করিতেন।

এইভাবে কয়েকদিন কাটিবার পর, লোকসমাগম এত বেশী হইতে লাগিল যে স্বামীজীর ঘর ও বারান্দায় তাহাদের ধরিত না। তখন কয়েকজন অবস্থাপন্ন লোক পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে (আলোয়ার স্টেটের অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার) পণ্ডিত শম্ভুনাথজীর বাড়ীতে লইয়া গেলেন। সেখানে স্বামীজী নিয়ম করিয়া প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠিয়া বেলা নয়টা পর্যন্ত ধ্যান-জপাদি করিতেন এবং তারপর তাঁহার ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দ্বিপ্রহর পর্যন্ত এবং পরে পুনরায় সন্ধ্যার সময় সমাগত ব্যক্তিদের নিকট ধর্মব্যাখ্যা করিতে ও তাহাদের প্রশ্নাদির উত্তর দিতে নিযুক্ত হইতেন। তবে সান্ধ্য আসরেই লোক অনেক অধিক হইতে এবং কোন কোন দিন সভা মধ্যরাত্রি পর্যন্ত চলিত। এইভাবে যাহারা স্বামীজীর ধর্মোপদেশ শুনিতে আসিতেন তাহাদের

মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, ধনী, দরিদ্র, যুবা, বৃদ্ধ, প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকই থাকিত। স্বামীজী তাহাদের সকলের সঙ্গেই সমান ব্যবহার করিতেন এবং অপূর্ব ধৈর্যের সহিত তাহাদের প্রত্যেকের সমস্ত প্রশ্নেরই যথোচিত উত্তর দিতেন। এমন কি, তিনি যখন উচ্চতম আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকল ব্যাখ্যা করিতে নিযুক্ত থাকিতেন, তখনও যদি কেহ কোন অনাবশ্যক বা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করিয়া বসিতেন, তিনি বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর দিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একদিন এইরূপ অবস্থায় হঠাৎ একজন প্রশ্ন করিলেন, "মহারাজ, আপকা শরীর কিস্ জাতিকা হ্যায়?" স্বামীজী দ্রুত উত্তর দিলেন, "ইয়ে কায়স্থ শরীর হ্যায়।" এইভাবে অপর একজন একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "মহারাজ আপনি গেরুয়া পরেন কেন?" স্বামীজী উত্তরে বলেন, "কারণ, ইহা ভিক্ষুকের পোষাক। আমি সাদা কাপড় পরে ভ্রমণ করলে, দরিদ্র ভিক্ষুকগণ আমার নিকট ভিক্ষা চাইবে। কিন্তু আমি নিজে ভিক্ষুক, ভিক্ষা কোথা থেকে দেব? অথচ, কেউ চাইলে না দিতে পারলে আমি বড় কষ্ট পাই। তাই আমি গরীবের পোষাক পরি,—আমাকে দেখলেই তারা বুঝতে পারে এও তাদেরই মত একজন, এর কাছে আর কি চাইব?" গৈরিক পরিধানের এই নূতন হৃদয়-স্পর্শী ব্যাখ্যা সকলকেই মুগ্ধ করে।

জানা যায়, স্বামীজী যখন মাতৃ-উপাসনার কথা বলিতেন, তখন তাঁহার সমস্ত প্রাণ যেন উথলিয়া উঠিত। ঐ সময়ে তিনি তাঁহার সুমধুর কণ্ঠে যে মার নাম করিতেন, তাহা ক্রমশঃ অনুচ্চ ও অস্ফুট হইতে হইতে পরিশেষে (যেন তাঁহার আত্মার সহিতই ভ্রমণ করিতে করিতে) সুদূরে গিয়া মিলাইয়া যাইত। এবং তখন তাঁহার নিমীলিত চক্ষু দুইটি হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে থাকিত এবং উপস্থিত ভক্তেরাও তাঁহার ভাবে আবিষ্ট হইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেন। রাত্রির আসরে সঙ্গীতাদির সময়ে এইরূপ একটা ভাব-তরঙ্গের বিকাশ প্রায়ই দেখা যাইত এবং তখন অনেকে তাঁহার গলার সহিত গলা মিলাইয়া গান গাহিতে রত হইতেন।

এইভাবে স্বামীজীর কথা, উপদেশ ও সঙ্গীতাদি শুনিয়া বহু লোক তাঁহার ভক্ত হইয়া উঠিল। এবং তাহাদের কয়েকজনকে তিনি মন্ত্রদীক্ষাও দিলেন। পূর্বোক্ত মৌলবী সাহেব মুসলমান হইয়াও ছিলেন স্বামীজীর একজন বিশেষ অনুরক্ত ভক্ত। তাই, তাহার ইচ্ছা হইল তিনি তাঁহাকে একদিন তাহার বাড়ীতে লইয়া আহার করাইবেন। তিনি ভাবিলেন, "স্বামীজী একজন শ্রেষ্ঠ ফকির, তাঁহার নিকট জাতিভেদ নাই, কিন্তু যাহার বাড়ীতে তিনি আছেন সেই পণ্ডিতজী (অর্থাৎ শম্ভুনাথজী) আপত্তি করিতে পারেন।" এইরূপ ভাবিয়া, তিনি একদিন সন্ধ্যাকালে পণ্ডিতজীর নিকট গিয়া জোড়হস্তে সকলের সম্মুখে বলিলেন, "পণ্ডিতজী, আপনারা সকলে অনুমতি করলে, আমি আগামী কাল বাবাজীকে আমার বাড়ীতে নিয়ে আহার করাই। আপনাদের সকলের সন্তোষের জন্য, আমি ব্রাহ্মণের দ্বারা আমার বৈঠকখানার সমস্ত আসবাবপত্র ধোয়াব এবং ব্রাহ্মণের দ্বারা বাজার করিয়ে তাদের বাড়ীর পাত্রে তাদের দ্বারাই রান্না করাব। স্বামীজী ঐ ঘরে বসে এই যবনের সেবা গ্রহণ করছেন, এ সে দূর থেকে দেখেই কৃতার্থ হবে।" মৌলবী সাহেব তাহার এই কথাগুলি এরূপ আন্তরিক দীনতার সহিত বলিলেন যে তাহাতে উপস্থিত কেহই তাহার প্রার্থনায় আপত্তি করিতে পারিলেন না। এবং পণ্ডিতজী তাহার দুই হাত ধরিয়া বলিলেন, "দোস্ত, স্বামীজী দরবেশ, তাঁর আবার জাত কি? তোমার এত কষ্ট করবার কোন দরকার নেই। তোমার যেরূপ সুবিধা হয় সেইরূপ ব্যবস্থা ক'রো। আমার কোন আপত্তিই হবে না। তুমি যে ব্যবস্থার কথা বললে, তাতে জীবন্মুক্ত স্বামীজী কেন, আমিও তোমার বাড়ীতে আহার করতে পারি।" পরদিন মৌলবী সাহেবের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া স্বামীজী তাহার বাড়ীতে আহার করিলেন। এবং তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আরও কতিপয় ভক্ত মুসলমান স্বামীজীকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ নিজ বাড়ীতে লইয়া ভোজন করাইলেন।

কিছুদিন পরে আলোয়ার-রাজের দেওয়ান (মেজর রামচন্দ্রজী)

শুনিলেন, একজন খুব বড় সাধু শহরে আছেন। এবং তিনি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ বাড়ীতে আনিয়া আলাপ-পরিচয়ে বুঝিলেন যে, ইহার প্রভাবে সাহেবিভাবাপন্ন আলোয়ারের মহারাজার কিছু উপকার হইতে পারে। তাই, তিনি স্বামীজীকে নিজ বাটীতে রাখিয়া মহারাজকে লিখিলেন, "একজন খুব বড় সাধু শহরে আছেন। ইংরেজি ভাষায় তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য।" মহারাজা মঙ্গল সিং এই সময়ে শহর হইতে দুই-তিন মাইল দূরবর্তী একটি নিভৃত প্রাসাদে বাস করিতেছিলেন। দেওয়ানের পত্র পাইয়া তিনি পরের দিনই তাহার বাড়ীতে আসিয়া স্বামীজীকে দর্শন ও প্রণাম করিলেন। এবং তৎপর তাঁহাকে নিজের সম্মুখে বসাইয়া তাঁহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

মহারাজা প্রথমেই স্বামীজীকে প্রশ্ন করিলেন, "স্বামীজী মহারাজ, শুনেছি আপনি একজন মহাবিদ্বান ব্যক্তি, ইচ্ছা করলেই প্রচুর অর্থ রোজগার করতে পারেন। কিন্তু তথাপি আপনি ভিক্ষা করে বেড়ান কেন?" উত্তরে স্বামীজী একটি পাল্টা প্রশ্ন করিলেন, "মহারাজ, আপনি বলতে পারেন, আপনি রাজকার্য অবহেলা করে দিন-রাত সাহেবদের সঙ্গে শিকার ইত্যাদি বৃথা আমোদ-প্রমোদে কালক্ষেপ করেন কেন?" স্বামীজীর প্রশ্ন শুনিয়া উপস্থিত সভাসদ্‌গণ স্তম্ভিত হইলেন এবং আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে এই দুঃসাহসিক সাধুর কপালে যথেষ্ট দুর্ভোগ আছে। কিন্তু মহারাজা চঞ্চল হইলেন না এবং একটু চিন্তা করিয়া ব'ললেন, "কেন আমি ঐরূপ করি তা বলতে পারি না, তবে ও আমার ভাল লাগে বলে যে করি তা ঠিক।" তখন স্বামীজী হাসিয়া কহিলেন, "ঐ একই কারণে আমিও ফকির বেশে ঘুরে বেড়াই।"

ইহার পর মহারাজা তাঁহার দ্বিতীয় প্রশ্ন করিলেন, "দেখুন বাবাজী মহারাজ, মূর্তিপূজায় আমার কোন বিশ্বাস নেই। এর ফলে আমার কি দশা ঘটবে?" এই কথাগুলি তিনি ঈষৎ হাসির সহিত বলায়, স্বামীজী একটু বিরক্তির ভাবেই বলিলেন, "আপনি বোধ হয় রহস্য

করছেন।" মহারাজ কহিলেন, "না স্বামীজী, তা মোটেই নয়। সত্যিই আমি অন্য লোকদের মত মাটি, কাঠ, পাথর বা ধাতুর পূজা করতে পারি না। এতে কি পরকালে আমার অধোগতি হবে?" স্বামীজী বলিলেন, "দেখুন, আমি মনে করি ধর্মবিষয়ে যার যেমন বিশ্বাস তার সেই ভাবেই চলা উচিত।" স্বামীজীর এই উত্তর শুনিয়া তাঁহার ভক্তেরা বিস্মিত হইলেন, কারণ তাহারা জানিতেন যে তিনি মূর্তিপূজা সমর্থন করেন। কিন্তু বাস্তবিক স্বামীজী তখনও তাঁহার জবাব শেষ করেন নাই। দেওয়ালে টাঙ্গান মহারাজার একখানা ফটোগ্রাফ দেখিয়া তিনি তাহা নামাইয়া আনিতে বলিলেন। এবং উহা হাতে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কার ছবি?" দেওয়ান উত্তর দিলেন, "মহারাজের।" তখন স্বামীজী বলিলেন, "এর ওপর থুথু ফেলুন।" শুনিয়া সকলে ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন। স্বামীজী পুনরায় বলিলেন, "আপনারা যে কেউ এর ওপর থুথু ফেলতে পারেন। এ তো এক টুক্‌রা কাগজ বই তো আর কিছু নয়! এর ওপর থুথু ফেলতে আপনাদের কি আপত্তি থাকতে পারে?" সকলেই ভয়ে স্তব্ধ হইয়া একবার স্বামীজীর ও একবার মহারাজের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। কিন্তু স্বামীজী জোরের সহিত অনবরতই বলিতে লাগিলেন, "আমি বলছি, আপনারা এর ওপর থুথু ফেলুন, এ এক টুকরা কাগজ মাত্র!" পরিশেষে দেওয়ান ভয়ে দিশেহারা হইয়া বলিলেন, "আপনি কি বলছেন, স্বামীজী? এ আমাদের মহারাজার ছবি! এর ওপর আমরা থুথু ফেলব কি করে?" স্বামীজী কহিলেন, "তাইই বটে। কিন্তু এই ফটোর ভেতর মহারাজা সশরীরে উপস্থিত নেই। এ এক টুকরা কাগজ মাত্র। এতে তার হাড়, মাংস বা রক্ত কিছুই নেই। এ মহারাজার মত নড়ে না, চলে না, কথা বলে না। তবু আপনারা সকলেই এর ওপর থুথু ফেলতে অস্বীকার করছেন। এর হেতু এই যে, এই ফটোতে আপনারা মহারাজার একটা ছায়া দেখতে পান এবং তার জন্যে আপনারা অনুভব করেন যে এতে থুথু ফেললে স্বয়ং মহারাজাকেই অপমান করা হবে।" ইহা বলিয়া তিনি

মহারাজার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "দেখুন মহারাজ, যদিও এক অর্থে আপনি এই ফটো নন, তথাপি আর এক অর্থে আপনিই ইহা। এই জন্যেই আমি যখন এর উপর আপনার কর্মচারীদের থুথু ফেলতে বললাম, তারা দিশেহারা হয়ে পড়ল। এর ভেতর আপনার ছায়া আছে, এ দেখলে আপনার কথাই তাদের মনে আসে ও তারা বস্তুতঃ আপনাকেই দেখে। তাই, তারা আপনাকে যতটা সম্মান করেন, এই ফটোকেও ঠিক তাই করেন।

"মূর্তি-উপাসকদের কথাও ঠিক এইরূপ। মূর্তি তাদের ইষ্টের কথাই মনে জাগায় ও ইষ্টের উপর মনকে একাগ্র করতে সাহায্য করে, তাই তারা ভগবানকে ঐ মূর্তির ভিতরই পূজা করে। তারা পাথর বা ধাতু উপাসনা করে না। আমি অনেক স্থানে বেড়িয়েছি, কিন্তু আমি কোন হিন্দুকেই মূর্তি-উপাসনাকালে বলতে শুনিনি, 'হে পাথর, আমি তোমাকে উপাসনা করছি! হে ধাতু, আমাকে দয়া কর!' মহারাজ, সকলেই সেই জ্ঞানস্বরূপ একই ঈশ্বরকে পূজা করছে। শুধু যার যেমন ভাব, তার নিকট তিনি সেইরূপেই প্রকাশিত হন।"

স্বামীজী থামিলে মহারাজ মঙ্গল সিং করজোড়ে কহিলেন, "স্বামীজী, আপনি যা বললেন তা খুবই সত্য। আমিও কখন কাউকে পাথর, কাঠ বা ধাতু পূজা করতে দেখিনি। আমি পূর্বে মূর্তিপূজার অর্থ বুঝতে পারিনি। আজ আপনার কথা শুনে আমার চক্ষু খুলেছে। কিন্তু আমার কি গতি হবে? আপনি আমাকে কৃপা করবেন।" স্বামীজী বলিলেন, "কৃপা করবার অধিকার একমাত্র ভগবানেরই আছে। তাঁর কাছে প্রার্থনা করুন, তিনি আপনাকে কৃপা করবেন।"

স্বামীজী চলিয়া গেলে মহারাজা কহিলেন, "দেওয়ানজী, আমি এরূপ মহাত্মা পূর্বে কখন দেখিনি। এঁকে আপনি আর কিছুদিন আপনার কাছে রাখুন।" দেওয়ানজী বলিলেন, "আমি চেষ্টার ত্রুটি করব না। কিন্তু কৃতকার্য হব কিনা বলতে পারি না। কারণ, ইনি অত্যন্ত তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা।" যাহা হউক, অনেক অনুরোধের পর স্বামীজী আর কয়েকদিন দেওয়ানের বাড়ীতে থাকিতে সম্মত

হইলেন। তবে সর্ত করাইয়া লইলেন, ধনী ও পদস্থ ব্যক্তিদের ন্যায় দরিদ্র ও অশিক্ষিত লোকেরাও অবাধে তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতে পারিবে।

আলোয়ারে স্বামীজী মোট প্রায় দেড়মাস কাল ছিলেন। এবং জানা যায়, সেখানে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া অনেকের জীবনের গতি পরিবর্তিত হইয়াছিল। তাঁহার উপদেশ ও প্রেরণায় অনেক যুবক সংস্কৃত অধ্যয়নে রত হন। তিনি তাহাদের বলিতেন, "সংস্কৃতের সঙ্গে পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানও পড়বে। পড়ো, খাটো, নির্ভুল (accurate) হতে শিক্ষা কর, যাতে এমন দিন আসে যখন তোমরা তোমাদের দেশের ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। বর্তমানে ঐ ইতিহাসের সবই আগোছাল অবস্থায় আছে। ইংরাজদের লেখা ইতিহাস আমাদের মনে শুধু দুর্বলতাই সৃষ্টি করে, কারণ ওতে কেবল আমাদের অধঃপতনের কথাই লেখা হয়েছে। বিদেশী লেখকগণ আমাদের ধর্ম, দর্শন, সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি কিছুই বোঝে না, তাই তাদের দ্বারা ভারতবর্ষের নির্ভুল ও নিরপেক্ষ ইতিহাস রচিত হওয়া অসম্ভব। তথাপি ঐতিহাসিক গবেষণা কি করে করতে হয়, তা তারা আমাদের দেখিয়েছে। এখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে বেদ, পুরাণ, পুরাতন ইতিবৃত্ত ইত্যাদি অধ্যয়ন করা ও তা থেকে দেশের নির্ভুল ও মহাপ্রাণপ্রদ ইতিহাস রচনা করা। তাই, তোমরা ঐ কাজে লেগে যাও। দেশের গুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় রত্নরাজিকে বিস্মৃতির হাত থেকে রক্ষা কর। ভারতের অতীত গৌরবকে দেশবাসীর মনে প্রতিষ্ঠিত কর। এবং তাহাই বস্তুতঃ প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা হবে এবং তারই প্রসারে ভারতে প্রকৃত জাতীয় চেতনা জাগ্রত হবে।"

ইহা ব্যতীত, তিনি তাঁহার ভক্তদের সকলকেই বলিতেন, "সত্য লাভের জন্য চাই পুরুষকার, নিজের আপ্রাণ চেষ্টা। যে নিজে নিজের জন্য খাটতে চায় না, তাকে ভগবান কি দয়া করবেন? তাই, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সর্বপ্রকার দুর্বলতা পরিত্যাগ করে অনাসক্তভাবে

স্বধর্ম পালন করতে উপদেশ দিয়েছেন। তোমরা সবল হও, শক্তিমান হও, নিজের পুরুষকার প্রকাশ কর। যে সবল ও শক্তিমান, সে অসৎ হলেও তার ওপর আমার শ্রদ্ধা হয়, কারণ তার ঐ শক্তিই একদিন তাকে অসৎ-প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়ে দ্রুত উন্নতির পথে চালিত করবে। কিন্তু যে দুর্বল, তার সদিচ্ছা থাকলেও তার দ্বারা কোনও কার্যই সিদ্ধ নয় না।"

বস্তুতঃ যাহারা নিশ্চেষ্ট, নিরুদ্যম ও আন্তরিকতাশূন্য স্বামীজী তাহাদের কোন দিনই সহ্য করিতে পারিতেন না। আলোয়ারের একটি বৃদ্ধ রোজই আসিয়া স্বামীজীর আশীর্বাদ চাহিতেন, কিন্তু তাঁহার উপদেশের কিছুই পালন করিতেন না। এইজন্য স্বামীজী একদিন তাহাকে আসিতে দেখিয়া হঠাৎ নীরব ও গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন এবং তাহার কোন প্রশ্নেরই জবাব না দিয়া অপর সকলের সঙ্গেও বাক্যালাপ বন্ধ রাখিলেন। এইভাবে দেড় ঘণ্টাকাল অতিবাহিত হইলে, ঐ বৃদ্ধটি ক্রোধে অধীর হইয়া নিজমনে বকিতে বকিতে চলিয়া গেলেন। তখন স্বামীজী হাসিয়া সকলকে বলিলেন, "এই লোকটি সমস্ত জীবন ইন্দ্রিয়-সম্ভোগে কাটিয়েছে, এখন ঐহিক-পারমার্থিক সকল কাজেই অশক্ত, আর মনে করে শুধু মুখের চাওয়াতেই ও ভগবানের কৃপা লাভ করতে পারবে।"

অন্যদিকে দেখা যায়, স্বামীজী তাঁহার আত্মচেষ্টাসম্পন্ন ভক্তদের, বিশেষভাবে উদ্যমশীল যুবক ভক্তদের, জন্য সব কিছুই করিতে প্রস্তুত ছিলেন। এইরূপ একটি ব্রাহ্মণ বালকভক্তের কথা জানা যায়। অর্থাভাবে তাহার উপনয়ন হইতেছে না জানিয়া, স্বামীজী তাঁহার সঙ্গতিসম্পন্ন ভক্তদের চাঁদা তুলিয়া তাহার ঐ কার্য উদ্ধার করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। এবং ঐ কার্য সমাধা হইবার পূর্বেই তিনি আলোয়ার ত্যাগ করায়, প্রায় এক মাস পরে আবু পাহাড় হইতে তিনি আলোয়ারের একটি ভক্তের নিকট এক পত্রে (৩০শে এপ্রিল, ১৮৯১) ঐ বিষয়ের খোঁজ লন।

যাহা হউক, ভক্তদের অনুরোধে ও তাহাদের সন্তোষ বিধান

করিয়া স্বামীজী ছয় সপ্তাহাধিক কাল আলোয়ারে থাকিয়া পুনরায় পরিব্রাজক জীবনের জন্য ব্যাকুল হইলেন। তাই, তিনি তাহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া (১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ তারিখে) ঐ স্থান পরিত্যাগ করিলেন। ভক্তদের একান্ত অনুরোধে তিনি (গরম এড়াইবার জন্য) আঠার মাইল দূরবর্তী পাণ্ডুপোল গ্রাম পর্যন্ত গরুর গাড়ীতে গেলেন ও কয়েকজন ভক্তকেও প্রথম পঞ্চাশ-ষাট মাইল পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গে যাইবার অনুমতি দিলেন।

পাণ্ডুপোল পৌঁছিয়া স্বামীজী সেখানকার বিখ্যাত হনুমানজীর মন্দিরের প্রাঙ্গণে রাত্রি যাপন করিলেন। এবং পরদিন প্রভাতে তিনি গরুর গাড়ী ছাড়িয়া দিয়া, ভক্তদের সহিত পদব্রজে ষোল মাইল দূরবর্তী টাহলা গ্রামে রওনা হইলেন। এই পথটি হিংস্রজন্তু পূর্ণ এক বনজঙ্গলময় পার্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সঙ্গের ভক্তেরা স্বামীজীর (হাস্যকৌতুক ও উপদেশাদি পূর্ণ) নানারকমের গল্প ও কথা শুনিতে শুনিতে নির্ভয়ে মহানন্দে ঐ পথ অতিক্রম করিলেন। টাহলায় তাঁহারা নীলকণ্ঠ মহাদেবের প্রাচীন মন্দিরে রাত্রি কাটাইলেন। পরদিন সকালে তাঁহারা তথা হইতে হাঁটিয়া আঠারো মাইল দূরবর্তী নারায়ণী গ্রামে পৌঁছিয়া সেখানকার প্রসিদ্ধ দেবী-মন্দির দর্শন করিলেন। এইখানে স্বামীজী তাঁহার অনুগামী ভক্তদের বিদায় দিয়া, একাকী ষোল মাইল দূরবর্তী বস্‌ওয়া গ্রামে পৌঁছিলেন ও তথা হইতে রেলগাড়ীতে জয়পুর রওনা হইলেন।

আলোয়ারে দীক্ষিত একটি শিষ্যের অনুরোধে স্বামীজী জয়পুরে আসেন ও সেখানে দুই সপ্তাহকাল থাকেন। ঐ সময়ে উক্ত শিষ্যটি অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া তাঁহার পরিব্রাজক জীবনকালের প্রথম ছবি তোলেন।

জয়পুরে একজন ব্যাকরণবিদের সহিত স্বামীজীর পরিচয় হয়। এবং তিনি তাঁহার নিকট (পাণিনি সূত্রের) পতঞ্জলির মহাভাষ্য পড়িতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু পণ্ডিতজীর নিজের অগাধ পাণ্ডিত্য

থাকিলেও, অপরকে বুঝাইতে সুপটু ছিলেন না। তাই, তিনি তিন দিন ধরিয়া চেষ্টা করিয়াও প্রথম সূত্রটির ভাষ্য-ব্যাখ্যা স্বামীজীর নিকট পরিষ্কার করিতে পারিলেন না। এবং চতুর্থ দিন তিনি বলিলেন, "স্বামীজী, আমার নিকট পড়িয়া যে আপনার কোন উপকার হইবে তাহা মনে হয় না। আমি তিন দিনেও আপনাকে একটি সূত্রের অর্থ বুঝাইতে পারিলাম না।" পণ্ডিতজীর এই উক্তিতে স্বামীজী লজ্জিত হইয়া, নিজেই ঐ সূত্রটির অর্থ আয়ত্ত করিতে নিযুক্ত হইলেন। এবং মাত্র তিন ঘণ্টা পরে তিনি পুনরায় পণ্ডিতজীর নিকট ফিরিয়া আসিয়া সূত্রটির ভাষ্য ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শুনিয়া পণ্ডিতজী যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। এবং ইহার পর হইতে স্বামীজী অনায়াসেই সূত্রের পর সূত্র ও অধ্যায়ের পর অধ্যায় বুঝিয়া যাইতে লাগিলেন।

জয়পুরের প্রধান সেনাপতি সর্দার হরি সিং'এর সহিত স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় এবং তাঁহার বাড়ীতে তিনি কয়েকদিন ধর্মবিষয়ে নানা আলোচনা করেন। একদিন আলোচনার বিষয় ছিল মূর্তিপূজার কার্যকারিতা। হরি সিং ছিলেন দৃঢ় বেদান্তবাদী এবং স্বামীজীর সঙ্গে কয়েকঘণ্টা আলোচনা করিয়াও তিনি মূর্তিপূজায় আস্থাবান হইতে পারিলেন না। পরে বৈকালবেলায় বেড়াইতে বাহির হইয়া তাঁহারা দেখিলেন, কতকগুলি লোক শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ সহ গান গাহিতে গাহিতে যাইতেছে। শোভাযাত্রাটি নিকটে আসিলে, স্বামীজী হরি সিংকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "দেখুন—ভগবানের জীবন্ত বিগ্রহ।" তখন হরি সিং শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের দিকে তাকাইয়াই স্তব্ধ ও নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং তৎসঙ্গে তাঁহার দুই চোখ হইতে জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। যখন তাঁহার হুঁস হইল, তখন তিনি বিগলিত কণ্ঠে স্বামীজীকে বলিলেন, "স্বামীজী, বহু তর্ক করেও যা বুঝতে পারিনি, তা আজ আপনার কৃপা-স্পর্শে বুঝতে পারলাম। সত্যই আমি ঐ কৃষ্ণমূর্তিতে ভগবানের দর্শন লাভ করেছি।"

জয়পুরের আর একটি কাহিনী এইরূপ। স্বামীজী একদিন কতিপয় ভক্তকে ধর্মোপদেশ দিতেছিলেন। এমন সময়ে জয়পুরের বিখ্যাত পণ্ডিত সর্দার সূরয নারায়ণ তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন ও তাঁহার একটি কথার সূত্র ধরিয়া বলিলেন, "স্বামীজী, আমি একজন বেদান্ত-বাদী। ভগবানের কোন বিশেষ অবতারে আমার বিশ্বাস নেই। আমরা সকলেই ব্রহ্ম। সুতরাং আমাতে ও অবতারে প্রভেদ কি?" শুনিয়া স্বামীজী উত্তর দিলেন, "আপনি যা বলছেন তা ঠিক। (আপনার মতানুসারে) আপনিও অবতার। তবে হিন্দুরা মৎস্য, কচ্ছপ ও বরাহকেও অবতার বলে। তাই, আপনি এর কোন্‌টি বলে আপনার মনে হয়?" শুনিয়া সভায় হাসির রোল উঠিল এবং সর্দারজী অপ্রস্তুত হইয়া নীরব হইলেন। দেখা যায়, স্বামীজী অনেক সময়ে তাঁহার অবুঝ ও একগুয়ে প্রতিপক্ষদের এই প্রকারের পরিহাসের দ্বারা নিরস্ত করিতেন।

জয়পুর হইতে স্বামীজী আজমীঢ় গেলেন (১৪ই এপ্রিল, ১৮৯১)। সেখানে তিনি অল্প কয়েক দিন থাকিয়া হিন্দু ও মুসলমান আমলের পুরাতন স্মৃতি-সৌধ সকল দর্শন করিলেন। এবং তৎপর তথা হইতে তিনি (রাজপুতানা ও মধ্য ভারতের বিখ্যাত শৈলাবাস) রমনীয় আবু পাহাড়ে আসিলেন (এপ্রিল—শেষার্ধ, ১৮৯১)।

আবু পাহাড়ে স্বামীজী একটি পরিত্যক্ত গুহায় রহিলেন। সেখানকার প্রসিদ্ধ জৈন মন্দিরের অপূর্ব কারুকার্য তিনি বিশেষ যত্নের সহিত দেখিলেন। এবং অতি অল্পকালের মধ্যে সেখানেও তাঁহার একদল ভক্ত জুটিল। তাহাদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ভ্রমণে বাহির হইতেন। এইভাবে একদিন ভক্তগণ সহ বেড়াইতে গিয়া তিনি আবু লেকের উচ্চ তীরে বসিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া গান গাহেন। তখন তাঁহার সুমিষ্ট সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া কয়েকজন ইওরোপীয় ভদ্রলোক অদূর হইতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহার ঐ গান শুনেন এবং তিনি যখন ফিরিয়া

যাইতেছিলেন, তখন তাঁহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ও ভাবপূর্ণ সঙ্গীতের জন্য তাঁহাকে তাহাদের অভিবাদন জ্ঞাপন করেন।

বিধাতার ব্যবস্থায় আবু পাহাড়ে স্বামীজী খেতড়ির মহারাজার সঙ্গে পরিচিত হইলেন। এই অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি যেভাবে সংঘটিত হয় তাহা এই। স্বামীজী তাঁহার নির্জন গুহায় ধ্যান, জপ ও নানা কৃচ্ছ্রসাধনে দিন কাটাইতেন। একদিন একটি দেশীয় রাজার মুসলমান উকীল ঐ গুহার নিকট দিয়া যাইবার সময় তাঁহাকে দেখিতে পান এবং তাঁহার অপূর্ব দীপ্তিপূর্ণ চেহারা দেখিয়া অতিমাত্রায় বিস্মিত ও আকৃষ্ট বোধ করেন। নিকটে গিয়া তাঁহার সহিত কয়েক মিনিট কথা বলিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন সাধুটির জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের কোন তুলনা নাই। তাই, তিনি তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া প্রায়ই তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। এবং একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "স্বামীজী, এই গুহাটি যারপরনাই খারাপ। আমি একা একটি উত্তম বাংলোতে বাস করি। আপনি যদি আমার ওখানে এসে থাকেন, তা হলে আমি নিজেকে ধন্য বোধ করব।" স্বামীজী সম্মত হইয়া তাহার বাড়ীতে আসিয়া রহিলেন। এবং তাহার মাধ্যমে আবু পাহাড়ে (কোটার রাজার উকীল ও তাঁহার মন্ত্রী ঠাকুর ফতে সিংহ প্রভৃতি) অনেক উচ্চপদস্থ লোকের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব জন্মিল। একদিন উক্ত মুসলমান উকীলটির আমন্ত্রণে ক্ষেতড়ির মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী মুন্সী জগমোহনলাল তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। স্বামীজী তখন শুধু কৌপীন ও একখানি বহির্বাস পরিয়া একটি খাটিয়ার উপর শুইয়া ঘুমাইতেছিলেন। তাঁহাকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া জগমোহনলাল মনে করিলেন, "একজন অতি সাধারণ সাধু,—হয়তো বা চোর-বদ্‌মায়েস্।" একটু পরেই স্বামীজীর ঘুম ভাঙ্গিল এবং তিনি উঠিয়া বসিলেন। তখন জগমোহনলাল তাঁহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামীজী, আপনি একজন হিন্দু সন্ন্যাসী। আপনি কেন মুসলমানের সঙ্গে আছেন? এই মুসলমান ভদ্রলোকটি তো আপনার খাবার সময়ে

সময়ে ছুঁয়ে ফেলতে পারেন।" প্রশ্নটি শুনিয়াই স্বামীজী গরম হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "মশাই, আপনার এ কথা বলার অর্থ কি? আমি সন্ন্যাসী,—আমি আপনাদের সমস্ত সামাজিক আচার নিয়মের ঊর্ধ্বে। আমি একজন মেথরের সঙ্গে বসেও আহার করতে পারি। সে জন্যে আমি ঈশ্বরকে ভয় করি না, কারণ তিনি এ অনুমোদন করেন। আমি শাস্ত্রকেও ভয় করি না, কারণ শাস্ত্র এ সমর্থন করে। কিন্তু আমি আপনাদের মত লোক ও তাদের সমাজকে ভয় করি। আপনি ঈশ্বর বা শাস্ত্রের কিছুই জানেন না। আমি সর্বভূতে ব্রহ্ম দর্শন করি। আমার কাছে উচ্চ-নীচ নেই। শিব! শিব!" কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর মুখমণ্ডল এক স্বর্গীয় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। জগমোহনলাল নীরব ও স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কিন্তু তাহার মনে হইতে লাগিল, এরূপ একজন মহাজ্ঞানী ও মহাতেজস্বী সাধুর সহিত মহারাজার আলাপ-পরিচয় হওয়া উচিত। তাই, তিনি বলিলেন, "স্বামীজী, অনুগ্রহপূর্বক আমার সঙ্গে রাজভবনে[১] চলুন, মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করবেন।" স্বামীজী কহিলেন, "পরশু যাব।" জগমোহনলাল রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া মহারাজাকে সমস্ত জানাইলে, তিনি বলিলেন, "আমি এখনই তাঁকে দেখিতে যাব।" এই সংবাদ পাইয়া স্বামীজী নিজেই অবিলম্বে রাজপ্রাসাদে গেলেন। সেখানে মহারাজা তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং প্রাথমিক আলাপ পরিচয়ের পরে প্রশ্ন করিলেন, "স্বামীজী জীবনটা কি?" স্বামীজী উত্তর দিলেন, "প্রতিকূল অবস্থা সকলের মধ্যে একটি জীবের বিকাশ ও বৃদ্ধির নামই জীবন।"[২] মহারাজা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "স্বামীজী তা হলে শিক্ষা কি?" স্বামীজী বলিলেন, "কতকগুলি

১। আবু পাহাড়ে 'খেতড়ি হাউস' (Khetri-House) নামে মহারাজার বাড়ী।

২। "Life is the unfoldment and development of a being under circumstances tending to press it down."

ভাবকে স্নায়ুগত করার নামই শিক্ষা।" [১] এবং তাঁহার এই উক্তিটির অর্থ সুস্পষ্ট করিবার জন্য তিনি আরও বলিলেন, "কোন ভাব বা ধারণা স্বভাবগত না হওয়া পর্যন্ত, তাকে নিজের খাঁটি ও কার্যকরী সম্পত্তি বলা যায় না।" ইঁহার দৃষ্টান্তস্বরূপ, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের কতকগুলি ঘটনা বর্ণনা করিলেন এবং মহারাজা তাহা বিশেষ আগ্রহের সহিত ও একাগ্র মনে শ্রবণ করিলেন।

এইভাবে আবু পাহাড়ে কয়েক দিন ধরিয়া স্বামীজীর জ্ঞানগর্ভ অমূল্য কথা সকল শুনিয়া, মহারাজা তাঁহার একান্ত ভক্ত হইয়া উঠিলেন। এবং তিনি তাঁহাকে তাহার সহিত খেতড়ি যাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। স্বামীজী কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। এবং তাহার কয়েকদিন পরেই, মহারাজা ও তাঁহার অনুচরবর্গের সহিত তিনি আবু পাহাড় হইতে রেলগাড়ীতে জয়পুর ও তথা হইতে রাজসরকারের গাড়ীতে নব্বই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া খেতড়ি পৌঁছিলেন।

সেখানে পৌঁছিবার কয়েকদিন পরেই মহারাজা তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। গুরুর প্রতি তাহার ভক্তি, বিশ্বাস ও আনুগত্যের কোন সীমা ছিল না। স্বামীজীও তাহার নানা সদ্‌গুণের জন্য তাহাকে যৎপরোনাস্তি ভালবাসিতেন। জানা যায়, মহারাজা স্বামীজীর সম্মুখে নতজানু হইয়া তাঁহাকে তাহার অন্তরের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রণাম নিবেদন করিতেন। এবং রাত্রে স্বামীজী ঘুমাইলে তিনি নিঃশব্দে আসিয়া তাঁহার পদসেবায় রত হইতেন। স্বামীজী প্রথমদিন জাগিয়া তাহাকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিলেও তিনি তাহা শুনেন না। বলেন, "গুরুজী, আমি আপনার শিষ্য। আপনি আমাকে এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করবেন না।" তবে স্বামীজী অপরের সমক্ষে ইহা তাহাকে কিছুতেই করিতে দিতেন না। বলিতেন, "উহাতে প্রজার চক্ষে রাজার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়।"

১। "Education is the nervous association of certain ideas."

স্বামীজী মহারাজার সহিত তাহার রাজপ্রাসাদে বহু সপ্তাহ বাস করেন। তখন সেখানে খেতড়ি-রাজের সভাপণ্ডিত নারায়ণ দাসের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। পণ্ডিতজী রাজপুতনার সর্বশ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ ছিলেন। তাই সুযোগ বুঝিয়া, তাঁহার নিকট স্বামীজী (তাঁহার জয়পুরে আরব্ধ) পতঞ্জলির মহাভাষ্য অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহাকে পড়াইতে আরম্ভ করিয়া পণ্ডিতজী প্রথম দিনই বলিলেন, "স্বামীজী, আপনার মত ছাত্র ক্বচিৎ দেখতে পাওয়া যায়।" তৎপর একদিন তিনি তাঁহাকে সুদীর্ঘ পাঠ দিয়া পরদিন তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিলে, স্বামীজী উহার সমস্তই হুবহু আবৃত্তি করিলেন ও তৎসঙ্গে তাঁহার নিজের টীকাও যোগ করিয়া দিলেন। তাঁহার এইরূপ অসাধারণ মেধার পরিচয় পাইয়া পণ্ডিতজী যারপরনাই বিস্মিত হইলেন ও তাঁহাকে প্রতিদিন দীর্ঘতর পাঠ দিয়া দ্রুত পড়াইয়া যাইতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে পণ্ডিতজী দেখিলেন তিনি স্বামীজীর বহু সূক্ষ্ম প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম হইতেছেন না ও সে সকলের সমাধান স্বামীজী নিজেই দিতেছেন। তখন তাঁহাকে তিনি একদিন বলিলেন, "স্বামীজী, আপনাকে আর আমার শেখাবার কিছু নেই। আমি যা জানি তা আপনাকে শিখিয়েছি।" স্বামীজীও তখন তাঁহার এই শিক্ষাগুরুকে শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করিয়া তাঁহার দয়ার জন্য তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

জানা যায়, রাজপ্রাসাদে স্বামীজী নানা রকমের পুস্তক অধ্যয়ন করিতেন। এবং তিনি যে ভাবে শুধু পাতার পর পাতা উল্টাইয়া বইগুলি অতি দ্রুত পড়িয়া যাইতেন, তাহা দেখিয়া মহারাজা যারপর-নাই বিস্মিত হন এবং এ বিষয়ে তাহার প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বলেন, "এ কিছুই নয়। শুধু অভ্যাস, ব্রহ্মচর্য ও একাগ্রতার ফল। যে কেউ চেষ্টা করলেই এ ক্ষমতা লাভ করতে পারে। আপনি চেষ্টা করুন, আপনিও পারবেন।" অপর একদিন মহারাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "স্বামীজী, নিয়ম (Law) কি?" স্বামীজী কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া কহিলেন, "নিয়ম সম্পূর্ণ আভ্যন্তরিক জিনিষ। বাইরের

জগতে ওর কোন অস্তিত্ব নেই। আমাদের মন কতকগুলি ঘটনা পরম্পরার উপলব্ধি যে প্রণালীতে ধারণা করে তাইই নিয়ম।" বলিয়া তিনি ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিলেন। এবং সেই প্রসঙ্গে তিনি সাংখ্য দর্শনের উল্লেখ করেন ও দেখান যে উহার সিদ্ধান্ত সকল আধুনিক জড় বিজ্ঞানের দ্বারা কি ভাবে সমর্থিত হয়। তারপর তিনি মহারাজকে দেশে বিজ্ঞান শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া, তাহার প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে আগ্রহশীল হইতে উপদেশ দেন। এবং তদুদ্দেশ্যে তিনি মহারাজের জন্য কয়েকখানি প্রাথমিক বিজ্ঞান পুস্তক ও কতিপয় সরল বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনাইয়া তাহাকে নিজেই বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন।

খেতড়ির মহারাজা অপুত্রক ছিলেন। তাই, তিনি একদিন এ বিষয়ে তাহার মনোব্যথা স্বামীজীকে জানাইয়া বলিলেন, "স্বামীজী, আমার কোন উত্তরাধিকারী পুত্র নাই। আপনি আশীর্বাদ করুন আমার যেন একটি পুত্রসন্তান লাভ হয়। আপনি আশীর্বাদ করলেই আমার প্রার্থনা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে।" তাহার ও তাহার প্রজাগণের শুভার্থী স্বামীজী তাহার মানসিক উদ্বেগ বুঝিয়া তাহাকে তাঁহার প্রার্থিত আশীর্বাদ করেন।

খেতড়ি অবস্থানকালে স্বামীজী যে সকল সময়েই রাজপ্রাসাদে থাকিতেন তাহা নয়। তিনি অনেক সময়ে তাঁহার দরিদ্র ভক্তদের বাড়িতে যাইতেন এবং পণ্ডিত শঙ্কর লাল নামে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে প্রায়ই আহার করিতেন। ইহা ভিন্ন, খেতড়ি শহরের সমস্ত অধিবাসীই স্বামীজীর গুণমুগ্ধ ছিল এবং তিনিও মহারাজকে যেরূপ ভালবাসিতেন, তাহার দীনতম প্রজাকেও ঠিক সেইরূপ ভালবাসিতেন।

এই সকল ব্যতীত জানা যায়, খেতড়ির মহারাজার অনুরোধে স্বামীজী এইকালে সর্বপ্রথম বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করেন। তৎপূর্বে তিনি বিবিদিষানন্দ, সচ্চিদানন্দ, ইত্যাদি নানা নামে পরিচয় দিতেন।

এইভাবে কিছুকাল খেতড়িতে অতিবাহিত করিয়া স্বামীজী পুনরায় পরিব্রাজকরূপে তাঁহার সঙ্কল্পিত ভ্রমণে বাহির হইলেন।

আঠার

ভারত পরিক্রমা

চতুর্থ যাত্রা (১৮৯০-৯৩)—তৃতীয়াংশ

(পরিব্রাজক বেশে—পশ্চিম ভারতে)

চতুর্থ যাত্রা—তৃতীয়াংশ—গুজরাট ও বোম্বাই প্রদেশে :

(i) গুজরাট প্রদেশের আমেদাবাদ, ওয়াঢোয়ান, লিম্ব্‌ডি, জুনাগড়, ভুজ, ভেরাওয়াল, প্রভাস, পোরবন্দর, দ্বারকা, মাণ্ডবী, নারায়ণ সরোবর, আশাপুরী, পলিটানা ও বরোদায় এবং তৎপর (বোম্বাই যাইবার পথে) মধ্য প্রদেশের খাণ্ডোয়ায় :

খেতড়ি ত্যাগ করিয়া স্বামীজী আজমীঢ় যান। এবং তথা হইতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া ভারতের পশ্চিমাংশস্থ গুজরাট প্রদেশের আমেদাবাদ নগরে উপনীত হন। সেখানে কয়েকদিন ঘুরিয়া বেড়াইয়া ও ভিক্ষান্নে জীবন যাপন করিয়া, তিনি পরিশেষে ওখানকার সবজজ শ্রীযুত লালশঙ্কর উমিয়াশঙ্করের আতিথ্য গ্রহণ করেন। তাঁহার বাড়ীতে অবস্থানকালে তিনি আমেদাবাদ ও উহার উপকণ্ঠের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান সকল দর্শন করেন। ওখানকার মনোহর জৈন মন্দির সকল ও মুসলমান আমলের বিরাট মসজিদ ও কবর সমূহ তাঁহাকে বিশেষ আনন্দ দান করে। ইহা ব্যতীত, তিনি স্থানীয় জৈন পণ্ডিতদিগের সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া জৈন ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান বৃদ্ধি করেন। এইভাবে আরও কয়েক দিন গত হইলে, তিনি ওয়াঢোয়ান নামক স্থানে যাত্রা করিলেন।

ওয়াঢোয়ানে রণিকদেবীর প্রাচীন মন্দির দর্শন করিয়া, স্বামীজী লিম্বডি অভিমুখে রওনা হইলেন। পথে তিনি ভিক্ষার দ্বারা জীবন ধারণ করেন এবং রাত্রিকালে যেখানে-সেখানে আশ্রয় লইতেন। লিম্বডি শহরে পৌঁছিয়া তিনি খোঁজ লইয়া জানিতে পারিলেন যে,

সেখানে একস্থানে সাধুরা বাস করেন। ঐ স্থানটি শহর হইতে কতকটা বিচ্ছিন্ন ছিল। স্বামীজী সেখানে গেলে, তথাকার সাধুগণ তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং যতদিন ইচ্ছা সেখানে বাস করিবার জন্য তাহাদের ঐকান্তিক অনুরোধ জানাইলেন। কিন্তু মাত্র অল্প কয়েকদিন তাহাদের সহিত বাস করিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাহারা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর লিঙ্গোপাসক এবং ধর্মের নামে স্ত্রীলোক লইয়া নানা রকম গুপ্ত পাপাচরণে রত। রাত্রে পার্শ্বের ঘর হইতে তিনি ঐ সকল স্ত্রীপুরুষের প্রার্থনা ও মন্ত্রপাঠ শুনিতে পাইতেন। তাই, তিনি অবিলম্বে একদিন ঐ স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু দেখিলেন তাঁহার ঘরের দরজা বাহির হইতে তালাবন্ধ এবং তিনি যাহাতে না পলাইতে পারেন তজ্জন্য একটি লোককে পাহারাতেও নিযুক্ত রাখা হইয়াছে। পরে ঐ সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, "তোমাকে একজন উঁচুদরের সাধু বলে মনে হচ্ছে। তুমি নিশ্চয়ই বহু বৎসর ব্রহ্মচর্য পালন করেছ। এখন তোমার ঐ সাধনার ফল আমাদের দিতে হবে। আমরা তোমার ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ করিয়ে একটা বিশেষ সাধনা করব, যার ফলে আমরা নানা অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করতে পারব।"

শুনিয়া স্বামীজী শঙ্কিত হইলেন। কিন্তু বাহ্যতঃ কোন উদ্বেগ প্রকাশ না করিয়া তিনি মুক্তির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঐ স্থানে তাঁহার নিকট যাতায়াতকারী ভক্তদের মধ্যে, একটি অনুরাগী বালক তাঁহাকে খুব ঘন ঘন দর্শন করিতে আসিত। তিনি তাহার দ্বারা (লিম্বড়ি-রাজ) ঠাকুর সাহেবের নিকট একখানি ক্ষুদ্র চিঠি পাঠাইয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ছেলেটি ছুটিয়া রাজ-প্রাসাদে গিয়া ঐ চিঠি ঠাকুর সাহেবের হাতে দিতেই, তিনি তাঁহার কয়েকজন দেহরক্ষী পাঠাইয়া স্বামীজীকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন এবং তাঁহাকে তাহার সহিত রাজপ্রাসাদে বাস করিতে অনুরোধ করিলেন। জানা যায়, তথায় অবস্থানকালে স্বামীজী স্থানীয় পণ্ডিত-গণের সহিত সংস্কৃত ভাষায় নানা বিষয় আলোচনা করেন। পুরীর

গোবর্ধন মঠের শঙ্করাচার্য ঐ আলোচনা শুনেন এবং স্বামীজীর অদ্ভুত পাণ্ডিত্য ও পরমতসহিষ্ণুতা দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করেন।

লিম্বডিতে অল্প কিছুদিন থাকিয়া, স্বামীজী (ঠাকুর সাহেবের প্রদত্ত কয়েকখানি পরিচয়-পত্র সহ) জুনাগড় রওনা হইলেন। পথে তিনি ভাবনগর ও শিহোর দর্শন করিলেন। জুনাগড় পৌঁছিয়া তিনি তথাকার রাজদেওয়ান বাবু হরিদাস বিহারীদাস দেশাই'এর অতিথি হইলেন। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া দেওয়ান সাহেব এত মুগ্ধ হইলেন যে, তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে সমস্ত উচ্চ রাজকর্মচারীগণ সহ তাঁহার নিকট গিয়া বসিতেন ও অনেক রাত্রি পর্যন্ত তাঁহার সহিত নানা বিষয়ে কথাবার্তা বলিতেন।

জানা যায়, জুনাগড়ে স্বামীজী তাঁহার আলাপ-আলোচনায় যীশুখৃষ্টের কথা বলেন এবং গর্বের সহিত দেখান পাশ্চাত্যের ধর্মচিন্তা কিভাবে হিন্দু ধর্মের দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত। তৎসম্পর্কে তিনি প্রমাণ করেন, মধ্য ও পশ্চিম এসিয়াই পূর্বে আন্তর্জাতিক ভাববিনিময়ের ক্ষেত্র ছিল। এবং তাঁহার শ্রোতাগণকে বোঝান, হিন্দুসংস্কৃতির ঐতিহাসিক গুরুত্ব কত অধিক ও জগতে আধ্যাত্মিক আদর্শ-প্রচারে হিন্দুদের অনুভূতি সকল কি অমূল্য। ইহা ব্যতীত, তিনি তাহাদের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব জীবন-কথাও বর্ণনা করেন।

জুনাগড় হইতে স্বামীজী কয়েক মাইল দূরবর্তী গীর্ণার পর্বত দর্শন করিতে যান। এই পর্বতটি ভারতবর্ষের প্রায় সকল সম্প্রদায়ের নিকটই পবিত্র। এখানে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনদের অনেকগুলি মনোহর মন্দির ও প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন বর্তমান আছে। মুসলমানদেরও কতকগুলি সুন্দর মসজিদ ও কবর আছে। হিন্দু ধ্বংসাবশেষগুলির মধ্যে "খাপড়া খোদিয়া" নামে কতকগুলি গুহা খুবই বিশেষত্বপূর্ণ। এই গুহাগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দ্বারা মঠরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। স্বামীজী এই সমস্ত দর্শন করিয়া, এই বহু সম্প্রদায়ের তীর্থস্বরূপ পর্বতটিতে একটু সাধনা করতে ইচ্ছুক হইলেন। এবং একটি নির্জন

গুহা খুঁজিয়া বাহির করিয়া সেখানে থাকিয়া কয়েকদিন ধ্যান-জপ করিলেন। তৎপর তিনি জুনাগড়ে ফিরিয়া, বন্ধুদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া ভুজরাজ্যের অভিমুখে রওনা হইলেন। যাত্রাকালে জুনাগড়ের দেওয়ান ভুজের উচ্চ রাজকর্মচারীদের নিকট কয়েকখানি পরিচয়-পত্র তাঁহাকে দিলেন।

ভুজে স্বামীজী তথাকার দেওয়ানের সহিত থাকেন। কয়েক বৎসর পরে, এই দেওয়ানজী (বার্ধক্যের জন্য তখন তিনি অবসরপ্রাপ্ত) স্বামীজীর সম্বন্ধে তাঁহার এক শিষ্যের নিকট বলেন, "তাঁর অগাধ বুদ্ধি ও অপূর্ব দাক্ষিণ্যময় ব্যক্তিত্ব ছিল। অতি দুরূহ বিষয় সকলও তিনি এমন সরলভাবে প্রকাশ করতে পারতেন যে, শুনে সকলেই মুগ্ধ হয়ে যেত।" জুনাগড়ের দেওয়ানের ন্যায়, এই দেওয়ানের সহিতও স্বামীজী রাজ্যের কৃষি, শিল্প ও আর্থিক সমস্যা সকলের এবং জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বহু সুদীর্ঘ আলোচনা করেন। দেওয়ানজী তাঁহাকে (ভুজরাজ) কচ্ছের মহারাজার সহিত পরিচয় করাইয়া দেন এবং তিনি মহারাজার সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করেন। ফলে, মহারাজার মনে স্বামীজীর সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা অঙ্কিত হয়।

স্বামীজী (তাঁহার রীতি অনুসারে) ভুজের নিকটবর্তী নানা তীর্থস্থান দর্শন করিয়া এবং বহু তীর্থযাত্রী ও সন্ন্যাসীগণের সহিত মিশিয়া নিজ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করেন। তৎপর তিনি ভুজ হইতে জুনাগড়ে ফিরিয়া আসিলেন এবং সেখানে কয়েক দিন বিশ্রাম লইয়া ভেরাওয়াল ও সোমনাথপত্তন বা প্রভাস তীর্থ দর্শন করিতে গেলেন। ভেরাওয়াল অতি প্রাচীন স্থান বলিয়া বিখ্যাত। সোমনাথের খ্যাতি তাহার বিধ্বংসিত বিরাট মন্দিরের জন্য। এই মন্দির তিনবার বিনষ্ট এবং তিনবার পুনর্নির্মিত হয়। এই বিরাট ধ্বংসস্তূপের সম্মুখে আসিয়া স্বামীজী স্তব্ধ হইয়া ভারতের অতীত গৌরবের কথা চিন্তা করিলেন। স্মরণ হইল, প্রত্যেক হিন্দুর নিকট এই স্থানের চতুষ্পার্শ্বস্থ বহু ক্রোশব্যাপী ভূমির প্রতি ধূলিকণা পবিত্র। কারণ,

এইখানেই যাদবগণ পরস্পরকে হত্যা করিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হন এবং তৎপর শ্রীকৃষ্ণ নিজেও (লীলাবসানের সময় আসন্ন জানিয়া) যোগে বসিয়া এক ব্যাধের বাণে বিদ্ধ হইয়া দেহত্যাগ করেন।

সোমনাথ মন্দির দর্শন করিয়া, স্বামীজী সূর্যমন্দির ও অহল্যাবাঈ কর্তৃক নির্মিত সোমনাথের নূতন মন্দির দেখিলেন। তৎপর তিনি সেখানকার তিনটি নদীর সঙ্গমস্থলে স্নান করিয়া সমুদ্রতীরে বেড়াইতে গেলেন। সেখানে কচ্ছের মহারাজার সহিত তাঁহার পুনরায় সাক্ষাৎ ও নানা বিষয়ে সুদীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয়। তাঁহার অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও অগাধ পাণ্ডিত্যের দ্বারা অভিভূত হইয়া মহারাজা একদিন তাঁহাকে বলেন, "স্বামীজী, অনেকগুলি বই একসঙ্গে পড়লে মাথাটা যেমন ঘুরতে থাকে, আপনার আলোচনাগুলি শুনলেও আমার ঠিক ঐ অবস্থা হয়। এই বিপুল প্রতিভা আপনি কিভাবে ব্যবহার করবেন? আপনি নিশ্চয়ই একটা বিরাট কিছু না করে কখন নিরস্ত হবেন না।"

ইহার অল্প পরেই, স্বামীজী জুনাগড়ে ফিরিয়া আসিলেন। বস্তুতঃ এই স্থানটিই যেন তাঁহার কাথিয়াওয়াড় ও কচ্ছদেশ ভ্রমণের কেন্দ্র-স্বরূপ হইয়াছিল। এই স্থান তিনি তৃতীয়বার ত্যাগ করিয়া পোর-বন্দর অভিমুখে রওনা হইলেন। সঙ্গে তথাকার দেওয়ানের নিকট লিখিত একখানি পরিচয়-পত্র। পোরবন্দর (ভাগবতোক্ত) প্রাচীন সুদামাপুরী বলিয়া খ্যাত। সেখানে পৌঁছিয়া স্বামীজী প্রথমে সুদামা-মন্দির দেখিলেন। এবং তৎপর তথাকার দেওয়ান পণ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডুরাং'এর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পণ্ডিতজী তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া নিজের কাছে রাখিলেন। এই সময়ে পোরবন্দরের মহারাজা নাবালক থাকায়, পণ্ডিতজীই ছিলেন ঐ রাজ্যের শাসক (Administrator)। ইহা ব্যতীত, তিনি বেদের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন ও এইকালে বেদের অনুবাদ করিতে নিযুক্ত ছিলেন। স্বামীজীর বিপুল পাণ্ডিত্য দেখিয়া তিনি প্রায়ই তাঁহাকে বেদের দুরূহ স্থান সকলের ব্যাখ্যায় সাহায্য করিতে বলিতেন। এবং তাঁহার অনুরোধে স্বামীজী এগার মাস কাল পোরবন্দরে থাকিয়া তাঁহার ঐ

কার্য সম্পূর্ণ করিতে সাহায্য ও সহযোগিতা করেন। এই জন্য দুই-জনেই নিয়ত পরিশ্রম করিতেন। ইহা ব্যতীত, স্বামীজী এই সময়ে (পাণিনি ব্যাকরণের) পতঞ্জলির মহাভাষ্য পাঠও শেষ করেন। আর ঐ সঙ্গে তিনি পণ্ডিতজীর প্রেরণায় ফরাসী ভাষাও শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। পণ্ডিতজী তাঁহাকে বলেন, "স্বামীজী, দেখবেন ভবিষ্যতে এ আপনার কাজে লাগবে।"

জানা যায়, স্বামীজীর অসাধারণ মেধা ও তাঁহার চিন্তারাশির অপূর্ব ঔদার্য ও মৌলিকতার পরিচয় পাইয়া, পণ্ডিতজী অপর একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "স্বামীজী, আপনি যে এ দেশে বেশী কিছু করতে পারবেন তা মনে হয় না। এখানে খুব কম লোকেই আপনাকে বুঝতে পারবে। আপনার পাশ্চাত্য দেশে যাওয়া উচিত। সেখানে লোকে আপনার ও আপনার কথার মূল্য বুঝবে। আপনি সনাতন ধর্ম প্রচারের দ্বারা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির উপর নিশ্চয়ই এক অত্যুজ্জ্বল আলোক নিক্ষেপ করতে পারবেন।" পণ্ডিতজীর কথাগুলি শুনিয়া স্বামীজী খুশী হইলেন। কারণ, এইরূপ একটি চিন্তা তাঁহার মনেও কিছুদিন যাবৎ উদয় হইতেছিল। জুনাগড়ের শ্রীযুত সি এইচ পাণ্ডিয়ার নিকট তিনি এই বিষয় একটু উল্লেখও করিয়াছিলেন।

স্বামীজীর পোরবন্দর অবস্থানকালে, তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী ত্রিগুণাতীত পদব্রজে তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে সেখানে আসেন ও অপর কয়েকটি সাধুর সহিত মিলিত হইয়া হিংলাজ তীর্থে যাইতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু স্থানটি ছিল পোরবন্দর হইতে বহুদূরে। এবং তাঁহারা সকলেও ছিলেন ভ্রমণ-ক্লান্ত ও বিক্ষত-চরণ। তাই, তাঁহারা স্থির করিলেন যে, তাঁহারা স্টীমারে করাচী ও তথা হইতে উটের পিঠে চড়িয়া মরুভূমি পার হইয়া হিংলাজ যাইবেন। কিন্তু তজ্জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কোথা হইতে আসিবে? অনেক চিন্তা-পরামর্শের পর একজন সাধু বলিলেন, "শুনেছি পোরবন্দরের দেওয়ানের বাড়ীতে একজন মহাপণ্ডিত পরমহংস আছেন। তিনি জলের মত ইংরেজি বলেন। সুতরাং (ইংরেজি ভাষাভিজ্ঞ) ত্রিগুণাতীত তাঁর সঙ্গে দেখা করুক।

মহাত্মাকে ধরলে তিনি হয়তো দেওয়ানজীকে বলে আমাদের আবশ্যকীয় টাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।" তখন তাঁহারা সকলে স্বামী ত্রিগুণাতীতকে মুখপাত্র করিয়া রাজপ্রাসাদের দিকে চলিলেন। স্বামীজী ঐ সময়ে প্রাসাদের গাড়িবারান্দার ছাদের উপর পায়চারি করিতেছিলেন এবং সেখান হইতে আগত সাধুদের দলে ত্রিগুণাতীতকে দেখিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তিনি তখনই নীচে নামিয়া নিজ ঘরে গিয়া বসিলেন। ত্রিগুণাতীত তাঁহাকে দেখিয়া খুবই আনন্দিত হইলেন বটে। কিন্তু স্বামীজী সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাব ধারণ করিলেন এবং তাঁহাকে অনুসরণ করার জন্য ত্রিগুণাতীতকে কঠোরভাবে তিরস্কার করিলেন। ইহাতে আপত্তি জানাইয়া ত্রিগুণাতীত তাঁহাকে তাহার ও অপর সাধুগণের আগমনের হেতু ও উদ্দেশ্য বুঝাইয়া বলিলেন। শুনিয়া স্বামীজী তাহাদের হিংলাজ যাইবার খরচের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন এবং বিশেষভাবে বলিয়া দিলেন, সে যেন আর কখন পুনরায় তাঁহার খোঁজ না করে।

ইহার কিছুদিন পরে, স্বামীজী পোরবন্দর ত্যাগ করিয়া দ্বারকাধামে যান। এই স্থানটি এক সময়ে শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী ছিল। কিন্তু এখন তাহার কোন চিহ্নই আর নাই, শুধু সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ তাহার উপর দিয়া গড়াইয়া যাইতেছে। অকূল বারিধির দিকে তাকাইয়া ঐ লুপ্ত গৌরবের কথা চিন্তা করিতে করিতে স্বামীজীর অন্তর বেদনায় ভরিয়া উঠিল। এবং চিত্রার্পিতের ন্যায় সমুদ্র-তীরে বসিয়া তিনি ক্রমে ভারতের ভবিষ্যতের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। পরে তিনি উঠিয়া আশ্রয়ের জন্য (শঙ্করাচার্য-প্রতিষ্ঠিত) সারদা মঠে গেলেন। সেখানকার মোহন্ত তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার জন্য একটি ঘর নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিপূতঃ দ্বারকাধামের ঐ নির্জন কক্ষে বাসকালে, চিন্তাচ্ছন্ন স্বামীজীর মানস-নেত্রে ফুটিয়া উঠিল এক বিপুল আলোকচ্ছটা—ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যত।

দ্বারকা হইতে স্বামীজী মাণ্ডবীতে যান। এবং সেখান হইতে

তিনি নারায়ণ-সরোবর ও আশাপুরী নামক তীর্থ দর্শন করিয়া পুনরায় মাণ্ডবীতে ফিরিয়া আসেন ও সেখানে এক ভাটিয়ার বাড়ীতে অবস্থান করিতে থাকেন। এই সময়ে স্বামী অখণ্ডানন্দ বহু অন্বেষণের পর[১] এই বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার দেখা পাইলেন। এই সাক্ষাতের বিবরণ তিনি নিজে এইরূপ দিয়াছেন :

"দেখিলাম স্বামীজীর পূর্ব রূপ আর নাই। রূপলাবণ্যে ঘর আলো করিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু আমাকে দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলেন।······বলিলেন, 'আমি একটা মতলব করেছি, তোরা (গুরুভাইরা) কেউ সঙ্গে থাকলে তা কার্যে পরিণত করতে পারবো না।' কিন্তু আমি কোন কথাই শুনি না। অবশেষে স্বামীজী বলিলেন, 'দেখ্, আমি অসৎ হয়ে গেছি, আমার সঙ্গ ত্যাগ কর্।' বলিলাম, 'হলেই বা তুমি অসৎ। আমি তোমায় ভালবাসি।······ তোমাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলাম, সে আকাঙ্ক্ষা মিটেছে। এখন তুমি একলা যেতে পার'।"

কচ্ছের মহারাজার আমন্ত্রণে স্বামীজী পরদিনই ভুজে চলিয়া গেলেন। তাহার পরদিন স্বামী অখণ্ডানন্দও সেখানে গেলেন এবং দুইজনে কয়েকদিন একত্রে রাজপ্রাসাদে কাটাইলেন। তৎপর মাণ্ডবীতে ফিরিয়া তাঁহারা আর একপক্ষ কাল একত্র থাকিয়া পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর স্বামীজী পলিটানা নামক তীর্থে যান।[২] সেখানকার শত্রুঞ্জয় পর্বত জৈনদিগের নিকট বিশেষ পবিত্র। এই পর্বতের

১। এই অন্বেষণ কি বিরাট ও বিপদসঙ্কুল হইয়াছিল, তাহা স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁহার 'স্মৃতিকথায়' লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

২। স্বামী অখণ্ডানন্দ লিখিয়াছেন, স্বামীজী মাণ্ডবী হইতে পোরবন্দরে যান এবং পাঁচ-সাত দিন পরে তিনি নিজেও সেখানে গিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ পান। এই বর্ণনার সহিত অদ্বৈত আশ্রম হইতে প্রকাশিত Life of Swami Vivekananda পুস্তকের বর্ণনার পার্থক্য দেখা যায়। এইরূপ পার্থক্য (পূর্বের ও পরের) আরও কয়েকটি স্থলে লক্ষিত হয়।

উপরে হিন্দুদের হনুমানজীর মন্দির ও মুসলমানদের একটি দরগাও আছে। স্বামীজী ঐ পর্বত শিখরে উঠিয়া চারিদিকের অপূর্ব সৌন্দর্য দর্শন করেন।

ইহার পর তিনি বরোদারাজ্যে যান এবং রাজধানী বরোদায় দেওয়ান বাহাদুর মণিভাই'এর আতিথ্য গ্রহণ করেন। কিন্তু সেখানে মাত্র অল্প কয়েকদিন থাকিয়া তিনি (বোম্বাই যাইবার পথে) মধ্যপ্রদেশের খাণ্ডোয়া শহরে চলিয়া আসেন (২৭শে/২৮শে এপ্রিল, ১৮৯২)। সেখানে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি হরিদাস চাটার্জি নামক একজন বাঙ্গালী উকীলের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হরিদাসবাবু কাছারী হইতে ফিরিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া বুঝিলেন, এত বড় বিদ্বান লোক তিনি আর কখন দেখেন নাই। তাই, তিনি আগ্রহের সহিত তাঁহাকে তাহার গৃহে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। স্বামীজী সম্মত হইয়া তাহার বাড়ীতে তিন সপ্তাহ কাল থাকেন। তখন ওখানকার বাঙ্গালী সম্প্রদায় ও অপর বহুলোক তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন এবং তাহারা সকলেই তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান ও ইংরেজী সাহিত্যে অধিকার দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হন। হরিদাসবাবু লিখিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার কথা শুনিয়া মনে হইত তিনি একজন আদিষ্ট পুরুষ। স্বামীজীর সম্মানার্থে খাণ্ডোয়ার দেওয়ানী আদালতের জজ বাবু মাধবচন্দ্র ব্যানার্জি একদিন ওখানকার সমস্ত বাঙ্গালীগণকে একটি ভোজে আমন্ত্রণ করেন। ভোজনের পূর্বে ও পরে স্বামীজী উপনিষদ্ হইতে কয়েকটি দুর্বোধ্য দুরূহ স্থান সমাগত ব্যক্তিগণের নিকট এমন সরলভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, শুনিয়া সকলেই চমৎকৃত হন। এবং অভ্যাগতদের মধ্যে প্যারীলাল গাঙ্গুলী নামে একজন সংস্কৃত শাস্ত্রাভিজ্ঞ উকীল হরিদাসবাবুর নিকট মন্তব্য করেন, "ওঁর চেহারা দেখলেই মনে হয় উনি একজন অতি মহৎ শক্তিমান ব্যক্তি।"

খাণ্ডোয়াতেই আমরা সর্বপ্রথম দেখিতে পাই যে স্বামীজী চিকাগো ধর্ম মহাসভায় (Parliament of Religions at Chicago) যোগদানের ইচ্ছা আন্তরিকভাবে পোষণ করিতেছেন। জুনাগড় বা

পোরবন্দর থাকিতে তিনি প্রথম শুনিয়াছিলেন যে ঐ সভা আগামী বৎসরে (১৮৯৩) বসিবে। খাণ্ডোয়াতে তিনি হরিদাসবাবুর নিকট বলেন, "কেউ যদি আমার যাতায়াতের খরচ দেয়, তা হলে আমি নিশ্চয়ই (ঐ সভায় যোগ দিতে) যাব।"

খাণ্ডোয়া হইতে স্বামীজী বোম্বাই যাত্রা করেন। যাইবার সময় হরিদাসবাবুর ভ্রাতা তাঁহাকে বোম্বাই'এর প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার শেঠ রামদাস ছবিলদাসের নিকট একখানি পরিচয় পত্র দেন।

(ii) বোম্বাই প্রদেশের রাজধানী বোম্বাই, পুণা, মহাবালেশ্বর ও বেলগাঁও শহরে :

স্বামীজীর বোম্বাই প্রদেশ ভ্রমণের যে বিবরণ তাঁহার (অদ্বৈত আশ্রম হইতে প্রকাশিত) Life'এ দেওয়া হইয়াছে, তাহা কিছু ভ্রমপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। ইহা ঐ বিবরণ ও স্বামীজীর বরদা, পুণা ও বোম্বাই হইতে লিখিত পত্রগুলি দেখিলেই সুস্পষ্ট হয়। তাই Life'এর ঐ বিবরণ ও উক্ত পত্রগুলির তথ্যগুলি একত্র করিয়া স্বামীজীর বোম্বাই প্রদেশ ভ্রমণের ক্রম ও ঘটনাবলী যেরূপ মনে হয়, তদনুসারেই উহা নিম্নে বর্ণনা করা হইল।

খুব সম্ভবতঃ ১৮৯২ খৃস্টাব্দের মে মাসের শেষ সপ্তাহে স্বামীজী বোম্বাই শহরে পৌছেন ও সেখানে তিনি উক্ত শেঠ ছবিলদাসের অতিথি হইয়া থাকেন। ঐ সময়ে তিনি একদিন বোম্বাই'এর একজন প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক নেতার সহিত সাক্ষাৎ করেন ও প্রসঙ্গক্রমে বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে কঠোর মত প্রকাশ করেন। তবে এইবার মাত্র অল্প কয়েক দিন বোম্বাই শহরে থাকিয়া তিনি পুণা রওনা হন।

পুণায় স্বামীজী দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে যাইতেছিলেন। ঐ গাড়ীতে কয়েকজন মারাঠী যুবক তাঁহাকে দেখিয়া ইংরেজী ভাষায় সন্ন্যাসের নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অপর একটি যুবক ঐ আশ্রমের সমর্থন করিতে লাগিলেন। এই শেষোক্ত যুবকটি ছিলেন অতীব বিদ্বান ও ভবিষ্যতের সর্বভারতীয় নেতা লোকমান্য বালগঙ্গাধর

তিলক। ইহারা মনে করিয়াছিলেন স্বামীজী ইংরেজী জানেন না। কিন্তু অল্পপরেই তিনি যখন তিলকের পক্ষ লইয়া তর্কে যোগ দিলেন, তখন তাঁহার অকাট্য যুক্তি ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া তাহারা সকলেই বিস্মিত হইলেন। এবং পুণায় পৌঁছিয়া তিলক তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া নিজ বাটীতে লইয়া গেলেন। সেখানে এই দুইজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি কয়েকদিন ধরিয়া নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। তারপর লিম্ব্‌ডির ঠাকুর সাহেব মহাবালেশ্বরে আছেন শুনিয়া, স্বামীজী তাহার সহিত দেখা করিবার নিমিত্ত সেখানে চলিয়া গেলেন।

ঠাকুর সাহেব ইতিপূর্বে কোন সময়ে স্বামীজীর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই, মহাবালেশ্বরে গুরুর সহিত দেখা হইতেই তিনি তাঁহাকে তাহার সহিত লিম্ব্‌ডি যাইতে ও সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু স্বামীজী অস্বীকার করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর সাহেব, এখন নয়। আমার একটা কাজ আছে। তাই, এখন আমার বিশ্রাম করবার অবসর নেই। কিন্তু কখন যদি অবসর লই, আমি আপনার ওখানেই থাকব।"

তাহা হইলেও দেখা যায়, স্বামীজী লিম্ব্‌ডির ঠাকুর সাহেবের সহিত পুনরায় পুণায় আসেন ও সেখানে তাহার বাড়ীতে কয়েক সপ্তাহ বাস করেন।

তারপর, সম্ভবতঃ জুলাই মাসের প্রথম দিকে, তিনি পুনরায় বোম্বাই যান এবং সেখানে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত থাকিয়া কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত পুস্তক অধ্যয়ন করেন।

ইহার পর দেখা যায়, স্বামীজী ভাবনগরের মহারাজার প্রদত্ত একখানি পরিচয় পত্র সহ কোলাপুরের মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন। কোলাপুরের রাণী তাঁহার বিশেষ ভক্ত হন ও তাঁহাকে একখানি গেরুয়া বস্ত্র দান করেন। কোলাপুর হইতে স্বামীজী বেলগাঁও যান। যাত্রাকালে কোলাপুর স্টেটের একজন উচ্চ রাজ-কর্মচারী বেলগাঁও'এর এক মারাঠী ভদ্রলোকের নিকট একখানি পরিচয় পত্র তাঁহার সঙ্গে দেন। বেলগাঁও'এর সংবাদ অনেক স্পষ্টতর।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের এক সকালে স্বামীজী বেলগাঁও পৌঁছেন ও সেখানে উক্ত মারাঠী ভদ্রলোকের আতিথ্য গ্রহণ করেন। ঐ ভদ্রলোকের পুত্র অধ্যাপক জি এস্ ভাটে লিখিয়াছেন, 'তাহার পিতা অতি অল্পেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে স্বামীজী একজন অতি অসাধারণ লোক এবং তাহার ও তাহার বন্ধুগণের দ্বারা বেলগাঁও শহরে স্বামীজীর উপস্থিতির সংবাদ প্রচারিত হইলে, প্রতিদিন বহু লোক তাঁহার কথা শুনিবার জন্য একত্র হইতেন। এবং যদিও এই সকল সভায় কখনও কোনও বিষয়ের তর্ক উঠিলে তাহাতে স্বামীজীই জয়ী হইতেন, তাহা হইলেও ঐ জয়ের প্রতি তাঁহার কোন লক্ষ্য ছিল না। এই কালে তিনি সকলকেই বিশেষভাবে বুঝাইতে চাহিতেন, সময় আসিয়াছে যখন দেশ ও সর্বজগৎকে দেখাইতে হইবে যে হিন্দুধর্ম মরণোন্মুখ নহে এবং মানবকল্যাণের জন্য জগতে প্রচার করিতে হইবে বেদান্তের অমূল্য সত্যরাজি। অতীতকালে বেদান্তকে যে সকল মানুষেরই প্রেরণার শাশ্বত উৎস মনে না করিয়া একটি দলীয় সম্পদ মনে করা হইয়াছে, এজন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন।'

উক্ত মারাঠী ভদ্রলোকের বাড়ীতে কয়েকদিন থাকিয়া, স্বামীজী বেলগাঁও'এর সবডিভিসনাল ফরেস্ট অফিসার বাবু হরিপদ মিত্রের বাড়ীতে আসিয়া নয় দিন থাকেন। পরবর্তীকালে হরিপদবাবু এই সময়ের যে সুদীর্ঘ স্মৃতিকথা লিখিয়াছেন তাহা বহু মূল্যবান তথ্যপূর্ণ এবং তাহা হইতেই আমরা কয়েকটি কথা নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে সন্নিবেশিত করিলাম। হরিপদবাবু লিখিয়াছেন,

"১৮৯২ খৃস্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর, মঙ্গলবার, রাত্রে একটি তরুণ সন্ন্যাসী আমার একটি উকীল বন্ধুকে নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাকিয়ে দেখলাম, এক সুপুষ্ট শান্তমূর্তি,—প্রফুল্লবদন, চোখে বিদ্যুতের ঝলক; গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা, মাথায় গেরুয়া পাগড়ি, পায়ে মহারাষ্ট্রদেশীয় চটিজুতা। খুবই আকৃষ্ট হলাম, তবু মনে হল লোকটি নিশ্চয়ই কিছু চাইতে এসেছে। কিন্তু তিনি কিছুই চাইলেন না এবং আলাপ করে বুঝলাম প্রত্যেক দিকেই তিনি

আমার চাইতে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। তাঁকে আমার বাড়ীতে থাকতে বললে তিনি বললেন, 'আমি মারাঠী ভদ্রলোকটির কাছে সুখেই আছি। একজন বাঙ্গালীর সঙ্গে দেখা করেই তার বাড়ী থেকে চলে এলে তিনি দুঃখিত হতে পারেন। আর তা ছাড়া, তার সমস্ত পরিবারবর্গই আমাকে খুব ভালবাসেন। তাই, আপনার বাড়ীতে আসার বিষয় আমি পরে বিবেচনা করব।' যা হোক, স্বামীজী পরদিন সকালবেলা আমার বাড়ীতে চা খেতে রাজী হলেন।

"কিন্তু পরদিন সকালে তিনি আসতে দেরি করায়, আমি তাঁকে আনতে ঐ মারাঠীর বাড়ীতে গেলাম। গিয়ে দেখি এক সভায় শহরের বড় বড় উকীল, পণ্ডিত ও বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোক তাঁকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করছেন, আর তিনি কিছুমাত্র চিন্তা বা বিলম্ব না করে ইংরেজী, বাংলা, হিন্দি ও সংস্কৃতে উত্তর দিচ্ছেন। দেখে স্তম্ভিত হয়ে ভাবলাম—লোকটা মানুষ না দেবতা!

"দর্শকগণ চলে গেলে স্বামীজী আমাকে বললেন, 'এতগুলি লোককে দুঃখিত করে আমি যেতে পারিনি।' আমি পুনর্বার তাঁকে আমার বাড়ীতে এসে থাকবার জন্যে অনুরোধ করলে তিনি বললেন, 'আমি যার বাড়ীতে আছি, তিনি আপনার প্রস্তাবে রাজী হলে আমি যাব।' তখন আমি গৃহস্বামীকে বিশেষ করে বললে, তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হলেন। এই সময়ে স্বামীজীর জিনিস-পত্রের মধ্যে ছিল একটি কমণ্ডলু, আর দুখানি বই—একখানি গেরুয়াকাপড়ে জড়ানো, অপর খানি ফরাসী সঙ্গীত সম্বন্ধে।"

যাহা হউক, তিন দিন হরিপদবাবুর বাড়ীতে থাকিয়া স্বামীজী চতুর্থ দিনে তাহার নিকট বিদায় চাহিয়া বলেন, "সন্ন্যাসীর তিনদিনের বেশী কোন শহরে ও একদিনের বেশী কোন গ্রামে থাকা উচিত নয়। যাতে মনে মায়া জন্মে তা থেকে তার দূরে থাকা কর্তব্য।" কিন্তু হরিপদবাবু আপত্তি করায়, স্বামীজী আরও কয়েক দিন তাহার বাড়ীতে থাকিতে সম্মত হন।

এইভাবে মোট নয় দিন স্বামীজী হরিপদবাবুর বাড়ীতে থাকেন।

এবং তখন শহরের বহু শিক্ষিত লোক হরিপদবাবুর বাড়ীতে রোজই সমবেত হইয়া, ধর্ম ও অপর নানা বিষয়ে স্বামীজীর আলাপ-আলোচনা শুনিতেন। উহা কত মূল্যবান, বহুবিস্তৃত, ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ছিল তাহা বর্ণনা করিয়া হরিপদবাবু লিখিয়াছেন, "আমার উঠানের চন্দনগাছের তলে বসে স্বামীজী যে সকল অমূল্য শিক্ষা আমাদের দিয়েছেন, তা আমি কখনও ভুলব না।"

আবার, এই শিক্ষা যেমন নানা বিষয় সম্পর্কিত ছিল, তেমনি উহা নানা আকর্ষণীয় ভাব-ভঙ্গীর সহিত বিতরিত হইত। এই সম্বন্ধে হরিপদবাবু লিখিয়াছেন, "স্বামীজী অনেক সময়েই স্ফূর্তির সঙ্গে হাসি. তামাসা ও আনন্দের মধ্য দিয়া উপদেশ দিতেন। আবার, কখন কখন তিনি এমন গম্ভীর হইয়া কথা বলিতেন যে, শ্রোতার মন আপনিই ভয়-সম্ভ্রমে পূর্ণ হইয়া উঠিত। ইহা ব্যতীত, তিনি এত নির্ভয়ে সত্য কথা বলিতেন যে, তাহাতে সময়ে সময়ে মনে হইত তিনি যেন বজ্র হানিতেছেন। যাহারা ধর্মান্ধের ন্যায় নিজেদের যুক্তি-হীন মত-বিশ্বাস আঁকড়াইয়া থাকিত তাহাদের তিনি আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না এবং তাহাদের দ্বারা যে কি অনিষ্টপাত হইতে পারে তৎসম্বন্ধে তিনি একদিন নিম্নের কাহিনীটি বর্ণনা করেন। "এক রাজার রাজ্য শত্রু-কর্তৃক আক্রান্ত হইলে, তিনি রাজধানী রক্ষার উপায় নির্ধারণ জন্য এক পরামর্শ সভায় প্রজাদিগের মত জানিতে চাহিলেন। তখন ইঞ্জিনিয়ারগণ পরামর্শ দিলেন, রাজধানীর চারিপার্শ্বে উচ্চ মাটির প্রাচীর তুলিয়া উহা পরিখা-বেষ্টিত করা কর্তব্য। ইহাতে ছুতারগণ আপত্তি করিয়া বলিল, ঐ প্রাচীর কাঠের তৈরী হওয়া উচিত; মুচিরা বলিল, না, উহা চামড়ার হউক, কারণ চামড়ার মত বস্তু আর নাই; এবং লোহার কামাররা বলিল, ইহারা সকলেই ভ্রান্ত, প্রাচীরটি লৌহ-নির্মিত হওয়াই উচিত। এই সময়ে উকীলরা উঠিয়া বলিলেন, রাজ্যরক্ষার সর্বোত্তম উপায় হইতেছে শত্রুপক্ষকে জানাইয়া দেওয়া যে, অপরের রাজ্য আক্রমণ বা দখল করিবার কোন আইন-সঙ্গত অধিকার তাহাদের নাই। সর্বশেষে পুরোহিতগণ ইহাদের সকলের প্রতি

একটি অবজ্ঞার হাসি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'ইহারা সকলেই বাতুলের মত কথা বলিতেছে, দেশরক্ষার জন্য সর্বপ্রথম যাগযজ্ঞাদির দ্বারা দেবতাদের সন্তুষ্ট করিতে হইবে এবং মাত্র তখনই আমরা অজেয় হইব।' এইভাবে দেশরক্ষা করার পরিবর্তে তাহারা বাদানুবাদ করিয়া পরস্পরের সহিত সংগ্রাম-রত হইলেন। ইতিমধ্যে শত্রুসৈন্য অগ্রসর হইয়া রাজধানী দখল ও লুণ্ঠন করিল। সর্বক্ষেত্রেই মানুষ ঠিক এইরূপ।"

হরিপদবাবুর নিকট স্বামীজী একদিন তাঁহার পরিব্রাজক জীবনের নানা ঘটনা বর্ণনা করেন। তাহার একটি কাহিনী এই। তিনি একদিন যখন ভয়ানক ক্ষুধার্ত, তখন একজন তাঁহাকে এমন ঝাল তরকারী খাইতে দিয়াছিল যে, তাহা আহার করিতেই তাঁহার মুখ ও পেটে ভীষণ জ্বালা উপস্থিত হইয়াছিল এবং বহু সময় অন্তেও উহার উপশম হয় না। আর একদিন এক বাড়ীতে ভিক্ষা চাহিলে, গৃহস্বামী তাঁহাকে তাড়াইয়া দেন ও বলেন, "এখানে সাধু ও চোরের কোন স্থান নেই।" স্বামীজী আরও বলেন যে, বহু দিন পর্যন্ত ডিটেক্টিভ পুলিশ তাঁহার পিছনে পিছনে ঘুরিয়া তাঁহার কার্যকলাপ লক্ষ্য করিয়াছে।

এইরূপ নানা বিষয় বর্ণনা করিয়া হরিপদবাবু লিখিয়াছেন, "স্বামীজীর মধ্যে যে গভীর দেশপ্রেম দেখেছি, তা আর কখন কারও মধ্যে দেখিনি। একদিন সন্ধ্যাবেলায় দেখি তিনি অত্যন্ত বিষণ্ণমুখে বসে আছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বললেন, 'এইমাত্র কাগজে পড়লাম, কলকাতায় একটা লোক অনাহারে মারা গেছে। দেখ, পাশ্চাত্য দেশে সমাজের অবহেলায় লোক মারা গেলে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কিন্তু আমাদের দেশের ভিক্ষুক চাইলেই অন্ততঃ একমুঠো চাল পায়। তাই, এক দুর্ভিক্ষের সময়ে ছাড়া, আমাদের দেশের লোক না খেয়ে বড় মরে না। এই আমি প্রথম শুনলাম, একটি লোক খেতে না পেয়ে মারা গেছে'।"

স্বামীজী একদিন নির্জনে হরিপদবাবুকে বলেন যে, চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগ দিবার জন্য তাঁহার আমেরিকায় যাইবার ইচ্ছা

আছে। শুনিয়া হরিপদবাবু অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া তখনই বেলগাঁও শহর হইতে কিছু চাঁদা তুলিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু যে কারণেই হউক স্বামীজী উহাতে আপত্তি করেন।

হরিপদবাবু পূর্বে ধর্ম বিষয়ে কতকটা সন্দেহবাদীর মত ছিলেন। এবং স্বামীজী বেলগাঁও আসার কিছু আগে তাহার স্ত্রী দীক্ষা লওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি তাহাকে এই বলিয়া নিরস্ত করিয়াছিলেন, "যদি কোন প্রকৃত সাধু লোকের সাক্ষাৎ কখন পাই, তখন আমরা দুজনেই তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নেব।" এখন স্বামীজীকে কাছে পাইয়া, তাহারা দুইজনেই তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা লওয়ার জন্য মনে মনে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। পরিশেষে হরিপদবাবু স্ত্রীর সম্মতি লইয়া স্বামীজীর নিকট তাহাদের প্রার্থনা জানাইলে স্বামীজী বলেন, "গুরু হওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার। গুরুকে শিষ্যের পাপ গ্রহণ করতে হয়। আর আমি সন্ন্যাসী—সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চাই, কোন নতুন বন্ধনে আর আবদ্ধ হতে ইচ্ছা করি না। এ ছাড়া, দীক্ষার পূর্বে গুরুশিষ্যের অন্ততঃ তিনবার দেখা হওয়া প্রয়োজন।" কিন্তু হরিপদবাবু নাছোড়বান্দা হইয়া পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তাই, স্বামীজী পরিশেষে তাহাদের উভয়কেই দীক্ষা দিলেন।

উনিশ

ভারত পরিক্রমা

চতুর্থ যাত্রা—(১৮৯০-৯৩)—চতুর্থ বা শেষাংশ

(পরিব্রাজক বেশে—দক্ষিণ ভারতে)

চতুর্থ যাত্রা—চতুর্থাংশ—দক্ষিণ ভারতে :

বাঙ্গালোর, মহীশূর, ত্রিচুর, ত্রিবান্দ্রম, মাদুরা, রামেশ্বর ও কন্যাকুমারীতে :

বেলগাঁও হইতে সমুদ্রতীরবর্তী পর্তুগীজ উপনিবেশ মর্মাগাও হইয়া, স্বামীজী মহীশূর রাজ্যের বাঙ্গালোর শহরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে অল্প কয়েক দিন (অখ্যাতভাবে) থাকিবার পর, তাঁহার কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং তিনি সত্বরই মহীশূররাজ্যের দেওয়ান স্বনামধন্য স্যার শেষাদ্রি আয়ারের সহিত পরিচিত হইলেন। এই প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ্ মাত্র কয়েক মিনিটকালের আলাপেই বুঝিতে পারিলেন, এই তরুণ সন্ন্যাসীর শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ও ঐশী ক্ষমতা দেশের ইতিহাসের উপর একটা দাগ রাখিয়া যাইবে। তাঁহার আমন্ত্রণে স্বামীজী তিন-চারি সপ্তাহকাল তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া থাকেন। এই সময়ে মহীশূর রাজসভার বিশিষ্ট কর্মচারী ও পদস্থ ব্যক্তিগণ তাঁহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করেন। এবং স্যার শেষাদ্রি আয়ার এক উপলক্ষে বলেন, "ধর্মসম্বন্ধে আমরা অনেকেই অনেক বই পড়েছি। কিন্তু তাতে আমাদের কি লাভ হয়েছে? আমার জানিত যে-কোনও লোকের চাইতে এই তরুণ সন্ন্যাসীর অন্তর্দৃষ্টি অনেক বেশী। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। ইনি নিশ্চয়ই ধর্মজ্ঞ হয়েই জন্মগ্রহণ করেছেন, নইলে এই অল্প বয়সে এত জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি ইনি কি করে লাভ করলেন?"

এই অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন তরুণ সন্ন্যাসীকে দেখিয়া মহীশূরের মহারাজা সন্তুষ্ট হইবেন মনে করিয়া স্যার শেষাদ্রি আয়ার তাঁহাকে

তাঁহার নিকট লইয়া গেলেন। গেরুয়াবস্ত্র পরিহিত ও রাজোচিত চেহারাসম্পন্ন স্বামীজীকে দেখিয়া ও তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া মহারাজা অত্যন্ত খুশী হইলেন। এবং তাঁহার অনুরোধে স্বামীজী রাজ-অতিথিরূপে রাজপ্রাসাদেই বাস করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজা প্রায়ই তাঁহার সহিত নির্জন রুদ্ধ কক্ষে বসিয়া নানা বিষয়ে তাঁহার উপদেশ ও পরামর্শ চাহিতেন।

মহারাজা একদিন তাঁহার পার্ষদগণের সমক্ষে স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামীজী, আপনি আমার পার্ষদ্‌দের কিরূপ মনে করেন?" স্বামীজী নির্ভয়ে উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আপনি অতি হৃদয়বান লোক, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আপনি আপনার পার্ষদদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকেন। আর পার্ষদরা সর্বত্রই (একই চরিত্রের) পার্ষদ।" ইহাতে মহারাজা আপত্তি জানাইয়া বলিলেন, "না, না, আমার দেওয়ান সেরূপ নন। তিনি বুদ্ধিমান ও বিশ্বাসযোগ্য।" ইহার উত্তরে স্বামীজী কহিলেন, "মহারাজ, দেওয়ান হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি মহারাজার অর্থ লুঠ করে ইংরেজ-প্রতিনিধিকে (Political Agent) দেন।" শুনিয়া মহারাজা আলোচনার বিষয় পরিবর্তন করিলেন এবং পরে স্বামীজীকে তাঁহার নিজ ঘরে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, "স্বামীজী, অত্যধিক স্পষ্টবাদীতা সব সময়ে নির্বিঘ্ন নয়। আপনি যদি আমার পার্ষদদের সামনে এইভাবে কথা বলতে থাকেন, তা হলে কেউ হয়তো আপনাকে বিষ খাইয়েও মারতে পারে।" কিন্তু রাজদরবারের এই সকল শঙ্কা-ভয়ের বিষয় জানিয়া-বুঝিয়াও[১],

১। দেখা যায়, এ বিষয়ে স্বামীজী খুবই অবহিত ছিলেন। স্বামী অখণ্ডানন্দ লিখিয়াছেন, তাঁহার সহিত কয়েক দিন ভুজের রাজপ্রাসাদে থাকিবার পর স্বামীজী আমাকে বলিলেন, "রাজা যে রকম আদর করছেন, তাতে এখানে বেশী দিন থাকলে অনেকের চক্ষুশূল হতে হবে। পঁচিশ বছর পূর্বে আনন্দ আশ্রম নামে এক বাঙালী সন্ন্যাসী ভুজে এসে (রাজাকে সুপরামর্শ দিয়ে) রাজ্যের বিশেষ উন্নতি করেছিলেন।...এ জন্যে আনন্দ আশ্রম কর্মচারীগণের চক্ষুশূল হলেন। খাদ্যের সঙ্গে বিষ দিয়ে তাঁর শত্রুরা তাঁকে হত্যা করে।

স্বামীজী ছিলেন সত্যের সেবায় উৎসর্গিত। তাই, তিনি কহিলেন, "মহারাজ, আপনি কি মনে করেন, জীবন বিপন্ন হবে বলে একজন সৎ সন্ন্যাসী সত্য বলতে ভয় পায়? ধরুন, কাল যদি আপনার ছেলে আমাকে জিজ্ঞাসা করে আমার বাবা কেমন লোক, তা হলে আমি কি আপনার যে সব গুণ নেই তা আপনার আছে বলব? তা কখনই বলব না।"[1] অথচ দেখা যায়, এই মহারাজাকেই স্বামীজী তাঁহার অসাক্ষাতে প্রচুর প্রশংসা করিয়াছেন।

মহীশূর রাজসভায় স্বামীজীর একজন অস্ট্রিয়ান সঙ্গীত বিশারদের সহিত ইউরোপীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তখন ঐ সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁহার গভীর জ্ঞান দর্শনে সকলেই বিস্মিত হন। এইরূপ, অপর একদিন রাজপ্রাসাদের কর্মে নিযুক্ত একজন তড়িৎতত্ত্ববিদের (electrician) সহিত তড়িৎ সম্বন্ধে আলোচনায় ঐ বিষয়েও তাঁহার বিস্ময়কর জ্ঞান প্রকাশ পায়।

একদিন রাজপ্রাসাদের হলে পণ্ডিতদিগের একটি সুবৃহৎ সভা হয়। এবং স্বামীজী তাহাতে উপস্থিত থাকিবার জন্য নিমন্ত্রিত হন। সভায় প্রধান মন্ত্রী সভাপতি ছিলেন এবং আলোচনার বিষয় ছিল বেদান্ত। পণ্ডিতদিগের বক্তৃতা শেষ হইলে, সভাপতি স্বামীজীকে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তখন স্বামীজী তাঁহার অপূর্ব প্রাণস্পর্শী ভাষায় বেদান্তের সত্যগুলি এমনভাবে ব্যাখ্যা করিলেন যে, শুনিয়া পণ্ডিতগণ একযোগে সমস্বরে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

স্বামীজীর উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া প্রধানমন্ত্রী তাঁহাকে একদিন একটি উপহার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। এবং তৎসঙ্গে তিনি তাঁহার একজন সেক্রেটারিকে তাঁহাকে লইয়া বাজারের সর্বোৎকৃষ্ট দোকানে গিয়া তিনি যাহা পছন্দ করেন তাহাই কিনিয়া দিতে বলিলেন। বাজারে গিয়া স্বামীজী শিশুর মত আগ্রহের সহিত সব

আমাদেরও সেই দশা হতে পারে। চল্, এ স্থান হতে কালই চলে যাওয়া যাক্।"

দেখিলেন ও অনেক জিনিসের প্রশংসা করিলেন, কিন্তু পরিশেষে বলিলেন, "বন্ধু, আমি যা চাই, তাই আমি কিনব এ যদি দেওয়ান ইচ্ছা করে থাকেন, তা হলে আমাকে এখানকার সর্বোৎকৃষ্ট চুরুট কিনে দিন।"

ইহার পর স্বামীজী একদিন স্বয়ং মহারাজা-কর্তৃক আহুত হইয়া প্রধান মন্ত্রীর সহিত তাঁহার কক্ষে গেলে, মহারাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামীজী, আমি আপনার জন্যে কি করতে পারি?" উত্তরে স্বামীজী সেদিন উচ্ছ্বসিত ভাষায় তাঁহার জীবনোদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন। তিনি ভারতবর্ষের অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, 'ভারতের সম্পদ হচ্ছে তার দর্শন ও আধ্যাত্মিকতা। এবং তার এখন দরকার আধুনিক জড়বিজ্ঞানের জ্ঞান ও ভিতর হইতে একটা আমূল সংস্কার। এবং তজ্জন্য এখন চাই ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্য দেশসমূহের মধ্যে একটা আদান-প্রদান। তারা আমাদের বিজ্ঞান ও কৃষি, শিল্প ইত্যাদি ব্যবহারিক বিদ্যাসকল শিক্ষা দেবে, আর বিনিময়ে আমরা তাদের আমাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান করব। কারণ, শুধু ভিক্ষার দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। তজ্জন্য একটা বিনিময়ের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া একান্ত দরকার। এবং প্রধানতঃ তজ্জন্যই আমি আমেরিকায় গিয়ে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের নিকট বেদান্তের মহান সত্যসকল প্রচার করতে ইচ্ছা করেছি।" স্বামীজীর উদাত্ত কণ্ঠনিঃসৃত এই আবেগময় কথাগুলি শুনিয়া মহারাজা মুগ্ধ হইলেন এবং তখনই তাঁহার আমেরিকা যাইবার সকল ব্যয় বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু স্বামীজী অগ্রে রামেশ্বর যাইতে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। সম্ভবতঃ তজ্জন্য অথবা অপর কোনও কারণে, তিনি ঐ সময়ে মহারাজার নিকট হইতে কোন অর্থসাহায্য লইতে সম্মত হইলেন না।

ইহার কিছুদিন পরে স্বামীজী মহারাজার নিকট বিদায় চাহিলে, তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে আর কয়েক দিন থাকিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "স্বামীজী, আমি আপনার একটা স্মৃতিচিহ্ন

রাখতে চাই। আপনি অনুমতি দিলে, আমি আপনার কণ্ঠস্বরের একটা (ফোনোগ্রাফিক) রেকর্ড তৈরী করে রাখি।” স্বামীজী ইহাতে স্বীকৃত হইলে, ঐ রেকর্ড প্রস্তুত করা হয় এবং তাহা আজিও অস্পষ্ট অবস্থায় মহীশূরের রাজপ্রাসাদে রক্ষিত আছে। বস্তুতঃ দেখা যায়, স্বামীজীর প্রতি মহারাজার অনুরাগ ক্রমশঃ অত্যন্ত গভীর হইয়া উঠিয়াছিল এবং একদিন তিনি তাঁহাকে তাঁহার শ্রীচরণ পূজা করিবার ইচ্ছাও জানাইয়াছিলেন। কিন্তু স্বামীজী তাহা তাঁহাকে কিছুতেই করিতে দেন নাই।

অল্প পরেই স্বামীজীর যাইবার দিন আগত হইলে, মহারাজা তাঁহাকে কতকগুলি মূল্যবান উপহার দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু স্বামীজী ঐ সব লইতে অস্বীকার করায়, মহারাজা তাঁহাকে অন্ততঃ একটা কিছু লইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। ইহাতে স্বামীজী পরিশেষে কহিলেন, “মহারাজ. আমাকে যদি নিতান্তই কিছু নিতে হয়, তবে ধাতুর সম্পর্কশূন্য একটি হুঁকা আমাকে দিন।” তখন মহারাজা তাঁহাকে অতি সুন্দর কারুকার্যখচিত একটি রোজউডের পাইপ (বা হুঁকা) দান করিলেন। যাত্রার সময়, মহারাজা তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। এবং প্রধান মন্ত্রী তাঁহার পকেটে একতাড়া নোট গুঁজিয়া দিবার অনেক নিষ্ফল চেষ্টা করিলেন। পরিশেষে স্বামীজী বলিলেন. “আমার জন্যে যদি কিছু করতে চান, তবে আমাকে (কোচিনের রাজধানী) ত্রিচুড়ের একখানি টিকিট কিনে দিন। আমি রামেশ্বর যাচ্ছি পথে কোচিনে কয়েকদিন অপেক্ষা করব।” তখন প্রধান মন্ত্রী তাঁহাকে একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর রেলগাড়ীর টিকিট কিনিয়া দিলেন এবং কোচিনের দেওয়ান শ্রীশঙ্করিয়ার নিকট একখানি পরিচয় পত্রও দিলেন।

ত্রিচুড়ে মাত্র অল্প কয়েক দিন থাকিয়া, স্বামীজী মালাবারের মধ্য দিয়া ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজধানী ত্রিবান্দ্রমে উপস্থিত হইলেন। ত্রিবান্দ্রমে তিনি অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ারের আথিত্য গ্রহণ করেন ও মোট নয় দিন তাহার বাড়ীতে থাকেন (ডিসেম্বর, ১৮৯২)।

এই সময়কার কিছু কিছু সংবাদ তুইটি বিবরণ হইতে পাওয়া যায়। একটি এস্ কে নায়ারের প্রদত্ত, অপরটি উক্ত অধ্যাপক সুন্দররামের লিখিত। এস্ কে নায়ার তাহার বর্ণনায় লিখিয়াছেন, "স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্য সকলকেই বিস্মিত ও মুগ্ধ করিত। তাঁহার এই এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল যে, তিনি একই সময়ে বহু লোকের বহু প্রশ্নের জবাব দিতে পারিতেন। এবং প্রশ্নের বিষয় যাহাই হউক না কেন (যথা, স্পেন্সার, সেক্সপীয়র, কালীদাস, ডারউইনের ক্রমবিকাশ-বাদ্, ইহুদীজাতির ইতিহাস, আর্যসভ্যতার বিকাশ, বেদ, ইসলাম, খৃষ্টধর্ম, ইত্যাদি), তাঁহার উত্তর তৈরীই থাকিত। বস্তুতঃ মহত্ত ও সরলতা তাঁহার সর্বাবয়বে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত ছিল।"

অধ্যাপক সুন্দররামের বিবরণ সুদীর্ঘ। অন্য নানা কথার মধ্যে তিনি লিখিয়াছেন, "কোচিনরাজের একটি মুসলমান পিওনের সঙ্গে তিনি আমার বাড়ীতে পৌছেন। শুনিলাম, পূর্বের তুই দিন তিনি একটু তুগ্ধ ব্যতীত আর কিছুই আহার করেন নাই। তাহা হইলেও, অগ্রে তাঁহার ঐ মুসলমান সঙ্গীটিকে খাওয়াইয়া বিদায় না করিয়া, তিনি নিজে কিছুই গ্রহণ করিলেন না।

"তুই-চার মিনিটকাল আলাপ করিয়াই বুঝিলাম, স্বামীজী একজন অতি শক্তিশালী লোক। তাঁহার ব্যক্তিত্ব, কণ্ঠস্বর, চোখের দীপ্তি এবং তাঁহার কথা ও ভাব-প্রবাহ—এ সবই ছিল মহা উদ্দীপনাময়। আমি ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার (এম এ পরীক্ষার্থী) ভ্রাতুষ্পুত্র রাজকুমার মার্তণ্ড বর্মার গৃহ-শিক্ষক ছিলাম। কিন্তু স্বামীজীর আকর্ষণে সেদিন আর আমার তাহাকে পড়াইতে যাওয়া হইল না। সন্ধ্যার সময় আমি স্বামীজীকে ত্রিবান্দ্রম ক্লাবে লইয়া গেলাম। সেখানে আমি তাঁহাকে রসায়নের অধ্যাপক সুবিখ্যাত পণ্ডিত রঙ্গচারিয়া ও উপস্থিত অপর সকলের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলাম। স্বামীজী ক্লাবে অল্পক্ষণ থাকিলেও, তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

"পরদিন তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া আমার পূর্বোক্ত ছাত্র

রাজকুমার মার্তণ্ড বর্মার সহিত দেখা করেন ও তখন প্রসঙ্গক্রমে দেশীয় নৃপতিগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের বিষয় উল্লেখ করেন। রাজকুমারের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, যে সকল হিন্দুরাজার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে তন্মধ্যে বরোদার মহারাজার কার্যদক্ষতা, স্বদেশপ্রীতি ও দূরদৃষ্টি সর্বাপেক্ষা অধিক। ঐ সঙ্গে তিনি খেতড়ীর মহারাজার গুণাবলীরও উচ্চ প্রশংসা করেন এবং পরিশেষে বলেন, দক্ষিণের দিকে তিনি যত অগ্রসর হইয়াছেন, ততই ভারতীয় রাজন্য-বর্গের চরিত্র ও কর্মদক্ষতার একটা অবনতি লক্ষ্য করিয়াছেন।

"রাজকুমারের ফটো তুলিবার সখ ছিল। তাই, স্বামীজীর সুদর্শন চেহারায় আকৃষ্ট হইয়া তিনি তাঁহার একখানি ফটো তুলিলেন। ইহার কয়েক দিন পরে, ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার সহিতও স্বামীজীর অল্পক্ষণের জন্য একবার সাক্ষাৎ হয়। মহারাজা তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করেন ও দেওয়ানকে তাঁহার থাকিবার ও রাজ্যমধ্যে সর্বত্র ভ্রমণ করিবার সুব্যবস্থা করিয়া দিতে বলেন।

"এই সময়ে মাদ্রাজের সহকারী একাউন্ট্যান্ট-জেনারেল বাবু মন্মথনাথ ভট্টাচার্য কোনও কাজে ত্রিবান্দ্রমে আসিয়াছিলেন। স্বামীজীর অনুরোধে আমি তাঁহার বাসার ঠিকানা লইয়া আসিলাম। তখন হইতে স্বামীজী রোজই সকালে তাঁহার বাসায় গিয়া একেবারে আহারাদি শেষ করিয়া আসিতে লাগিলেন। এ জন্য আমি একদিন অনুযোগ জানাইলে তিনি বলিলেন, 'আমরা বাঙ্গালীরা দলবদ্ধভাবে থাকতে ভালবাসি। তা ছাড়া, মন্মথ আমার সহপাঠী, আর সে হচ্ছে বিখ্যাত পণ্ডিত ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ৺মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্নের পুত্র। তাই, তার ওপর আমার একটা বিশেষ দাবী আছে। আর আমি অনেক দিন মাছ খাইনি। সে জন্যেও মন্মথের ওখানে খাবার সুযোগটা আমি গ্রহণ করেছি।' এই কথা শুনিয়া আমি মাছ-মাংস আহারের উপর আমার ঘৃণা ব্যক্ত করিলে তিনি বলিলেন, 'প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণগণ মাংস, এমন কি গোমাংসও খেতেন। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে তা ক্রমশঃ বন্ধ হয়েছে।

এবং উহাই আমাদের জাতীয় শক্তির ক্রমাবনতি ও হিন্দুরাজগণের স্বাধীনতা লোপের একটা প্রধান কারণ। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'হিন্দুরা যদি জগতের অপর জাতি সকলের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় জয়ী হতে চায়, তবে তাদের অবাধে মাংসাহারী হতে হবে।'

"স্বামীজীর সহিত প্রতিদিনই আমার এইরূপ নানা বিষয়ে নানা প্রকার কথাবার্তা হইত। শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিও তাঁহার সহিত দেখা করিয়া নানাপ্রকার আলাপ-আলোচনা করিতেন। এবং সকলেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার কথা শুনিতেন। একদিন আলোচনান্তে ত্রিবাঙ্কুর স্টেটের সহকারী দেওয়ান স্বামীজীর চরণে বার বার প্রণাম করেন এবং যাইবার সময় বলেন, 'এরকম লোক আর কখন দেখিনি। আজ যে সকল কথা শুনলাম তা জীবনে কখন ভুলব না'।"

এইরূপ বহু কথা ও ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া অধ্যাপক সুন্দররাম তাহার বর্ণনার শেষে লিখিয়াছেন, "আমার গৃহে অবস্থানকালে, তিনি আমার বাড়ীর সকলের হৃদয় কাড়িয়া লইয়াছিলেন। আমাদের প্রত্যেকের নিকট তিনি ছিলেন শুধুই স্নেহ, করুনা ও মাধুর্য। এবং যখন তিনি আমাদের ছাড়িয়া গেলেন, তখন মনে হইয়াছিল আমাদের ঘরের আলো নিবিয়া গেল (১৮৯২, ডিসেম্বর)"।

ত্রিবান্দ্রম হইতে স্বামীজী পূর্বদিকে রামেশ্বরাভিমুখে রওনা হইলেন। পথে মাদুরায় তিনি (একখানি পরিচয়-পত্র সহ) রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই ভক্তিমান ও সুশিক্ষিত রাজা অতি অল্পেই স্বামীজীর বিশেষ ভক্ত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। স্বামীজী তাঁহার এই সুযোগ্য শিষ্যের নিকট জনশিক্ষা, কৃষির উন্নতি, ভারতের বর্তমান সমস্যাসমূহ ও ভবিষ্যতের বিপুল অভ্যুদয়-সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার অনেক চিন্তা ও সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। তাঁহার এই সকল উদ্দীপনাময় কথা শুনিয়া, বিস্মিত ও বিমুগ্ধ রাজা তাঁহাকে সর্বাগ্রে চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগ দিবার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহিত করিতে

লাগিলেন। বলিলেন, "প্রাচ্যের অধ্যাত্ম আলোকের প্রতি পাশ্চাত্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার ও ভারতের উন্নতির জন্য তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্মের ভিত্তি স্থাপনের উহাই সর্বাপেক্ষা অনুকূল সুযোগ।" এবং ঐ সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য তিনি তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিতেও প্রতিশ্রুত হইলেন।

রামনাদের রাজার নিকট হইতে বিদায় লইয়া, স্বামীজী রামেশ্বর যাত্রা করিলেন। সেখানে—রামেশ্বরের বিশাল মন্দিরে—তিনি শ্রীরামচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত শিবমূর্তি দর্শন ও পূজা করিয়া তাঁহার জীবনের একটি বড় অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। তৎপর তিনি ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিকের শেষ প্রান্ত কন্যাকুমারী অভিমুখে রওনা হইলেন।

কন্যাকুমারী পৌঁছিয়া স্বামীজী শিশুর ন্যায় ব্যাকুল হৃদয়ে মা কুমারীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন ও প্রবল ভাবাবেগে দেবীর সম্মুখে ভূপতিত হইলেন। তারপর দেবীর পূজা শেষ করিয়া, তিনি অন্তরের ঐ আবেগভরেই সমুদ্র সাঁতরাইয়া আর্দ্র-বস্ত্রে তট হইতে বিচ্ছিন্ন ভারতের শেষ শিলাখণ্ডের উপর গিয়া বসিলেন। তখন তাঁহার সামনে অকূল বারিধি ও তাহার উত্তাল তরঙ্গমালা, পশ্চাতে তুষার-মণ্ডিত হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত জননীস্বরূপা পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ। এবং সেখানে—ভারতের ঐ শেষ উপলখণ্ডের উপর বসিয়া—তিনি এক মহা ধ্যান ও অনুধ্যানে নিমগ্ন হইলেন (১৮৯২, ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ)।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেল ঐ ধ্যানে। তবু তাঁহার হুঁস নাই, চিন্তারও বিরাম নাই। কি ছিল তাঁহার ঐ ধ্যান-অনুধ্যানের বিষয়?

ভারতের নিবিষ্ট পরিব্রাজক তিনি। আজ তাঁহার সুদীর্ঘ তীর্থ-ভ্রমণের সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে। হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত ভারতের প্রায় সকল তীর্থই তিনি দেখিয়াছেন। ঐ সকলের মাহাত্ম্য এবং ভারতভূমির প্রতি ধূলিকণার পবিত্রতা তিনি

অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু চলিতে চলিতে তাঁহার বুকে নিরন্তর বাজিয়াছে কোন্ ধ্বনি, কোন্ বাণী, কার উদাত্ত আহ্বান? আমরা দেখিয়াছি অমৃতপানের আকাঙ্ক্ষা লইয়া তিনি গৃহ ছাড়িয়াছিলেন, নিরবচ্ছিন্ন সাধনা ও চরমতম সিদ্ধি লক্ষ্য করিয়া তিনি পরিব্রাজক সাধুর জীবন অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে নিজ জীবনোদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজন জানাইয়া তিনি সঙ্গের গুরুভাইদের পরিত্যাগ করিয়া নিঃসঙ্গ ভ্রমণে রত হইয়াছিলেন।

বস্তুতঃ এই শেষোক্ত সঙ্কল্প লইয়া স্বামীজী যখন একাকী মীরাট হইতে যাত্রা করেন, তখন তাঁহার নিজের মুক্তি ও নিজের জন্য তপস্যার প্রয়োজন যেন মিটিয়া গিয়াছে। তাহা আর তাঁহার প্রাণকে পূর্বের ন্যায় নিরন্তর উদ্বেলিত করে না। তখন তাঁহার হৃদয় তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠিয়াছে অন্য একটি উত্তাল অশ্রান্ত ধ্বনি—ভারত ও ভারতের প্রয়োজন। তাই, তাঁহার এইবারকার ভ্রমণ-সঙ্কল্পের লক্ষ্য শুধু যে তীর্থ-দর্শনই ছিল তাহা নয়। উহার পূর্ণতর উদ্দেশ্য ছিল ভারতের পুনরুত্থানের উপায় নির্ধারণ জন্য ভারত-দর্শন—ভারতের রাজা-প্রজা, সমাজ-সংসার, পাহাড়-নদী, বন-মরু, নগর-প্রান্তর, তীর্থ-মন্দির, অতীত কীর্তি, সাগর-মেখলা ইত্যাদি সব কিছুরই দর্শন।

আজ কন্যাকুমারী দর্শনান্তে তাঁহার ঐ সঙ্কল্পিত ভারত-দর্শনের কাজও শেষ হইয়াছে। কিন্তু যে বোঝা বুকে করিয়া তিনি এই দীর্ঘ—দুই সহস্রাধিক মাইল-ব্যাপী—পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, তাহা নামাইবার উপায় তো এখনও অনির্ধারিত। তাই, আজ তাঁহার হৃদয়-মনে উঠিয়াছে এক প্রচণ্ড আলোড়ন। অধঃপতিত, দারিদ্র্য-দুঃখনিপীড়িত, রোগ-শোকে নিমজ্জিত ভারতবর্ষের পুনরুত্থানের পথ কি? ভ্রমণকালে তিনি তাহারই অন্বেষণে তাঁহার এই প্রিয় জন্মভূমির বিশালতার মাঝে ডুব দিয়া তাহার দিকে দিকে সন্তরণ করিয়া দেখিয়াছেন। কিন্তু যাহা দেখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার হৃদয় জ্বলিয়া উঠিয়াছে। দেশের অধিকাংশ নরনারীই নিরন্ন, অস্পৃশ্য, অশিক্ষিত

এবং সমাজে সর্বপ্রকারে বঞ্চিত ও নিঃস্বত্ব! ইহাদের এই ঘোর দুর্দশা মোচনের উপায় কি? বিশাল হিন্দুসমাজ এখন স্থবির, অসাড়, অনড়। অন্যদিকে, দেশের বর্তমান রাজশক্তি বিদেশী ইংরেজ। অর্থশোষণের জন্য ভারতের আষ্টেপৃষ্ঠে তাহার নাগপাশ। তাই, এই দুইটির নিকট হইতে কোন প্রতিকারের আশা দুরাশা মাত্র। বস্তুতঃ প্রতিকারের জন্যই প্রয়োজন ইহাদের একটিকে ভাঙ্গিয়া পুনর্গঠিত করা এবং অপরটিকে তাহার নাগপাশ চূর্ণ করিয়া দেশ হইতে বিদায় করা। কিন্তু এই দুইটি কার্য সাধনের জন্য দরকার সমগ্র জাতির পক্ষ হইতে দীর্ঘ দিনের অনেক প্রয়াস, অনেক শিক্ষা, শিক্ষণ ও প্রচার-প্রস্তুতি। তাই, তাঁহার মনে প্রশ্ন উঠিয়াছিল, ঐ সমাজ-নিষ্পিষ্ট বিশাল জন-সমষ্টির দুঃখ-দুর্দশা উপস্থিত মত একটু লাঘব করিবার কি কোন উপায়ই নাই? এই জন্য অনেক আশা করিয়া তিনি বহু দেশীয় নৃপতিদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং সুযোগ পাইলেই নানাভাবে তাঁহাদের ঐ কার্যে ব্রতী হইয়া দেশের কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি-সাধনে রত হইতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু উহাতে কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য কিছু ফল দেখা গেলেও, উল্লেখযোগ্য কিছুই সাধিত হয় নাই। এবং তিনি সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়াছিলেন, এই সকল ভোগৈশ্বর্যমত্ত ও পাশ্চাত্যের অনুকরণপ্রিয় দেশীয় রাজাদিগের দ্বারা অধিক কিছু হইবার নয়।

তাই পরিশেষে তিনি ভ্রমণ-পথেই জীবনোদ্দেশ্য সাধনের অন্য উপায় চিন্তা করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। এবং কন্যাকুমারীতে —তাঁহার ভ্রমণ পর্বের শেষে—ঐ চিন্তাই প্রবল হইয়া বিপুল আকারে তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে: ভারতের জনগণের দুঃখ-মোচন— ভারতের পুনরভ্যুদয়—ভারতের অধ্যাত্ম জ্ঞানের দ্বারা পৃথিবী বিজয়।

কি বিরাট বিশ্বজোড়া কাজ! কিন্তু তিনি একা। এই পৃথিবী-ব্যাপী সুবিপুল কাজ কি তিনি একাকী করিয়া উঠিতে পারিবেন? পারিবেন যে তাহাতে তাঁহার মনে কোন সংশয় ছিল না। কারণ,

তাঁহার অন্তরে সদা সঞ্চরণ করিত বিশ্বশক্তির মুক্তধারা। আর তাহা ছাড়া, এই কাজ ছিল তাঁহার গুরুর আদিষ্ট কাজ—তাঁহার নিজ অন্তরাত্মার নির্দেশিত কাজ—তাঁহার বুক-জোড়া ব্যথা-বেদনা অপসারণের কাজ। তাই অপরিহার্য,—ইহা তাঁহার করিতেই হইবে। 'হয় ঐ মহাকার্য সুসাধিত করিব, না হয় ঐ চেষ্টাতেই জীবন দিব,' ইহাই তাঁহার মনোভাব।

কিন্তু উপায় কি—পথ কি? চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার ধ্যানাবিষ্ট মনের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল শত শত শতাব্দীব্যাপী অতীত ভারতের উজ্জ্বল ছবি: যুগযুগান্ত ধরিয়া তপস্যারত বৈদিক ঋষিগণের সুমহান ধারা—তাঁহাদের ধ্যান-চিন্তা প্রসূত ভারতের অধ্যাত্ম জীবন ও তাহার অবিরাম প্রবাহ এবং তাহা হইতেই উদ্ভূত ভারতের অন্তর্নিবাসী চৈতন্যময় আত্মা বা ভারতমাতা। অনুভব করিলেন, জগন্মাতা হইতে অভিন্ন আমাদের এই মা—জননী জন্মভূমি। মন্দিরে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত তাঁহারই মূর্তি। তীর্থে তীর্থে ঐ দেবীরই প্রদীপ্ত নিশান। এবং হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ঐ আলোক-সজ্জাতেই ভারতবর্ষ চির দীপ্যমান।

আর দেখিলেন ও বুঝিলেন, এই উজ্জ্বল অধ্যাত্ম জীবনই ভারতের প্রাণধারা ও তজ্জন্য তাহার ঐহিক কল্যাণের সঙ্গেও চির-বিজড়িত। যখনই এই জীবন নিষ্প্রভ হইয়াছে, তখনই ভারতের ঐহিক দুর্দশারও সূত্রপাত হইয়াছে। তাই, ভারতের বর্তমান দুর্দশা মোচনের উপায় হইতেছে তাহার অধ্যাত্ম জীবনকে পুনঃসঞ্জীবিত করা।

কিন্তু তাহার জন্য কোন্ পথ অবলম্বন করা শ্রেয়? ভ্রমণকালে ভারতীয় ধর্মসাধনার অনন্ত মত-পথ তিনি লক্ষ্য করিতে করিতে আসিয়াছেন। তাই, চিন্তা চলিল। এবং তিনি তাঁহার সুপরিচ্ছন্ন দিব্য-দৃষ্টি সহায়ে দেখিলেন, ত্যাগ ও সেবা—এই দুইটি মহান আদর্শই ভারতকে ধর্মে, কর্মে ও ঐহিক সুখ-সমৃদ্ধি অর্জনে জগতের শীর্ষস্থানে উন্নীত করিবে। এবং এই দুইটি আদর্শ অনুসরণের দ্বারাই আসিবে ভারতের জনগণের মুক্তি—তাহাদের দুঃখ-দুর্দশার চিরাবসান। তাই,

ভারতকে এই দুইটি আদর্শই তাহার জাতীয় আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

আর এই সম্পর্কে একটি অতি অভিনব ও যুগান্তকারী কর্মপন্থাও তাহার মনে উদয় হইল। তিনি চিন্তা করিলেন, 'আমরা এতগুলি সন্ন্যাসী দেশের বুকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি ও তাহার অশিক্ষিত ও অনশন-ক্লিষ্ট জনগণকে তত্ত্বকথা শিখাইতেছি। ইহা বাতুলতা ছাড়া আর কি? আমাদের গুরুদেব বলিতেন, খালি পেটে ধর্ম হয় না। এই সকল নিরন্ন হতভাগ্য লোক শুধু শিক্ষার অভাবেই পশুর ন্যায় জীবন যাপন করিতেছে। এবং যুগ যুগ ধরিয়া আমরা শুধু তাহাদের রক্তশোষণ করিয়াছি—তাহাদিগকে পদদলিত করিয়া আসিয়াছি।' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে এক অভিনব ও মহাফলপ্রদ উপায়ের কথা তাঁহার মনে উদয় হইল: যদি কতকগুলি নিঃস্বার্থ ও পরহিত-পরায়ণ সন্ন্যাসী গ্রামে গ্রামে গিয়া আচণ্ডাল সমস্ত দরিদ্র লোকদের মুখে মুখে এবং ম্যাপ, ক্যামেরা ও গ্লোব ইত্যাদির সাহায্যে শিক্ষা দেন ও সর্বপ্রকারে তাহাদের অবস্থার উন্নতি-সাধনে সচেষ্ট হন, তাহাতে কালে কি সুফল পাওয়া যাইবে না? নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া[১], তিনি আরও একটি সত্য উপলব্ধি করিলেন: ভারতের অধঃপতিত বিশাল জনগণকে ঊর্ধ্বে তুলিবার শক্তি ভিতর হইতেই আসিবে, অর্থাৎ বিরাট গোঁড়া হিন্দুসমাজ হইতেই উত্থিত হইবে।

তারপর তিনি তাঁহার এই সকল সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করিবার উপায় চিন্তা করিলেন। তাঁহার ভ্রমণকালের অভিজ্ঞতা হইতে তিনি জানিতেন, জনগণের উন্নতি-সাধনের জন্য প্রত্যেক শহরেই তিনি অন্ততঃ দশ-পনর জন উৎসাহী যুবকের সাহায্য পাইবেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ কোথা হইতে আসিবে? সারা ভারত ঘুরিয়া তিনি

১। এই বিষয়ে স্বামীজীর এই সময়কার এই প্রাথমিক চিন্তাটিই তাঁহার ভবিষ্যৎ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠায় পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়া ভারতের ভাগ্যাকাশে এক অভূতপূর্ব যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে।

বুঝিয়াছিলেন, ঐ অর্থ এ দেশে কখন পাওয়া যাইবে না। কারণ, দেখিয়াছেন যাহারা উহা যোগাইতে সক্ষম তাহারা স্বার্থান্ধ ও দান-বিমুখ। নিরাশ হৃদয়ে তিনি অকূল সমুদ্রের পানে চাহিলেন। এবং সেদিক হইতে একটি আশার আলো যেন তাঁহাকে ইশারা করিল। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, ঐ মহাসাগর পার হইয়া তিনি আমেরিকায় গিয়া তাঁহার মস্তিষ্কের সাহায্যে অর্থ রোজগার করিবেন এবং দেশে ফিরিয়া ঐ অর্থের দ্বারা ভারতের পুনরুত্থানের জন্য তাঁহার পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবেন। যদি তাহা না পারেন, ঐ চেষ্টায় জীবন শেষ করিবেন। তিনি জানিতেন, তাঁহার এই কার্যে জগতের আর কেহ তাঁহাকে সাহায্য করুক বা না করুক, তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ নিশ্চয়ই তাঁহার দিশারী হইয়া তাঁহাকে পথ দেখাইয়া যাইবেন।

কন্যাকুমারীতে বসিয়া স্বামীজী যখন এই সকল যুগান্তকারী চিন্তা করিতেছিলেন, তখন নিশ্চয়ই (ইহা আমরা কল্পনা করিতে পারি) তাঁহার চারিপার্শ্বে দেবতাগণ, ভারতের ভাগ্যবিধাতা ও গুরু রামকৃষ্ণ উন্মুখ হইয়া তাঁহাকে দেখিতেছিলেন ও ব্যাকুলভাবে তাঁহার সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। কারণ, উহার উপরই দুলিতেছিল ভারতের ভাগ্য এবং জগতের প্রাণ ও কল্যাণ। ভারত ও জগতের পক্ষে ঐ মহাসন্ধিক্ষণে স্বামীজী আরও কত কি চিন্তা ও অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা সবই যে আমরা জানিতে পারিয়াছি তাহা নয়। তবে ইহা সুস্পষ্টভাবে বলা যায়, তিনি ঐ কালে ভারতের সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিলেন।[১] ভারতের ব্যথা, বেদনা, আশা, আকাঙ্ক্ষা সবই তাঁহার হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছিল। এবং ভারতমাতার হৃদয়ের স্পন্দন তাঁহার বুকেও স্পন্দিত হইতেছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ভারতের কল্যাণে জগতের কল্যাণ এবং ভারতের পুনরুত্থান তাহার নিজের জন্য যতখানি

১। দেখা যায়, পরবর্তীকালে স্বামীজী (একটি অতি প্রিয় পাশ্চাত্য শিষ্যের নিকট) নিজেকে একটি ঘনীভূত ভারত (A condensed India) বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন।

প্রয়োজন, তাহার চাইতে অনেক বেশী প্রয়োজন সারা জগতের জন্য।

এই প্রকার নানা ধ্যান-চিন্তার শেষে, স্বামীজী চূড়ান্তভাবে স্থির করিলেন যে তিনি পাশ্চাত্য দেশে যাইবেন। সেখানে তিনি ভারতের অধ্যাত্ম জ্ঞানের দ্বারা ঐ দেশ জয় করিবেন এবং ঐ অতুলনীয় জ্ঞানদানের পরিবর্তে তিনি ভারতের জন্য তথা হইতে গ্রহণ করিবেন প্রয়োজনীয় অর্থ এবং ঐ দেশীয় জড়বিজ্ঞান ও কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় শিক্ষা। এবং সেদিন—ঐ মহা সঙ্কল্প গ্রহণের শুভ মুহূর্তে—তিনি দিব্যচক্ষে দেখিলেন, ঐ আদান-প্রদান প্রতিষ্ঠার ফলে ভারত উত্থিত হইতেছে,—একটি বিশাল জ্যোতির আকারে (সূর্যের ন্যায়) সমগ্র জগৎকে আলোকিত করিয়া নবীন ভারতের উদয় হইতেছে।

কুড়ি

পরিব্রাজক জীবনের

নানা কাহিনী

গত কয়েক অধ্যায়ে আমরা স্বামীজীর পরিব্রাজক জীবনের যে বর্ণনা দিয়াছি, তাহা যে পরিপূর্ণ তাহা নয়। উহার ভিতর অনিবার্য-ভাবে অনেক ফাঁক (gap) ও অন্য নানা ত্রুটি বর্তমান। তাহার হেতু এই। স্বামীজী নিজে তাঁহার ঐ জীবনের খুব অল্প কথাই প্রকাশ করিয়াছেন এবং যাহা করিয়াছেন তাহাও নানা সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে করিয়াছেন। তাই, আমাদের বর্ণনার বেশীর ভাগই তাঁহার ভ্রমণ-পথের নানা স্থানের স্থানীয় শিষ্য, ভক্ত, বা গুণমুগ্ধ ব্যক্তিগণের বহু বৎসর পরে প্রদত্ত বিবরণ হইতে সংগৃহীত। আবার, ঐ সকল উপাদান হইতে যাহা জানা গিয়াছে, তাহাও আমাদের গ্রন্থের সীমা রক্ষার প্রয়োজনে অনেক সংক্ষিপ্ত করিয়া লিখিতে হইয়াছে। এই সকল কারণে আমাদের উক্ত বর্ণনায় যে অপূর্ণতা দোষ ঘটিয়াছে, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে অপসারণের জন্য আমরা স্বামীজীর পরিব্রাজক জীবনের কয়েকটি অতিরিক্ত কাহিনী নিম্নে সন্নিবেশিত করিলাম। এই কাহিনীগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইলেও, উহা সমস্তই স্বয়ং স্বামীজী-কর্তৃক কথিত। এবং উহা হইতে বোঝা যাইবে, তাঁহার পরিব্রাজক জীবন কিরূপ কঠিন, কৃচ্ছ্রসাধনপূর্ণ ও নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল।

১। ভারত ভ্রমণকালে স্বামীজীর একটা সঙ্কল্প ছিল যে, তিনি নিজের জন্য কখন কাহারও নিকট অর্থ ভিক্ষা করিবেন না। তাই, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার সময় কেহ নিজ হইতে রেলগাড়ীর টিকিট কিনিয়া না দিলে তিনি পায়ে হাঁটিয়াই যাইতেন।

এই জন্য পথে সময়ে সময়ে তিনি অনাহার ও ভ্রমণ-ক্লান্তিতে দারুণ কষ্ট পাইয়াছেন। এই সম্বন্ধে তিনি যে কয়েকটি কাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা গুছাইয়া নিম্নে দেওয়া হইল :

(ক) একবার পদব্রজে বহু পথ পর্যটন করিয়া তিনি এত ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন যে তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। এবং আর চলিতে না পারিয়া, তিনি প্রখর রৌদ্রের মধ্যে কোন মতে নিকটবর্তী একটি গাছের তলায় গিয়া অবশভাবে বসিয়া পড়িলেন। দেখিলেন, তাঁহার আর চলিবার ক্ষমতা নাই, নিকটে কোন আশ্রয়ও নাই। এই সম্পূর্ণ নিরুপায় অবস্থায় অকস্মাৎ তাঁহার মনে চিন্তা উঠিল, "আত্মার মধ্যেই তো সকল শক্তি অবস্থিত। সুতরাং দেহ বা ইন্দ্রিয়ের ক্লান্তিতে আত্মা ক্লান্ত হবে কেন? তাই, (আত্মাস্বরূপ) আমি কি করে দুর্বল হতে পারি?" এইরূপ চিন্তা করিতেই একটা শক্তির প্রবাহ তাঁহার দেহ-মন প্লাবিত করিল। তখন তিনি উঠিয়া পুনরায় হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন এবং সঙ্কল্প করিলেন তিনি আর কখন শারীরিক দুর্বলতার অধীনতা স্বীকার করিবেন না। পরিব্রাজক জীবনে তাঁহার এই প্রকার অবস্থা বহুবার ঘটিয়াছে এবং প্রত্যেক-বারেই নিজ উচ্চতম সত্তাকে স্মরণ করিয়া তিনি পুনরায় তাঁহার শরীর-মনে বল অনুভব করিয়াছেন। এই বিষয় সম্বন্ধে তিনি পরবর্তীকালে তাঁহার কালিফোর্নিয়ার একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন—

"আমি জীবনে বহুবার পথশ্রান্ত, ক্ষতপদ ও অনশনক্লিষ্ট হইয়া মৃত্যুর কবলে পড়িয়াছি। দিনের পর দিন আমার কোন আহার জোটে নাই এবং তজ্জন্য অনেক সময়ে আমি আর চলিতেও অক্ষম হইয়াছি। তখন আমি ঘোর অবসন্ন অবস্থায় একটি গাছের তলায় শুইয়া পড়িয়াছি, মনে হইয়াছে এখনই জীবন শেষ হইবে। তখন আমার কথা বন্ধ, চিন্তার ক্ষমতাও প্রায় বিলুপ্ত। কিন্তু পরিশেষে আমার মনে জাগিয়াছে এই ভাব : 'আমার ভয় নাই, মৃত্যু নাই। আমি কখন জন্মিও নাই, মরিও নাই। আমার ক্ষুধাও নাই, তৃষ্ণাও নাই। সোঽহং, সোঽহং। সমগ্র প্রকৃতি আমাকে ধ্বংস করিতে

পারে না, প্রকৃতি আমার দাসী। হে আমার (আত্মা-রূপ) মহেশ্বর, হে মহাদেব, তোমার শক্তি প্রকাশ কর। তোমার নষ্ট সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার কর! ওঠো, চলো, থামিও না।' এবং তখনই আমি পুনঃসঞ্জীবিত হইয়াছি ও (পুনরায় চলিবার জন্য) উঠিয়া দাঁড়াইয়াছি। আর আমি আজও জীবিত আছি। এইরূপ, যখনই অন্ধকার ছাইয়া আসিবে, তখনই সত্যকে সজোরে নিজের সম্মুখে ধরিও, তাহা হইলেই যাহা কিছু প্রতিকূল তাহা অন্তর্হিত হইবে। কারণ, শেষের কথা এই যে, এ সবই একটা স্বপ্ন মাত্র। যদিও বাধারাশি পর্বতপ্রমাণ এবং পরিবেশ ভীষণ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়া মনে হয়, তথাপি উহারা মায়া মাত্র। এই মায়াকে ভয় করিও না—দেখিবে ইহা দূরীভূত হইয়াছে। ইহাকে আঘাত কর—দেখিবে ইহা আর নাই। ইহাকে পদদলিত কর—দেখিবে ইহা মরিয়া গিয়াছে।"

(খ) একবার পর পর তিন দিন অনাহারে থাকিয়া স্বামীজী পথের উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। কতক্ষণ ঐ অবস্থায় ছিলেন তাহা জানিতে পারেন নাই। যখন জ্ঞান হইল, দেখিলেন বৃষ্টির জলে তাঁহার জামা-কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐ জলে ভিজিয়া তাঁহার শরীরটা একটু সুস্থ বোধ হইতেছিল। তখন তিনি উঠিয়া আর কিছুটা পথ হাঁটিয়া একটি মঠে পৌঁছিলেন এবং সেখানে কিছু খাইতে পাইয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইল।

(গ) মধ্যভারত ভ্রমণকালে কোন কোন স্থানের স্থানীয় লোকেরা তাঁহাকে আহার বা আশ্রয় দিতে অস্বীকার করে এবং তজ্জন্য তিনি ঐকালে খুবই কষ্ট পাইয়াছিলেন। ঐ সময়ে তিনি একস্থানে কয়েকদিন একটি মেথর পরিবারের সহিত বাস করিয়াছিলেন। তখন তিনি দেখিতে পান, এই সকল নিম্নতম জাতির মধ্যে কি অমূল্য গুণাবলী ও মহত্ত্বের বীজ নিহিত আছে। এই অভিজ্ঞতা তাঁহার আরও নানা সূত্রে লাভ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। নিম্নের ঘটনাটি তাহারই একটি নিদর্শন।

(ঘ) এই ঘটনাটি স্বামীজী বিশেষ আবেগের সহিত এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন :

"আমার ভারত-ভ্রমণকালে একস্থানে দলে দলে বহু লোক আমার নিকট এসে ভিড় করত ও উপদেশ চাইত। তিন দিন ধরে দিনরাত আমি তাদের সঙ্গে কথা বলতে বাধ্য হই এবং তারা আমাকে মুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম দেয় না। এমন কি, আমি কিছু খেয়েছি কিনা তাও তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করে না। তৃতীয় রাত্রে সকলে চলে গেলে, একটি নীচ জাতীয় দরিদ্র লোক এসে আমাকে বলল, 'স্বামীজী, আমি লক্ষ্য করেছি আজ তিন দিন আপনি কিছু আহার করেন নি, এমন কি, এক গ্লাস জলও খান নি। এতে আমি খুবই কষ্ট বোধ করছি।' শুনে আমার মনে হল, স্বয়ং ভগবানই এই দীন লোকটির বেশে আমাকে পরীক্ষা করছেন। আমি তাকে বললাম, 'তুমি আমাকে কিছু খেতে দিতে পার কি?' সে বললে, 'স্বামীজী, দেবার জন্যে আমার প্রাণ তো ব্যাকুল। কিন্তু আমার তৈরী চাপটি আপনি খাবেন কি করে? আমি আটা, ডাল, ইত্যাদি এনে দি, আপনি নিজে তৈরী করে খান।' এই কালে সন্ন্যাসাশ্রমের নিয়মানুসারে আমি অগ্নি স্পর্শ করতাম না। তাই আমি তাকে বললাম, "তোমার হাতের তৈরী চাপটিই আমাকে দাও, আমি তাই খাব।' শুনে লোকটি বিষম ভয় পেল। সে ছিল খেতড়ির মহারাজার প্রজা। তাই তাহার ভয়, মহারাজা যদি শুনেন যে সে মুচি হয়ে একজন সাধুকে তার তৈরী চাপটি দিয়েছে, তা হলে তিনি তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন এবং হয়তো রাজ্য হতেই নির্বাসিত করবেন। আমি তাকে বললাম, 'তোমার ভয় নেই, এ জন্যে মহারাজা তোমাকে কোন শাস্তি দেবেন না।' কিন্তু সে এ কথা বিশ্বাস করতে পারল না। তবু তার অন্তরের দয়ার বশেই সে তার তৈরী চাপটি আমাকে এনে দিল। খেয়ে আমার মনে হল, দেবরাজ ইন্দ্র যদি আমাকে স্বর্ণপাত্রে করে স্বর্গের সুধা এনে দিতেন তাও এত সুস্বাদু লাগত না। লোকটির দয়ার কথা স্মরণ করে চোখে জল এল এবং ভাবলাম, 'দীন

কুটিরগুলিতে এইরূপ উদার-হৃদয় হাজার হাজার লোক বাস করে, কিন্তু আমরা তাদের নীচ জাতি ও অস্পৃশ্য বলে ঘৃণা করি!' পরে আমি যখন খেতড়ির মহারাজার সঙ্গে সুপরিচিত হলাম, তখন আমি তাকে এই লোকটির এই মহৎ কার্যের কথা বলি। দুচার দিনের মধ্যেই মহারাজা লোকটিকে ডাকালেন। খুব বড় রকমের একটা শাস্তির ভয়ে সে কাঁপতে কাঁপতে মহারাজার নিকট এল। মহারাজা কিন্তু তার কাজের জন্য তাকে প্রশংসা করলেন ও সে যাতে সচ্ছল-ভাবে জীবন যাপন করতে পারে তার ব্যবস্থা করে দিলেন।"

(২) ভ্রমণপথে বিপদ-আপদের সময়ে, স্বামীজী মাঝে মাঝে ঈশ্বরের কৃপা ও তাঁহার অমোঘ নিয়ন্ত্রণ যে কি সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রকাশিত নিম্ন ঘটনা দুইটি হইতে জানা যায়ঃ

(ক) এই দুইটি ঘটনার একটি ঘটে উত্তর প্রদেশের তাড়িঘাট রেল স্টেশনে। সেখানে একদিন এক গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে স্বামীজী (একখানি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট সহ) ট্রেন হইতে অবতরণ করেন। এবং চৌকিদার তাঁহাকে স্টেশনের ভিতর থাকিতে না দেওয়ায়, তিনি বাহিরে আসিয়া তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্রাম চালার একটি খুটি ঠেস দিয়া রৌদ্রের মধ্যে মাটিতে বসিয়া রহিলেন।

সেখানে যাত্রীদের মধ্যে উত্তর ভারতের একজন মধ্যবয়স্ক বানিয়া স্বামীজীর প্রায় মুখোমুখী হইয়া ছায়াপূর্ণ স্থানে সতরঞ্চির উপর বসিয়া ছিল। পূর্ব রাত্রে সে গাড়ীতে স্বামীজীর সহিত একই কামরায় আসিয়াছে এবং তাঁহাকে অনশনক্লিষ্ট দেখিয়া অনেক ঠাট্টা-বিদ্রূপও করিয়াছে। তখন বিভিন্ন স্টেশনে গাড়ী থামিলে, স্বামীজী তৃষ্ণার্ত হইয়া পানিপাঁড়েদের নিকট জল চাহিলে তাহারা তাঁহার কথায় কান না দিয়া, যাহারা পয়সা দিল শুধু তাহাদেরই জল দিতে লাগিল। উক্ত বানিয়াটিও এক পয়সা দিয়া এক ঘটি জল কিনিয়া পান করিতে করিতে স্বামীজীকে উপহাস করিয়া বলিল, "ওহে সাধুজী, তুমি তো

সন্ন্যাসী, টাকা-পয়সা ত্যাগ করেছ, জল কেনার ক্ষমতা নেই। তাই, তুমি এখন জল না খাওয়ার আরাম উপভোগ কর। তুমি যদি আমার মত পয়সা রোজগার করতে, তবে আমার মত সুখেও থাকতে পারতে।" তাড়িঘাট স্টেশনে নামিয়াও, সে তাহার বসিবার স্থান হইতে নানা ঠাট্টা-বিদ্রূপের দ্বারা স্বামীজীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে যে, সন্ন্যাসীরা উপবাসে কষ্ট পায় ইহাই ন্যায়সঙ্গত এবং স্বামীজী যে অনাহারে রৌদ্রের মধ্যে বসিয়া আছেন, তাহার কারণ তিনি উহারই উপযুক্ত। তারপর সে একটা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া ঠোঁট কুঞ্চিত করিয়া বলিল, 'দেখ, আমি কি চমৎকার পুরি ও লাড্ডু খাচ্ছি! কিন্তু তুমি তো পয়সা রোজগার কর না, তাই তোমার শুক্‌নো গলা ও খালি পেট নিয়ে মাটিতে বসেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।'

ঠিক এই সময়ে একটি স্থানীয় লোক তাহার ডান হাতে একটি পুঁটুলি ও লোটা, বাঁ হাতে এক কুঁজা জল ও বামবগলে একটি সতরঞ্চি লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। এবং একটা পরিষ্কার জায়গায় সতরঞ্চিটি পাতিয়া স্বামীজীকে কহিল, "বাবাজী, আসুন। আমি আপনার জন্যে যে খাবার এনেছি তা গ্রহণ করুন।" শুনিয়া স্বামীজী অত্যন্ত আশ্চর্য বোধ করিলেন। এবং সে পুনঃ পুনঃ ঐ অনুরোধ করিতে থাকিলে, তিনি তাহাকে বলিলেন, "দেখ, খুব সম্ভবতঃ তুমি একটা ভুল করেছ। বোধ হয় আমাকে অপর একজন ভেবেছ।" কিন্তু ঐ লোকটি সজোরে বলিয়া উঠিল, "না না, আপনিই সেই বাবাজী, যাকে আমি দেখেছি।" ইহাতে স্বামীজী অত্যন্ত কৌতুহলী হইয়া কহিলেন, "সে কি? আমাকে তুমি কোথায় দেখলে?" লোকটি বলিল, "আমি একজন মিষ্টান্ন-বিক্রেতা। দুপুরের আহারাদির পর আমি যখন ঘুমিয়েছিলাম, তখন স্বপ্ন দেখি শ্রীরামজী আপনাকে দেখিয়ে বলছেন, আপনি গতকাল থেকে অভুক্ত থাকায় তিনি কষ্ট বোধ করছেন, তাই আমাকে তখনই কিছু পুরি-তরকারি তৈরী করে, তা এবং কিছু মিষ্টি, ভাল ঠাণ্ডা জল ও বসবার জন্যে একখানা সতরঞ্চি নিয়ে রেল স্টেশনে আপনার নিকট যেতে হবে।' আমি জেগে

ভাবলাম এ স্বপ্ন মাত্র, তাই পাশ ফিরে শুয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। কিন্তু শ্রীরামজী তাঁর অপার দয়ায় আমাকে আবার ঐ স্বপ্ন দিয়ে অবিলম্বে ঐ কাজগুলি করবার জন্যে ঠেলে জাগিয়ে দিলেন। তাই, আমি তাড়াতাড়ি কিছু পুরি ও তরকারি তৈরী করে, ঐ সব ও সকালের তৈরী কিছু মিষ্টি, কিছু জল ও সতরঞ্চি নিয়ে আমার দোকান থেকে দৌড়ে এখানে এসেছি এবং দূর থেকে আপনাকে দেখেই চিনতে পেরেছি। এখন আপনি আসুন, খাবারগুলি গরম থাকতে থাকতে খান। আপনি নিশ্চয়ই খুব ক্ষুধার্ত।" সমস্ত শুনিয়া স্বামীজী আহার করিলেন এবং সাশ্রু নয়নে তাঁহার এই সরল আহার্য-দাতাকে ধন্যবাদ জানাইলেন। কিন্তু সে বাধা দিয়া বলিল, "বাবাজী আমাকে কেন ধন্যবাদ দিচ্ছেন। এ সবই শ্রীরামজীর ইচ্ছায় হয়েছে।" ঘটনাটি আনুপূর্বিক লক্ষ্য করিয়া, পূর্বোক্ত উপহাসকারী বানিয়ার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। এবং সে উঠিয়া স্বামীজীকে কটু কথা বলার জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল।

(খ) দ্বিতীয় ঘটনাটি যে ঠিক কোথায় ঘটে তাহা জানা যায় না। তবে উহার বিবরণ এইরূপ। ভ্রমণপথে স্বামীজীর এক সময়ে মনে হইল, "আমি নির্লজ্জের মত অপরের গৃহে আহার করে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আর তার জন্যে ঠিক কাকগুলির মতই আমার মনে একটু বিবেকদংশনও জাগে না!" এবং তৎসঙ্গে তিনি আরও চিন্তা করিলেন, "আমাকে খাইয়ে গরীব লোকদের লাভ কি? তারা যদি এক মুঠো চাল বাঁচাতে পারে, তবে তা তারা তাদের ছেলেপিলেদের খাওয়াতে পারে। আর আমার যখন ঈশ্বর লাভ হল না, তখন আমার এই শরীরটাকে রাখারই বা দরকার কি?" এই প্রকার চিন্তার ফলে একটা গভীর নৈরাশ্যময় তীব্র বৈরাগ্যের ভাব আসিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। এবং তাহারই বশে তিনি তৎক্ষণাৎ বহু ক্রোশব্যাপী এক গভীর অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে ক্লান্তি ও অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবার উদ্দেশ্যে, তিনি কিছুই না খাইয়া সমস্ত দিন হাঁটিয়া বেড়াইলেন। ক্রমে রাত্রি

হইল। তখন দারুণ ক্লান্তি ও অবসাদে তিনি একটি গাছের নীচে শুইয়া পড়িলেন ও মনে মনে ঈশ্বরের চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে তিনি দেখিলেন একটি বাঘ আসিতেছে এবং সেটি ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া তাঁহার অদূরে আসিয়া বসিল। দেখিয়া স্বামীজী ভাবিলেন, "এইই ঠিক। এ দেহ দিয়ে চরম সত্য লাভ হল না, আর এর দ্বারা যে জগতের কোন হিত সাধিত হবে, তাও মনে হয় না। তাই, এটা অন্ততঃ এই ক্ষুধার্ত বাঘটার কাজে লাগুক, ইহাই বাঞ্ছনীয়।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি শান্ত ও নিশ্চল হইয়া প্রতিমুহূর্তেই বাঘটির আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যে কারণেই হউক, সে অন্য একদিকে দৌড় দিল। স্বামীজী মনে করিলেন, ওটা আবার এখনই ফিরিয়া আসিবে এবং তজ্জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাঘটি আর ফিরিল না এবং স্বামীজী ঈশ্বরে মন সংযুক্ত করিয়া সমস্ত রাত্রি ঐ জঙ্গলের মধ্যে কাটাইলেন। প্রত্যুষে ভগবানের অমোঘ কৃপা ও নিয়ন্ত্রণের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে একটা প্রচণ্ড শক্তির অনুভূতি লইয়া, তিনি ঐ বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

(৩) স্বামীজীর ভ্রমণকালের উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা সকল যে কিরূপ বিচিত্র ছিল তাহা নিম্নের ঘটনা কয়টি হইতে কিছুটা অনুমান করা যায়ঃ

(ক) একবার তাঁহার একটি আশ্চর্য স্বপ্ন দর্শন হয়। উহাতে তিনি দেখেন, বৈদিক যুগের একটি বৃদ্ধ ঋষি সিন্ধুনদের তীরে দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত ঋক্‌টি এক সম্পূর্ণ নূতন স্বরভঙ্গীতে গাহিতেছেনঃ

আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রি ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনি নমস্তু তে॥

স্বামীজী মনে করিতেন যে, এই স্বপ্নটির দ্বারা তিনি প্রাচীনতম যুগের আর্যদিগের স্বর-ছন্দের উদ্ধার সাধন করিতে পারিয়াছেন। এবং

এইরূপ ছন্দ শঙ্করাচার্যের কবিতায় দেখা যায় বলিয়া তিনি অনুমান করেন যে, শঙ্করাচার্যও সম্ভবতঃ এইরূপ একটি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।

(খ) কচ্ছদেশ ভ্রমণকালে স্বামীজী একবার এক মরুভূমির মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন। সেখানকার প্রখর রৌদ্রতাপে তাঁহার গলা শুকাইয়া আসিল, অথচ তিনি কোথাও মনুষ্যের আবাস দেখিতে পাইলেন না। এইভাবে আরও কিছুদূর চলিয়া তিনি একস্থানে আসিয়া দেখিলেন, অদূরে চমৎকার সব জলাশয়ে পূর্ণ একটি গ্রাম। এবং সেখানে আহার্য, পানীয় ও আশ্রয় পাইবার আশায়, তিনি দ্রুত চলিতে লাগিলেন। কিন্তু দেখিলেন, তিনি যত অগ্রসর হইতেছেন, গ্রামটিও তত দূরে সরিয়া যাইতেছে। পরিশেষে তিনি হতাশ হইয়া একস্থানে বালুরাশির উপর বসিয়া পড়িয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, গ্রামটি আর নাই! উহা কোথায় ছিল? আর কোথায় উড়িয়া গেল? ক্ষণপরে বুঝিলেন, উহা মরীচিকা মাত্র! তখন তাঁহার ইহাও মনে হইল, আমাদের জীবনটাও ঠিক এইরূপ! মায়ার প্রবঞ্চনাও এই রকমের! তারপর তিনি উঠিয়া পুনরায় পথ চলিতে লাগিলেন এবং পুনরায় ঐরূপ মরীচিকা দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু এবার আর তিনি প্রবঞ্চিত হইলেন না। কারণ, তিনি এখন জানিয়াছেন উহা কি? দেখা যায়, ইহার কিছুকাল পরে স্বামীজী যখন পাশ্চাত্য দেশে গিয়া বেদান্তের মায়াবাদ ব্যাখ্যা করেন, তখন তিনি তাঁহার এই অভিজ্ঞতাটি দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন।

(গ) স্বামীজীর ভ্রমণপথের একটি কৌতুককর কাহিনী এই। রাজপুতানায় তিনি একদিন ট্রেনে এক গাড়ীতে দুইটি ইংরেজ যাত্রীর সহিত যাইতেছিলেন। তাহারা মনে করিল তিনি একজন অশিক্ষিত সাধু। তাই, তাহারা ইংরেজি ভাষায় তাঁহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে লাগিল। স্বামীজী এমনভাবে বসিয়া রহিলেন যেন তিনি কিছুই বুঝিতেছেন না। পরে এক স্টেশনে গাড়ী থামিলে তিনি স্টেশন মাস্টারের নিকট ইংরেজীতে এক গ্লাস জল চাহিলেন। তখন ইংরেজ দুইটি চমকিত হইয়া বুঝিতে পারিল যে, তাহারা যাহা বলাবলি

করিয়াছেন তাহা স্বামীজী সবই বুঝিতে পারিয়াছেন। তাই, তাহারা তাহাদের অসভ্য আচরণের জন্য অত্যন্ত বিব্রত বোধ করিয়া স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কোন রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ করেননি কেন?" উত্তরে স্বামীজী বলিলেন, "বন্ধুগণ, আমি যে নির্বোধ লোক এই প্রথম দেখলাম তা নয়।" শুনিয়া ইংরেজ দুইটি রাগিয়া উঠিল, কিন্তু স্বামীজীর বলিষ্ঠ শরীর ও অটল নির্ভিক ভাব দেখিয়া তাহারা থামিয়া গেল এবং পরিশেষে স্বামীজীর নিকট ক্ষমা চাহিল।

(ঘ) এইরূপ আমোদপ্রদ অথচ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের আর একটি কাহিনী এই। স্বামীজীর এক দীর্ঘ ট্রেন যাত্রায়, তাঁহার এক শিক্ষিত সহযাত্রী ছিলেন গুপ্ত মহাত্মাদির কাহিনীতে ঘোর বিশ্বাসী। স্বামীজীর সন্ন্যাসীর বেশ দেখিয়া তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি হিমালয়ে ছিলেন কি? সেখানকার (অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন) কোন মহাত্মার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হয়েছে কি? ইত্যাদি।" প্রশ্নগুলি শুনিয়া স্বামীজী মনে মনে হাসিলেন। কিন্তু লোকটিকে একটা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে তিনি মহাত্মাদের অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপের এক অত্যুজ্জল বর্ণনা দিলেন এবং লোকটি অপার বিস্ময়ে হাঁ করিয়া তাহা শুনিতে লাগিলেন। তারপর তিনি স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বর্তমান কল্প আর কতদিন থাকবে তৎসম্বন্ধে মহাত্মারা কিছু বলেছেন কি?" স্বামীজী কহিলেন, "এ বিষয়ে মহাত্মাদের সঙ্গে আমার সুদীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। তা ছাড়া, তাঁরা কিভাবে মানুষের উন্নতি সাধন করে পুনরায় সত্যযুগ প্রবর্তন করবেন, ইত্যাদি বহু বিষয় সম্বন্ধে নানা কথা তাঁরা আমাকে বলেছেন।" লোকটি স্বামীজীর মুখের প্রত্যেকটি কথা পরম আগ্রহের সহিত শুনিলেন। এবং এতগুলি অমূল্য সংবাদ পাইয়া তিনি এত পরিতৃপ্ত বোধ করিলেন যে, তিনি তাহার সঙ্গের খাবারের অংশ গ্রহণ করিবার জন্য স্বামীজীকে আমন্ত্রণ করিলেন। স্বামীজী বিনা দ্বিধায় রাজি হইলেন। কারণ, পূর্ব একদিন তিনি কিছুই খাইতে পান নাই। যাত্রার সময় তাঁহার ভক্তগণ তাঁহাকে

দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানা টিকিট কিনিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা কিছুতেই তাঁহাকে কোন টাকা বা খাদ্য সঙ্গে লইতে রাজি করাইতে পারেন নাই।

যাহা হউক, স্বামীজী দেখিলেন ভদ্রলোকটির হৃদয় উচ্চ, কিন্তু নির্বিচার বিশ্বাস-প্রবণতা তাহাকে একটা মিথ্যা অতীন্দ্রিয়বাদে আস্থাবান করিয়া রাখিয়াছে। তাই, তাহার একটু উপকারার্থে তিনি আহারান্তে তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, "আপনি শিক্ষা ও জ্ঞানের বড়াই করেন, আপনি কি করে এই সব মিথ্যা আজগবী কথা বিশ্বাস করলেন?" এই তিরস্কার-সূচক প্রশ্নটি শুনিয়া ভদ্রলোকটি নীরবে মাথা নীচু করিয়া রহিলেন। তখন স্বামীজী আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে তাহার ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার জন্য তাহাকে পুনরায় বলিলেন, "বন্ধু, আপনি বুদ্ধিমান। আপনার মত লোকের উচিত বিচার-শক্তি প্রয়োগ করা। বিচার করলে দেখা যায়, অনিমাদি বিভূতি প্রদর্শনের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কোন সংস্রব নেই। যে ঐ সকল বিভূতি দেখিয়ে বেড়ায়, সে বাসনার দাস ও ঘোর অহমিকাপূর্ণ লোক। আধ্যাত্মিকতার প্রধান কাজ হচ্ছে চরিত্রের উন্নতি সাধন করা—ইন্দ্রিয়ের দমন ও বাসনার উৎসাদন করা। এ ছাড়া, বিভূতির পিছনে ছুটে জীবনের সমস্যার সমাধান করা যায় না। ওতে কেবল শক্তির অপচয় হয় ও মনের অবনতি ঘটে। এই অর্থহীন বাজে জিনিসটাই আমাদের সমস্ত জাতটাকে দুর্বল করে রেখেছে। আমাদের এখন দরকার উত্তম ব্যবহারিক বুদ্ধি, জাতীয় কল্যাণ সাধনের চেতনা এবং এমন ধর্ম ও দর্শন যা আমাদের প্রকৃত মানুষ করে তুলবে।" স্বামীজীর এই সকল কথায় ভদ্রলোকটির চৈতন্য হইল এবং তিনি তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে ভবিষ্যতে তিনি তাঁহার উপদেশ অনুসরণ করিয়া চলিবেন।

(ঙ) অন্যদিকে, হিমালয় ভ্রমণকালের একটি ঘটনা স্বামীজীর নিজের পক্ষেই বিশেষ শিক্ষাপ্রদ হয়। ঐ সময়ে তিনি কিছুদিন একটি তিব্বতী পরিবারের সঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। তিব্বতীদের এক স্ত্রীর বহু স্বামী গ্রহণের প্রথা অনুসারে, ঐ পরিবারের ছয় ভাই এর

একটিমাত্র স্ত্রী ছিল। তাহাদের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হইবার পর, স্বামীজী একদিন তাহাদের নিকট এক নারীর বহু স্বামী গ্রহণ প্রথার বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি দর্শাইয়া উহার খুব নিন্দা করিলেন। ইহাতে তাহারা তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিল, "আপনি সাধু হয়ে আমাদের স্বার্থপর হবার শিক্ষা দিচ্ছেন! এ জিনিসটা আমি একা ভোগ করব, আর কাউকে ভাগ দেব না—এ রকম মনোভাব কি অন্যায় নয়? আমরা প্রত্যেকেই এক একটি পৃথক স্ত্রী চাইব, এ রকম স্বার্থপর আমরা কেন হব? ভাইদের প্রত্যেক জিনিসই, এমন কি, তাদের স্ত্রীকেও, ভাগ করে ভোগ করা উচিত।" ঐ সরল পাহাড়ীদের মুখে এই উত্তর শুনিয়া স্বামীজী যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। এবং বুঝিলেন, প্রায় প্রত্যেক জিনিসেরই স্বপক্ষ-বিপক্ষ উভয় দিকেই যুক্তি দর্শান যাইতে পারে। এই ঘটনাটি ও এই প্রকারের আরও কয়েকটি ঘটনার ফলে, তিনি জীবনকে সমস্ত দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতে শিখেন, এবং পৃথিবীর সমস্ত জাতির সামাজিক ও নৈতিক আদর্শগুলি তিনি তাহাদের নিজ নিজ চক্ষু দিয়াই দেখিবার চেষ্টা করিতেন।

অবশ্য এইরূপ কোন না কোন শিক্ষা স্বামীজী তাঁহার ভ্রমণপথের প্রতিটি ঘটনা হইতে, এমন কি, প্রতি পদক্ষেপেই সংগ্রহ করিয়াছেন। কারণ, তাঁহার মন ছিল সর্বগ্রাহী। তাঁহার বিশাল চক্ষু দুইটি ছিল অতীব স্বচ্ছ ও তীক্ষ্ণ—কোন কিছুই উহাদের দৃষ্টি এড়াইত না। আর তাঁহার অন্তরের উদ্দেশ্যও ছিল বিরাট, সুমহৎ—ভারতের, তথা সমগ্র জগতের কল্যাণ সাধন। তাই, তাঁহার চলার পথে তিনি অনবরতই দেখিয়াছেন, শিখিয়াছেন ও অগ্রসর হইয়াছেন। এবং ভারতের অন্তহীন বৈচিত্র্য—তাহার বহু বিভিন্ন প্রকারের ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, আদর্শ, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি—তাঁহাকে নিরাশ, বিভ্রান্ত বা দিশেহারা করে নাই। এবং ঐ সকলের কিছুই পরিত্যাগ না করিয়া এবং উহাদের সকলকেই সমগ্রভাবে গ্রহণ

করিয়া, তাঁহার বিরাট, বিশাল মনঃসরোবরে চলিয়াছে এক অশ্রান্ত আলোড়নঃ এই অনন্ত বিভেদপূর্ণ প্রিয় জন্মভূমি ভারতবর্ষের জাতীয় ঐক্য কোথায় বা কি হইতে পারে? ফলে, তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, তাহা অপূর্ব, অমূল্য—ভারত ও জগতের পক্ষে অমৃতস্বরূপ। তিনি দেখিলেন, ভারতের সকল প্রকারের সকল বৈচিত্র্য-বিভিন্নতার মধ্যে বর্তমান এক বিরাট একত্বের চেতনা; তাহার অঙ্গের সকল বৈষম্য ব্যাপিয়া চির-বিরাজমান এক মহান অধ্যাত্ম সত্তা, যাহার প্রতি হৃদ্-স্পন্দনে ধ্বনিত হয় সৃষ্টির অন্তরতম বাণী—সবই এক, শুধু রূপের পার্থক্য (একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি)।

এই মহান অনুভূতি বুকে করিয়াই স্বামীজী কন্যাকুমারীতে ভারতের জাতীয় মুক্তি ও অভ্যুদয়ের উপায় চিন্তা করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এবং সেখানে তাঁহার কর্মপন্থা স্থির করিয়া, তিনি যে বিশ্ববিজয়ী শক্তি, সঙ্কল্প ও শাণিত জ্ঞান-তরবারি লইয়া তাঁহার কর্ম-ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহার কার্যক্রম আমরা পরের অধ্যায়গুলিতে দেখিতে পাইব। এখানে শুধু ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, মোগল-সাম্রাজ্যের পক্ষে ছত্রপতি শিবাজী যে বিভীষিকা ছিলেন, কন্যাকুমারী হইতে নির্গত স্বামীজী ইংরেজ-রাজত্বের পক্ষে তাহার চাইতে বহুগুণে ভয়ঙ্কর ছিলেন। কিন্তু কেহ তাহা বুঝিতে পারে নাই। কারণ, তাঁহার অস্ত্র ছিল সূক্ষ্ম—আধ্যাত্মিক জ্ঞান, আধ্যাত্মিক শক্তি ও সর্বজয়ী ইচ্ছা। যাদুকরের মত তাহা সকলের অলক্ষ্যে ভারত ও জগতের জীবনে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে এবং আজিও অব্যাহত গতিতে তাহা তাহার কাজ করিয়া চলিয়াছে।

একুশ

উদ্যোগ পর্ব

(পণ্ডিচেরী, মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ, খেতড়ি ও বোম্বাই)

মা কুমারীর মন্দিরে প্রণাম করিয়া, স্বামীজী কন্যাকুমারী হইতে পদব্রজে রামনাদের মধ্য দিয়া (ফরাসী উপনিবেশ) পণ্ডিচেরীতে পৌঁছিলেন। ভ্রমণক্লান্তিবশতঃ তিনি সেখানে কয়েকদিন বিশ্রাম করিলেন। তখন কতিপয় স্থানীয় যুবক তাঁহার বিশেষ অনুরাগী হইয়া উঠিল। এবং একদিন একটি গোঁড়া পণ্ডিতের সহিত তাঁহার হিন্দুধর্ম ও উহার সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে বিচার হইল। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়েই স্বামীজীর উদার প্রগতিসমর্থক মতাবলীর বিরুদ্ধে পণ্ডিতজী যুক্তির পরিবর্তে নিন্দাবর্ষণ করিতে করিতে ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। এবং স্বামীজী যখন সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রসম্মত বলিয়া উল্লেখ করিলেন, তখন তিনি তাহার বিপুল শিখা দোলাইয়া ও নানা অঙ্গভঙ্গী করিতে করিতে "কদাপি ন", "কদাপি ন" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। বিচার-সভার এই অবস্থা দেখিয়া, স্বামীজী পণ্ডিতজীর দিকে চাহিয়া তারস্বরে বলিলেন, "বন্ধু, আপনি কি বলতে চান ? প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতবাসীর কর্তব্য ধর্মের নামে প্রচলিত আচার-ব্যবহারগুলি পরীক্ষা করে দেখা। এখন আমাদের অতীতের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী হতে বেরিয়ে এসে প্রগতিশীল জগতের দিকে চেয়ে দেখতে হবে। এবং যে সকল প্রথা আমাদের জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী, তা পরিত্যাগ করে আমাদের ঐ উন্নতির পথে অগ্রসর হতে হবে।" তারপর তিনি অপর সকলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দিন এসেছে, যখন শূদ্রগণ জাগ্রত হয়ে তাদের অধিকার দাবী করবে। এখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কর্তব্য তাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করা এবং গুরুপুরুতের অত্যাচার ও সর্বপ্রকার সামাজিক বৈষম্য দূর করে জাতীয় সংহতি স্থাপন করা।"

যাহা হউক, যে সঙ্কল্প বুকে করিয়া তিনি কন্যাকুমারী ত্যাগ করিয়াছিলেন, বিধির ব্যবস্থায় তাহা সংসিদ্ধির পথ খুলিল। এই সময়ে শ্রীযুত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য কোন সরকারী কাজে মাদ্রাজ হইতে পণ্ডিচেরীতে আসিয়াছিলেন। দৈবক্রমে একদিন রাজপথে দণ্ডকমণ্ডলু হস্তে ভ্রমণরত স্বামীজীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। এবং স্বামীজী মাদ্রাজ যাইবেন জানিয়া তিনি তাঁহাকে তাহার সহিত যাইতে ও তাহার বাড়িতে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। স্বামীজী রাজি হইলেন ও পরে নির্দিষ্ট দিনে তাঁহারা একত্রে মাদ্রাজ রওনা হইলেন (১৮৯৩, জানুয়ারী)।

মাদ্রাজে স্বামীজীর জন্য ক্ষেত্র যেন পূর্ব হইতেই প্রস্তুত করা ছিল। যেদিন তিনি সেখানে পৌঁছিলেন, সেই দিন হইতেই তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার কথা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত প্রতিদিন বহু লোক মন্মথবাবুর বাড়ীতে আসিতে লাগিলেন[1]। এবং তাহাদের সংখ্যা দিন দিনই বাড়িয়া চলিল। বিশেষভাবে বহু বুদ্ধিমান ও সুশিক্ষিত যুবক অত্যল্প কালের মধ্যে তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগী ভক্ত হইয়া উঠিল। এবং তাহাদের মধ্য হইতে বারো-চৌদ্দ জন তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার কার্যের অত্যুৎসাহী সহায় হইয়া দাঁড়াইল।

এই শেষোক্ত দলের মধ্যে একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি ছিলেন নাস্তিক ও ক্রিশ্চিয়ান কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক নাম সিঙ্গারভেলু মুদলিয়র। তিনি একদিন স্বামীজীকে তর্কে পরাস্ত করিতে আসিয়া, তাঁহার যুক্তি ও বাক্যচ্ছটায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার একজন অত্যুৎসাহী ভক্ত হইয়া উঠেন ও তাঁহার

১। মন্মথবাবুর বাড়িতে ব্যতীত, ত্রিপ্লিকেনের সাহিত্য সমিতিতেও (Literary Society of Triplicane) স্বামীজী কয়েকদিন নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। এবং তাহাতে তাঁহার নাম আরও দ্রুত শহরময় ছড়াইয়া পড়ে। তবে মাদ্রাজে মন্মথবাবুর বাড়ীই ছিল তাঁহার ধর্মালোচনার স্থায়ী ও প্রধান কেন্দ্র।

নিকট হইতে দীক্ষা লইয়া তাঁহার শিষ্য হন। স্বামীজীও তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং আদর করিয়া 'কিডি' বলিয়া ডাকিতেন। কয়েক বৎসর পরে স্বামীজীর ইচ্ছায় মাদ্রাজে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা স্থাপিত হইলে, তিনি তাহার অবৈতনিক ম্যানেজার হন। পরে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া জীবসেবায় আত্ম-নিয়োগ করেন।

স্বামীজীর মাদ্রাজ অবস্থানের (তাঁহার ভক্ত, শিষ্য বা গুণমুগ্ধ ব্যক্তিগণ-প্রদত্ত) যে সকল বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা হইতে জানা যায়, এইকালে স্বামীজীর চিন্তা, জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের সীমাহীন পরিধি সকলকেই যারপরনাই বিস্মিত করিত। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, মনোবিজ্ঞান, কলাবিদ্যা ইত্যাদি যখন যে বিষয়ে আলোচনা উপস্থিত হইয়াছে, তিনি অপূর্ব দক্ষতার সহিত তখন সেই বিষয়েরই আলোচনা চালাইয়াছেন। অন্যদিকে, তিনি একই সময়ে বহু লোকের বহু প্রশ্নের জবাব দিয়া সকলকেই নীরব ও তৃপ্ত করিতেন। আবার অনেক সময়ে, প্রশ্নকর্তা তাহার মনের প্রশ্ন ব্যক্ত করিবার পূর্বেই তিনি উহার উত্তর দিতেন। ইহাতে বিস্মিত হইয়া কেহ কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "আপনি কি করে আমাদের মনের কথা জানতে পারেন?" তাহাতে স্বামীজী হাসিয়া জবাব দিয়াছেন, সন্ন্যাসীরা "মানুষদের চিকিৎসক," তাই তাঁহারা তাহাদের রোগ নির্ণয় করিতে সক্ষম।

এই সকল ব্যতীত আরও জানা যায়, তিনি ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষায় বিস্ময়কর স্বচ্ছন্দতার সহিত কথা বলিতেন এবং প্রয়োজন হইলেই একটা ঝড়ঝঞ্ঝার ন্যায় তাঁহার শ্রোতাগণের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িতেন। আবার, তাঁহার অনেক উক্তি ছিল সংক্ষিপ্ত ও তীরের মত তীক্ষ্ণ। শ্লেষপূর্ণ, অথচ রসাল, প্রত্যুত্তর দিতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। আর তাঁহার ব্যক্তিত্ব, বাগ্মিতা ও তর্কশক্তি, তাঁহার সঙ্গীত, কণ্ঠস্বর ও হাসি-ঠাট্টা—এ সবই ছিল অতুলনীয়, তাঁহার শ্রোতাগণকে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বাঁধিয়া রাখিত।

একজন বিবরণদাতা (শ্রী কে ব্যাস রাও, বি এ) লিখিয়াছেন,

"তবে এ সব ছাড়া, যা তাঁকে সকলের নিকট সব চাইতে অধিক প্রিয় করে তুলেছিল, তা ছিল তাঁর নিখুঁত দেশপ্রেম। এই যুবক সন্ন্যাসী, যিনি সকল ঐহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজেকে বন্ধনমুক্ত করেছিলেন, তাঁর একটিমাত্র ভালবাসার পাত্র ছিল—তাঁর দেশ, আর তাঁর একটিমাত্র দুঃখ ছিল—তাঁর দেশের অধঃপতন। এ দু'টির বশে তিনি সময়ে সময়ে গভীর চিন্তাগ্রস্ত হয়ে আপন মনে যে সকল কথা বলতেন, তা তাঁর শ্রোতাগণকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত। তিনি আমাদের যুবকদের পৌরুষহীনতার জন্য দুঃখ করতেন ও ঐ দুর্বলতার অপরিসীম নিন্দা করতেন। তাঁর কথাগুলি যেন বিদ্যুৎপ্রভা নিয়ে ছুটত ও ইস্পাতের ন্যায় অন্তর্বিদ্ধ করত।"

স্বামীজীর মাদ্রাজ অবস্থানকালের নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনী পাওয়া যায়। নমুনাস্বরূপ তাহার কয়েকটি নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

(i) স্বামীজী একদিন দেখিলেন মন্মথবাবুর পাচক তাঁহার (মহীশূরের মহারাজার প্রদত্ত) হুঁকাটির দিকে সতৃষ্ণনয়নে তাকাইয়া আছে। দেখিয়া স্বামীজী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি ওটা পেতে চাও?" কোন জবাব না পাইয়া তিনি প্রশ্নটি পুনর্বার করিলেন। কিন্তু লোকটি ইচ্ছা সত্ত্বেও ভয়ে 'হাঁ' বলিতে পারিল না। অবস্থা বুঝিয়া স্বামীজী তৎক্ষণাৎ তাঁহার ঐ অতি প্রিয় হুঁকাটি তাহাকে দান করিলেন।

(ii) মাদ্রাজে স্বামীজী রোজই সন্ধ্যাবেলা ভক্ত ও শিষ্যগণের সহিত সমুদ্রতীরে বেড়াইতে যাইতেন। একদিন সেখানে কতকগুলি অনাহার-ক্লিষ্ট জীর্ণশীর্ণ জেলে শিশুদিগকে তাহাদের মায়েদের সঙ্গে কোমর-জলে নামিয়া কাজ করিতে দেখিয়া, তিনি অশ্রুসিক্তনয়নে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠেন, "হা ভগবান, তুমি এই সব হতভাগ্য দীন-দুঃখীদের সৃষ্টি কর কেন? আমি তো এ দৃশ্য আর দেখতে পারি না। ভগবান, আর কতকাল, আর কতকাল!" তাঁহার এই কাতর আর্তনাদ শুনিয়া যাহারা তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, তাহারাও চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন।

(iii) মাদ্রাজে অবস্থানকালে উপর্যুপরি কয়েক দিন যাবৎ কতকগুলি প্রেতাত্মা আসিয়া স্বামীজীকে বিরক্ত করিতে থাকে। উহারা তাঁহাকে নানা রকম মিথ্যা সংবাদ দিয়া চঞ্চল করিয়া তোলে এবং তিনি পরে অনুসন্ধান লইয়া দেখিতে পান উহাদের দেওয়া সকল সংবাদই মিথ্যা। তখন তিনি ঐরূপ মিথ্যা সংবাদ দেওয়ার জন্য উহাদিগকে তিরস্কার করিলে, উহারা নিজেদের দুর্দশার কথা তাঁহাকে জানাইল। তখন স্বামীজী এই বিষয় চিন্তা করিয়া, একদিন সমুদ্রতীরে গিয়া (চাল-কলা ইত্যাদির অভাবে) এক মুঠা বালি লইয়া অঞ্জলি দিয়া সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিলেন, ঐ প্রেতাত্মারা যেন শান্তি লাভ করে। ইহার ফলে, উহারা শান্তি পায় এবং স্বামীজীকে আর কখন বিরক্ত করে নাই।

দেখা যায়, মাদ্রাজ পৌঁছিবার অল্প পরেই স্বামীজী তাঁহার আমেরিকা যাইবার ইচ্ছা পরিচিত ব্যক্তিদের নিকট খোলাভাবে ঘোষণা করেন এবং পাশ্চাত্য-দেশে ধর্ম-প্রচারের আবশ্যকতা তাহাদের বিশেষ করিয়া বুঝান। তাঁহার কথার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব সকলেই উপলব্ধি করেন। এবং তাঁহার কতিপয় উৎসাহী শিষ্য তাঁহার ঐ উদ্দেশ্য সাধনের সাহায্যার্থে আবশ্যকীয় অর্থ সংগ্রহে উদ্যোগী হন ও অতি অল্প সময়ের মধ্যে পাঁচ শত টাকা সংগ্রহ করেন। কিন্তু উহাতে স্বামীজী চঞ্চল হইলেন। কারণ, তিনি চিকাগো ধর্মমহাসভায় যাওয়া স্থির করিলেও, তিনি বুঝিতে চাহিতেছিলেন যে তাঁহার ঐ সঙ্কল্প তিনি জগন্মাতার ইচ্ছাতেই করিয়াছেন, শুধু নিজের কোন ইচ্ছা বা অহমিকার বশে করেন নাই। তাই, তিনি তাঁহার শিষ্যদের বলিলেন, "আমি আমেরিকা যাত্রার পূর্বে বুঝতে চাই, আমার যাওয়া মায়ের ইচ্ছাতেই হচ্ছে। সুতরাং তোমরা যা সংগ্রহ করেছ, তা গরীবদের বিলিয়ে দাও। আমার যাওয়া যদি মায়ের ইচ্ছা হয়, তবে টাকা আপনা থেকেই আবার আসবে।" শুনিয়া শিষ্যগণ তাঁহার ঐ আদেশ অনুসারে তাহাদের সংগৃহীত টাকা ব্যয় করিয়া ফেলিলেন।

ইহার অল্প পরেই, হায়দরাবাদ হইতে একটি আহ্বান আসিল। সেখানকার যে সকল হিন্দু তাহাদের মাদ্রাজের বন্ধুগণের নিকট হইতে স্বামীজীর কথা অবগত হইয়াছিলেন, তাহাদের অনেকে তাঁহাকে একবার হায়দরাবাদ আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। এই অপ্রত্যাশিত আহ্বানের পশ্চাতে (ঈশ্বরের) কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে মনে করিয়া স্বামীজী যাইতে সম্মত হইলেন। তখন মন্মথবাবু তাহার বন্ধু ও নিজাম সরকারের ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত মধুসূদন চ্যাটার্জিকে তারযোগে জানাইলেন যে স্বামীজী ১০ই ফেব্রুআরি (১৮৯৩) তারিখে হায়দরাবাদ পৌঁছিবেন। তৎপূর্ব দিন হায়দরাবাদ ও সেকেন্দরাবাদের হিন্দুগণ একটি সভা করিয়া তাঁহাকে যথাযোগ্যভাবে অভ্যর্থনা করা স্থির করেন। তাই, সেখানে পৌঁছিয়া স্বামীজী বিস্মিত হইয়া দেখিলেন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য পাঁচশতাধিক লোক স্টেশনে অপেক্ষা করিতেছে এবং তাহার মধ্যে রহিয়াছেন নিজাম সরকারের রাজকর্মচারীগণ, কতিপয় অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক, এবং অনেক ধনী ব্যবসায়ী, উকীল ও পণ্ডিত প্রভৃতি। এই জনতার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন—রাজা শ্রীনিবাস রাও বাহাদুর, মহারাজা রম্ভা রাও বাহাদুর, পণ্ডিত রতন লাল, ক্যাপটেন রঘুনাথ, সামসুল-উলেমা সৈয়দ আলি বিলগ্রামী, নবাব ইমাদজঙ্গ বাহাদুর, নবাব সেকেন্দর নেওয়াজজঙ্গ বাহাদুর, নবাব ইমাদ নেওয়াজজঙ্গ বাহাদুর, নবাব দুলাখান বাহাদুর, শ্রীযুত এইচ ডোরাবজী, রায় হুকুমচাঁদ, এম্ এ, এল্‌এল্ ডি, মিঃ এফ এস্ মাগুন, শেঠ চতুর্ভুজ ও শেঠ মতিলাল। মধুসূদন বাবুর পুত্র বাবু কালীচরণ চ্যাটার্জি কলিকাতায় থাকিতেই স্বামীজীর সহিত পরিচিত ছিলেন। তাই, তিনি প্রত্যেককে তাঁহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। এবং তখন স্বামীজীর উপর যে পুষ্প-মাল্য বর্ষিত হইতে লাগিল তাহা এক বিরাট স্তূপ বাঁধিল। একজন প্রত্যক্ষদর্শী লিখিয়াছেন, 'কোন সাধুকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য এত লোকের সমাবেশ আমরা কখন দেখি নাই। অভ্যর্থনাটি খুবই জমকালো

ধরনের হইয়াছিল।' অভ্যর্থনার শেষে স্বামীজীকে মধুসূদন বাবুর বাসায় লইয়া যাওয়া হইল।

পরদিন (১১ই ফেব্রুআরি) সকালবেলা সেকেন্দরাবাদের এক শত হিন্দু-অধিবাসীর একটি কমিটি তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে দুধ, মিষ্টি ও ফল উপহার দিয়া, তাঁহাকে সেখানকার মহবুব কলেজে একটি বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করিলেন। স্বামীজী সম্মত হইয়া ঐ জন্য ১৩ই ফেব্রুআরি দিন স্থির করিয়া দিলেন। তৎপর তিনি সেদিন কালীচরণবাবুর সহিত গোলকোণ্ডার কেল্লা দেখিতে গেলেন। পরের দিন সকালবেলা তিনি—নিজাম বাহাদুরের শ্যালক নবাব বাহাদুর স্যার খুরসিদ জা, কে, সি, এস, আই, মহোদয়ের আমন্ত্রণ অনুসারে—কালীচরণবাবুকে লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত নিজাম বাহাদুরের রাজপ্রাসাদে যান। স্যার খুরসিদ জা উদার ধর্মমত পোষণ করিতেন এবং হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সমস্ত হিন্দুতীর্থ সকল দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি সমাদরের সহিত স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিলেন।

দুই ঘণ্টাধিক কাল তাঁহারা হিন্দু, খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। নবাব বাহাদুর সাকার ঈশ্বরে আপত্তি করিলে, স্বামীজী সকল ধর্মমতের সমন্বয়ভূমি দেখাইয়া, বেদান্ত সত্যের উপর স্থাপিত এক উদার সর্বজনীন সনাতন ধর্মের কথা বলিলেন। এবং কথাপৃষ্ঠে জানাইলেন যে তিনি ঐ ধর্ম প্রচারের জন্য পাশ্চাত্য দেশে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তিপূর্ণ কথা ও অপূর্ব বাগ্মীতায় মুগ্ধ হইয়া নবাব বাহাদুর তাঁহার পাশ্চাত্যদেশে যাইবার সাহায্যে এক হাজার টাকা দিতে চাহিলেন। কিন্তু স্বামীজী ঐ সময়ে ঐ টাকা লইতে অস্বীকার করিয়া বলিলেন, "যখন আমি কার্যক্ষেত্রে নামিব, তখন আমি উহা চাহিয়া পাঠাইব।"

১৩ই ফেব্রুআরি সকালে স্বামীজী হায়দরাবাদ স্টেটের প্রধান মন্ত্রী স্যার আসমান জা, কে, সি, এস, আই, পেস্কার মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর এবং মহারাজা সিউরাজ বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং

তাহারা সকলেই তাঁহার প্রস্তাবিত আমেরিকায় ধর্মপ্রচারের কাজ সমর্থন করেন। ঐ দিন বৈকালে তিনি সেকেন্দরাবাদের মহবুব কলেজে "পাশ্চাত্যদেশে আমার গমনোদ্দেশ্য" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। পণ্ডিত রতনলাল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সহস্রাধিক লোক সভায় যোগদান করে এবং তাহার মধ্যে কতিপয় ইওরোপীয় ভদ্রলোকও ছিলেন। স্বামীজীর পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, ও ইংরেজী ভাষার দখল সকলকেই চমৎকৃত ও মুগ্ধ করে। পরদিন সকালে বেগম বাজারের ব্যাঙ্কারগণ শেঠ মতিলালের নেতৃত্বে তাঁহার সহিত দেখা করেন ও তাহারা সকলেই তাঁহাকে আমেরিকা যাইবার জন্য অর্থ-সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দেন। ইহা ব্যতীত, থিওসফিক্যাল সোসাইটি ও সংস্কৃত ধর্মমণ্ডল সভার সভ্যগণও তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন।

১৫ই ফেব্রুআরি তারিখে স্বামীজী পুণার হিন্দুগণের নিকট হইতে তারযোগে সেখানে যাইবার জন্য এক আমন্ত্রণ পান। উত্তরে তিনি তাহাদের জানান যে, তিনি এখনই যাইতে পারিতেছেন না, পরে সুযোগ হইলে সানন্দে সেখানে যাইবেন। ইহার পরের দিন তিনি হিন্দুমন্দির সকলের ধ্বংসাবশেষ, বাবা সরফুদ্দিনের বিখ্যাত কবর ও স্যার সালর জঙ্গের প্রাসাদ দেখিতে যান।

ইহা ব্যতীত জানা যায়, স্বামীজী কতিপয় বন্ধু সহ হায়দরাবাদের এক খ্যাতিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ যোগীকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তাহার কতকগুলি যোগলব্ধ শক্তি (বিভূতি) ছিল। স্বামীজী যখন তাহার নিকটে পৌঁছেন, তখন তিনি প্রবল জ্বরে শয্যাশায়ী ছিলেন। স্বামীজীকে সন্ন্যাসী ও উচ্চ আধ্যাত্মিক লক্ষণযুক্ত দেখিয়া তিনি তাঁহাকে তাহার মাথায় হাত রাখিতে অনুরোধ করিলেন। স্বামীজী ঐরূপ করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ জ্বরমুক্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। তখন স্বামীজী তাঁহার আগমনোদ্দেশ্য তাহাকে জানাইলে, তিনি তাঁহাকে তাহার যোগলব্ধ কয়েকটি অত্যদ্ভুত শক্তির ক্রিয়া দেখাইলেন।[১]

১। স্বামীজী বলিয়াছেন, "আমার ব্যবস্থায় যোগী মাত্র এক টুকরা

পরে স্বামীজী এই বিষয় চিন্তা করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, ঐ শক্তিগুলি মন হইতে জাত এবং মনের বৃত্তিগুলির বিকাশ-সাধনের দ্বারা অতি আশ্চর্য সব ব্যাপার ঘটানো যাইতে পারে।

যাহা হউক, ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে স্বামীজী হায়দরাবাদের বন্ধুগণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া মাদ্রাজ রওনা হইলেন। সহস্রাধিক লোক স্টেশনে আসিয়া তাঁহাকে বিদায়-সংবর্ধনা জানাইলেন। গাড়ী মাদ্রাজ পৌঁছিলে, সেখানেও বহু ভক্ত, শিষ্য ও অনুরাগী ব্যক্তিগণ স্টেশনে আসিয়া তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন।

মাদ্রাজে ফিরিয়া স্বামীজী পূর্বের ন্যায় ধর্মালোচনা এবং ধর্ম ও অপর নানা বিষয়ের কথোপকথনে ব্যাপৃত হইলেন। ফলে, এখানে (পূর্বের ন্যায়ই) তাঁহার ভক্ত ও শিষ্যদের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। অন্যদিকে, যতই সময় যাইতে লাগিল, তাঁহার আমেরিকা যাইবার চিন্তা ততই গভীর হইয়া উঠিতে লাগিল। তথাপি তিনি পূর্বের ন্যায় এইকালেও গুরু ও জগন্মাতার সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নির্দেশের অপেক্ষায় থাকিয়া একরূপ নিশ্চেষ্ট হইয়াই রহিলেন।

কিন্তু তিনি নিজে এইভাবে নিশ্চেষ্ট থাকিলেও, তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে আমেরিকা যাইবার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন এবং মার্চ ও এপ্রিল মাসে প্রবল উদ্যমে ঐ জন্য আবশ্যকীয় অর্থ সংগ্রহ করিতে নিযুক্ত হইলেন। এমন কি, এই উদ্দেশ্যে তাহাদের কেহ কেহ রামনাদ, মহীশূর ও হায়দরাবাদ পর্যন্ত গিয়াছিলেন। সমস্ত লক্ষ্য করিয়া, স্বামীজী একদিন তাহাদের বলিলেন, "আমি ভারতের জনসাধারণের হিতার্থে আমেরিকা যাচ্ছি। তাই, আমার যাওয়া যদি

কাপড় পরিয়া ও (শীতের জন্য আমারই প্রদত্ত) একখানি কম্বল গায়ে দিয়া ঘরের কোণে বসিয়া, ঐ কম্বলের ভিতর হইতে (আমার ও উপস্থিত অপর সকলের ফরমাশ মত) কয়েক মণ স্তূপীকৃত আঙ্গুর, কমলা, ইত্যাদি ফল ও পরিশেষে একরাশ তাজা গোলাপ বাহির করিয়া দেন। ঐ সব ফল আমরা খাইয়া দেখিয়াছিলাম। এবং উহা হায়দরাবাদ অঞ্চলে কখন জন্মে না।"

মায়ের ইচ্ছা হয়, তবে আমার যাওয়ার খরচ তাদের কাছ থেকেই আসুক।" যাহারা অর্থসংগ্রহ করিতে রত হইয়াছিলেন, তাহাদের নেতা ছিলেন স্বামীজীর একনিষ্ঠ শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমল, এম এ। তিনি গুরুর মুখে এই কথা শুনিয়া দ্বারে দ্বারে গিয়া অর্থভিক্ষা করিতে লাগিলেন। এবং পরিশেষে তিনি ও তাহার সঙ্গীগণ উক্তরূপে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া প্রয়োজনীয় অর্থের বেশীর ভাগ সংগ্রহ করিলেন। স্বামীজী ইহা মায়ের ইচ্ছার নিদর্শন বলিয়াই গ্রহণ করিলেন। তথাপি তিনি আরও স্পষ্টতর নির্দেশের জন্য মা ও ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

অল্প পরেই সে নির্দেশ তিনি পাইলেন। একদিন রাত্রে অর্ধ-নিদ্রিত অবস্থায় তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ সমুদ্রতীর হইতে বিস্তীর্ণ সাগরজলের উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছেন এবং যাইতে যাইতে তাহাকে তাঁহার অনুসরণ করিবার জন্য ইশারা করিতেছেন। ক্ষণপরে স্বামীজী জাগিলেন এবং এক অপার শান্তি ও আনন্দে তাঁহার দেহ-মন ভরিয়া উঠিল। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল ঠাকুর তাঁহাকে এই-ভাবে যাইবার আদেশ দিয়া গেলেন। এবং তৎসঙ্গে তাঁহার মনের সকল সংশয়, সন্দেহ ও দুর্বলতা দূরীভূত হইল।

তবে ইহাতেও তাঁহার পূর্ণ তৃপ্তি হইল না। কারণ, তাঁহার কাছে সব চাইতে বড় জিনিস ছিল শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ। তাই, তিনি তাহার (শেষবারের) সুদীর্ঘ পরিব্রাজক জীবন অবলম্বনের পূর্বে যে ভাবে তাঁহার আশীর্বাদ চাহিয়াছিলেন, ঠিক সেইভাবেই তাহার এই দীর্ঘতর বিদেশ যাত্রার পূর্বে তিনি ব্যাকুল আগ্রহে পুনরায় তাঁহার ঐ আশীর্বাদ চাহিয়া পাঠাইলেন। শ্রীশ্রীমা তাঁহার এই অতি প্রিয় সন্তানটিকে কোন সুদূর অজানা দেশে যাইতে দিতে যে ইচ্ছুক ছিলেন তাহা নয়। কিন্তু স্বামীজীর পত্র পাইবার অব্যবহিত পরেই, তাঁহার একটি দর্শন উপস্থিত হইল : ঠাকুর তীর হইতে সমুদ্রের উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছেন এবং তাঁহাকে অনুসরণ করিবার জন্য নরেনকে ইঙ্গিত করিতেছেন। এই দর্শনটি হইতেই, শ্রীশ্রীমা বুঝিতে পারিলেন

যে নরেনের আমেরিকায় যাওয়া ঠাকুরেরই ইচ্ছা। তাই ঐ বিষয়ে তিনি তাহাকে সর্বান্তঃকরণে তাঁহার আশীর্বাদ ও উপদেশ জানাইয়া লিখিলেন—"বাবা, তোমার মুখে সরস্বতী বসুক, তুমি জয়ী হয়ে ফিরে এসো।"

তাঁহার ঐ পত্র পাইয়া স্বামীজী আনন্দে পরিপ্লুত হইলেন। এবং নিজ শিষ্যগণকে ঐ চিঠির বার্তা জানাইয়া বলিলেন, "মায়ের আশীর্বাদ পেয়েছি। আর আমার কোন সংশয় সন্দেহ নেই। আমি আমেরিকা যাবার জন্যে প্রস্তুত।" শুনিয়া তাঁহার উৎসাহদীপ্ত শিষ্যগণ পুলকিত হইয়া কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁহার যাত্রার সকল বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলেন। এবং স্থির হইল যে তিনি মাসখানেক পরে ৩১শে মে (১৮৯৩) তারিখে আমেরিকাগামী কোন জাহাজে রওনা হইবেন।

কিন্তু তাহা হইলেও নানা-সূত্র হইতে বোঝা যায়, তাঁহার শিষ্যদের সংগৃহীত অর্থ তখনও তাঁহার জাহাজে যাইবার পক্ষে যথেষ্ট হয় নাই। তবে তাহারা আশা করিতেছিলেন, যে স্থিরীকৃত যাত্রার দিনের পূর্বে তাহারা আবশ্যকীয় বক্রী টাকা চাঁদা তুলিয়া পূরণ করিতে পারিবেন। এবং স্বামীজী স্থির করিয়াছিলেন, যদি ঐ টাকা সংগৃহীত নাও হয়, তাহা হইলেও তিনি যাওয়া স্থগিত করিবেন না এবং আবশ্যক হইলে পদব্রজে আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশের মধ্য দিয়া যাইবেন।

কিন্তু স্বামীজীর পশ্চাতে ছিলেন তাঁহার গুরু ও স্বয়ং বিধাতা। তাই, (তাঁহাদের ইচ্ছায়) তাঁহার যাত্রা-সংক্রান্ত সকল দুশ্চিন্তা ও অব্যবস্থা আপনি দুর হইল। খেতড়ির মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি মুন্সী জগমোহন লাল অকস্মাৎ একদিন মন্মথবাবুর বাড়ীতে আসিয়া স্বামীজীকে ধরিয়া বসিলেন যে, তাঁহার অবিলম্বে একবার খেতড়ি যাইতে হইবে। এবং তাহার হেতু এই।

(আমরা দেখিয়াছি) প্রায় দুই বৎসর পূর্বে স্বামীজী খেতড়ির অপুত্রক মহারাজকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন যে, তাহার একটি পুত্রসন্তান লাভ হউক। তারপর এখন তাঁহার একটি পুত্র হওয়ায়, ঐ পুত্রের জন্মোপলক্ষ্যে সারা খেতড়ি রাজ্যে এক বিপুল উৎসবের

আয়োজন করা হইয়াছে। তাই মহারাজের একান্ত ইচ্ছা যে তাহার গুরু এই উৎসবে যোগদান করুন। এবং তদনুসারে তাঁহাকে লইবার জন্যই তিনি মুন্সী জগমোহন লালকে মাদ্রাজ পাঠাইয়াছেন।

সমস্ত শুনিয়া স্বামীজী জগমোহন লালকে বলিলেন, "প্রিয় জগমোহন, আমি আগামী ৩১শে মে আমেরিকা রওনা হচ্ছি এবং তার মাত্র আর এক মাস বাকী আছে। তাই, এখন আমার ঐ যাত্রার জন্য সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করতে হবে,—আমি কি করে যাব?" উত্তরে জগমোহন লাল কহিলেন, "স্বামীজী, আপনি না গেলে মহারাজা যারপরনাই নিরাশ বোধ করবেন। আপনি অন্ততঃ একদিনের জন্য চলুন।" ইহাতে স্বামীজী তাহাকে খুলিয়াই বলিলেন যে, তাঁহার যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত অর্থ এখনও সংগ্রহ হয় নাই এবং তাহা সংগ্রহের জন্যই তাঁহার এখন এখানে থাকা একান্ত আবশ্যক। বিশেষ, ঐ অর্থ সংগ্রহ না হইলে তাঁহাকে আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশের মধ্য দিয়া পদব্রজে যাইতে হইবে।

ইহা শুনিয়া মুন্সী জগমোহন লাল এক সুদীর্ঘ পত্রে মহারাজাকে সমস্ত কথা জানাইয়া তাঁহার আদেশের জন্য মাদ্রাজ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহার পত্র পাইয়া মহারাজা ১১ই এপ্রিল তারিখে এক পত্রে ও একখানা টেলিগ্রাম দ্বারা তাহাকে জানাইলেন যে স্বামীজীর আমেরিকা যাইবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সকল দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করিলেন। ঐ পত্র ও টেলিগ্রাম পাইয়া জগমোহন লাল উহার মর্ম স্বামীজীর নিকট নিবেদন করিয়া বলিলেন, "আপনার আমেরিকা যাবার ব্যবস্থার জন্য কোন চিন্তা করবেন না। সে সব মহারাজ করবেন এবং ঐ জন্য যে টাকার আবশ্যক হয় তা তিনি দেবেন। আপনি শুধু আমার সঙ্গে খেতড়ি চলুন।" মহারাজা ও জগমোহন লালের এইরূপ ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়া স্বামীজী পরিশেষে খেতড়ি যাইতে সম্মত হইলেন। এবং হাতে সময় অল্প থাকায়, স্থির হইল স্বামীজী আর মাদ্রাজ ফিরিবেন না, বোম্বাই হইতে আমেরিকায় যাত্রা করিবেন। প্রয়োজনের গুরুত্ব বুঝিয়া তাঁহার মাদ্রাজী ভক্ত ও

শিষ্যগণ এই ব্যবস্থায় সম্মত হইলেন এবং যাত্রার সময় সাশ্রুনয়নে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

বোঝা যায়, মাদ্রাজ ত্যাগের সময় স্বামীজীর হৃদয়-মনও এক বেদনাপূর্ণ উদ্বেল স্মৃতিতে ভরিয়া উঠিয়াছিল। কারণ দেখা যায়, এই স্মৃতি তিনি জীবনে কখন ভুলেন নাই। এই মাদ্রাজই যেন তাঁহাকে সমগ্র ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে গ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার পাণ্ডিত্য, প্রতিভা ও অধ্যাত্মজ্ঞান, তাঁহার প্রচারিত ধর্ম, শিক্ষা ও আদর্শ, ভারতের নিজস্ব বস্তু বলিয়া মাদ্রাজবাসীগণই সর্বপ্রথম শিরে ধারণ করিয়া লইয়াছিল। এবং পরিশেষে মাদ্রাজেরই কতিপয় যুবক তাঁহাকে সমগ্র ভারতবর্ষের যোগ্যতম প্রতিনিধি স্থির করিয়া চিকাগো ধর্মমহাসভায় পাঠাইবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছিল এবং তাহার ফলেই তিনি ঐ সভায় যোগ দিতে পারিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাহারা তখন তাঁহার জন্য যাহা করিয়াছিল, তজ্জন্য আজ সমগ্র ভারত (ও সারা পৃথিবীও) তাহাদের নিকট চির-ঋণী।

যাহা হউক, স্বামীজী মুন্সী জগমোহন লালের সহিত মাদ্রাজ হইতে বোম্বাই এবং বোম্বাই হইতে জয়পুর হইয়া খেতড়ি পোঁছেন। বোম্বাই'এ ঠাকুরের গৃহীভক্ত কালীপদ ঘোষের বাসায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাহারা বোম্বাই হইতে স্বামীজীর সহিত একত্রে রওনা হইয়া আবু রোড স্টেশনে নামিয়া যান।

জগমোহন লালের সহিত স্বামীজী যেদিন সন্ধ্যাকালে খেতড়ি পোঁছিলেন, তাহার তিন-চারি দিন পূর্বে উৎসব আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। তাই, তখন পথঘাট ও সমস্ত শহরটাই ছিল উজ্জ্বল সাজে সুসজ্জিত, চতুর্দিক নৃত্যগীতবাদ্যে মুখরিত এবং অভ্যাগত-পূর্ণ রাজপ্রাসাদটি অত্যুজ্জ্বল আলোকে আলোকিত। মহারাজা ঐ সময়ে রাজ-অতিথিগণ সহ রাজতরণীতে জলবিহার করিতেছিলেন। স্বামীজীর আগমন সংবাদ পাইয়া তিনি তাঁহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিবার

নিমিত্ত অবিলম্বে তাহার সভাকক্ষে আসিয়া বসিলেন। এবং জগমোহন লাল স্বামীজীকে তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিলে, তিনি আসন হইতে উঠিয়া তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। স্বামীজী তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিলেন। তখন উপস্থিত অপর সকলেও উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্বামীজীকে অভিবাদন করিলেন। তৎপর তাঁহাকে তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট আসনে লইয়া যাইবার সময় গায়কগণ একটি অভ্যর্থনা সঙ্গীত গাহিল। সঙ্গীত শেষ হইলে, মহারাজা তাঁহাকে অভ্যাগত রাজপুত সর্দারগণ, রাজন্যবর্গ ও অপর অতিথিদিগের সহিত আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করাইয়া দিলেন। এবং তিনি যে তাহাকে পুত্রলাভের আশীর্বাদ করিয়াছিলেন ও বর্তমানে সনাতন ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আমেরিকা যাইতেছেন, তাহাও সকলকে জানাইলেন। শুনিয়া সকলেই হর্ষধ্বনির দ্বারা স্বামীজীকে অভিনন্দিত করিলেন। পরিশেষে স্বামীজীর আশীর্বাদ গ্রহণের জন্য রাজশিশুকে সভায় আনা হইলে, স্বামীজী তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

কয়েক দিন পরে স্বামীজী মহারাজাকে জানাইলেন, আমেরিকা যাইবার প্রস্তুতির জন্য তাঁহার এখন অবিলম্বে বোম্বাই যাওয়া দরকার। যাত্রাপথে মহারাজা ও জগমোহন লাল তাঁহার সহিত জয়পুর পর্যন্ত আসিলেন। জয়পুরে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। মহারাজা সেদিন সন্ধ্যায় তাহার জয়পুরের প্রাসাদে বসিয়া একটি নর্তকীর গান শুনিতেছিলেন। তখন স্বামীজী তাঁহার তাঁবুতে থাকায়, তিনি তাঁহাকে প্রাসাদে আসিয়া ঐ গান শুনিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। উত্তরে স্বামীজী জানাইলেন যে, সন্ন্যাসী হিসাবে তিনি ঐ স্থানে আসিতে পারেন না। তাঁহার এই উত্তর শুনিয়া গায়িকা মর্মাহত হইয়া প্রত্যুত্তর স্বরূপ (সুরদাস রচিত) যে গান ধরিল তাহার মর্ম এই :

'প্রভু, তুমি আমার দোষ দেখো না, কারণ তোমার নাম সমদর্শন। এক টুকরা লোহা মন্দিরের বিগ্রহে এবং আর এক টুকরা কসাই'এর

ছুরিতে আছে। কিন্তু পরশপাথর স্পর্শ করিলে, উহারা উভয়েই সমভাবে সোনায় রূপান্তরিত হয়। তাই, প্রভু, তুমি আমার দোষ দেখো না। ইত্যাদি।'

তাঁবু হইতে গানটি শুনিয়া স্বামীজী চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তিনি যে সত্য ভুলিয়া যাইতেছিলেন, তাহা এই গায়িকা ও তাহার গান তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিল। সবই তো ব্রহ্ম, একই ঈশ্বরই তো সর্বত্র—এই মেয়েটির মধ্যেও! হায়, এই আমার সন্ন্যাস! আমি এখনও আমার ও এই মেয়েটির মধ্যে ভেদ দেখছি! এইরূপ চিন্তা করিয়া স্বামীজী তৎক্ষণাৎ প্রাসাদে আসিয়া সকলের সহিত মেয়েটির গান শুনিতে লাগিলেন। পরবর্তীকালে এই ঘটনাটি বর্ণনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "ঘটনাটি আমার চোখের আবরণ সরিয়ে দেয়। সবই যখন একেরই বিকাশ, তখন আমি আর কাকে ঘৃণা করবো ?"

ইহার পর স্বামীজী জয়পুর হইতে একখানি প্রথম শ্রেণীর কামরায় বোম্বাই রওনা হইলেন। এবং তাঁহার আমেরিকা যাত্রার সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিবার জন্য, মহারাজার নির্দেশে জগমোহন লাল তাঁহার সঙ্গে গেলেন। পথে আবু রোড স্টেশনে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ (নির্দিষ্ট দিনে) তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। স্বামীজী গাড়ী হইতে নামিয়া তাহাদের সহিত কথাপ্রসঙ্গে স্বামী তুরীয়ানন্দকে বলিলেন, "হরিভাই, আমি আজও তোমাদের তথাকথিত ধর্মের কিছু বুঝতে পারিনি। কিন্তু আমার হৃদয় খুবই প্রসারিত হয়েছে। আমি (পরের দুঃখবেদনা) অনুভব করতে শিখেছি। আমাকে বিশ্বাস কর, আমি (ও) অতি তীব্রভাবে অনুভব করি।" কথা কয়টি বলিতে বলিতে আবেগে স্বামীজীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, আর বলিতে পারিলেন না,—শুধু চোখ হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। পরবর্তীকালে স্বামী তুরীয়ানন্দ একদিন এই ক্ষুদ্র ঘটনাটি বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নিজেই ভাবাবেগে অভিভূত হইয়া পড়েন। এবং অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলেন,

"স্বামীজীর কথা শুনে আমার কি মনে হয়েছিল জানো? মনে হল, এই করুণার কথা, এই অপার সহানুভূতি,—এ তো শ্রীবুদ্ধেরই কথা ও অনুভূতি! আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম সমগ্র মানবজাতির দুঃখকষ্ট তাঁর বুকে প্রতিফলিত হচ্ছে ও সেখানেই তার উপশমের ওষুধ তৈরী হচ্ছে।"

কথাগুলি হইতে বোঝা যায়, স্বামীজী কি বেদনার চাপে একাকী এক অনন্ত সিন্ধুর ওপারের সুদূর অজানা অচেনা দেশের পানে ছুটিয়াছিলেন।[১] অন্তরের প্রেরণা, গুরু ও ঈশ্বরের আহ্বান, সমগ্র মানবকুলের আকুল ক্রন্দন—এ সবই তাঁহাকে একই নির্দেশ দিতেছিল। তাই, তিনি যাইতেছিলেন।

এক রাত্রি আবু রোড স্টেশনে থাকিয়া, স্বামীজী যখন পুনরায় (বোম্বাই-গামী) গাড়ীতে উঠিলেন, তখন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। স্বামীজীর অনুরাগী একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক তাঁহার সহিত একই কামরায় বসিয়া ছিলেন। একটি ইউরোপীয় টিকিট কালেক্টার রেলের একটি নিয়ম উদ্ধৃত করিয়া ঐ ভদ্রলোকটিকে অত্যন্ত অশিষ্ট ভাষায় নামিয়া যাইতে বলে। ভদ্রলোকটি নিজেও একজন রেল কর্মচারী ছিলেন। তিনি টিকিট কালেক্টারের কথায় শান্তভাবে আপত্তি করিয়া বলিলেন, 'এমন কোন নিয়ম নেই যার জন্যে আমি নেমে যেতে বাধ্য হতে পারি।' ইহাতে ঐ টিকিট কালেক্টার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া

১। স্বামী অখণ্ডানন্দ লিখিয়াছেন, স্বামীজী আমেরিকা রওনা হইবার কিছু পরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত আমার আবু রোড স্টেশনে সাক্ষাৎ হয়। তখন স্বামীজীর আমেরিকা যাইবার কারণ সম্বন্ধে স্বামী ব্রহ্মানন্দ আমাকে বলেন, "স্বামীজী যখন পশ্চিমঘাট পর্বত ও মহারাষ্ট্র দেশে ভ্রমণ করেন, সেই সময় সাধারণ লোকের দুঃখ-দারিদ্র্য এবং বড়লোকের অত্যাচার দেখে তিনি সর্বদা কাঁদতেন। আমাদের বলেছেন, দেখ ভাই, এদেশে যে রকম দুঃখ-দারিদ্র্য, এখানে এখন ধর্মপ্রচারের সময় নয়। যদি কখন এদেশের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করতে পারি, তখন ধর্মকথা বলব। সেইজন্য কুবেরের দেশে যাচ্ছি। দেখি যদি কিছু উপায় করতে পারি।"

উঠিল। তখন স্বামীজী মধ্যস্থ হইয়া দুই-একটি কথা বলিতেই, টিকিট কালেক্টার তাঁহার দিকে চাহিয়া রুক্ষভাবে বলিল, "তুম কাহে বাত করতে হো ?" ইহাতে স্বামীজীও রাগিয়া বলিলেন, "তুমি 'তুমের' দ্বারা কি বোঝাতে চাও ? তুমি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের কাজে নিযুক্ত আছ, আর তুমি ভদ্রভাবে ব্যবহার করতে জাননা ? তুমি 'আপ' বলতে পার না ?" টিকিট-কালেক্টার তাহার ভুল বুঝিতে পারিয়া ইংরেজীতে বলিল, "(আমার ভুলের জন্য) আমি দুঃখিত। আমি হিন্দী ভাল জানি না। আমি শুধু এই লোকটিকেই চাই···।" ইহা বলিতেই স্বামীজী বাধা দিয়া বলিলেন, "তুমি এইমাত্র বললে তুমি হিন্দী ভাল জান না। এখন দেখছি তুমি তোমার নিজ মাতৃ-ভাষাও জান না। এই 'লোকটি' বলে তুমি যার কথা বলছ, তিনি একটি ভদ্রলোক !" তখন টিকিট-কালেক্টার নিজ অন্যায় বুঝিতে পারিয়া ঐ কামরা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

অতঃপর তাঁহারা বোম্বাই পৌঁছিলে, সেখানে তাঁহাদের সহিত আলাসিঙ্গা পেরুমলের সাক্ষাৎ হইল। তিনি গুরুর আমেরিকা যাত্রার পূর্বে তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিবার জন্য মাদ্রাজ হইতে বোম্বাই আসিয়াছিলেন। জগমোহন লাল মহারাজার আদেশানুসারে স্বামীজীকে (তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও) রাজগুরুর উপযুক্ত বহুমূল্য পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিস-পত্রাদি কিনিয়া দিলেন। এবং তৎসঙ্গে (দি পেনিনসুলার এণ্ড ওরিয়েণ্ট কোম্পানির) "পেনিনসুলার" নামক জাহাজের একখানি প্রথম শ্রেণীর টিকিট ও প্রয়োজনীয় অর্থ তাঁহার হাতে দিয়া সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিলেন।

ক্রমে যাত্রার দিন (৩১শে মে, ১৮৯৩) আগত হইলে স্বামীজী বন্ধুগণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া রওনা হইলেন। জগমোহন লাল ও আলাসিঙ্গা পেরুমল সঙ্গে গিয়া তাঁহাকে জাহাজে উঠাইয়া দিলেন। এবং জাহাজ ছাড়িবার সময় হইলে, তাহারা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সাশ্রুনয়নে বিদায় লইলেন। এই জাহাজে বোম্বাই'এর ব্যারিস্টার ছবিলদাসও যাইতেছিলেন। আমরা দেখিয়াছি স্বামীজী

পূর্বে একবার কয়েক দিনের জন্য তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রওনা হইবার সময় স্বামীজী বন্ধুগণের অনুরোধে গেরুয়া রং'এর রেশমী পোশাক ও পাগড়ি পরিয়াছিলেন। ঐ উজ্জ্বল পোশাকে তিনি এক জ্যোতির্ময় মূর্তির ন্যায় দীপ্তি পাইতেছিলেন। এবং জাহাজ ছাড়িবার সময় তিনি ঐ পোশাকেই ডেকের উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রিয় জন্মভূমি ভারতবর্ষের তীরভূমির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

অল্প পরেই জাহাজ ছুটিয়া চলিল। তট হইতে জগমোহন লাল ও আলাসিঙ্গা দেখিলেন, পৃথিবী বিজয়ের জন্য গত কয়েক দিন ধরিয়া যাহাকে তাহারা সজ্জিত করিয়া পরিশেষে রওনা করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাকে লইয়া জাহাজখানা ধীরে ধীরে দূর চক্রবালরেখায় মিলাইয়া গেল,—আর দেখা গেল না। একটা বিচ্ছেদ-বেদনার সহিত এক অত্যুজ্জ্বল গরিমাময় আশা-ভরসায় তাহাদের বুক ভরিয়া উঠিল : অদূরভবিষ্যতেই তাহারা সংবাদ পাইবেন যে, চিকাগো ধর্মমহাসভায় তাহাদের প্রেরিত অজেয় মহাপুরুষই জয়ী হইয়াছেন।

চতুর্থ স্তর

বাইশ

আমেরিকার পথে
ও
তথাকার প্রথম দিনগুলি

স্বামীজী যে জাহাজে রওনা হইলেন, তাহার যাত্রা-পথ ছিল প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্য দিয়া। তাই, জাহাজ ব্যবস্থানুসারে প্রথমে কলম্বো এবং তারপর ক্রমান্বয়ে পেনাং, সিঙ্গাপুর, হংকং, নাগাসাকি, কোবি ও ইয়োকোহামা বন্দরে থামিল। এই পথটুকুর কিছু সংবাদ পাওয়া যায়।

কলম্বোতে জাহাজ প্রায় পূর্ণ একদিন অপেক্ষা করে। সেই সুযোগে স্বামীজী গাড়ী করিয়া কলম্বো শহর ও তথাকার একটি বৌদ্ধ মন্দির দর্শন করেন।

হংকং'এ জাহাজ তিন দিন ছিল। এই বন্দরে চীনা মাঝিদের নৌকার সংখ্যা ও জাহাজের যাত্রীদের তীরে লইবার জন্য তাহাদের তীব্র প্রয়াস ও প্রতিযোগিতা দেখিয়া স্বামীজী বিস্মিত হন। এক পত্রে লেখেন, "চীনা মাঝি সপরিবারে তাহার নৌকায় বাস করে। এবং তাহার স্ত্রী শিশু-সন্তানকে পিঠে বাঁধিয়া রাখিয়া যে বলের সহিত নৌকা চালায়, ভারী মাল ঠেলে ও এক নৌকা হইতে অপর নৌকায় লাফাইয়া পড়ে তাহা দেখিলে অবাক হইতে হয়।' আর ঐ সঙ্গে মন্তব্য করেন, 'চীন ও ভারতবর্ষের দারিদ্র্য তাহাদের সভ্যতার প্রগতি-হীন অবস্থার একটি কারণ। একটি সাধারণ হিন্দু বা চীনার নিকট তাহার দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটানোই এমন সাংঘাতিক ব্যাপার যে সে আর কিছুরই চিন্তা করিবার অবসর পায় না।'

তিন দিন সময় হাতে পাইয়া, স্বামীজী হংকং হইতে ক্যাণ্টন শহর

দেখিতে গেলেন। দেখিলেন সেখানে নৌকার সংখ্যা আরও বেশী এবং কতকগুলি বাসের নৌকা অতি চমৎকার,—দুই-তিন তলা এবং রাস্তা ও বারান্দা সমন্বিত। ক্যাণ্টনে স্বামীজী কয়েকটি বৌদ্ধ মন্দির ও একটি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মঠ দর্শন করেন। একটি মন্দিরে বুদ্ধের প্রথম পাঁচ শত শিষ্যের (কাষ্ঠনির্মিত) মূর্তি দেখিয়া তাঁহার মনে হয় এ সবই বাঙ্গালী ভিক্ষুর মূর্তি। এবং উক্ত বৌদ্ধ মঠটিতে তিনি পুরাতন বাংলা অক্ষরে লিখিত অনেকগুলি সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি দেখিতে পান। এই সকল প্রমাণ ও তাঁহার (পূর্বার্জিত) চৈনিক বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসের জ্ঞান হইতে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, কোন এক সময়ে বাংলা ও চীনের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ আদান-প্রদান চলিত।

হংকং হইতে জাহাজ নাগাসাকি (জাপান) পৌঁছে। সেখানে স্বামীজী জাপানীদের রাস্তা ও বাড়ীঘর প্রভৃতির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া মুগ্ধ হন। এই কালের এক পত্রে তিনি লেখেন, 'জাপানীদের সব কিছুই, এমন কি, চলাফেরা, হাবভাব পর্যন্ত, ছবির মত।'

নাগাসাকি হইতে জাহাজ কোবি যায়। জাপানের অভ্যন্তর দেখিবার ইচ্ছায়, স্বামীজী কোবি হইতে স্থলপথে ইয়োকোহামায় গিয়া পুনরায় জাহাজ ধরেন। পথে তিনি ওসাকা, কিওটো ও রাজধানী টোকিও, এই তিনটি বড় শহর দেখেন। এই সময়ে তিনি জাপানীদের জাতীয় জীবনের ধারা, তাহাদের সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতি-নীতি ইত্যাদি বুঝিবার চেষ্টা করেন। তবে যাহা তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাবিত করে তাহা ছিল তাহাদের শিল্প, বাণিজ্য, রণসজ্জা ও সব কিছুতেই আধুনিক ধরনের সর্বাঙ্গীন উন্নতির বিপুল প্রচেষ্টা। এই সকল দেখিয়া, সামাজিক বৈষম্য ও নানা কুপ্রথা-জর্জরিত নিশ্চেষ্ট ভারতবাসীদের ঐরূপ মহা কর্মোদ্যমে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য তিনি বিশেষ ব্যাকুল হইয়া পড়েন। এবং ইয়োকোহামা হইতে তিনি তাঁহার মাদ্রাজের শিষ্যগণের নিকট যে উদ্দীপনাময় পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে তিনি লিখেন, 'বেরিয়ে এস, মানুষ হও। তোমাদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী থেকে বেরিয়ে এসে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতির পথে ছুটে

চলেছে। এস, পেছনে তাকিও না, সামনে এগিয়ে যাও। ভারত-মাতা তাহার অন্ততঃ এক সহস্র যুবকের বলিদান চান।'

যাহা হউক, উক্ত তিনটি শহরেই স্বামীজী স্থানীয় প্রধান মন্দির সকল দর্শন করেন। এবং তিনি বিস্ময়ের সহিত দেখিতে পান ঐ সকল মন্দিরের গায়েও পুরাতন বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত মন্ত্র সকল খোদিত রহিয়াছে।

ইয়োকোহামা হইতে জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্য দিয়া আমেরিকা অভিমুখে চলিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এই বহু সহস্র মাইল ব্যাপী ভ্রমণপথের কোন বিশেষ সংবাদ পাওয়া যায় না। তবে জানা যায়, স্বামীজী জাহাজে প্রথম প্রথম তাঁহার ট্রাঙ্ক, স্যুটকেস ও পোশাকের বাক্স প্রভৃতি মালপত্র লইয়া খুবই বিব্রত বোধ করিতেন। অন্যদিকে, তাঁহার চেহারা, ব্যক্তিত্ব ও সৌজন্যের জন্য তিনি অতি অল্পেই তাঁহার সহযাত্রীদের প্রিয় হইয়া উঠেন। এবং জাহাজের ক্যাপ্টেন অবসর সময়ে প্রায়ই তাঁহার ভ্রমণসঙ্গী হইতেন। তিনি তাঁহাকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত জাহাজটি দেখান ও উহার যন্ত্রাদির কাজ বুঝাইয়া দেন। জাহাজের খাদ্য ও পরিবেশের সহিত স্বামীজী নিজেকে সহজেই খাপ খাওয়াইয়া লন। এবং ইওরোপীয় যাত্রীদের লক্ষ্য করিয়া তিনি তাহাদের রীতি-নীতি ও আদব-কায়দা প্রভৃতির সহিত সুপরিচিত হন। আর ঐ সকলের সঙ্গে চির-তরঙ্গায়িত অকূল বারিধি-বক্ষে ও মেঘমালাসমন্বিত অনন্ত আকাশের গায়ে সৌন্দর্যের অন্তহীন রূপ দেখিয়া তাঁহার কল্পনা-প্রবণ মন ভাবে বিভোর হইয়া উঠিত।

এই সমস্ত ব্যতীত আরও জানা যায়, গরম জামা-কাপড় সঙ্গে না থাকায় স্বামীজী জাহাজে শীতে খুব কষ্ট পাইয়াছেন। তাঁহাকে রওনা করিবার সময় জগমোহন লাল বুঝিতে পারেন নাই যে গরমের দিনেও প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরাংশে শীত থাকে। জাহাজের গমন পথ ঐ অংশ দিয়াই ছিল।

যাহা হউক, জাহাজখানি চলিয়া চলিয়া ক্রমে প্রশান্ত মহাসাগর

অতিক্রম করিয়া উত্তর আমেরিকার ভ্যাঙ্কুভার বন্দরে তাঁহার যাত্রা শেষ করিল (২৫শে জুলাই, ১৮৯৩)। স্বামীজী সেখান হইতে রেলগাড়ীতে উঠিয়া ক্যানাডার মধ্য দিয়া তৃতীয় দিন চিকাগো শহরে পৌঁছিলেন (২৭শে/২৮শে জুলাই ১৮৯৩)।

স্টেশন হইতে (সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত) বিরাট চিকাগো মহানগরীতে প্রবেশ করিয়া স্বামীজী প্রথমটা খুবই দিশেহারা বোধ করিলেন। চতুর্দিকে রাস্তার জাল ও বিপুল জনস্রোত। তাহার মধ্যে তাঁহার গৈরিক পরিচ্ছদের জন্য সকলেরই তাঁহার উপর কৌতুহলপূর্ণ দৃষ্টি। এবং বিশেষভাবে বালকগণ উহাই একটা আমোদের বিষয় করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে। আর ঐ সকলের সঙ্গে ছিল দীর্ঘ ট্রেণ-ভ্রমণের ক্লান্তি ও কুলীদের অসম্ভব দাবী। বস্তুতঃ নূতন মহাদেশে পদার্পণ করা অবধি তাঁহার ভ্রমণপথের প্রত্যেক স্তরেই যে যেভাবে পারিয়াছে তাঁহাকে ঠকাইয়াছে। এইভাবে বিব্রত ও প্রতারিত হইয়া তিনি পরিশেষে একটি হোটেলে উঠিয়া নিজ মনকে শান্ত করিবার অবসর পাইলেন।

পরদিন তিনি চিকাগোর বিশ্ব-প্রদর্শনী (The World's Columbian Exposition, সংক্ষেপতঃ World's Fair) দেখিতে গেলেন। গিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তিনি স্তম্ভিত হইলেন। কি বিপুল অবিশ্বাস্য আয়োজন! কি বিরাট সংগঠন-শক্তি! এই বিশালকায় (মেলা বা) প্রদর্শনীতে পৃথিবীর সকল দেশের শিল্প, বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যা-জাত সমস্ত প্রকারের নূতনতম যন্ত্র ও দ্রব্য-সম্ভার একত্রিত করা হইয়াছে। কি অশ্রান্ত প্রচেষ্টা ও নিখুঁত কর্মকুশলতার দ্বারা এই অগণিত নূতন দ্রব্যসকল উৎপন্ন করা সম্ভব হইয়াছে! কত শক্তি উহার পিছনে ব্যয় হইয়াছে! ভাবিয়া স্বামীজীর বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। তিনি সেদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রদর্শনী-প্রাসাদ সকল দেখিয়া সন্ধ্যার সময় তাঁহার হোটেলে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পর তিনি রোজই ঐ প্রদর্শনী দেখিতে

যাইতেন এবং উহাকে এক বিরাট শিক্ষার ক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করিয়া দশ-বারো দিনের মধ্যে বহু বিষয়ে প্রচুর জ্ঞানার্জন করিলেন।

এই কয়দিনে স্বামীজী সম্বন্ধে শহরে কিছু জানাজানিও হইল। তাঁহার উজ্জ্বল রাজদীপ্তিসম্পন্ন চেহারায় আকৃষ্ট হইয়া খবরের কাগজের সংবাদদাতাগণ তাঁহার হোটেলের ম্যানেজারের নিকট হইতে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা জানিয়া লইয়া তাহার কিছু কিছু খবরের কাগজে ছাপাইয়া দিলেন। অপর অনেকে মেলাস্থানে তাঁহার সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকেই নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তবে এই সকল সাময়িক আলাপ হইতে তাঁহার যে কাহারও সঙ্গে বন্ধুত্ব জন্মিল তাহা নয়। তিনি পূর্বের ন্যায় একাকী শুধু ভগবানের উপর নির্ভর করিয়াই চিকাগো শহরে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

এইভাবে কয়েকদিন চিকাগো অবস্থানের পর, তিনি প্রদর্শনীর সংবাদ সরবরাহ অফিসে গিয়া ধর্মমহাসভার অধিবেশনের সময় ও তৎসম্বন্ধে অন্যান্য আবশ্যকীয় সংবাদ জানিতে চাহিলেন। উত্তরে যাহা শুনিলেন তাহাতে তিনি স্তম্ভিত হইলেন। ধর্মমহাসভা সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের পূর্বে আরম্ভ হইবে না, ঐ সভার নিয়মাবলী অনুসারে উপযুক্ত পরিচয়-পত্র ব্যতীত কাহাকেও প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করা হয় না, আর কোন নূতন প্রতিনিধি লইবার সময়ও অতীত হইয়া গিয়াছে। সংবাদগুলি পাইয়া স্বামীজী বুঝিলেন তিনি বড় বেশী আগে আসিয়া পড়িয়াছেন এবং তাঁহার কোন খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হইয়া আসা উচিত ছিল। তাহা না করিয়া তিনি কেন যে মাদ্রাজের কতকগুলি ভাবপ্রবণ যুবকের পরামর্শে ব্যক্তিগতভাবে রওনা হইয়াছিলেন তাহা ভাবিয়াই তিনি এখন আশ্চর্য বোধ করিতে লাগিলেন।

তবে তাঁহার সব চাইতে অধিক চিন্তার বিষয় হইল তাঁহার সঙ্গের অর্থের অবস্থা। তাঁহার হোটেলের ব্যয় অত্যধিক ছিল। এবং তিনি দেখিতেছিলেন আমেরিকায় সকল কাজেই জলের মত টাকা খরচ হয়। আর তাহা ছাড়া, এই নূতন অপরিচিত দেশে তিনি

সর্বত্রই ভয়ানকভাবে প্রতারিতও হইতেছিলেন। এই সকল কারণে তাঁহার সঙ্গের অর্থ এত কমিয়া আসিয়াছিল যে, তাঁহার আশঙ্কা হইতে লাগিল যে হয়তো তাঁহার মাদ্রাজের শিষ্যগণের নিকট টাকার জন্য তার করিতে হইবে।

তবে এই ঘোর নৈরাশ্যজনক অবস্থাতেও, তিনি পরিশেষে স্থির করিলেন যে ধর্মমহাসভার সুযোগ না পাইলেও, তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য আমেরিকাতে অন্যভাবে কাজ করিবেন। তাহাতে কৃতকার্য হইতে না পারিলে তিনি ইংলণ্ডে যাইবেন। এবং সেখানেও যদি তিনি নিষ্ফল হন, তাহা হইলে তিনি ভারতে ফিরিয়া ঈশ্বরের পুনরাদেশের জন্য অপেক্ষা করিবেন। ইহার কিছুদিন পরে ২০শে আগষ্ট তারিখের একখানি পত্রে মনের এই সঙ্কল্প ব্যক্ত করিবার কালে তিনি লিখেন, "একশত বার আমার এ দেশ ছাড়িয়া ভারতে ফিরিবার কথা মনে হইয়াছে। কিন্তু আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং আমার উপর ভগবানের আদেশ আছে। আমি কোন পথ দেখিতেছি না, কিন্তু তাঁহার চক্ষু সবই দেখিতেছে। কাজেই আমার সঙ্কল্পিত চেষ্টাতেই নিযুক্ত থাকিতে হইবে, তাহাতে জীবন থাকুক বা যাউক।"

যাহা হউক, তিনি শুনিতে পাইলেন যে বোস্টনে চিকাগো হইতে অনেক কম খরচে থাকা যায়। তাই তিনি মোট প্রায় বারো দিন চিকাগো থাকিয়া রেলগাড়ীতে বোস্টন অভিমুখে রওনা হইলেন (খুব সম্ভবতঃ ৮ই বা ৯ই আগস্ট)। ভগবানের ইচ্ছায় এই গাড়ীতেই তাঁহার সকল সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের ব্যবস্থা শুরু হইল। তাঁহার সহিত একই কামরায় (বোস্টনের নিকটবর্তী কোন গ্রামের) একটি বর্ষীয়সী মহিলাও যাইতেছিলেন। তিনি স্বামীজীর প্রদীপ্ত চেহারায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বামীজী একজন ভারতীয় ও বেদান্তের মহান সত্যসকল প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে আমেরিকায় আসিয়াছেন জানিয়া তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "আচ্ছা স্বামী, আমি আপনাকে আমার বাড়ীতে এসে থাকবার জন্যে আমন্ত্রণ করছি। হয়তো তাতে আপনার একটা সুবিধা হয়ে যেতে পারে।"

এই সময়ে স্বামীজীর সম্মুখে ছিল অভাবের অকুল সমুদ্র।[১] তাই, মহিলাটি আশ্রয় দিবার প্রস্তাবে তিনি বিনাদ্বিধায় রাজি হইলেন। এবং পরদিন তাঁহার সহিত তাঁহার গ্রাম্য আবাসে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠিকানা—ব্রিজি মেডোজ, মেটকাফ. ম্যাসাচুসেটস্।

জানা যায়, এই মহিলাটির নাম মিস কেট স্যানবর্ণ, বয়স তখন চুয়ান্ন বৎসর। তিনি খুব মিশুক, অতিথিসেবাপরায়ণ ও বেশ সঙ্গতি-সম্পন্ন ছিলেন। তাহা ছাড়া, তিনি বই লিখিতেন এবং বক্তৃতাও দিতেন। তাঁহার বাড়ীতে থাকা সম্বন্ধে স্বামীজী তাঁহার পূর্বোক্ত ২০শে আগস্ট তারিখের পত্রে লিখিয়াছেন, "তাঁর বাড়ীতে থাকার আমার সুবিধা এই যে আমি কিছুকালের জন্য আমার দৈনিক এক পাউণ্ড খরচ বাঁচাতে পারবো, আর তাঁর এই সুবিধা যে তিনি তাঁর বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করে এনে ভারতের একটি অপূর্ব জীবকে দেখাতে পারছেন। তবে এ সবই সহ্য করতে হবে। শীত, অনাহার এবং আমার অদ্ভুত পোশাকের জন্য রাস্তার লোকের বিদ্রূপ, এই সবের সঙ্গে আমার যুদ্ধ করতে হচ্ছে।

যাহা হউক, মিস্ স্যানবর্ণের বাড়ীতে থাকা স্বামীজীর পক্ষে পরিচয় ও খ্যাতি অর্জনের দিক দিয়া ক্রমে ক্রমে খুবই সুফলপ্রদ হইয়া উঠিল।[২] যাহারা তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন, তাহারা তাঁহার প্রচারিত হিন্দুধর্মের উদার মতাবলী ও যীশুখ্রীষ্টের প্রতি

১। জানা যায়, ইহার কিছু পরে স্বামীজী বোস্টন হইতে তাঁহার অর্থাভাবের বিষয় খেতড়ি-রাজকে জানাইবার জন্য মাদ্রাজে মন্মথ ভট্টাচার্যকে তার করেন এবং রাজা সংবাদ পাইবামাত্র স্বামীজীকে কুক কোম্পানির মারফত পাঁচশত টাকা পাঠাইয়া মন্মথবাবুকে জানান যে, 'স্বামীজীর উত্তর পাইলে আবশ্যক অনুযায়ী আরও টাকা পাঠাইব।' তবে তাহা পাঠাইবার প্রয়োজন আর হয় নাই।

২। বস্তুতঃ স্বামীজী তাঁহার ঘোর নৈরাশ্যের মধ্যেও এই আশাই করিতেছিলেন। পূর্বোক্ত ২০।৮।৯৩ তারিখের পত্রে তিনি লিখেন, "আমি এখানে মেরীপুত্রের সন্তানদের মধ্যে আছি এবং প্রভু যীশু আমাকে সাহায্য করবেন।"

তাঁহার অকুণ্ঠ ভক্তি দেখিয়া খুবই মুগ্ধ বোধ করিতেন। এবং ফলে অতি অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি নানা স্থানে বক্তৃতা দিবার আমন্ত্রণ পাইতে লাগিলেন। এই বিষয়ের সর্বপ্রথম সংবাদ তাঁহার পূর্বোক্ত ২০শে আগষ্ট তারিখের পত্র হইতে পাওয়া যায়। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন, তাঁহার একটি স্থানীয় মেয়ে ক্লাবে (Boston Ramabai Circle)[১] বক্তৃতা দিতে হইবে এবং তৎপূর্ব তিনি (২১শে আগষ্ট তারিখে) বোষ্টনে গিয়া একটি আমেরিকান স্যুট কিনিবেন, কারণ তিনি গেরুয়া পোশাকে রাস্তায় বাহির হইলে তাঁহাকে দেখিবার জন্য শত শত লোক জমিয়া যায়।[২] উক্ত বক্তৃতা তিনি কবে দেন তাহা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে ইহা নিশ্চিত যে তিনি উহা ২১শে আগষ্ট হইতে ২৪শে আগষ্ট মধ্যে দিয়াছেন।

তাঁহার (বক্তৃতা দিবার) দ্বিতীয় আমন্ত্রণের সংবাদ এইরূপ। ব্রিজি মেডোজের নিকটবর্তী ক্ষুদ্র শেরবর্ণ শহরের নারী-সংশোধনাগারের মহিলা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ১৯শে আগষ্ট তারিখে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন। তিনি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া তাহার ঐ সংশোধনাগার দেখান। এবং তাহার আমন্ত্রণে ২২শে আগষ্ট তারিখে সন্ধ্যাবেলা স্বামীজী উক্ত সংশোধনাগারের অধিবাসীগণের নিকট ভারতের নারীদিগের রীতি, নীতি ও জীবনযাত্রা পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন।

১। এই ক্লাবটি একটি খৃষ্টধর্মাবলম্বী মারাঠী মহিলার নামে স্থাপিত। ইহার ইতিহাস আমরা পরে ব্রুকলিনের ঘটনাবলী আলোচনাকালে পাইব।

২। এই উৎপাত এড়াইবার জন্য মিস স্যানবর্ন স্বামীজীকে আমেরিকান পোশাক পরিতে পরামর্শ দেন। কিন্তু একটি ভাল স্যুটের দামই ছিল একশত ডলার এবং উহা ব্যয় করিলে তাঁহার ক্ষীণ অর্থসম্বলের অতি সামান্যই অবশিষ্ট থাকিবে দেখিয়া স্বামীজী প্রথমটা ঐরূপ একটি স্যুট করিতে ইতস্ততঃ করেন। কিন্তু পরে বুঝিলেন যে উহা করাই সঙ্গত এবং না করিলে বহু অসুবিধা। ঐ স্যুট করার পরে তিনি শুধু বক্তৃতা দিবার সময় তাঁহার গেরুয়া পাগড়ি ও আলখাল্লা পরিতেন।

ইহার পর দেখা যায়, ২৪শে আগষ্ট তারিখে স্বামীজী কোন কারণে (মিস্ স্যানবর্ণের কংকর্ড-নিবাসী জ্ঞাতি ভাই) মিঃ এফ বি স্যানবর্ণের সহিত বোস্টন গমন করেন এবং তাহার পরের দিন শুক্রবার (২৫শে আগষ্ট) তিনি সেখান হইতে একটি আমন্ত্রণ রক্ষার্থ একাকী সমুদ্রতীরবর্তী এনিস্কোয়াম গ্রামে যান। এই গুরুত্বপূর্ণ আমন্ত্রণটির ইতিহাস এইরূপ।

হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক ডাঃ জন হেনরি রাইট (Dr. John Henry Wright) এইকালে গ্রীষ্মের ছুটিতে আটলান্টিক উপকূলের এনিস্কোয়াম গ্রামে বাস করিতেছিলেন। তিনি স্যানবর্ণদের নিকট হইতে স্বামীজীর কথা শুনিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে বিশেষ উদ্গ্রীব হন। এবং স্বামীজী পূর্বোক্তরূপে ২৪শে আগষ্ট তারিখে বোষ্টনে থাকিবেন জানিয়া, তিনিও ঐ শহরের দিকে রওনা হন। কিন্তু কোন আকস্মিক কারণে স্বামীজীর সহিত সেখানে দেখা না হওয়ায়, তিনি তাঁহাকে তাহার এনিস্কোয়ামের বাড়ীতে আসিয়া ঐ সপ্তাহের শেষ কয়দিন থাকিবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। তদনুসারে স্বামীজী ২৫শে আগষ্ট, শুক্রবার, উক্ত এনিস্কোয়াম গ্রামে যান ও ঐ দিন হইতে ২৮শে আগষ্ট, সোমবার, পর্যন্ত উক্ত অধ্যাপকের গৃহে অতিথি হইয়া থাকেন।

তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া অধ্যাপক রাইট এত মুগ্ধ ও প্রভাবিত হইলেন যে, স্বামীজী যাহাতে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হইয়া চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদান করেন তজ্জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন। এবং ঐ বিষয়ে তাঁহাকে তাঁহার অনুরোধ জানাইয়া বলিলেন, "আপনার সমগ্র (আমেরিকান) জাতির সঙ্গে পরিচিত হইবার উহাই একমাত্র পথ।" তখন স্বামীজী তাঁহার অসুবিধা সকল বুঝাইয়া বলিয়া কহিলেন, "আমার কোন পরিচয়-পত্রও নাই।" শুনিয়া অধ্যাপক রাইট বলিলেন, "স্বামী, আপনার কাছে পরিচয়-পত্র চাওয়াও যা, সূর্যকে তাহার কিরণ দিবার অধিকার দর্শাইতে বলাও তাই।" বলিয়া তিনি স্বামীজীকে আশ্বাস দিয়া

কহিলেন, "আপনাকে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে ধর্মমহাসভায় গ্রহণ করার জন্য যা কিছু করতে হয়, তা আমি করব।" ঐ সভার পরিচালকদের অনেকের সহিত অধ্যাপক রাইটের পরিচয় ছিল। তাঁহার যে বন্ধুটি ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন, তাহাকে তিনি স্বামীজীকে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার জন্য একখানি পত্র লিখিয়া তাহাতে তাঁহার সম্বন্ধে লিখিলেন, "আমাদের সমস্ত অধ্যাপকদের একত্র করলে যা হয়, এ লোকটি তার চাইতেও বেশী পণ্ডিত।"

ইহার পর অধ্যাপক রাইটের উদ্যোগে স্বামীজী রবিবার (২৭শে আগষ্ট, ১৮৯৩) সন্ধ্যায় স্থানীয় গির্জায় একটি বক্তৃতা দেন। তদ্ব্যতীত, তাঁহাকে দেখিবার ও তাঁহার কথা শুনিবার জন্য অধ্যাপকের বাড়ীতে এনিস্কোয়াম গ্রামের লোকেরা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িত। তাঁহার অপূর্ব (ও কোন কোন বিষয়ে অগ্নি-গোলাসম) কথাগুলির কিছু কিছু অধ্যাপকের স্ত্রী মিসেস রাইটের লিখিত একটি প্রবন্ধের দ্বারা রক্ষিত হইয়াছে।

সোমবার ২৮শে আগষ্ট তারিখে স্বামীজী এনিস্কোয়াম ত্যাগ করিয়া (অপর একটি আমন্ত্রণ রক্ষার্থ) স্যালেমে যান। সেখানে (স্থানীয় Thought and Work Club'এর অতিথিরূপে) তিনি তিনটি বক্তৃতা দেন। প্রথমটি দেন উক্ত ২৮শে আগষ্ট তারিখের সন্ধ্যায় স্থানীয় ওয়েসলি চ্যাপেল নামক গির্জায়, দ্বিতীয়টি দেন ২৯শে আগষ্ট বৈকালে বালক-বালিকাদের জন্য (উক্ত Thought and Work Club'এর প্রতিষ্ঠাতা) মিসেস কেট ট্যানাট উড্‌সের উদ্যানে এবং তৃতীয়টি দেন ৩রা সেপ্টেম্বর, রবিবার, সন্ধ্যায় স্থানীয় ইষ্ট চার্চ নামক গির্জায়।

জানা যায়, স্যালেমে স্বামীজী ২৯শে আগষ্ট হইতে ৪ঠা সেপ্টেম্বর (সোমবার) পর্যন্ত এই সাত দিন উক্ত মিসেস উড্‌স্'এর বাড়ীতে ছিলেন। এবং তাঁহার ও তাঁহার অধ্যয়নরত যুবক পুত্রের আতিথ্য

ও আদর-যত্নে তিনি বিশেষ মুগ্ধ হন।[১] আর দেখা যায়, ইহাদের বাড়ীতে থাকিতেই তিনি অধ্যাপক রাইট ও চিকাগোর একটি ভদ্রলোকের (Mr. Theles) নিকট হইতে সংবাদ পান যে তিনি চিকাগো ধর্মমহাসভার প্রতিনিধিরূপে গৃহীত হইয়াছেন। অধ্যাপক রাইট তাঁহাকে চিকাগোয় ব্যবহার করিবার জন্য কয়েকখানি পরিচয় পত্রও পাঠান।

স্যালেমে অবস্থানকালে স্বামীজী (মিস্ স্যানবর্ণের পূর্বোক্ত জ্ঞাতি ভাই) মিঃ এফ বি স্যানবর্ণের নিকট হইতে স্যারাটোগা স্প্রিংসে আসিয়া একটি ধর্মসম্পর্কহীন সম্মেলনে (Convention of the American Social Science Association) বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাত্রে স্যালেম হইতে স্যারাটোগায় রওনা হন। এবং সেখানে পৌঁছিয়া তিনি ৫ই, ৬ই ও ৭ই তারিখে পর পর তিনটি বক্তৃতা দেন। প্রথমটির বিষয় ছিল "ভারতে মুসলমান শাসন", দ্বিতীয়টির বিষয় ছিল "ভারতে রৌপ্যের ব্যবহার", এবং তৃতীয়টির বিষয় অনেক অনুসন্ধান করিয়াও জানা যায় নাই। ইহা ব্যতীত, তিনি স্যারাটোগায় ডাঃ হ্যামিলটনের বৈঠকখানায় ভারতের অধিবাসীগণের রীতি, নীতি ও ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে আরও দুইটি বক্তৃতা দেন। সকল কয়টি বক্তৃতাই বিশেষ মনোজ্ঞ ও উচ্চ-প্রশংসিত হইয়াছিল।

এইভাবে স্বামীজী তিন সপ্তাহেরও কম সময়ে নানা স্থানে এগারটি বক্তৃতা দেন এবং আমেরিকার সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের সংস্পর্শে আসিয়া অতি মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। ধর্মমহাসভায় যোগ

১। স্যালেম হইতে যাইবার সময় স্বামীজী মিসেস উড্সের বাড়ীতে তাঁহার একটি ট্রাঙ্ক, একখানি কম্বল ও একটি ভ্রমণদণ্ড রাখিয়া যান। কয়েক মাস পরে ফিরিয়া আসিয়া তিনি তাঁহার ট্রাঙ্কটি ও কম্বলখানা মিসেস উড্সকে এবং তাঁহার ভ্রমণদণ্ডটি তাঁহার পুত্রকে দান করেন ও বলেন, "এই মহান দেশে যাহারা আমাকে বাড়ীর মত আরামে রাখিয়াছেন, আমার সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান জিনিসগুলি আমার তাহাদেরই দেওয়া কর্তব্য।"

দিবার পূর্বে এই প্রস্তুতি লওয়া তাঁহার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এবং তাহা লইয়াই তিনি ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে স্যারাটোগা হইতে চিকাগো অভিমুখে রওনা হন।

৯ই সেপ্টেম্বর 'সন্ধ্যার পূর্বে চিকাগো পৌঁছিয়া স্বামীজী এক নূতন মুস্কিলে পড়িলেন। পথে গাড়ীর ভিতর একটি ব্যবসায়ী ভদ্রলোক কথা দিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে স্টেশন হইতে তাঁহার গন্তব্য স্থান ডাঃ ব্যারোজের অফিসে যাইবার পথ বলিয়া দিবেন। কিন্তু চিকাগো পৌঁছিয়া ব্যস্ততার জন্য তিনি তাঁহাকে তাহা বলিতে ভুলিয়া গেলেন। তখন স্বামীজী তাঁহার পকেট অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, তিনি ডাঃ ব্যারোজের অফিসের ঠিকানাটি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। এই অবস্থায় তিনি রাস্তায় বাহির হইয়া কয়েকজন পথচারী ভদ্রলোকের নিকট তাঁহার অফিসের ঠিকানার খোঁজ করিলেন। কিন্তু তাহারা কেহ তাঁহার কথা বুঝিতে পারিলেন না। কারণ শহরের ঐ অংশের প্রায় সকল অধিবাসীই ছিলেন জার্মান। ক্রমে রাত্রি আগত দেখিয়া তিনি পরিশেষে শুধু একটি হোটেলের সন্ধান চাহিয়াও তাঁহার কথা কাহাকেও বুঝাইতে সক্ষম হইলেন না। তখন কি করিবেন কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, তিনি রেলওয়ে মালগুদামের সামনে রক্ষিত একটি প্রকাণ্ড খালি প্যাকিং বাক্সের ভিতর গিয়া শুইয়া রহিলেন। পরদিন সকাল হইলে তিনি হাঁটিতে হাঁটিতে অল্প সময়ের মধ্যে শহরের সর্বোত্তম বাসপল্লীতে (Lake Shore Drive) আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে শহরের ক্রোরপতি ব্যবসায়ী ও ধনকুবেরগণ বাস করিতেন। অত্যন্ত ক্ষুধার্ত বোধ করিয়া স্বামীজী সেখানে প্রকৃত সন্ন্যাসীর ন্যায় দ্বারে দ্বারে গিয়া ভিক্ষা চাহিলেন ও ধর্মমহাসভা কমিটির অফিসে যাইবার পথেরও অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু তাঁহার মলিন পোশাক ও ভ্রমণ-ক্লান্ত চেহারা দেখিয়া কেহ তাঁহাকে আমল দিল না। কোথাও তিরস্কৃত হইলেন, কোথাও বা ভৃত্যগণ তাঁহাকে অপমান করিয়া মুখের উপর দরজা বন্ধ করিয়া দিল। অবসন্ন হৃদয়ে তিনি পুনরায় চলিতে

লাগিলেন। এবং একস্থানে আসিয়া অত্যধিক পরিশ্রান্তির জন্য ফুটপাথের উপর বসিয়া পড়িলেন ও শান্তভাবে ভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া রহিলেন। ঠিক এই সময়েই তাঁহার বিপরীত দিকের একটি সুন্দর হালফ্যাশনের বাড়ীর দ্বার খুলিল এবং একটি অতি সুশ্রী রাজগরিমাসম্পন্ন বর্ষীয়সী মহিলা নামিয়া আসিয়া তাঁহাকে অতি সুমার্জিত ও সুমিষ্টকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনি কি ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি?" তখন স্বামীজী তাঁহাকে তাঁহার অসুবিধার কথা জানাইলে, তিনি তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার গৃহে লইয়া গেলেন এবং তাঁহাকে একটি ঘরে লইয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইবার জন্য ভৃত্যগণকে আদেশ দিলেন। তৎসঙ্গে তিনি স্বামীজীকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, তাঁহার প্রাতর্ভোজনের পরে তিনি নিজে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ধর্মমহাসভার অফিসে লইয়া যাইবেন। এই মহীয়সী মহিলাটির নাম মিসেস জর্জ ডব্লিউ হেল (Mrs. George W. Hale)। আমরা পরে দেখিতে পাইব, আমেরিকাতে তিনি ও তাঁহার পরিবারবর্গই স্বামীজীর সর্বাপেক্ষা প্রিয় বান্ধব ও বড় সহায় হইয়া দাঁড়ান।

প্রাতরাশের পর স্বামীজী মিসেস হেলের সহিত ধর্মমহাসভার উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার পরিচয়পত্র দাখিল করিলে, তিনি সানন্দে সভার প্রতিনিধি বলিয়া গৃহীত হইলেন এবং পূর্বদেশীয় অপর প্রতিনিধিদের সহিত একই বাড়ীতে থাকিবার স্থান পাইলেন। সেদিনের অধিকাংশ সময় তিনি ধ্যান ও প্রার্থনায় কাটাইলেন। ধর্মমহাসভায় যোগ দিবেন এরূপ বহু খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সহিত আলাপ-পরিচয়ও করিলেন। এবং সকল বিষয়ে ভগবানই নিয়ন্তা ও পরিচালক এই বোধ ও বিশ্বাসে তিনি শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন মনে আগামী দিনের অপেক্ষায় রহিলেন। ঐ দিন (১১ই সেপ্টেম্বর, সোমবার) বেলা ১০টায় ধর্মমহাসভার অধিবেশন আরম্ভ হইবার সময় নির্দিষ্ট ছিল।

তেইশ

ধর্মমহাসভা

(The Parliament of Religions)

১।

চিকাগো বিশ্ব-প্রদর্শনীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জগতের ঐহিক প্রগতির ফলরাশি (অর্থাৎ, নব নব উপায়ে উৎপন্ন পৃথিবীর সর্বদেশের সর্বপ্রকারের পণ্যসম্ভার) একত্র করা। আর উহারই পরিপূর্ণতার জন্য ঐ প্রদর্শনীতে মানবজাতির স্বার্থসংযুক্ত বড় বড় চিন্তার বিষয়-সমূহকেও বিবেচনা করিবার ব্যবস্থা করা হয়। তদনুসারে ঐ প্রদর্শনীর অঙ্গস্বরূপ (১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মে হইতে ২৮শে অক্টোবর মধ্যে) নানা বিষয়ে বিশটি কংগ্রেস বা মহাসভার অধিবেশন হয়। তন্মধ্যে ধর্মমহাসভা (The Parliament of Religions) সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ও গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দাঁড়ায়।

এই সকল নানা-বিষয়ক মহাসভাগুলির উদ্ভাবক ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ আইনব্যবসায়ী মিঃ বনি (Mr. Charles Carroll Bonney) এবং তিনিই ছিলেন বিশ্ব-প্রদর্শনীর কংগ্রেস বিভাগের (The World's Congress Auxiliary of the Columbian Exposition) প্রেসিডেণ্ট বা সভাপতি। ধর্মমহাসভার পরিকল্পনা বিশেষভাবে তাঁহারই চিন্তা-প্রসূত ছিল এবং উহার সর্বোচ্চ কর্তাও ছিলেন তিনি।[১] তাহা হইলেও, ঐ সভার সাধারণ কমিটির

১। মিঃ বনির সম্বন্ধে স্বামীজী খেতড়ির মহারাজার নিকট এক পত্রে লিখেন, "মিঃ বনি কি অদ্ভুত লোক! যে মনটির দ্বারা এই বিরাট অনুষ্ঠানটি পরিকল্পিত ও প্রভূত সফলতার সহিত কার্যে পরিণত হইয়াছে, তাঁহার কথা চিন্তা করুন। তিনি নিজে পাদরী নন, একজন আইনব্যবসায়ী। অথচ তিনি মহা মহা ধর্মযাজকগণের সভায় সভাপতিত্ব করিতেছেন—সেই ধীর, মিষ্টভাষী,

চেয়ারম্যান ছিলেন চিকাগোর প্রখ্যাত খ্রীষ্টান ধর্মযাজক ডাঃ ব্যারোজ (Rev. John Henry Barrows) এবং তাঁহার উপরই উক্ত সভার পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার ভার অর্পিত ছিল।

এই সাধারণ কমিটি পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য প্রায় সমস্ত ধর্মাবলম্বীদেরই উক্ত ধর্মমহাসভায় প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। এই জন্য (আড়াই বৎসর কালে) দশ হাজারের অধিক চিঠি ও চল্লিশ হাজারের অধিক ছাপানো কাগজ ও পুস্তিকা পাঠানো হয় এবং উহার উত্তরও বস্তায় বস্তায় পাওয়া যায়। কার্যের সাহায্যের জন্য পৃথিবীর সকল অংশ হইতে প্রায় তিন হাজার পরামর্শদাতা নিযুক্ত করা হয়। ঐ কাজে ভারত হইতে নির্বাচিত হইয়াছিলেন জি এস্ আয়ার (মাদ্রাজ—'হিন্দু' পত্রিকার সম্পাদক), বি, বি, নাগরকার (বম্বে—ব্রাহ্মনেতা) এবং পি সি মজুমদার (কলিকাতা—ব্রাহ্মনেতা)। উক্ত জি এস্ আয়ার তাঁহার বিখ্যাত 'হিন্দু' পত্রিকায় ধর্মমহাসভা সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ লিখেন, প্রধানতঃ তাহার দ্বারাই ভারতে ঐ বিষয় কিছু জানাজানি হয়।

উপরে যাহা লেখা হইল তাহা হইতে বোঝা যাইবে যে, ধর্মমহাসভা সংগঠনের কাজ কি বিরাট ছিল এবং কত উদ্যোগ, আয়োজন ও অর্থব্যয়ের দ্বারা উহা কার্যে পরিণত করা সম্ভব হইয়াছিল। মিঃ বনির দ্বারা পরিকল্পিত এই সভার উদ্দেশ্য ছিল: (১) পৃথিবীর সমস্ত প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ধর্মের প্রতিনিধিগণকে এক সভায় একত্রিত করা, (২) বিভিন্ন ধর্মসকল কতগুলি এবং কি কি গুরুত্বপূর্ণ সত্য সমভাবে প্রচার করে ও শিক্ষা দেয় তাহা লোকের কাছে সুস্পষ্ট করা, (৩) প্রত্যেকটি ধর্ম কি কি বিশেষ সত্য প্রচার করে ও শিক্ষা দেয় তাহা নির্ধারণ করা, (৪) এক ধর্ম অপর ধর্মগুলিকে কি আলোক দিয়াছে বা দিতে পারে তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করা, (৫) ধর্ম বর্তমান কালের সমস্যা সকল সমাধানে কি সাহায্য করিতে পারে তাহা

মহাপণ্ডিত মিঃ বনি, যার সমস্ত আত্মা তাঁহার উজ্জ্বল চক্ষু দুটির ভিতর দিয়া কথা বলিতেছে।"

আবিষ্কার করা, (৬) স্থায়ী আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে জগতের বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে অধিকতর সদ্ভাব স্থাপন করা, ইত্যাদি।

কিন্তু সভার কার্য কিছুদূর অগ্রসর হইতেই, নানা স্থানের গোঁড়া ও ধর্মান্ধ খ্রীষ্টানগণ উহার অধিবেশনে নানারূপ আপত্তি করিতে থাকেন। তাহাদের একদল বলেন, এই সভার দ্বারা খ্রীষ্টধর্মকে অপমানিত করা হইবে; আর একদল বলেন, মিথ্যা ধর্মগুলির সহিত খ্রীষ্টধর্মকে জড়িত করিলে খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে; এবং আরও একদল বলেন, খ্রীষ্টধর্মই যখন একমাত্র সত্য ধর্ম, তখন উহাকে ধর্মমহাসভার সভ্য করা অনুচিত, কারণ তাহা করিলে উহার সহিত অপর ধর্ম সকলের সমান পদ ও দাবী মানিয়া লওয়া হইবে। ইত্যাদি।

যাহা হউক, এই সকল আপত্তিকারীদের এই বলিয়া নিরস্ত করা হয় যে, ধর্মমহাসভায় খ্রীষ্টধর্মেরই জয় হইবে এবং উহা উত্তমভাবে উপস্থিত করা হইলে অপর ধর্মাবলম্বীরাও ঐ ধর্ম গ্রহণ করিবে বলিয়া আশা করা যায়। সভার সাধারণ কমিটির চেয়ারম্যান ডাঃ ব্যারোজ নিজেও অন্তরে অন্তরে এইরূপ একটি আশা পোষণ করিতেন। তবে ইহা লক্ষণীয় যে, মিঃ বনি ও ধর্মমহাসভার অন্য অনেক কর্মকর্তার এই মনোভাবের সহিত কোন সংস্রব ছিল না। এবং তাঁহারা উক্ত সভা অতি উচ্চ ও উদার ভাবেই কল্পিত করিয়াছিলেন।

২।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর, সোমবার, বেলা ১০টার সময় ধর্মমহাসভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। স্থান—চিকাগোর নবনির্মিত আর্ট ইন্‌ষ্টিটিউট'এর (Art Institute of Chicago) সুবৃহৎ কলম্বাস হল (Hall of Columbus)। সভার আরম্ভকালে ঐ হলের মেঝের উপর ও গ্যালারীতে ঠাসাঠাসিভাবে বসিয়া প্রায়

পাঁচ-ছয় হাজার নরনারী প্রতিনিধিগণের আগমনের জন্য নীরবে উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে অপেক্ষা করিতেছিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে—১০টার ঘণ্টা বাজিতেই—নানা রং'এর পোষাক পরিহিত বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ দুইজন করিয়া সারি বাঁধিয়া এক অপূর্ব মিছিলে শ্রোতাদের পশ্চাৎ দিক দিয়া সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং বহু জাতির পতাকার তল দিয়া ও মাঝের পথ বাহিয়া বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে মঞ্চে গিয়া উঠিলেন। এই মিছিলের প্রথম সারিতে ছিলেন সভাপতি মিঃ বনি ও (আমেরিকার ক্যাথলিক চার্চের সর্বপ্রধান ধর্মাচার্য) কার্ডিনাল গিবনস্।[১]

প্রতিনিধিগণ তাহাদের নিজ নিজ নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলে, সঙ্গীত ও প্রার্থনার সহিত সভার কার্য আরম্ভ করা হইল। সর্বপ্রথম সভার উদ্যোক্তাদের পক্ষ হইতে কয়েকজন বক্তা সমাগত প্রতিনিধিবর্গকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন। তারপর সভার চেয়ারম্যান ডাঃ ব্যারোজ প্রতিনিধিদের একে একে সভার সমক্ষে পরিচয় দিতে লাগিলেন এবং তাঁহারা অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনার প্রত্যুত্তরে নিজ নিজ বক্তব্য বলিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই তাঁহাদের বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামীজী একেবারেই তৈরী ছিলেন না। তাই, চেয়ারম্যান তাঁহাকে যতবারই বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করিতে লাগিলেন, তিনি ততবারই বলিতে লাগিলেন, "না, এখন না।" স্বামীজী পরে এক পত্রে লিখিয়াছেন, "ঐ সময়ে আমার বুক কাঁপিতেছিল, জিহ্বা শুকাইয়া আসিতেছিল।" বস্তুতঃ তখন তাঁহার সম্মুখে ও চতুর্দিকে শ্রোতারূপে এক বিরাট, অদৃষ্টপূর্ব জনসমষ্টি—আমেরিকার সুশিক্ষিত

১। পরের বিভিন্ন সারিতে ভারতীয় প্রতিনিধিগণের মধ্যে ছিলেন স্বামীজী (হিন্দুধর্ম), মজুমদার ও নাগরকার (ব্রাহ্মধর্ম), চক্রবর্তী ও এনি বেসান্ট (থিওসফি), ধর্মপাল (বৌদ্ধধর্ম), গান্ধি (জৈনধর্ম), মণিলাল দ্বিবেদী (হিন্দুধর্ম) এবং (আশ্চর্যের বিষয়) একটি ভবঘুরে মাদ্রাজী যুবক নরসিংহাচার্য (হিন্দুধর্ম)।

ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি নরনারীগণ, নানাদেশের বুধমণ্ডলী[১] ও সকল ধর্মের দিকপালগণ। তিনি যেদিকে চাহেন, দেখেন উজ্জ্বল, সুমার্জিত চেহারা—চোখেমুখে মহা জ্ঞানবুদ্ধির দীপ্তি। ইতিপূর্বে তিনি কয়েক স্থানে কতিপয় বক্তৃতা দিয়া থাকিলেও, এতবড় জনতার সম্মুখে তিনি আর কখন দাঁড়ান নাই। তাই, উহার দিকে তাকাইয়া একটা অজ্ঞাত ভয় আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়াছিল। বিপুল কুরুসৈন্য দেখিয়া মহাবীর অর্জুনের মনে প্রথমটা যে ভয় জাগিয়াছিল, ঠিক সেই রকমের একটা ভয়। এবং এই ভয়ের জন্যই তিনি "না, এখন না" বলিয়া পূর্বাহ্নে বক্তৃতা দিতে স্বীকৃত হইলেন না। তারপর অপরাহ্নের অধিবেশনকালেও তিনি ঐ কথাই বলিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় অপর চারিজন প্রতিনিধির বক্তৃতা-পাঠ শেষ হইলে, ডাঃ ব্যারোজ তাঁহাকে আর সময় দিতে চাহিলেন না। ইহাতে স্বামীজীর ভিতর নিমেষে এক বিস্ময়কর ভাবান্তর দেখা দিল। তিনি বীরের ন্যায় নির্ভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এবং ডাঃ ব্যারোজ তাঁহার পরিচয় দিলে, তিনি দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন।

সে এক মহা মুহূর্ত! উদ্‌গ্রীব সভা,[১] উৎকণ্ঠিত জগৎ, চঞ্চল আশীষবর্ষী দেবতাগণ,—সকলেই উৎকর্ণ স্বামীজীর মুখ দিয়া কি বাণী বাহির হয় তাহা শুনিবার জন্য। উজ্জ্বল, বিশাল নয়নে শ্রোতাদের দিকে তাকাইয়া স্বামীজীর গরিমামাখা মুখখানি এক প্রদীপ্ত দিব্য-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার প্রথম বাণী উচ্চারণ করিলেন—"আমেরিকার ভগ্নী ও ভ্রাতাগণ!"

শুধু একটা শুভেচ্ছা-প্রকাশক সম্বোধন! কিন্তু ঐ বাণী শ্রুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট সভাকক্ষটি যেন দুলিয়া উঠিল। এবং সভার পাঁচ-ছয় হাজার নরনারী এক বিপুল তরঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কয়েক

১। জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের মধ্যে অনেকে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে ধর্মমহাসভায় উপস্থিত থাকিতেন।

১। স্বামীজীর উজ্জ্বল গৈরিক রং'এর পোশাক ও প্রদীপ্ত রাজকীয় চেহারা পূর্ব হইতেই সকলকে তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী করিয়া রাখিয়াছিল।

মিনিট কাল ধরিয়া উন্মত্তভাবে হর্ষধ্বনির দ্বারা স্বামীজীকে তাহাদের প্রশংসা ও সংবর্ধনা জানাইতে লাগিলেন। তাঁহার পূর্বে সভায় বক্তৃতা দিয়া ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা বলিয়া আরও অনেকে সভায় বাহবা অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু এ যেন এক সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের জিনিস। সকলেই উল্লাসধ্বনি করিতেছেন, সকলেই আনন্দে উন্মত্ত, সকলেই কোন অজ্ঞাত কারণে স্বামীজীর জয়াভিলাষী হইয়া যেন তাঁহার জয় ঘোষণা করিতেই প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যখন তাহারা থামিলেন ও পুনরায় আসন গ্রহণ করিলেন, তখন ঐরূপ একটা উন্মুখ প্রত্যাশাই তাহাদের অন্তরে বাজিতে লাগিল।

তাহারা নিরাশ হইলেন না। আমেরিকাবাসীদের সাদর অভ্যর্থনার উত্তরে স্বামীজী যে বক্তৃতা দিলেন, তাহা প্রয়োজনানুসারে ক্ষুদ্র। কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র বক্তৃতাটিতে তিনি যাহা বলিলেন তাহা পাশ্চাত্য জগতের স্থলে জলে কোথাও কি ছিল? মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার শ্রোতাগণ প্রথমে দেখিলেন, স্বামীজী তাঁহার অপূর্ব সঙ্গীতময় কণ্ঠে তাহাদের সাদর অভ্যর্থনার জন্য ধন্যবাদ দিতেছেন—জগতের প্রাচীনতম (ভারতীয়) সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে, 'সর্ব ধর্ম-জননী' হিন্দুধর্মের পক্ষ হইতে এবং সর্ব শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের কোটি কোটি হিন্দু নরনারীগণের পক্ষ হইতে। কিন্তু তাহার পরই তিনি নিমেষে কোথায় উঠিয়া গেলেন! নিস্তব্ধ সভা অবাক হইয়া শুনিল স্বামীজী বলিতেছেন, "এই সভায় আজ যে সকল বক্তা পূর্বদেশীয় প্রতিনিধিগণের আগমন তাহাদের পরধর্ম-সহিষ্ণুতার পরিচয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, আমি তাহাদেরও ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু আমি এমন একটি ধর্মের লোক, যাহা শুধু পরধর্ম-সহিষ্ণুতাই নয়, সকল ধর্মকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেও শিক্ষা দেয়।" বলিয়া তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপ হিন্দুদিগের ধর্মশাস্ত্র হইতে দুইটি বাক্য উদ্ধৃত করিলেন: (১) "যেমন বিভিন্ন নদী বিভিন্ন স্থানে উৎপন্ন হইয়া পরিশেষে সমুদ্রে গিয়া মিলিত হয়, তেমনি, হে প্রভু, মনুষ্যগণ বিভিন্ন প্রকৃতির বশে যে বিভিন্ন পথ সকল গ্রহণ করে, তাহা সবই তোমাতে গিয়াই পৌঁছায়।" (২) "যে

যে ভাবেই আমার উপাসনা করুক না কেন, সে সেই পথেই আমাকে পায়। মানুষ সকল পথ দিয়াই আমার দিকেই আসিতেছে।"

সভায় এই মহান সর্বজনীন সত্য দুইটি ঘোষণার দ্বারা স্বামীজী সমস্ত ধর্মকে একই উচ্চাসনে তুলিয়া ধরিয়া সর্বপ্রকার দলাদলি, গোঁড়ামি ও ধর্মোন্মত্ততার শিরে বজ্র হানিলেন। এবং পরিশেষে এই বলিয়া তিনি তাঁহার বক্তৃতার উপসংহার করিলেন, "আমি ঐকান্তিক ভাবে আশা করি এই সভার সম্মানে আজ সকালে যে ঘণ্টা বাজিয়াছে তাহাই সর্বপ্রকার ধর্মোন্মত্ততা, অন্যায় নিগ্রহ ও একই লক্ষ্যগামী ব্যক্তিদের মধ্যে বিদ্বেষভাবের মৃত্যুঘণ্টা বলিয়া প্রমাণিত হইবে।"

এইভাবে সভাকে অশেষ গুরুত্ব দান করিয়া স্বামীজী আসন গ্রহণ করিতেই, সমস্ত সভাগৃহটি তাঁহার প্রশংসা, সমর্থন ও সংবর্ধনায় বিপুল হর্ষধ্বনিতে পুনরায় মুখরিত হইতে লাগিল। এবং পরদিন আমেরিকার সমস্ত সংবাদপত্র ঘোষণা করিলেন, স্বামীজীর বক্তৃতাই সভার উদ্দেশ্য অনুযায়ী ও সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। এইভাবে তাঁহার প্রথম জয় বিঘোষিত হইল। ফলে, ঐ একদিনেই সমস্ত আমেরিকা তাঁহাকে জানিল এবং ঐ দিন হইতেই তিনি জগদ্‌বিখ্যাত হইলেন।

৩।

১১ই সেপ্টেম্বর হইতে ২৭শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই মোট ১৭ দিন ধর্মমহাসভার অধিবেশন হয়।[১] প্রতিদিনের অধিবেশনের সময় ছিল সকাল ১০টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত, মাঝে আহারের জন্য মাত্র আধঘণ্টা অবকাশ থাকিত। উক্ত ১৭ দিনের অধিবেশনে সহস্রাধিক প্রবন্ধ পাঠ হয়। এই জন্য সময়াভাবে প্রত্যেক বক্তার বক্তৃতার সময় আধঘণ্টা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। তবে যে সকল বক্তা সভার প্রিয় হইয়া উঠেন, তাহাদের বেশী সময় দেওয়া হইত। স্বামীজী সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় হওয়ায়, তিনি অনেক অধিক সময় পাইতেন।

১। জানা যায়, প্রত্যেক দিনের অধিবেশনে একজন পৃথক ব্যক্তি সভাপতিত্ব করিতেন।

উক্ত ১৭ দিনের অধিবেশনে স্বামীজী যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ছয়টি তাঁহার 'সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলীতে' (Complete Works) পাওয়া যায়। ঐ ছয়টি বক্তৃতার বিষয় ছিল : (১) অভ্যর্থনার উত্তর (১১ই সেপ্টেম্বর), (২) আমাদের মতভেদের কারণ (১৫ই সেপ্টেম্বর), (৩) হিন্দুধর্ম (লিখিত বক্তৃতা, ১৯শে সেপ্টেম্বর), (৪) ধর্ম ভারতের কোন তীব্র প্রয়োজন নয় (২০শে সেপ্টেম্বর), (৫) বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মেরই পরিপূর্ণতা (২৬শে সেপ্টেম্বর), (৬) বিদায় বক্তৃতা (২৭শে সেপ্টেম্বর)। এই সকল ব্যতীত, স্বামীজী ধর্ম-মহাসভায় আরও কয়েকটি বক্তৃতা দিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার কোন উল্লেখযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় না।

অন্যদিকে, ধর্মমহাসভার কয়েকটি শাখা-বিভাগ ছিল। তন্মধ্যে উহার বিজ্ঞান-শাখা (Scientific Section) বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। এই শাখায় ধর্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে উচ্চ পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ সকল পাঠ হইত। ইহার অধিবেশন মূল ধর্মমহাসভার পঞ্চম দিনে (অর্থাৎ ১৫ই সেপ্টেম্বর) আর্ট ইন্‌স্টিটিউটের ৩নং হলে আরম্ভ হয়। এই শাখায় স্বামীজী মোট আটটি বক্তৃতা দেন। তন্মধ্যে চারিটি বক্তৃতার বিষয় ছিল : (১) গোঁড়া হিন্দুধর্ম ও বেদান্ত দর্শন (২২শে সেপ্টেম্বর, সকাল), (২) ভারতের আধুনিক ধর্ম সকল (২২শে সেপ্টেম্বর, বৈকাল), (৩) উক্ত বিষয় দুইটি সম্বন্ধে পুনরালোচনা (২৩শে সেপ্টেম্বর) এবং (৪) হিন্দুধর্মের সারকথা (২৫শে সেপ্টেম্বর বৈকাল)। অপর চারিটি বক্তৃতা সম্বন্ধে কোন উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না।

আমরা পরে যথাস্থানে দেখিব, স্বামীজীর বক্তৃতা কোন সাধারণ বক্তার বক্তৃতা ছিল না। উহা ছিল তাঁহার অন্তরের পুঞ্জীভূত অধ্যাত্ম জ্ঞান ও শক্তির মুক্ত প্রবাহ, তাই উৎকৃষ্ট, নিখুঁত ও অতিশয় চিত্তাকর্ষক। ফলে, ধর্মমহাসভায় তাঁহার প্রভাব ক্রমশঃই বাড়িয়া চলে। এবং তিনি সভার এত প্রিয় হইয়া উঠেন যে, তিনি যদি মঞ্চের উপর দিয়া শুধু একবার হাঁটিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও সভার

হল-কক্ষটি উচ্চ হর্ষধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিত। এবং তাঁহার মুখের দুইটি কথা শুনিবার জন্য সভার সহস্র সহস্র নরনারী গরমের দিনেও নীরবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া থাকিত। যখন নীরস বক্তাদের শুষ্ক বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে সভা ক্লান্ত ও চঞ্চল হইয়া উঠিত এবং সভার লোক সকল উঠিয়া যাইতে আরম্ভ করিত, তখন সভা ঠিক রাখিবার জন্য সভাপতি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিতেন, সভার শেষের দিকে স্বামী বিবেকানন্দ তাহাদের কিছু বলিবেন এবং তৎক্ষণাৎ সভার লোক চলিয়া যাইবার হিড়িক বন্ধ হইয়া যাইত। এই জন্য, ইহাও দেখা যাইত সভাপতি প্রায়ই সকল বক্তার শেষে ছাড়া স্বামীজীকে বক্তৃতা দিতে দিতেন না।

হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে স্বামীজী ধর্মমহাসভায় যে সকল বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা সবই উৎকৃষ্ট হইলেও, তাঁহার "হিন্দুধর্ম" সম্বন্ধে রচনাটি তুলনাহীন। সংক্ষেপে ও অতি প্রাঞ্জল সুমার্জিত ভাষায় বহু শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট ও কোন নির্দিষ্ট সীমাহীন বিরাট হিন্দুধর্মের যে বর্ণনা ও পরিচয় তিনি দিয়াছেন, তাহা উত্তম রচনার এক পরাকাষ্ঠা। অনন্ত বিভেদ ও অসীম বৈচিত্র্যপূর্ণ হিন্দুধর্ম যে কি, কোথায় তাহার ঐক্য এবং কিভাবে সে জগতের পরিপূর্ণ, মহোত্তম, সনাতন ও সর্বজনীন ধর্ম, তাহা তিনি উহাতে অপূর্ব কৌশলের সহিত দর্শন-বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। ফলে, একদিকে ঐ রচনাটি হইতে ধর্মমহাসভা ও সমগ্র জগৎ যেমন বিস্ময়ের সহিত অনন্ত আকাশের ন্যায় এক অতি উদার, মহৎ ও মহাসমন্বয়যুক্ত ধর্মের সন্ধান পায়, অন্যদিকে তেমনি উহার দ্বারা রূপহীন, সীমাহীন, সংজ্ঞাহীন, গঠনহীন, আত্মভোলা হিন্দুধর্মও একটি সম্পূর্ণ নূতন আত্মসম্বিৎ ও আত্ম-পরিচয় লাভ করে। এই বক্তৃতাটির মধ্যেই পরবর্তীকালে স্বামীজীর প্রচারিত সর্বজনীন ধর্মের প্রথম বার্তা উল্লিখিত হয় এবং ঐ ধর্মই যে নূতন নাম-রূপ-সম্বিৎ প্রাপ্ত অতি প্রাচীন সনাতন হিন্দুধর্ম তাহাও এই বক্তৃতাতেই সুস্পষ্ট করা হয়। এই বক্তৃতাটি সকলেরই সযত্নে পাঠ করা কর্তব্য।

বক্তৃতাটির প্রারম্ভেই স্বামীজী বলেন, (দ্বৈত, অদ্বৈত ও বিশিষ্টা-

দ্বৈতবাদসমন্বিত) উচ্চতম বেদান্ত দর্শন হইতে নিম্নতম মূর্তিপূজা, বৌদ্ধদের অজ্ঞেয়বাদ এবং জৈনদিগের নিরীশ্বরবাদ—এ সবেরই হিন্দু ধর্মে একটা স্থান আছে। এবং ঐ সকলের সমর্থনে ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়া তিনি দেখান, (পথ বিভিন্ন হইলেও) সকল মানুষই একই লক্ষ্যগামী ও একই সত্যের উপাসক। বস্তুতঃ "মানুষ ভুল হইতে সত্যে ভ্রমণ করে না ; সত্য হইতে সত্যে, নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে ভ্রমণ করে।" এবং মানুষ স্বরূপতঃ আত্মা ও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। তাই, সে ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্মস্বরূপ হইবে—ইহাই সকল ধর্মের সার কথা। এইজন্য ধর্ম প্রকৃতপক্ষে ঐ লক্ষ্যাভিমুখী একটি ভ্রমণ মাত্র, —দেবতাকে জানিয়া দেবত্ব লাভ করা। যাহারা অজ্ঞেয়বাদী বা নিরীশ্বরবাদী, তাহাদের উদ্দেশ্যও ঐ একই—মানুষকে দেবতায় পরিণত করা।

এইভাবে বিশাল হিন্দুধর্মের একটি নিখুঁত পরিচয় দিয়া স্বামীজী বলেন, 'হিন্দুগণ তাহাদের (সর্বজনীন ধর্মের) পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে অকৃতকার্য হইয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু যে ধর্ম সকলের ধর্ম হইবে তাহাতে সকলের স্থান থাকিবে। অর্থাৎ, তাহা সকল ধর্মের সমষ্টিস্বরূপ হইবে এবং তাহার উপরও তাহার ভবিষ্যতে অনন্ত বিস্তারের সুযোগ থাকিবে। উহা সূর্যের ন্যায় পাপী, পুণ্যাত্মা ও সকল ধর্মের সকল লোকের উপর সমভাবে কিরণ বর্ষণ করিবে এবং উহার সকল শক্তির দ্বারা মানবজাতিকে তাহার প্রকৃত দেবস্বরূপ উপলব্ধি করিতে সাহায্য করিবে।'

৪।

ধর্মমহাসভা যাহাতে কোন বাদানুবাদের ক্ষেত্র না হইয়া সকল ধর্মেরই একটি প্রীতিপূর্ণ আলোচনাস্থল হয়, ইহাই উহার কর্মকর্তাদের অভিপ্রায় ছিল। তদনুসারে সভার দ্বিতীয় দিন হইতে দশম দিন (অর্থাৎ, ১২ই সেপ্টেম্বর হইতে ২০শে সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত শুধু ধর্মবিষয়ক আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট থাকে। এবং বাকী সাত দিন

ধর্মের সহিত সামাজিক সমস্যা সমূহের সম্পর্ক ও তৎসংক্রান্ত নানা বিষয়ের আলোচনার জন্য রাখা হয়। এই বিষয় সমূহের মধ্যে খ্রীষ্টান মিশনারীদের কর্মপদ্ধতিও একটি আলোচ্য বিষয় ছিল।

উক্ত ব্যবস্থানুসারে প্রথম দশ দিন হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান, ইহুদী, মুসলমান ইত্যাদি সকল ধর্মের প্রতিনিধিগণ তাহাদের নিজ নিজ ধর্ম ব্যাখ্যা ও পুনর্ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু যদিও পরধর্ম-সহিষ্ণুতাই সভার আদর্শ ছিল, তাহা হইলেও দেখা যায় সভার তৃতীয় দিন হইতেই কোন কোন খ্রীষ্টান প্রতিনিধি পাকেপ্রকারে হিন্দুধর্মের নিন্দা ও খ্রীষ্টান ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ফলে, সভায় বাহ্য ভদ্রতা সত্ত্বেও তিক্ততার একটা অন্তর্প্রবাহ চলিতে থাকে।

জানা যায়, সভার প্রথম সপ্তাহে ভারতীয় প্রতিনিধি মনিলাল দ্বিবেদী "হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় দর্শন" সম্বন্ধে এবং ধর্মপাল "বৌদ্ধধর্ম" সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহা অনেক খ্রীষ্টান মিশনারী প্রতিনিধির মোটেই প্রিয় হয় না। তাহা হইলেও দেখা যায়, উহাতে তাহারা ততটা বিচলিত হন না। কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম হইতেই সভার শ্রোতাগণের নিকট হইতে যে বিপুল সংবর্ধনা ও সমর্থন পাইতেছিলেন, তাহা তাহাদের এক গুরুতর চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। তাই, যেদিন বৈকালে স্বামীজী তাঁহার হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে রচনাটি পাঠ করিবেন বলিয়া নির্ধারিত ছিল, সেই দিন (১৯শে সেপ্টেম্বর) সকাল হইতে কতিপয় খ্রীষ্টান প্রতিনিধি হিন্দু-ধর্মকে খোলাভাবে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। ফলে, স্বামীজী (তাঁহার হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিবার পূর্বেই) উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের একটি তীব্র কশাঘাত করিতে বাধ্য হন। বলেন, "আমরা যারা পূর্বদেশ থেকে এসেছি, আমাদের দিনের পর দিন অনুগ্রহের ভাবে বলা হয়েছে আমাদের খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করা কর্তব্য। কারণ, খ্রীষ্টান জাতিসকল সর্বাপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধিশালী। আমরা লক্ষ্য করে দেখতে পাই, সর্বাপেক্ষা ধনী খ্রীষ্টান জাতি ইংলণ্ড পঁচিশ কোটি

এশিয়াবাসীর ঘাড়ে পা চেপে আছে। আমরা অতীত ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখি, খ্রীষ্টান ইউরোপের সমৃদ্ধি স্পেনকে দিয়ে আরম্ভ হয় এবং স্পেনের সমৃদ্ধি মেক্সিকো আক্রমণের সঙ্গে শুরু হয়। খ্রীষ্টানগণ ভ্রাতৃসম অপর মানুষের গলা কেটে সমৃদ্ধি অর্জন করেন। ঐ মূল্যে হিন্দুগণ কোন সমৃদ্ধিই চায় না।"

এই দিন বৈকালে স্বামীজীর হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে রচনা পাঠের সময় ধার্য থাকায়, সকাল হইতেই সভা লোকে ভরিয়া যায়। এবং বৈকালের অধিবেশন আরম্ভ হইবার এক ঘণ্টা পূর্বে কলম্বাস হলের সকলগুলি প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে প্রচণ্ড ভিড় হয় এবং অনেকে প্রবেশ করিতে না পারিয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। একটি স্থানীয় সংবাদপত্র এই দিনের ভিড় সম্বন্ধে এইরূপ লিখেন, "মহিলা, মহিলা, মহিলা—এরাই (হলের) সমস্ত স্থান, সমস্ত ফাঁক ভরিয়া ফেলেন এবং বিবেকানন্দের পূর্বে যতক্ষণ অন্যদের রচনা সকল পাঠ হয়, ততক্ষণ ধৈর্যের সহিত অপেক্ষা করিতে থাকেন। ইত্যাদি।"

স্বামীজীর এই দিনকার বক্তৃতাটি (হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে প্রবন্ধ) আমরা ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি। এই বক্তৃতাটি সম্বন্ধে ভগ্নী নিবেদিতা লিখিয়াছেন, "অন্য সব বক্তারা বিশেষ বিশেষ ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। কিন্তু স্বামীজী এমন একটি ধর্মের কথা বলেন যাহার দৃষ্টিতে ঐ সকল বিশেষ বিশেষ ধর্ম একই লক্ষ্যে পৌঁছিবার বিভিন্ন পথ মাত্র।" এই বিষয়ে বোষ্টনের একটি সংবাদপত্র (The Boston Evening Transcript) লিখেন, "ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দের বক্তৃতাটি আকাশের ন্যায় উদার এবং ভবিষ্যৎ সর্বজনীন ধর্ম হিসাবে উহার মধ্যে সকল ধর্মের উত্তমাংশ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।" এবং প্রকৃতপক্ষে গোঁড়া খৃষ্টান পাদরী ও মিশনারীগণ যুক্তির ভিত্তিতে আপত্তি করিতে পারেন এরূপ কোনও কিছুই উহার ভিতর ছিল না। কিন্তু তাহা হইলেও সভায় স্বামীজী যে সংবর্ধনা পাইলেন এবং নিরপেক্ষ খবরের কাগজ সকল তাঁহার প্রশংসায় যাহা লিখিলেন, তাহাই তাহাদের ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। তাই, তাহাদের কেহ কেহ

হিন্দুধর্মকে প্রচুর গালি দিলেন। এবং তাহাদের মোট কথা এই দাঁড়াইল যে, খ্রীষ্টানধর্ম জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং মাত্র এই ধর্মই মানুষকে পরিত্রাণ (salvation) দিতে সমর্থ। সম্ভবতঃ ইহাদের এই আক্রমণের ফলেই, স্বামীজী দশম দিন (২০শে সেপ্টেম্বর) বৈকালে "ধর্ম ভারতের কোন তীব্র প্রয়োজন নয়" শীর্ষক বক্তৃতাটি দেন। এই বক্তৃতায় তিনি অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন, "তোমরা খ্রীষ্টানগণ মূর্তি-উপাসকের আত্মাকে রক্ষা করবার জন্য খুবই আগ্রহশীল। কিন্তু তোমরা তাদের দেহগুলিকে অনাহারের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা কর না কেন? ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের সময় হাজার হাজার লোক না খেতে পেয়ে মারা গেছে, কিন্তু তোমরা তখন কিছুই কর নি।" জানা যায়, খ্রীষ্টান মিশনারীদের সম্পর্কে স্বামীজী ধর্মমহাসভার আরও কয়েকটি অধিবেশনে বক্তৃতা দিয়াছেন।[1]

এই বাদানুবাদ সম্বন্ধে আরও দুইটি কথা জানা আবশ্যক। প্রথম, মিশনারী বা পাদরীদের সকলেই যে স্বামীজীর বিপক্ষে ছিলেন তাহা নয়। বিশেষভাবে ক্যাথলিকগণ স্বামীজীর সমালোচনাগুলি খুব সাদরে গ্রহণ করেন এবং তাহাদের কয়েকজন তাঁহার সমর্থনে সভায় বেশ জোরের সহিত বক্তৃতাও দেন। দ্বিতীয়, যদিও স্বামীজী আবশ্যকবোধে মিশনারীদের কয়েকটি তীব্র কশাঘাত করেন, তাহা হইলেও তাঁহার চাইতে উঁহাদের অনেক বেশী আঘাত করেন অপর বিদেশী প্রতিনিধিগণ তাহাদের লিখিত বক্তৃতায়। চীন ও জাপানের প্রতিনিধিগণ বলেন, "যে সকল মিশনারী তাহাদের দেশে যায়,

১। সম্ভবতঃ ইহারই কোন একদিন নিম্নলিখিত ঘটনাটি ঘটে। উহা একখানি বিখ্যাত পুস্তকে (Historians' History of the World by The Times) এইভাবে লিখিত হইয়াছে: একজন বিখ্যাত হিন্দু চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় বিপুল শ্রোতাগণের সমক্ষে বক্তৃতা দানকালে হঠাৎ থামিয়া বলেন, "আপনাদের মধ্যে যারা হিন্দুদের ধর্মপুস্তক সকল পাঠ করেছেন তারা হাত তুলুন।" তখন মাত্র তিন-চারিখানা হাত উঠায়, তিনি সটান হইয়া দাঁড়াইয়া তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, "তবু আপনারা আমাদের বিচার করতে সাহস করেন!"

তাহারা অশিক্ষিত, উদ্ধত ও সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।" ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিনিধি নাগরকার সভার সপ্তম দিনেই বলেন, "তোমরা জান না তোমাদের টাকা যে কি ভাবে শুধু খ্রীষ্টান অহঙ্কার, ঔদ্ধত্য ও ধর্মান্ধতা বিস্তারের জন্য ব্যয় হয়।" ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখের বৈকালের অধিবশন "মিশনারীদের কর্মপদ্ধতির আলোচনা ও সমালোচনার" জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ছিল। দেখা যায়, এই দিন ভারতীয় প্রতিনিধি ধর্মপাল ও নরসিংহাচর্যই পূর্ব দেশীয় ধর্ম সকলের পক্ষ হইয়া মিশনারীদের সমালোচনা করেন। এবং এই অধিবেশনে স্বামীজী সভায় আদৌ উপস্থিত ছিলেন না। কারণ, (আমরা দেখিয়াছি) এই দিন সকালে ও বৈকালে তিনি সভার বিজ্ঞান-শাখায় দুইটি বক্তৃতা দিতে নিযুক্ত ছিলেন।

তাহা হইলেও দেখা যায়, স্বামীজীর উপরেই মিশনারীদের আক্রোশ সর্বাপেক্ষা অধিক থাকিয়া যায়। ইহার প্রধান হেতুগুলি এই। প্রথম, স্বামীজী তাঁহার "হিন্দুধর্ম" সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে বলেন ও প্রমাণ করেন যে, সৃষ্টি আদি ও অন্তহীন। দ্বিতীয়, তিনি তাঁহার ঐ প্রবন্ধেই আরও বলেন যে, মানুষকে পাপী বলা পাপ, মানুষ প্রকৃতপক্ষে অমৃতের পুত্র ও অমৃতস্বরূপ। তৃতীয়, তাঁহার এই প্রকারের খ্রীষ্টান বিশ্বাস-বিরুদ্ধ উক্তি সকল সভার শ্রোতাগণ বিপুল হর্ষধ্বনির সহিত অনুমোদন করেন। এবং প্রধানতঃ এই কারণগুলির জন্যই সভার শেষ দিন পর্যন্ত খ্রীষ্টান মিশনারীদের কণ্ঠে খ্রীষ্টধর্মের প্রশংসা ও অপর ধর্মসকলের এবং বিশেষভাবে হিন্দুধর্মের নিন্দায় কলম্বাস হল মুখরিত হইতে থাকে।

এই বিষয় সম্পর্কে স্বামীজীর চূড়ান্ত উত্তরের জন্য শেষের দিনের ঘটনাবলী বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই দিন সভার শেষ দিন বলিয়া কলম্বাস হল অসংখ্য আলোকে আলোকিত করা হয়। এবং ভিড় এমন হয় যে, হলের কোথাও আর তিল ধারণের জায়গা থাকে না।[১]

১। ডাঃ ব্যারোজ লিখিয়াছেন যে, এই দিন কলম্বাস হল ও তাহার পার্শ্ববর্তী কক্ষ ওয়াসিংটন হলে সাত হাজারের অধিক লোক সমবেত হয়।

যথাসময়ে মঞ্চের উপর সকল দেশের জাতীয় পতাকার তলে নানা রংএর পোশাক পরিহিত সকল ধর্মের প্রতিনিধিগণ আসিয়া উপবেশন করিলেন। সভার প্রথম দিন যেমন অভ্যর্থনার উত্তরে তাহাদের সংক্ষেপে কিছু বলিবার দিন ছিল, তেমনি এই শেষের দিনটিও ছিল তাহাদের অল্পের মধ্যে বিদায় সম্ভাষণ করিবার দিন। এই উপলক্ষ্যে অনেকে অনেক ভাল কথা বলিলেন। কিন্তু স্বামীজী যে বক্তৃতা দিলেন তাহা তুলনাহীন। এই দিনের কথায় দি ক্রিটিক পত্রিকার সংবাদদাতা লুসি মনরো লিখেন, "এই দিনের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতাসকলের অনেকগুলি বাগ্মিতাপূর্ণ হইলেও, ধর্মমহাসভার ভাব, সীমা ও সুন্দরতম প্রভাব হিন্দু সন্ন্যাসী যেরূপ উৎকৃষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন তেমন আর কেহ পারেন নাই।" বক্তৃতাটি এরূপ চমৎকার ও পরিপূর্ণ যে উহা সম্পূর্ণ পাঠ না করিলে উহার নিখুঁত উৎকর্ষতা ও অবিচ্ছেদ্য সৌন্দর্য হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। তথাপি আমরা উহার কয়েকটি উক্তি স্থানোপযোগী মনে করিয়া নিম্নে উল্লেখ করিলাম।

এই বক্তৃতায় স্বামীজী সভার মহান উদ্যোক্তা এবং উদার ও সহানুভূতিসম্পন্ন বক্তা ও শ্রোতাগণকে ধন্যবাদ জানাইয়া, বিসম্বাদ সৃষ্টিকারী ধর্মান্ধ (খ্রীষ্টান) প্রতিনিধিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, "তাদের আমি আমার বিশেষ ধন্যবাদ জানাই, কারণ তাদের বেসুরো কণ্ঠস্বর সভার সাধারণ ঐক্যতানকে মিষ্টতর করে তুলেছে।" "ধর্মের ঐক্য-সাধন বিষয়ে অনেকে অনেক কথা বলেছেন।......কিন্তু এখানে কেউ যদি এরূপ আশা পোষণ করে থাকেন যে, ঐ ঐক্য তার ধর্মের জয় ও অপর সকল ধর্মের ধ্বংসের দ্বারা সাধিত হবে, তা হলে তাকে আমি বলি, 'ভাই, তোমার আশা একটা অসম্ভব আশা মাত্র'।" "বীজ ভূমিতে ফেলা হয়, আর তার চারপাশে মাটি, বাতাস ও জল রাখা হয়। কিন্তু বীজটি কি মাটি, বাতাস বা জল হয়? না। সে একটা উদ্ভিদে পরিণত হয়, তার নিজ বৃদ্ধির নিয়মানুসারে বাড়ে এবং বাতাস, মাটি ও জলকে আত্মস্থ করে

উদ্ভিদ বস্তুতে রূপান্তরিত করে ও উদ্ভিদরূপেই বেড়ে ওঠে।" "ধর্মজগতেও এই নিয়মই কার্যকরী। খ্রীষ্টান হিন্দু বা বৌদ্ধ হবে না এবং হিন্দু বা বৌদ্ধও খ্রীষ্টান হবে না। তবে প্রত্যেকেই অপর সকলের ভাব গ্রহণ করবে, অথচ নিজ (বৈশিষ্ট্যপূর্ণ) ব্যক্তিত্ব রক্ষা করে আপন বৃদ্ধির নিয়মানুসারে বাড়তে থাকবে।"

৫।

নিতান্ত অপ্রস্তুত অবস্থায় ও একেবারে শেষ মুহূর্তে স্বামীজী ধর্মমহাসভায় যোগ দিতে পারিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, মূল সভা ও তাহার বিজ্ঞানশাখায় প্রায় প্রত্যেক দিন তাঁহার একটি না একটি এবং কোন কোন দিন একাধিক বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল। তাই, সভার কয়দিন তাঁহার প্রচুর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে এবং অবসর তিনি খুব কমই পাইয়াছেন।

আবার সারাদিন ধরিয়া বক্তৃতা শোনা, বক্তৃতা দেওয়া ও নানা আলোচনার পরেও যে তাঁহার বিশ্রাম মিলিয়াছে তাহা নয়। চিকাগোর প্রধান প্রধান অধিবাসীগণ সভার সান্ধ্য অধিবেশনের পরে সমস্ত প্রতিনিধিগণকে প্রায়ই বিরাট বিরাট অভ্যর্থনার আসরে আমন্ত্রণ করিয়া আপ্যায়িত করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত, অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট সম্মিলনের অভ্যর্থনা সভার কয়দিন রোজই চলিয়াছে। এবং এই সকল অভ্যর্থনার আসরেও স্বামীজী অনুরুদ্ধ হইয়া কখন কখন বক্তৃতা দিয়াছেন। আর ঐ সঙ্গে দেখা যায়, মহাসভার অধিবেশনকালে তিনি অন্ততঃ একদিন সকালেও (২৫শে সেপ্টেম্বর) সভার বাহিরে চিকাগোর তৃতীয় ইউনিটেরিয়ান চার্চে "ঈশ্বর-প্রেম" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিয়াছেন।

এইভাবে সভার দিনগুলি তাঁহার বিপুল খাটুনির মধ্য দিয়া যায়। এবং অনিবার্যভাবে তাহার ফলও ফলিল। ধর্মমহাসভায় তিনি যে অপূর্ব বক্তৃতা সকল দিলেন, তাহার জন্য তাঁহার নাম ও প্রশংসা সর্বত্র ধ্বনিত হইতে লাগিল। তাঁহার বাস্তব দেহ-প্রমাণ ছবিসকল

চিকাগো শহরের রাস্তায় রাস্তায় রক্ষিত হইল এবং ছবির নীচে লেখা হইল "The Monk Vivekananda" (সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ)। পথচারী ব্যক্তিগণ স্বামীজীর ঐ সকল ছবির নিকটে আসিয়া মাথা নত করিয়া তাহাদের অন্তরের অভিনন্দন জানাইতে লাগিলেন। অন্যদিকে, আমেরিকার সংবাদপত্রসমূহ যেন সমস্বরে তাঁহার উচ্চ প্রশংসায় রত হইল। ঐ সকল প্রশংসাবাণী ও অনেক সমসাময়িক প্রখ্যাত লোকের বর্ণনাদি হইতে স্বামীজী ও তাঁহার কার্যাবলী সম্বন্ধে নানা সংবাদ পাওয়া যায়। নমুনাস্বরূপ আমরা নিম্নে উহার সামান্য কিছু উদ্ধৃত করিলাম।

নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড লিখেন—"তিনি (স্বামী বিবেকানন্দ) নিঃসন্দেহে ধর্মমহাসভার শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া আমরা বুঝিতে পারি এই পণ্ডিত জাতির নিকট মিশনারী পাঠানো কি বোকামী।"

দি প্রেস অব আমেরিকা লিখেন—'স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার বক্তৃতার দ্বারা বিরাট সভাকে যেন সম্মোহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আধুনিক সমস্ত খ্রীষ্টান চার্চের প্রতিনিধিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের বাগ্মিতার বাত্যাতরঙ্গে তাহাদের বক্তব্য সকল ভাসিয়া গিয়াছিল।'

দি ক্রিটিক লিখেন—"তিনি (স্বামী বিবেকানন্দ) ঐশ্বরিক অধিকারে বাগ্মী। এবং তাঁহার বুদ্ধিদীপ্ত মুখমণ্ডল তাঁহার গভীর, উদাত্ত ও ছন্দময় বাক্যাবলী অপেক্ষা কম আকর্ষণীয় ছিল না।"

দি বোষ্টন ইভনিং ট্রান্সক্রিপ্টে লিখিত হয়—"তাঁহার গরিমাময় ভাবরাশি ও চেহারার জন্য তিনি ধর্মমহাসভার অতীব প্রিয়। তিনি যদি মঞ্চের উপর দিয়া শুধু একবার হাঁটিয়াও যান, তাহা হইলেও তাঁহার সম্মানে সভায় বিপুল হর্ষধ্বনি উত্থিত হইতে থাকে।"

ধর্মমহাসভার বিজ্ঞানশাখার সভাপতি মিঃ স্নেল (The Hon'ble Mr. Merwin-Marie Snell) পরে তাঁহার একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "ধর্মমহাসভা এবং আমেরিকার জনসাধারণের উপর

হিন্দুধর্ম যে গভীর প্রভাব অঙ্কিত করিয়াছিল তাহা আর কোন ধর্ম-সম্প্রদায়ই করিতে পারে নাই। হিন্দুধর্মের খাঁটি ও সর্বপ্রধান প্রতিনিধি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং তিনি অবিসংবাদিতরূপে ধর্মমহাসভায় সর্বাপেক্ষা প্রিয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। মহাসভায় ও (আমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত) উহার বিজ্ঞানশাখার সভায় তিনি ঘন ঘন বক্তৃতা দিয়াছেন এবং সকল সময়েই তিনি খ্রীষ্টান-অখ্রীষ্টান যে কোন বক্তার চাইতে অনেক বেশী উৎসাহের সহিত সমাদৃত হইয়াছেন। তিনি যেখানে যাইতেন লোকে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইত ও আগ্রহের সহিত তাঁহার প্রতিটি কথা শুনিত।......অত্যন্ত গোঁড়া খ্রীষ্টানগণও বলেন—'মনুষ্যকুলে তিনি সত্যই একজন রাজা'।"

ধর্মমহাসভার সাধারণ কমিটির চেয়ারম্যান ডাঃ ব্যারোজ বলেন, "স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার শ্রোতাগণের উপর এক বিস্ময়কর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।"

আমেরিকার প্রসিদ্ধ কবি মিস্ হ্যারিয়েট মনরো ধর্মমহাসভায় উপস্থিত ছিলেন। তৎসম্বন্ধে তিনি পরে তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, "সভার মঞ্চের উপর বহু দেশের বহু প্রতিনিধি বসিয়া ছিলেন এবং তন্মধ্যে বোম্বাই হইতে আগত কমলা রং'এর পোশাক পরিহিত একজন সন্ন্যাসীও ছিলেন।

"এই শেষোক্ত ব্যক্তিই—মহা গরিমাময় স্বামী বিবেকানন্দ—সমস্ত অনুষ্ঠানটি আত্মসাৎ করেন ও সমগ্র (চিকাগো) শহরটি দখল করিয়া বসেন। অপর বিদেশী প্রতিনিধিগণ ভালই বলিলেন। কিন্তু কমলা রং'এর পোশাক পরিহিত সুদর্শন সন্ন্যাসী বিশুদ্ধ ইংরেজিতে আমাদের একটি চরম উৎকর্ষতাপূর্ণ বক্তৃতা শুনাইলেন। তাঁহার প্রভাব ও আকর্ষণপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, তাঁহার ব্রঞ্জ-ঘণ্টার ন্যায় গভীর ও উদাত্ত কণ্ঠস্বর, তাঁহার ভাবরাশির সংযত প্রখরতা, পাশ্চাত্য জগতের নিকট তাঁহার বাণীর সৌন্দর্য—এ সবই মিলিত হইয়া আমাদের একটি ক্বচিৎ লব্ধ চরম অনুভূতির ক্ষণ আনিয়া দিয়াছিল। ইহা মনুষ্য-বাগ্মিতার উচ্চতম বিকাশ।"

ডাঃ এনি বেসাণ্ট ভারতবর্ষ হইতে থিওসফির প্রতিনিধি হইয়া ধর্মমহাসভায় যোগ দিয়াছিলেন। অনেক পরে তিনি ঐ সভায় স্বামীজী সম্বন্ধে তাহার ধারণা এইভাবে লিপিবদ্ধ করেন :

"একটি দৃষ্টি আকর্ষণকারী মূর্তি, হলুদ ও কমলা রং'এর পোষাক পরিহিত, ভারতের সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান, সিংহের ন্যায় মস্তক, সুতীক্ষ্ণ চক্ষুদ্বয়, দ্রুত নড়াচড়া—প্রতিনিধিদের ব্যবহারের জন্য (পার্শ্বের) একটি ঘরে স্বামী বিবেকানন্দকে দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে ইহাই আমার প্রথম ধারণা হয়। লোকে তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলিত, কিন্তু বাস্তবিক তিনি ছিলেন যোদ্ধা-সন্ন্যাসী – স্বজাতি ও স্বদেশের গর্বে গর্বিত। তিনি (জগতের) প্রাচীনতম ধর্মের প্রতিনিধি ছিলেন এবং তাঁহার চতুষ্পার্শে ছিল কৌতূহলী খ্রীষ্টান দর্শকগণ, যাহারা তাঁহাকে পথ দিতে আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু ভারতের এই প্রতিনিধি ও সন্তান উদ্ধত পাশ্চাত্যের সম্মুখে ভারতের মুখ রক্ষা করিতে সক্ষম ছিলেন। ...উদ্দেশ্যযুক্ত, তেজস্বী ও বলবান, তিনি ছিলেন একজন আত্মপক্ষ সংরক্ষণে সমর্থ মানুষের মধ্যে মানুষ।

"মঞ্চের উপর তাঁহার আর একটা দিক দেখা যাইত। তাঁহার দেহমনের গর্ব-গরিমা এবং ক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাসের সহজাত অনুভূতি তখনও থাকিত, কিন্তু তাহা সবই তখন তাঁহার আধ্যাত্মিক বাণীর অপূর্ব সৌন্দর্যের বশীভূত হইয়া রহিত।...(তাঁহার বক্তৃতাকালে) আনন্দে উল্লসিত বিশাল জনসমষ্টি উদ্‌গ্রীব হইয়া তাঁহার কথা শুনিত—এমনিভাবে যাহাতে (তাঁহার মুখের) একটি শব্দাংশ বা স্বরলহরীও না হারায়। ঐ বিরাট হল হইতে বাহির হইবার সময় (একদিন) একজন মন্তব্য করেন, "এই লোকটি মূর্তিপূজক! আর আমরা ওদের নিকট মিশনারী পাঠাই! বরং ওঁরা আমাদের নিকট মিশনারী পাঠান ইহাই অধিক বাঞ্ছনীয়!"

আর উদ্ধৃতি দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর যোগদান যে পরিপূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল তাহা সকল দিক দিয়াই সুস্পষ্ট। এবং তাঁহার প্রথম বক্তৃতার পর হইতেই তাঁহার

খ্যাতি যেমন দেশ-দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তেমনি চিকাগো শহরেও তাঁহার সম্মান ও সমাদরের আর কোন সীমা ছিল না। এবং দেখা যায় ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর তারিখের এক পত্রে তিনি এই বিষয়ে লিখেন, "আমার আর অভাব নাই। চিকাগো শহরের অনেক উৎকৃষ্টতম বাড়ীর দ্বার (এখন) আমার নিকট উন্মুক্ত। এবং বর্তমানে আমি কাহারও না কাহারও বাড়ীতে অতিথিরূপে বাস করিতেছি।"

কিন্তু তাঁহার এই সহজ ও সম্মানের জীবন একেবারে নিরুপদ্রব ছিল না। ধর্মমহাসভায় তাঁহার অসাধারণ সাফল্যে কতকগুলি গোঁড়া খ্রীষ্টান পাদরী ও মিশনারীদের মনে দারুণ ঈর্ষার আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। এবং তাহারা তাঁহার মিথ্যা নিন্দা ও কুৎসা রটনা করিয়া তাঁহাকে আমেরিকা ও ভারতে ধূলিসাৎ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। তাহাদের এই প্রচেষ্টা ক্রমে অতি গুরুতর আকার ধারণ করে এবং অনেক দিন ধরিয়া চলিতে থাকে। তাহা হইলেও স্বামীজী একাই ছিলেন লক্ষ লোকের সমান। দমেন নাই, টলেন নাই এবং একাকী মহাবীর্যের সহিত একদিকে যেমন উহা উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি প্রয়োজন বোধ করিলেই উহার উপর সুতীক্ষ্ণ কশাঘাত করিয়াছেন ও বিজয়ী বীরের ন্যায় আমেরিকায় সর্বত্র সদর্পে ঘোরা-ফেরা করিয়াছেন। তবে এই বিষয়টি আমরা এখানে আর অধিক লক্ষ্য না করিয়া পরের একটি অধ্যায়ে সমগ্রভাবে আলোচনা করিব।

চব্বিশ

ধর্মমহাসভার পরের ঘটনাবলী ঃ চিকাগো ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানে

(১৮৯৩, অক্টোবর-নভেম্বর)

আমরা দেখিয়াছি ধর্মমহাসভায় কৃতকার্যতার ফলস্বরূপ স্বামীজী চিকাগোর উচ্চ-সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হইতে থাকেন এবং তখন নিমন্ত্রণের প্রাচুর্যে তিনি সেখানে সর্বদাই কাহারও না কাহারও বাড়িতে অতিথিরূপে বাস করিতেন। এইভাবে তিনি (২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে ধর্মমহাসভার অধিবেশন শেষ হইবার পর) প্রায় দুই মাস কাল চিকাগো শহরে অবস্থান করেন। এবং দেখা যায় তখন তিনি চিকাগো ও তাহার চতুষ্পার্শস্থ শহরগুলিতে বক্তৃতা দিতে রত হন। উদ্দেশ্য—তাঁহার ভারতের কাজের জন্য অর্থসংগ্রহ।

এই সম্পর্কে স্বামীজী ২রা অক্টোবর তারিখে চিকাগো হইতে ডাঃ রাইটের নিকট এক পত্রে লিখেন, "আমি আগামী কাল (বক্তৃতা দিবার জন্য) ইভানষ্টনে যাইতেছি।"[১] এবং ১০ই অক্টোবর তারিখে তিনি মিসেস ট্যানাট উড্‌সের নিকট লিখেন, "উপস্থিত আমি চিকাগো ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছি এবং প্রত্যেক বক্তৃতায় ৩০ হইতে ৮০ ডলার পাইতেছি। গতকাল আমি (চিকাগো হইতে ৯০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত) ষ্ট্রিটর হইতে ফিরিয়াছি। সেখানে একটি বক্তৃতা দিয়া আমি ৮৭ ডলার পাইয়াছি।

১। ইভানষ্টন শহর চিকাগোর উত্তরে অবস্থিত। এখানে স্বামীজী তিনটি বক্তৃতা দেন। প্রথমটি দেন ৩০শে সেপ্টেম্বর (বিষয়—হিন্দুধর্মে পরার্থবাদ), দ্বিতীয়টি দিবার তারিখ ৩রা অক্টোবর (বিষয়—অদ্বৈতবাদ) এবং তৃতীয় বক্তৃতাটি তিনি দেন ৫ই অক্টোবর (বিষয়—পুনর্জন্মবাদ)। এই বক্তৃতা তিনটিতে ধার্য প্রবেশ মূল্য ছিল—প্রতি বক্তৃতায় ৩০ সেন্ট এবং একত্রে তিনটি বক্তৃতায় ১ ডলার।

এই সপ্তাহে আমার প্রতিদিনই বক্তৃতা দিতে হইবে।" পরে ২৬শে অক্টোবর তারিখে তিনি ডাঃ রাইটের নিকট পুনরায় লিখেন, "আপনি জানিয়া সুখী হইবেন, আমি (বক্তৃতা দিয়া) অর্থ রোজগার বিষয়ে ভালই করিতেছি। অবশ্য এ ব্যবসায়ে আমি একেবারেই কাঁচা, তাহা হইলেও শীঘ্রই শিখিয়া লইতে পারিব আশা করি। চিকাগোতে আমি খুবই জনপ্রিয়,[১] তাই এখানে কিছুদিন থাকিয়া অর্থ রোজগার করিতে চাই।"

তবে দেখা যায়, যদিও তাঁহার আমেরিকা আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতের কাজের জন্য অর্থসংগ্রহ করা, তথাপি তিনি প্রায় প্রথম হইতেই ঐ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতাদিতে কিছু বলা বন্ধ করেন। তাহার হেতু সম্বন্ধে তিনি তাঁহার পূর্বোক্ত ২৬শে অক্টোবরের পত্রে ডাঃ রাইটের নিকট লিখেন, "বিদেশ হইতে যাহাদের (ধর্মমহাসভায়) আমন্ত্রণ করিয়া আনা হইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ পরিকল্পনা আছে এবং আমেরিকাই একমাত্র দেশ যেখানে সব কিছুরই সফলতা লাভের একটা সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমি অন্যভাবে অগ্রসর হওয়া শ্রেয় মনে করিয়াছি।······আমি আমার পরিকল্পনার জন্যই আন্তরিকভাবে খাটিব, শুধু উহার কথা পিছনে রাখিয়া সাধারণ বক্তার ন্যায় কাজ করিয়া যাইব।"

ইহা ব্যতীত, এইভাবে ভারতের কল্যাণ সাধনের জন্য অর্থ রোজগারে রত হইলেও, স্বামীজীর এই সময়ের সাধারণ মানসিক অবস্থাটি ছিল ভগবানের উপর অবিচল নির্ভরতাপূর্ণ। তিনি (তাঁহার পূর্বোক্ত ২রা অক্টোবর তারিখের পত্রে) ডাঃ রাইটের নিকট লিখেন, "কেহ না কেহ আমাকে আশ্রয় ও খাদ্য দিতেছেন, কেহ না কেহ আসিয়া আমাকে বলিতেছেন, ভগবানের সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইবে। আমি জানি তিনিই তাহাদের পাঠাইতেছেন এবং আমার কাজ শুধু

১। স্বামীজীর এই জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে ইভানষ্টনের একটি সংবাদপত্র (Evanston Index, 7th October) লিখেন, "চিকাগোতে তিনি অবিশ্রান্তভাবে সংবর্ধনা লাভ করিতেছেন।"

তাঁহার আদেশ পালন করা। অর্থাৎ, তিনিই আমার সব কিছু যোগাইতেছেন এবং তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে।

" 'যে আমার উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করে, তার যা কিছু প্রয়োজন তা আমিই তার নিকট বয়ে নিয়ে যাই' (গীতা)। এবং ইহা এশিয়া, ইউরোপ, ও আমেরিকায় সমভাবে সত্য। তাই, ভারতের মরুভূমির মধ্যে যেমন, এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের খরস্রোতের মধ্যেও তেমনি, কারণ তিনি কি এখানেও নাই? এবং (এখানে) আমার যাহা প্রয়োজন, তাহা যদি তিনি না যোগান তাহা হইলে আমি ধরিয়া লইব, তিনি চান আমি এই তিন মিনিটের মাটির দেহটা পরিত্যাগ করি এবং আশা করি আমি তাহা খুশী মনেই করিতে পারিব।"

পরে (পূর্ব কথিত ২৬শে অক্টোবর তারিখের পত্রে) তিনি ডাঃ রাইটকে পুনরায় লিখেন, "যিনি আমাকে এখানে আনিয়াছেন ও এখনও পরিত্যাগ করেন নাই, তিনি যতদিন আমি এখানে আছি আমাকে কখন পরিত্যাগ করিবেন না।"

ইহা ছাড়া আরও জানা যায়, এইকালে একদিন জ্যোৎস্না রাত্রিতে মিসিগান হ্রদের তীরে স্বামীজীর মন ব্রহ্মে লীন হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই তিনি দেখিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার সম্মুখে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্মরণ হইল তিনি কি কাজের জন্য এই পৃথিবীতে আসিয়াছেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার মন নামিয়া আসিয়া তাঁহার বিধি-নির্দিষ্ট কার্য সাধনে আগ্রহান্বিত হইল।[১]

যাহা হউক, দেখা যায় ধর্মমহাসভার পরে স্বামীজী যে দুই মাস চিকাগোতে ছিলেন, তখন তিনি যে উক্তরূপে শুধু বক্তৃতাই দিয়াছেন

১। এই আগ্রহ স্বামীজীর মনে সময়ে সময়ে কি প্রবলভাবে দেখা দিত তাহা তাঁহার নিম্ন-লিখিত উক্তিটি হইতে সুস্পষ্ট হয়: "আমার এক এক সময়ে সাধ হয়, আমি জীর্ণ বাস পরিয়া ও ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করিয়া (মানবরূপী) ভগবানকে সেবা করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ বৎসরের একটি জীবন পাই।" (ডাঃ রাইটের নিকট লিখিত পূর্বোক্ত ২রা অক্টোবর তারিখের পত্র)।

তাহা নয়। তিনি ঐ সময়ে আমেরিকার শিক্ষা, সভ্যতা ও ঐহিক উন্নতি বিষয়ক বহু সংবাদ সংগ্রহ করিতেও নিযুক্ত হইয়াছেন। উদ্দেশ্য, তিনি উহা পরে যথাসময়ে ও আবশ্যকানুসারে ভারতের উন্নতিকল্পে কাজে লাগাইবেন। চিকাগো শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি সকল বিষয়েই পাশ্চাত্য জগতের প্রতিচ্ছবিস্বরূপ থাকায় স্বামীজীর ঐ সংবাদ সকল সংগ্রহে বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

উপরি-প্রদত্ত তথ্যগুলি ব্যতীত, এইকালের আরও কয়েকটি সংবাদ (দি ক্রিটিক পত্রিকার সংবাদ-দাতা) লুসি মনরোর ১১ই নভেম্বর তারিখের রিপোর্টে পাওয়া যায়। উহাতে অন্যান্য কথার মধ্যে তিনি লিখিয়াছেন, "ধর্মমহাসভার অধিবেশনের ফলেই আমরা বুঝিতে পারি যে প্রাচীন মত-বিশ্বাসের দর্শনশাস্ত্রসমূহ আধুনিক কালের লোকদের পক্ষেও প্রচুর সৌন্দর্যপূর্ণ। এবং ইহা বুঝিতে পারিয়াই আমরা ঐ বিষয়ে আরও জানিতে কৌতূহলী হই। এবং স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাবলী হইতেই আমরা তাহা বিশেষভাবে জানিতে পারিয়াছি। তিনি এখনও চিকাগো শহরেই আছেন।......তাঁহার সংস্কৃতি, বাগ্মিতা ও ব্যক্তিত্ব হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আমাদের একটি সম্পূর্ণ নূতন ধারণা দিয়াছে।...সাহিত্য ক্লাব সকল ও গির্জাগুলিতে তিনি যে সমস্ত বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহার ফলে বুদ্ধের জীবন এবং তাঁহার নিজ ধর্মবিশ্বাস সমূহ আমাদের নিকট সুপরিচিত হইয়াছে। তিনি কোন লিখিত নোটের সাহায্য না লইয়া বক্তৃতা দেন, তাঁহার বক্তব্য বিষয় ও সিদ্ধান্ত সকল অপূর্ব দক্ষতা ও দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত উপস্থিত করেন এবং সময়ে সময়ে অতি উচ্চ, প্রেরণাময় বাগ্মিতাশিখরে আরোহণ করেন।"

চিকাগো শহরে অবস্থানকালে স্বামীজী কোথায় কোথায় বাস করিয়াছেন, তাহা জানিতে কৌতুহল জাগে। তাই, ঐ সম্বন্ধে যে সংবাদ পাওয়া যায়, তাহা গুছাইয়া নিম্নে দেওয়া হইল।

গত অধ্যায়ের পূর্ব অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি স্বামীজী ধর্মমহা-

সভার প্রতিনিধিরূপে গৃহীত হইয়া পূর্বদেশীয় অপর প্রতিনিধিদের সহিত একই বাড়ীতে থাকিবার স্থান পান। কিন্তু বাস্তবিক ধর্মমহাসভার অধিবেশনের সময় তিনি (ঊর্ধ্বপক্ষে দুই-এক দিন ব্যতীত) যে সেখানে ছিলেন তাহা মনে করা যায় না। ইহা মিস কর্ণেলিয়া কংগারের ১৯৫৬ সনে প্রকাশিত একটি বর্ণনা হইতে বোঝা যায়। বর্ণনাটি দীর্ঘ এবং উহা অংশতঃ এইরূপ ঃ

"আমার মাতামহ মিঃ লায়ন (Mr. John B. Lyon) দর্শন-চর্চা ভালবাসিতেন, কিন্তু ধর্মান্ধ গোঁড়াদের অত্যন্ত অপছন্দ করিতেন। তাই, (অন্য অনেকের ন্যায়) আমার মাতামহী (Mrs. Lyon) তাঁহার স্বামীর হইয়া একজন উদারমনা প্রতিনিধিকে অতিথিরূপে রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ধর্মমহাসভার কর্তৃপক্ষের নিকট একখানা চিঠি দেন। তদনুসারে একদিন দুপুররাত্রে স্বামীজীকে তাঁহাদের বাড়ীতে পাঠানো হয়। স্বামীজীর সহিত আলাপ করিয়া আমার মাতামহ বিশেষ মুগ্ধ হন এবং সানন্দে তাঁহাকে নিজ বাটীতে রাখেন। স্বামীজীও আমার মাতামহের সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা করেন এবং এক দিন (চিকাগো ক্লাবে) তাঁহার বন্ধুগণের সমক্ষে বলেন, 'আমি যত লোক দেখেছি তার মধ্যে মিঃ লায়ন সর্বাপেক্ষা অধিক খ্রীষ্ট-সদৃশ।'

"তবে আমার মাতামহীই ছিলেন স্বামীজীর বিশেষ প্রিয়, কারণ তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার নিজের মায়ের কথা মনে পড়িত। আমার মাতামহীও তাঁহাকে খুব যত্ন ও স্নেহ করিতেন।

"ঐ সময়ে আমি ও আমার বিধবা মা আমার মাতামহের বাড়ীতেই থাকিতাম। আমার বয়স তখন মাত্র ছয় বৎসর এবং আমি অনেক সময়ে স্বামীজীর কোলে উঠিয়া তাঁহার নিকট ভারতবর্ষের নানা গল্প শুনিতাম। আমার বিধবা মাকে (মিসেস কংগার)[১] তিনি নানাভাবে সাহায্য করেন। আমার মা পরে স্বামীজীর বই পড়িতেন ও তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন।

১। মিসেস কংগারের নাম স্বামীজীর কয়েকখানি পত্রে উল্লিখিত দেখা যায়।

"(ধর্মমহাসভার পরে) স্বামীজী বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলে, লোকে তাঁহাকে তাঁহার ভারতের কাজের সাহায্যার্থে টাকা দিত এবং তিনি তাহা একখানি রুমালে বাঁধিয়া আনিয়া আমার মাতামহীর কোলের উপর ঢালিয়া দিতেন। আমার মাতামহী প্রত্যেক-বারই স্বামীজীকে দিয়া ঐ টাকা গনাইয়া ও পরিমাণ লিখাইয়া, তারপর তাহা ব্যাঙ্কে পাঠাইতেন। স্বামীজী তাঁহার শ্রোতাদের দানশীলতা দেখিয়া অভিভূত হন। তদ্ব্যতীত, আমার মাতামহীকে একদিন বলেন, তিনি আমেরিকানদের গঠন-শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন এবং পাশ্চাত্য জগতের ভাল জিনিসগুলি কিভাবে ভারতবর্ষের উপযোগী করিয়া লওয়া যায় তাহা তাঁহার গভীর চিন্তার বিষয় হইয়াছে। ইত্যাদি।"

এই বর্ণনাটি হইতে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, ধর্মমহাসভার অধিবেশনকালে স্বামীজী মিঃ লায়নের বাড়ীতে থাকিতেন এবং ফলে ঐ পরিবারের সহিত তাঁহার বিশেষ হৃদ্যতা জন্মে। তবে এই সঙ্গে আরও দেখা যায়, স্বামীজী তাঁহার ২রা অক্টোবর (১৮৯৩) তারিখের পত্রে ডাঃ রাইটকে লিখেন, "আমি এখন নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। যখন চিকাগো আসি, আমি সর্বদাই মিঃ ও মিসেস্ লায়নকে দেখিতে যাই। তাঁহারা একটি মহত্তম দম্পতি। আপনি যদি আমার নিকট পত্র লিখেন, তবে তাহাদের বাড়ীর ঠিকানায় লিখিবেন (C/O. Mr John B. Lyon, 262, Michigan Avenue, Chicago)।" সুতরাং ইহাও সুস্পষ্ট যে, ধর্মমহাসভার অধিবেশন শেষ হইলে তিনি আর মিঃ লায়নের বাড়ীতে থাকিতেন না, তবে প্রায় প্রতিদিনই তাঁহার বাড়ীতে যাইতেন এবং সম্ভবতঃ তখন তাঁহার অর্জিত অর্থ মিসেস লায়নের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া আসিতেন।

তাই, প্রশ্ন জাগে তিনি চিকাগোতে এই সময়ে মিঃ লায়নের বাড়ীতে না থাকিলে, কাহার বাড়ীতে থাকিতেন? এই প্রশ্নটিরই কোন উত্তর পাওয়া যায় না। তবে ইহা অনুমান হয় যে, তিনি তাঁহার উক্ত (২রা অক্টোবর তারিখের) পত্র লিখিবার কালে যেখানে

থাকিতেন, সেখানে তিনি অস্থায়ীভাবে অতি অল্প কয়েক দিনের জন্যই ছিলেন। অন্যথায়, তিনি ডাঃ রাইটকে মিঃ লায়নের ঠিকানায় পত্র লিখিতে উপদেশ দিতেন না।

তবে ইহার পরেই বা তিনি কাহার কাহার বাড়ীতে ছিলেন? তাহারও কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। আমরা শুধু ইহাই জানি (ইহা আমরা দেখিয়া আসিয়াছি) যে তিনি ধর্মমহাসভার পর প্রায় দুইমাস কাল চিকাগোতে নানা লোকের বাড়ীতে অতিথিরূপে বাস করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা কাহারা তাহার কোনও খবর নাই। শুধু সর্বশেষের একটি নাম বা একটি সমগ্র পরিবার একটা উজ্জ্বল, আলোকময় চিত্রের ন্যায় আমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে ও আমাদের সমস্ত হারানো নামের ক্ষোভ নিমেষে মিটাইয়া দেয়। এই মহিমময় পরিবারটি হইতেছে হেলদের পরিবার (Hale Family)।

এই হেল পরিবারের সহিত আমাদের পূর্বে একবার সাক্ষাৎ হইয়াছে। ধর্মমহাসভার অধিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্বদিন (১০ই সেপ্টেম্বর) সকালে স্বামীজী যখন ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত ও দিশেহারা হইয়া ইহাদের বাড়ীর সম্মুখে রাস্তার উপরে বসিয়া পড়িয়াছিলেন, তখন এই পরিবারের স্নেহময়ী গৃহকর্ত্রী মিসেস্ জর্জ ডব্লিউ হেল জানালার ভিতর দিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া নীচে আসিয়া তাঁহাকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া যান। এবং তাঁহাকে খাওয়াইয়া ও বিশ্রাম করাইয়া নিজে সঙ্গে করিয়া ধর্মমহাসভার অফিসে পৌঁছাইয়া দেন ও সেখানকার আবশ্যকীয় সকল বিষয়ে সাহায্য করেন।

তবে স্বামীজীর সেবা ও সাহায্যে তাঁহার অবদান শুধু ইহাতেই সীমাবদ্ধ নয়। ধর্মমহাসভার অধিবেশনকালে স্বামীজীর নাম-যশ যখন চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল, তখন বা তাহার পরেও কিছুকাল তাঁহার সহিত যে মিসেস্ হেল বা তাঁহার পরিবারের কাহারও কোনও আদান-প্রদান হইয়াছে তাহা জানা যায় না। কিন্তু ইহা সুস্পষ্টভাবে জানা ও বোঝা যায় যে, স্বামীজীর চিকাগো অবস্থানের শেষের দিকে তিনি (আমন্ত্রিত হইয়া) পুনরায় হেল পরিবারের

অতিথি হন এবং তারপর তাঁহারা তাঁহাকে আর ছাড়েন না। এবং তিনিও সানন্দে তাঁহাদের পরিবারভুক্ত হইয়া তাঁহাদের বাড়ীকেই তাঁহার আমেরিকার 'হোম' (বাড়ী) মনে করিতেন ও অপরের নিকটও সময়ে সময়ে ঐ নামে ঐ বাড়ীর কথা উল্লেখ করিতেন। আর তদনুসারে দেখাও যায়, আমেরিকার মধ্য-পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে বক্তৃতা দানকালে তিনি এই পুণ্যময় হেল-গৃহকেই তাঁহার ভ্রমণ-কেন্দ্র বা হেড কোয়ার্টার্স করিয়াছিলেন। এবং পরে আমেরিকার পূর্বাংশে ভ্রমণকালেও তিনি মাঝে মাঝে এই বাড়ীতে আসিয়াই বিশ্রাম লইয়াছেন ও ক্লান্ত শরীর মনকে সুস্থ করিয়াছেন। বাড়ীটির ঠিকানা—৫৪১, ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ, চিকাগো।

হেল পরিবারের সহিত স্বামীজীর আত্মীয়তা যে কি গভীর ও অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা ভাবিলে আমাদের মন বিস্ময় ও পুলকে ভরিয়া উঠে। স্বামীজী মিঃ হেলকে ফাদার পোপ (Father Pope) এবং মিসেস হেলকে মাদার চার্চ (Mother Church) বলিয়া সম্বোধন করিতেন। মিসেস হেল তাঁহাকে নিজ সন্তানের ন্যায় দেখিতেন এবং (ঠিক মায়ের ন্যায়ই) তাঁহার সকল ভালমন্দে নিজেকে সর্বদাই জড়িত মনে করিতেন ; আর যখনই আবশ্যকবোধ করিয়াছেন তাঁহাকে সাহায্য করিতে বা উপদেশ দিতে অগ্রসর হইয়াছেন।

মিঃ ও মিসেস হেলের একমাত্র পুত্র চাকরি করিতেন ও অন্যত্র থাকিতেন। তবে তাঁহাদের দুইটি কন্যা ও দুইটি ভাগ্নী তাঁহাদের সঙ্গে থাকিত। কন্যা দুইটির নাম মেরী হেল ও হ্যারিয়েট হেল এবং ভাগ্নী দুইটির নাম ইজাবেল ম্যাকইণ্ডলী ও হ্যারিয়েট ম্যাকইণ্ডলী। ইহারা সকলেই ছিলেন যুবতী ও অবিবাহিতা এবং স্বামীজীর ভাষায় জন্ম হইতেই "ফুলের মত", "সৎ ও পবিত্র"। এবং তাহাদের সকলেরই মুখগুলি ছিল "পুণ্যময়, আনন্দভরা"।

এই চার বোনই স্বামীজীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। এবং ভারতবর্ষে ফিরিবার প্রাক্কালে তিনি লণ্ডন হইতে তাহাদের চারজনকে একসঙ্গে

এক পত্রে লিখেন, "আমার মনে হয় পৃথিবীতে তোমাদের চারজনকে আমি সবচেয়ে বেশী ভালবাসি এবং তোমরাও আমাকে ঐরূপ ভালবাস" (১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে নভেম্বর তারিখের পত্র)। পরে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ তারিখে তিনি বেলুড় মঠ হইতে মেরী হেলকে লিখেন, "তোমরা এবং তোমাদের পরিবারের সকলেই আমাকে এত ভালবাস যে, তাহাতে (আমরা হিন্দুরা যেমন বলে থাকি) আমি পূর্বজন্মে নিশ্চয়ই তোমাদের পরিবারের কেহ ছিলাম।"

এই পরিবার এবং বিশেষভাবে বোন চারিটি সম্বন্ধে স্বামীজীর এই প্রকারের বহু উক্তি পাওয়া যায়। এবং জানা যায়, স্বামীজীর সংস্পর্শে আসিয়া চারিটি বোনই এইকালে বৈরাগ্যপূর্ণ ও ব্রহ্মচিন্তায় নিযুক্ত হন। তাহা হইলেও দেখা যায়, মেরী ও ইজাবেলের সঙ্গেই তাঁহার ভাব ও চিঠি পত্রের আদান-প্রদান অধিক হইত এবং এই দুইজনের নিকট তিনি যে চিঠিগুলি লিখিয়াছেন তাহা সংখ্যায় অনেক ও বহু মূল্যবান তথ্যপূর্ণ।

যাহা হউক, উক্তরূপে প্রায় দুই মাসকাল চিকাগো থাকিয়া স্বাধীন ভাবে বক্তৃতা দিবার পর, স্বামীজী নানা বিবেচনায় একটি বক্তৃতা কোম্পানির (Lecture Bureau) সহিত তিন বৎসরের একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। সম্ভবতঃ আমেরিকার নানাস্থানে বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা ও অর্থরোজগারের নির্ঝঞ্ঝাট সুবিধা করিবার জন্য তিনি ইহা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু তিনি ঠিক কবে যে এই চুক্তি সম্পাদন করেন তাহা জানা যায় না। তবে দেখা যায়, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর তারিখে তিনি সর্বপ্রথম তাঁহার মধ্য-পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলের বিখ্যাত বক্তৃতা সফরে চিকাগো হইতে রওনা হইয়া যান। এবং ২১শে জানুআরি তারিখে (১৮৯৪) একটি খবরের কাগজে (Appeal-Avalanche, Memphis, Tennessee) সংবাদ বাহির হয় যে, স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোর একটি বক্তৃতা কোম্পানির (Slayton Lyceum Lecture Bureau) সহিত তিন বৎসর চুক্তিতে আবদ্ধ

আছেন। ঐ সঙ্গে তাঁহার এই সফরের নূতন নূতন স্থানে একই ধারায় অবিশ্রান্তভাবে বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়, স্বামীজী ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর বা ডিসেম্বর মাস হইতেই উক্ত কোম্পানির পরিচালনায় বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন।

পঁচিশ

আমেরিকার মধ্য-পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে

বক্তৃতা-সফর

(১৮৯৩ নভেম্বর—১৮৯৪ মার্চ)

(১) মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলের ম্যাডিসন, মিনিয়াপোলিস ও ডিময়েন শহরে :

গত অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি, স্বামীজী ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর তারিখে চিকাগো হইতে আমেরিকার মধ্য-পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলের নানাস্থানে বক্তৃতা দিতে বাহির হন। এই বক্তৃতা-সফরের প্রথম পর্যায়ে তিনি পর পর (মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলের) তিনটি শহরে বক্তৃতা দেন : ম্যাডিসন (Wisconsin State), মিনিয়াপোলিস (Minnesota), ডিময়েন (Iowa)। ম্যাডিসনে তিনি বক্তৃতা দেন ২০শে নভেম্বর রাত্রে এবং পরদিন একটি সংবাদপত্র (Wisconsin State Journal) ঐ বক্তৃতা সম্বন্ধে লিখেন, "তিনি অখ্রীষ্টান হইলেও খ্রীষ্টানগণ তাঁহার অনেক শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহার মত-বিশ্বাস সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় অনন্ত-বিস্তৃত এবং তাহাতে সকল ধর্মেরই স্থান আছে এবং সত্য যেখানেই আবিষ্কৃত হউক না কেন, তাহা সাদরে গৃহীত হয়।"

মিনিয়াপলিসে তিনি ফার্ষ্ট ইউনিটেরিয়ান চার্চে দুইটি বক্তৃতা দেন। প্রথমটি দেন ২৪শে নভেম্বর সন্ধ্যায় এবং দ্বিতীয়টি দেন ২৬শে নভেম্বর সকালে। দুইটি বক্তৃতাই ছিল হিন্দুধর্ম-বিষয়ক এবং দুইটিই সভায় ও পরে সংবাদপত্রে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়।

মিনিয়াপলিস হইতে স্বামীজী আড়াই শত মাইলের অধিক দূরবর্তী ডিময়েন (Des Moines) শহরে যান। এবং সেখানে ২৭শে নভেম্বর বৈকালে এক বৈঠকে কথোপকথনে নিযুক্ত হন ও সন্ধ্যায় একটি চার্চে (Central Church of Christ) 'হিন্দুধর্ম'

সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। পরদিন (২৮শে) রাত্রে তিনি ঐ চার্চেই 'পুনর্জন্মবাদ' সম্বন্ধে আর একটি বক্তৃতা দেন। প্রথম দিনের কথোপকথন সম্বন্ধে একটি সংবাদপত্র (Des Moines News) লিখেন, "কথোপকথনের বৈঠকে তিনি (স্বামীজী) প্রথমে ভারতের পোশাক-পরিচ্ছদ, রীতি-নীতি ও সমাজপ্রথা সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং তার-পর তিনি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের অজস্র প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকেন। তাঁহার রহস্য ও বিদ্রূপপূর্ণ প্রত্যুত্তরগুলি খুবই উপভোগ্য হইয়াছিল।" এবং উক্ত তিনটি ভাষণ (একটি কথোপকথন ও দুইটি বক্তৃতা) সম্বন্ধেই অপর একটি সংবাদপত্র (Iowa State Register) লিখেন—

"ডিময়েনে স্বামী বিবেকানন্দ তিনবার বলেন।···শহরের শ্রেষ্ঠ লোকদের অনেকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং তাহারা সকলেই তাঁহার সঙ্গে ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু যিনিই ঐ বিষয়ে তাঁহার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তিনিই বিপর্যস্ত হইয়াছেন। তাঁহার প্রত্যুত্তরগুলি বিদ্যুৎ-চমকানির মত উদ্গীর্ণ হইতে থাকিত এবং তাঁহার শাণিত বর্শার ন্যায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধির আঘাতে তাঁহার দুঃসাহসী প্রশ্নকারীর পরাভব ছিল সুনিশ্চিত। তাঁহার মন এরূপ সূক্ষ্ম, জ্ঞানোজ্জ্বল, তথ্যপূর্ণ ও শিক্ষণপ্রাপ্ত যে উহার ক্রিয়া-পদ্ধতি সময়ে সময়ে তাঁহার শ্রোতাগণকে হতবুদ্ধি করিয়া দিত। ···স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার উদ্দেশ্য সমস্ত খাঁটি খ্রীষ্টানদের অন্তরে একটা স্থান করিয়া লইয়াছে।"

(২) দক্ষিণ অঞ্চলের মেমফিস্ শহরে :

উক্তরূপে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ২৮শে নভেম্বর রাত্রে ডিময়েনে দ্বিতীয় বক্তৃতাটি দিবার পর হইতে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুআরি পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় পূর্ণ দেড় মাস যাবৎ স্বামীজীর আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। তারপর দেখা যায়, তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জানুআরি, শনিবার, দক্ষিণ অঞ্চলের মেমফিস্ শহরে (Ten-

nesse) আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে তিনি একটি ক্লাবের (Nineteenth Century Club) দ্বারা আমন্ত্রিত হইয়া আসেন। এই ক্লাবের কতিপয় সভ্য ধর্মমহাসভায় তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাহারা তাঁহাকে একবার মেম্‌ফিসে আনিতে কৃতসংকল্প হন এবং তদুদ্দেশ্যে তাহারা ঐ সভার অধিবেশন শেষ হইবার পর হইতেই তাঁহার সহিত পত্রালাপ করিতে থাকেন।

মেম্‌ফিসে স্বামীজী মিস্ মুনের বোর্ডিং বাড়ীতে মিঃ ব্রিঙ্কলির অতিথি হন। এবং ঐ বাড়ীর বড় বৈঠকখানা ঘরটি তিনি সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধি ও সাক্ষাৎকামী স্থানীয় ভদ্রলোকদের সহিত দেখা করিবার জন্য ব্যবহার করেন। এই শহরে তিনি ১৩ই জানুআরি হইতে ২২শে জানুআরি পর্যন্ত মোট নয় দিন থাকেন। এই সময় মধ্যে তিনি (১) ১৩ই জানুআরি সন্ধ্যায় তাঁহার সম্বর্ধনার্থ অনুষ্ঠিত একটি অভ্যর্থনা সভায় যোগ দেন, (২) ১৪ই জানুআরি একটি ভোজের নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন ও মেম্‌ফিস্ কমার্শিয়াল পত্রিকার (সাক্ষাৎকারী) রিপোর্টারের প্রশ্নাবলীর উত্তর দেন, (৩) দিনে রাত্রে সমাগত বহু লোকের সহিত দেখা করেন এবং (৪) মোট ছয়টি বক্তৃতা দেন ও (৫) একদিন (২১শে জানুআরি বৈকালে) মিস মুনের বোর্ডিং বাড়ীতে একটি বৈঠকে নানা বিষয় আলোচনা করেন।

স্বামীজী তাঁহার উক্ত ছয়টি বক্তৃতা মধ্যে প্রথমটি দেন ১৫ই জানুআরি বৈকালে পূর্বোক্ত ক্লাবে। শুধু ক্লাবের সভ্য ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের জন্যই এই সভা আহূত হইয়াছিল। এবং সম্ভবতঃ তজ্জন্যই এই বক্তৃতাটির কোন বিবরণ খবরের কাগজে বাহির হয় না। তবে কয়েক দিন পরে একটি সংবাদপত্র (Appeal-Avalanche) লিখেন, "স্বামীর ক্লাবের বক্তৃতা ও তৎপর সেখানে তাঁহার অভ্যর্থনা-অনুষ্ঠান, এ দুই-ই অত্যন্ত মনোরম হইয়াছিল।"

১৬ই জানুআরি রাত্রে স্বামীজী স্থানীয় অডিটোরিয়ামে তাঁহার দ্বিতীয় বক্তৃতা দেন, (বিষয়—হিন্দুধর্ম)। বক্তৃতার পূর্বদিন (১৫ই জানুআরি) উক্ত সংবাদপত্রে উহার যে বিজ্ঞাপন বাহির হয় তাহা

নিম্নলিখিত কথাগুলি দিয়া আরম্ভ করা হয় : "বক্তৃতামঞ্চের একটি বিরাট পুরুষ", "তাঁহার জাতির আদর্শ প্রতিনিধি", "ধর্মমহাসভায় তোলপাড় সৃষ্টিকারী", "ঐশ্বরিক অধিকারে বক্তা", ইত্যাদি। এবং ঐ কাগজেই ১৬ই জানুআরি সকালে স্বামীজীর সম্বন্ধে যে বিস্তৃত বিবরণ বাহির করা হয় তন্মধ্যে কয়েকটি কথা এইরূপ :

"এদেশে আজ পর্যন্ত যত লোক বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বাগ্মিতায় যাহারা সর্বশ্রেষ্ঠ স্বামী ভাইভ কানন্দ[1] (অর্থাৎ, স্বামী বিবেকানন্দ) তাহাদের একজন"; "কথোপকথনে তিনি একজন অতীব তৃপ্তিদায়ক ভদ্রলোক এবং তাঁহার নির্বাচিত শব্দগুলি ইংরেজি ভাষার রত্নরাজি স্বরূপ"; "আলাপকারী হিসাবে পাশ্চাত্য জগতের কোন শহরের কোন বৈঠকখানাতেই তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই। তিনি যে ইংরেজি শুধু ভাল বলেন তাহা নহে, তিনি উহা জলের মত অনর্গল ধারায় বলিয়া যান। এবং তাঁহার নূতন, দীপ্তময় ভাবগুলি তাঁহার জিহ্বা হইতে আলঙ্কারিক ভাষায় এক হতবুদ্ধিকর প্লাবনের ধারায় নির্গত হয়।"

যাহা হউক, স্বামীজীর এই (১৬ই তারিখের) দ্বিতীয় বক্তৃতাটি ও তৎপরের আরও চারিটি বক্তৃতা[2] (এবং পূর্বোক্ত নানা বিষয়ক আলোচনাটিও) বিস্তৃতভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত ও প্রশংসিত হয়। এবং সে সকল হইতে বোঝা যায়, স্বামীজী মেম্‌ফিসের সুধী সমাজের উপর কি বিস্ময়কর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার তৃতীয়

১। এইকালে সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনাদিতে স্বামীজীর নাম Swami Vive Kananda, অথবা শুধুই Kananda বলিয়া উল্লিখিত হইতে দেখা যায়।

২। স্বামীজী তাঁহার তৃতীয় বক্তৃতা দেন ১৭ই সন্ধ্যায় উইমেন্‌স কাউনসিল কক্ষে (বিষয়—মানবের গতি), চতুর্থ ও পঞ্চম বক্তৃতা দেন ১৯শে রাত্রে ও ২০শে বৈকালে মিস মুনের বোর্ডিং বাড়ীতে (বিষয়, যথাক্রমে—পুনর্জন্মবাদ এবং ভারতের আচার-ব্যবহার ও সমাজ-প্রথা) এবং তাহার ষষ্ঠ বা শেষ বক্তৃতা দেন ২১শে রাত্রে একটি স্থানীয় হলে (Y. M. H. A. Hall), (বিষয়—তুলনামূলক ধর্মবিজ্ঞান)।

বক্তৃতাটির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া একটি সংবাদপত্র (Appeal-Avalanche) লিখেন, "অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক যেভাবে বীজগণিতের অঙ্ক কষিয়া দেখান, তিনিও তাঁহার কথাগুলি ঠিক তেমনিভাবেই (যুক্তির পর যুক্তির দ্বারা) অগ্রসর করিয়া দেন।" তাঁহার চতুর্থ বক্তৃতা প্রকাশকালে উক্ত সংবাদপত্রটি লিখেন, "কানন্দের (অর্থাৎ বিবেকানন্দের) জনপ্রিয়তা আশ্চর্যভাবে বাড়িয়া গিয়াছে, বিশেষ-ভাবে মেয়েদের মধ্যে।···মেয়েরা তাঁহার কথা বলিতে কখন ক্লান্তি বোধ করেন না। গত রাত্রের শ্রোতাদের দুই-তৃতীয়াংশই ছিলেন মেয়েরা এবং তাহারা স্বামীজীর মুখ হইতে নির্গত প্রতিটি কথা এমন নিবিষ্টভাবে গ্রহণ করিতে থাকেন, যেন সেগুলি ছিল অতল সমুদ্র হইতে উৎক্ষিপ্ত মুক্তারাজি।" স্বামীজীর পঞ্চম বক্তৃতার সমালোচনায় ঐ কাগজটি মন্তব্য করেন, "মনে হয় কানন্দের ধর্মের পূর্বদেশীয় ঔজ্জ্বল্য আমাদের পুরাতন কালের পৈত্রিক খৃষ্টধর্মের সৌন্দর্য ম্লান করিয়া দিয়াছে এবং উৎকৃষ্টতর শিক্ষা-প্রাপ্ত আমেরিকানদের মন উহার বৃদ্ধির একটি উর্বরা ক্ষেত্রস্বরূপ হইবে।" "তাঁহার আশ্চর্য আকর্ষণ-শক্তি এবং তাঁহার বাগ্মিতায় তাঁহার শ্রোতাগণ বিমুগ্ধ।" "এই শহরে যত বক্তা বা ধর্মপ্রচারক আসিয়াছেন তাহাদের সকলের চাইতে কানন্দ অনেক বেশী সম্মান লাভ করিয়াছেন।"

স্বামীজীর ষষ্ঠ বা শেষ বক্তৃতার বিজ্ঞপ্তিতে একটি সংবাদপত্র (Memphis Commercial) লিখেন, "শহরবাসীগণ স্বামী বিবেকানন্দকে জনসাধারণের পক্ষ হইতে এবং ব্যক্তিগতভাবেও সংবর্ধনা ও আপ্যায়ন করিয়াছেন। তিনি সকল শিক্ষিত দলের মধ্যেই একটা গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য এত বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তৃত এবং তাঁহার জ্ঞান এত পরিপূর্ণ যে, বিবিধ জড়বিজ্ঞান, ধর্মবিজ্ঞান, কলাবিদ্যা ও সাহিত্যের বিশেষজ্ঞগণও তাঁহার উক্তিসকল হইতে শিক্ষা গ্রহণ করেন।" পরে এই বক্তৃতার বিবরণ প্রদানকালে অপর একটি সংবাদপত্র (Appeal-Avalanche) লিখেন, "কানন্দ অপূর্ব দক্ষতার সহিত এই বক্তৃতা দিয়াছেন।" "ইহা

তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট বক্তৃতা হইয়াছে এবং ফলে তাঁহার প্রতি শহর-বাসীগণের শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া গিয়াছে।"

এই সর্বশেষের বিবরণটি হইতে একটি নূতন সংবাদ পাওয়া যায়। মেম্‌ফিসের ছয়টি বক্তৃতার মধ্যে প্রথম পাঁচটি বক্তৃতা হইতে লব্ধ কোনও টাকাই স্বামীজী নিজে গ্রহণ করেন নাই, সবই কোন না কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দান করিয়াছেন। মাত্র ষষ্ঠ বা শেষের বক্তৃতাটির টাকা তিনি নিজের উপকারার্থ লইয়াছেন।

২১শে জানুআরি তারিখে উক্ত শেষ বক্তৃতাটি দিয়া স্বামীজী ২২শে জানুআরি (১৮৯৪), সোমবার, চিকাগো রওনা হইয়া যান। সেখানে ২৫শে জানুআরি রাত্রে তাঁহার একটি বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা ছিল।

(৩) চিকাগোয় প্রত্যাবর্তন :

২৩শে বা ২৪শে জানুআরি চিকাগো পৌঁছিয়া, স্বামীজী সেখানে প্রায় তিন সপ্তাহকাল (তাঁহার আমেরিকার 'হোম') হেলদের বাড়ীতে থাকিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করেন। এই বিশ্রামের যে তাঁহার কত প্রয়োজন ছিল তাহা নিম্নের কথাগুলি হইতে বোঝা যাইবে।

গত দুই মাসাধিক কাল অবিশ্রাম গুরুতর পরিশ্রম করিয়া তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং ফলে তাঁহার দৃঢ় ও বলিষ্ঠ শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িবার সূত্রপাত (তিনি তখন না বুঝিতে পারিলেও) এই কালেই হয়। দেখা যায়, তাঁহার বক্তৃতা-সফরের প্রথম তিনটি শহরের (ম্যাডিসন, মিনিয়াপলিস ও ডিময়েন) কাজ তিনি মাত্র এক সপ্তাহে শেষ করেন। এবং তাঁহার পরের দেড়মাসের কোন সংবাদ না পাওয়া গেলেও, আমরা তৎপরেই দেখিতে পাই মেম্‌ফিসে তিনি মাত্র আট-নয় দিনে ছয়টি বক্তৃতা দিয়াছেন, একটি আলোচনা সভা ও কয়েকটি অভ্যর্থনা ও নিমন্ত্রণ মজলিসে যোগ দিয়াছেন এবং দিনে-রাত্রে সংবাদপত্রের রিপোর্টার সহ বহু লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তাই অনুমান করা যায়, উক্ত সংবাদহীন দেড় মাসের

আগে-পরে তিনি যেরূপ অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, ঐ দেড়মাস কালেও তিনি অপর অনেক শহুরে গিয়া ঠিক ঐভাবেই কাজ করিয়াছেন। আবার এই সকল শহর যে কাছাকাছি অবস্থিত ছিল তাহাও নয়, সবই দূর দূরান্তে ছড়ানো। এই বিষয়ে স্বামীজী নিজে তাঁহার ১৯শে মার্চ তারিখের (১৮৯৪) এক পত্রে (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের নিকট) লিখেন, "প্রয়োজনবশতঃ আমাকে রেল-গাড়ীতে একদিন ক্যানাডার সীমান্তে যাইতে হইতেছে, আবার তাহার পরের দিনই আমেরিকার দক্ষিণ অঞ্চলে গিয়া বক্তৃতা দিতে হইতেছে।" এই চিঠিখানি স্বামীজীর বক্তৃতা-সফরের প্রথম তিন মাসের কিছু পরে লিখিত হইলেও, ইহা ঐ সময়ের অবস্থাও ব্যক্ত করিতেছে। কারণ, এই উভয় সময়েই তিনি ঐ একই বক্তৃতা কোম্পানির ব্যবস্থানুসারে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেন। দেখা যায়, এই বক্তৃতা কোম্পানি তাহাদের নিজেদের রোজগারের সুবিধার জন্য স্বামীজীকে একটা খেলার বলের মত অবিশ্রামভাবে যখন-তখন যেখানে-সেখানে ঠেলিয়া দিয়াছেন। এমন কি, যে সকল শহর ছিল শ্রমিকপ্রধান, এবং শিক্ষা ও জ্ঞান-চর্চায় অনগ্রসর ও তজ্জন্য স্বামীজীর বক্তৃতার মর্ম বুঝিতে অক্ষম, সেখানেও তাহারা তাঁহাকে একটি দুর্লভ, কৌতূহল চরিতার্থ করিবার পদার্থের ন্যায় পাঠাইয়া পয়সা অর্জন করিয়াছেন। ইহাতে স্বামীজী খুবই বিরক্ত বোধ করিতেন। এবং সিস্টার ক্রিষ্টিন প্রভৃতির নিকট একদিন বলেন, "যেখানে শ্রোতাদের বুদ্ধির সাড়া দেখা যায় না, সেখানে বক্তৃতা দেওয়া খুবই কঠিন।" এই সকল ব্যতীত, এই সময়টা ছিল শীতকাল এবং আমেরিকার ভীষণ শীত ও তুষার-পাতের মধ্যে অনবরত রেলে ভ্রমণ করা যে কি কষ্টকর ও আয়াসসাধ্য ব্যাপার ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়।

এই সঙ্গেই আর একটি লক্ষণীয় ব্যাপার এই। ঐ বক্তৃতা কোম্পানি শুধু যে স্বামীজীকে উক্তরূপে খাটাইয়াই নিঃশেষ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন তাহা নয়। তাহারা তাঁহাকে তাঁহার ন্যায্য পাওনাও কখনো ঠিক মত দেন নাই এবং সুবিধা বুঝিলেই ভয়ানক-

ভাবে ঠকাইয়াছেন। তাই পরিশেষে স্বামীজী ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের মাঝামাঝি বা শেষের দিকে ঐ বক্তৃতা কোম্পানির সহিত তাঁহার পূর্বোক্ত তিন বৎসরের চুক্তি বাতিল করিয়া দেন ও তাহাদের সহিত সকল সংস্রব পরিত্যাগ করেন। এই সুকঠিন কাজটি যেভাবে সম্ভব হইয়াছিল, তাহা আমরা এই অধ্যায়েই কিছু পরে দেখিতে পাইব।

উক্ত চুক্তি বাতিল সম্বন্ধে স্বামীজী ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১-ই জুলাই তারিখের এক পত্রে লিখেন, "ডেট্রয়েটের এক বক্তৃতায় আমি ৯০০ ডলার (২৭০০৲ টাকা) পাইয়াছি। অপর বক্তৃতাগুলির একটিতে আমার ২৫০০ ডলার (৭৫০০৲ টাকা) রোজগার হইয়াছিল, কিন্তু পাইয়াছি মাত্র ২০০ ডলার। একটি জুয়াচোর বক্তৃতা কোম্পানি আমাকে ঠকাইয়াছে। আমি তাহাদের পরিত্যাগ করিয়াছি।"

(৪) ডেট্রয়েট শহরে—প্রথমবার :

যাহা হউক, উক্তরূপে তিন সপ্তাহকাল বিশ্রাম করিয়া স্বামীজী ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুআরি, সোমবার, চিকাগো হইতে (মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলের) ডেট্রয়েট শহরে (Michigan) রওনা হইয়া যান। ডেট্রয়েট আমেরিকার একটি বড় শহর এবং শিল্প-বাণিজ্য ও জ্ঞান-চর্চাদিতে খুবই অগ্রবর্তী। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দেই উহার অধিবাসীগণের সংখ্যা ছিল দুই লক্ষের উপর। স্বামীজী এই সাহসী, উদ্যমশীল ও সকল বিষয়েই কৌতূহল ও মনোযোগ-সম্পন্ন জনগণের মধ্যে আসায় যে অবস্থার সৃষ্টি হইল তাহা একটা বিস্ফোরণের সঙ্গেই তুলনীয়। একদিকে বিপুল সমাদর ও সমর্থন, অপরদিকে তাহারই প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ গোঁড়া পাদরী ও মিশনারীগণের নিন্দা ও বাধাপ্রদান,—এ দুই-ই এক প্রবল ঝড়ঝঞ্ঝার ন্যায় সমভাবে ক্রিয়মান হইয়া উঠিল। এই সকল ঘটনাবলীর ধারা আমরা নিম্নে যথাসম্ভব সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম।

উক্ত ১২ই ফেব্রুআরি (১৮৯৪) স্বামীজী (একটা ভয়ঙ্কর তুষার-ঝড়ের মধ্যে) ডেট্রয়েটে পৌঁছেন। সেখানে তিনি মিসেস ব্যাগলির

(Mrs. John J. Bagley) অতিথি হন। এই মহিলাটি ডেট্রয়েটের একজন ধনী, সুশিক্ষিতা, উদারমতাবলম্বী ও অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী স্ত্রীলোক ছিলেন। তাঁহার পরলোকগত স্বামী (Mr. John Judson Bagley) মিসিগ্যান স্টেটের গভর্ণর ছিলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে মিসেস্ ব্যাগলি চিকাগো বিশ্ব-মেলার একজন মহিলা ম্যানেজার নিযুক্ত হন। এবং খুব সম্ভবতঃ সেখানে ধর্মমহাসভার প্রতিনিধিদের কোন সংবর্ধনা-সভায় স্বামীজীর সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

স্বামীজী যেদিন ডেট্রয়েটে পৌঁছেন, তাহার পরদিন সন্ধ্যায় (১৩ই ফেব্রুআরি) মিসেস ব্যাগলি তাঁহার বাড়ীতে এক বিপুল ও ব্যয়-বহুল অভ্যর্থনা উৎসবের দ্বারা স্বামীজীকে সংবর্ধিত করেন। এই অভ্যর্থনা মজলিসে তিনি নানা শ্রেণীর ধর্মযাজকগণ, অধ্যাপকগণ, মেয়র ও তাঁহার স্ত্রী এবং ডেট্রয়েট শহরের অন্ততঃ তিন শত পদস্থ ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এবং ঐ সময়ের স্থানীয় সংবাদপত্র-সমূহের রিপোর্ট সকল হইতে জানা যায়, ডেট্রয়েট শহরে পদস্থ লোকদের এত বড় সম্মিলন বহু বৎসরের মধ্যে এবং সম্ভবতঃ কোন দিনই দেখা যায় নাই।

এইভাবে মিসেস্ ব্যাগলি স্বামীজীকে ডেট্রয়েট-সমাজের উত্তমাংশের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচিত করাইয়া দেন। তদ্ব্যতীত, স্বামীজী এই শহরে আসিবার কয়েকদিন পূর্ব হইতেই শহরের সংবাদপত্র সকল তাঁহার যশ, মান, বাগ্মিতাশক্তি এবং ধর্মমহাসভায় তাঁহার অসাধারণ সাফল্য ইত্যাদির কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার আগমন সংবাদ প্রচার করিতেছিলেন। এবং তিনি আসার অব্যবহিত পরেই একটি সংবাদপত্রের (Detroit Free Press) প্রতিনিধিও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এক সুদীর্ঘ বিবরণে তাঁহার সম্বন্ধে আরও অনেক সংবাদ প্রকাশ করেন। এই সকল কারণে ডেট্রয়েটে স্বামীজীর বক্তৃতার প্রথম দিনই সভায় অসম্ভব রকমের ভিড় হয়। এবং তৎপর তাঁহার বক্তৃতাগুলির উৎকর্ষতার ফলে, ভিড় প্রতি পরবর্তী বক্তৃতায় ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর হইতে থাকে।

দেখা যায়, ডেট্রয়েটে স্বামীজী মোট পাঁচটি বক্তৃতা দেন। প্রথম চারিটি দেন স্থানীয় ইউনিটেরিয়ান চার্চে—১৪ই, ১৫ই, ১৭ই ও ২০শে ফেব্রুআরি তারিখের প্রতি সন্ধ্যায়। এবং পঞ্চম বা শেষ বক্তৃতাটি দেন মিসেস ব্যাগলির বাড়ীতে ২১শে ফেব্রুআরি বৈকালে। প্রথম বক্তৃতাটির বিষয় ছিল "ভারতের আচার ব্যবহার ও সমাজ-প্রথা"। বক্তৃতাটি উৎকৃষ্ট ও হৃদয়স্পর্শী হইলেও, ইহাতে স্বামীজী প্রসঙ্গক্রমে বলেন, "হিন্দুগণ (জীবনের) চরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইবার পথে যে দুঃখকষ্ট নম্রভাবে সহ্য করেন তাহা কতকটা খ্রীষ্টসদৃশ। এরূপ দেশে ধর্মপ্রচারের জন্য খ্রীষ্টান মিশনারীদের পাঠানো একেবারেই অনাবশ্যক। বস্তুতঃ হিন্দুগণ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা নীতিনিষ্ঠ (moral) জাতি। খ্রীষ্টান মিশনারীগণের উচিত সেখানে গিয়া পবিত্র বারি পান করা ও দেখা কিভাবে বহু সৎ ও পুণ্যাত্মা লোক একটি সুবৃহৎ জাতির উপর কি চমৎকার প্রভাব বিস্তার করিয়া আছেন।"

কথাগুলি বলিয়া স্বামীজী ডেট্রয়েট শহরের উপর যেন একটি বোমা নিক্ষেপ করিলেন। সারা শহর জুড়িয়া এক প্রবল আন্দোলন উঠিল। সর্বত্রই স্বামীজী ও তাঁহার ঐ কথাগুলি লইয়া আলোচনা ও বাদানুবাদ। একদিকে তাঁহার অসংখ্য সমর্থকগণ, অপরদিকে গোঁড়া খ্রীষ্টান ও খ্রীষ্টান ধর্মযাজক ও মিশনারীগণ।

ঠিক যেন একটা যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এবং স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিতে স্বামীজীকে আক্রমণ বা সমর্থন করিয়া ক্রমাগত শত শত পত্র ও সম্পাদকীয় লেখা বাহির হইতে লাগিল। তবে এই লেখনী-যুদ্ধে স্বামীজী নিজে কোন অংশ গ্রহণ করেন না। এবং তিনি প্রোগ্রাম অনুসারে ও অবধারিত স্থান ও দিন সকলে তাঁহার দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বক্তৃতা দিলেন। ঐ সকল বক্তৃতার বিষয় ছিল যথাক্রমে—"হিন্দুদর্শন", "মানুষের দেবত্ব" ও "ঈশ্বর-প্রেম"। প্রত্যেক দিনই বক্তৃতা-সভায় শ্রোতাদের দারুণ ভিড় হইল। এবং তৎসম্বন্ধে একটি স্থানীয় সংবাদপত্র (The Detroit Journal) লিখেন, "কানন্দকে যদি অনুরোধ করিয়া আর এক সপ্তাহ এখানে রাখা যায়,

তাহা হইলে ডেট্রয়েটের সর্ববৃহৎ হলও তাঁর বক্তৃতা শ্রবণেচ্ছু সকল লোকদের স্থান দিতে সমর্থ হইবে না।"

যাহা হউক, দেখা যায় স্বামীজীর সকল বক্তৃতার শেষেই উদার মতাবলম্বী শ্রোতাগণ বলিতেন, "এমন বক্তৃতা আর শুনি নাই।" আর গোঁড়া মতের লোক ও সংবাদপত্র সকল (বক্তৃতা শুনিয়া অথবা না শুনিয়াই) প্রচার করিতেন যে, উহা খৃষ্টান ধর্ম ও খৃষ্টান মিশনারীগণের প্রতি আক্রমণপূর্ণ। এমন কি, স্বামীজীর যে সকল কথা শুধুই দার্শনিক সত্য, তাহাও খ্রীষ্টান ধর্মের প্রচলিত মত-বিশ্বাসের বিরুদ্ধ হইলে তাহারা ধরিয়া লইতেন যে উহা তাহাদের ধর্মের উপরে একটা চাতুর্যপূর্ণ খোঁচা। কাজেই, উক্ত লেখনী-যুদ্ধ খরবেগেই চলিতে লাগিল। ইহার পরিপূর্ণ ছবি ডেট্রয়েটের ঐ কালের সংবাদপত্রসমূহে (চিঠি বা সম্পাদকীয় লেখার দ্বারা) ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমরা উহার খুঁটিনাটির মধ্যে না গিয়া বিষয়টি সমগ্রভাবে দেখিয়া যাহা পাই তাহা এই।

প্রথম, স্বামীজী হিন্দুধর্মের সিদ্ধান্ত সকল এমন সুযুক্তি ও জড়-বিজ্ঞানের আবিষ্কার সমূহের দ্বারা সমর্থন করিতেন যে, তাহা খণ্ডন করা গোঁড়া মতের পাদরী ও মিশনারীদের অসাধ্য ছিল। তাই, ইহা তাহাদের একটা গুরুতর উৎকণ্ঠার বিষয় হয়। দ্বিতীয়, স্বামীজী প্রচার করিতেন, ধর্ম বলিতে সকল ধর্মই বুঝায় এবং খ্রীষ্টান ধর্ম চরম সত্য সম্বন্ধে একটি বিশেষ মত-বিশ্বাস মাত্র। স্বামীজীর এই প্রকারের উক্তি সকল গোঁড়া পাদরী-মিশনারীদের পক্ষে বিশেষ-ভাবে অসহ্য ছিল। কারণ, তাহারা বিশ্বাস করিতেন যে খ্রীষ্টান ধর্মই একমাত্র সত্য ধর্ম এবং তাহারা আশা করিতেন যে সমস্ত পৃথিবীই একদিন না একদিন তাহাদের এই সত্যধর্মের পতাকাতলে আসিবে। কিন্তু স্বামীজীর উক্তরূপ প্রচার সকল তাহা সুদূরপরাহত করিয়া তুলিতেছিল। তৃতীয়, খ্রীষ্টান মিশনারীগণ তাহাদের বিদেশস্থ মিশনের সাহায্যে অর্থ তুলিবার উদ্দেশ্যে হিন্দুদের সম্বন্ধে আমেরিকায় (কাল্পনিক চিত্রের দ্বারা সমর্থন করিয়া) বহু মিথ্যা অপবাদ প্রচার

করিতেন। তন্মধ্যে কয়েকটি এই—হিন্দু মায়েরা তাহাদের শিশু-সন্তানগণকে কুমীরের আহারের জন্য গঙ্গায় নিক্ষেপ করে, বহু হিন্দু নরনারী জগন্নাথের রথের তলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নিজেদের হত্যা করে, হিন্দুরা তাহাদের বিধবাদিগকে মৃত স্বামীর সহিত পোড়াইয়া মারে। বিশেষভাবে এই তিনটি বিষয়েই বহু আমেরিকান নরনারী স্বামীজীকে নানা স্থানে নানারূপ প্রশ্ন করিতেন। তাই, স্বামীজী তাঁহার বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তরাদির মাধ্যমে এই সকল নিন্দা-কুৎসাকে এমনভাবে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিতেন যে, তাঁহার শ্রোতাগণ সর্বত্রই মিশনারীদের ঐ সকল মিথ্যা প্রচার অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করেন। এবং ইহা অনিবার্যভাবে মিশনারীগণের জীবিকা ও অর্থার্জনের এক প্রবল বাধাস্বরূপ হয়। অনেক আমেরিকান সাহায্যদাতা আর তাহাদের অর্থ সাহায্য করিতে অস্বীকার করেন। তাই, ঐ অপবাদগুলি যে সত্য এবং স্বামীজী যে মিথ্যাবাদী ও নির্ভরের অযোগ্য তাহা প্রমাণ করিবার জন্য উক্ত মিশনারীগণ উঠিয়া পড়িয়া লাগেন।

তবে দেখা যায়, গোঁড়ার দল এইরূপ আক্রমণ চালাইতে থাকিলেও, স্বামীজীর সমর্থনকারীগণ সমানতালেই উহার জবাব দিয়াছেন। আর তাহাদের মধ্যে কয়েকজন অতি উদার ও উচ্চ শ্রেণীর ধর্মযাজকও ছিলেন। ইহাদের দুইজন (রেভারেণ্ড স্টুয়ার্ট ও ডাঃ গ্রস্‌ম্যান) স্বামীজীর সমর্থনে এক রবিবারে (১৮ই ফেব্রুআরি) দুইটি বিভিন্ন গির্জার বেদী হইতে যে বক্তৃতা দেন তাহা অপূর্ব এবং তাহারা পরিপূর্ণভাবেই স্বামীজীকে সমর্থন করেন।

অপর দিকে, ঐ একই কালে ডেট্রয়েটের বিভিন্ন ক্লাব স্বামীজীকে আমন্ত্রণ করিয়া লইতেছিলেন, বহু প্রখ্যাত বাড়ী হইতে তিনি আহারের নিমন্ত্রণ পাইতেছিলেন এবং এমন একটি দিন যাইত না যেদিন তিনি কোথাও না কোথাও আপ্যায়িত ও সংবর্ধিত না হইতেন। এই সকল নিমন্ত্রণ মজলিসে স্বামীজী নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিতেন এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের প্রশ্ন সকলের উত্তর দিতেন।

এইভাবে উচ্চ-শিক্ষিত সমাজে তাঁহার অনেক বন্ধু জুটিয়াছিল। আর বিশেষভাবে তিনি যাহাদের "রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী" বলিতেন, সেই উচ্চ স্তরের আমেরিকান মহিলাদের নিকট তাঁহার সমাদরের সীমা ছিল না।

এই সমস্ত হইতে বোঝা যায়, গোঁড়ার দল তাহাদের আক্রমণের দ্বারা স্বামীজীর কোন অনিষ্টই করিতে পারেন নাই। এবং ইহার একটা বড় হেতু এই ছিল যে, এইকালে পুরাতন গোঁড়া খ্রীষ্টান মতের দ্বারা শিক্ষিত আমেরিকানদের প্রাণের পিপাসা মিটিতেছিল না। তাহারা চাহিতেছিলেন একটা মহা প্রাণপূর্ণ ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিস্তৃত ধর্ম। এবং তাহাই তাহারা স্বামীজীর নিকট হইতে পাইতেছিলেন। জাতির অন্তরের এই ভাব ব্যক্ত করিয়াই পূর্বোক্ত উদার-হৃদয় ধর্ম-যাজক ডাঃ গ্রসম্যান বলেন, "আমাদের ঈশ্বর আকাশে থাকেন। কিন্তু কানন্দের ঈশ্বর এই পৃথিবীতেই বিরাজ করেন।...এই হিন্দুর নিকট হইতে আমাদের শেখা উচিত যে ঈশ্বর চির-ক্রিয়াশীল এবং তিনি মাঠের প্রতিটি পুষ্পে, আমাদের প্রতিটি নিঃশ্বাসে ও রক্তের প্রতি নর্তনে অবস্থিত আছেন।"

এই সঙ্গে স্বামীজীর একজন সমর্থক একখানি পত্রে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি অপর নানা কথার মধ্যে লিখিয়াছেন, "স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি আক্রমণ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। আমি মনে করি, তাঁহার বক্তৃতা যাহারা শুনিয়াছেন তাহারা (সত্যের অপলাপ না করিয়া) বলিতে পারেন না যে তিনি খ্রীষ্টান ধর্মকে আক্রমণ করিয়াছেন। বরং তিনি বরাবরই যীশু ও তাঁহার প্রচারিত ধর্ম সম্বন্ধে ভক্তি ও ভালবাসার সহিতই কথা বলিয়াছেন। তিনি যাহার নিন্দা করিয়াছেন তাহা একদিকে ঐ ধর্মের বিকৃতি ও উহা হইতে উৎপন্ন ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার ইত্যাদি, অপর দিকে আমাদের সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবনের অসাধুতা, নিষ্ঠুরতা, পরমত অসহিষ্ণুতা ও চরম স্বার্থপরতা।...

"আমরা যদি জানিতে পারি কানন্দ আমাদের নিকট হইতে কি ব্যবহার পাইয়াছেন, তাহা হইলে তিনি যে আমাদের গোটাকয়েক গা-পোড়ানো সত্য কথা বলিয়াছেন তাহাতে বিস্ময়ের কিছু থাকে না। চিকাগোতে ধর্মান্ধ আমেরিকান মেয়েরা তাঁহার নামে মিথ্যা কুৎসা রটনা করিয়াছে। এই শহরে প্রায় প্রত্যেক ডাকেই তাঁহাকে যারপরনাই অপমানকর পত্রসকল দ্বারা আক্রমণ করা হইতেছে। এখানে তিনি সাধারণের সমক্ষে একটি কথাও বলার পূর্বেই, একটি স্ত্রীলোক তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য এক বাড়ীতে আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া নির্লজ্জের মত তাঁহার মুখের উপর তাঁহাকে নিন্দা করিতে আরম্ভ করেন। একটি বক্তৃতা কোম্পানি অতি নীচ ও অন্যায়ভাবে তাঁহাকে তাঁহার বক্তৃতার আয় হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। তাঁহার বক্তৃতা আদৌ না শুনিয়া, শুধু খবরের কাগজের সংক্ষিপ্ত ও ভ্রমাত্মক রিপোর্ট দেখিয়া গোঁড়া ধর্মযাজকগণ গির্জাগুলির বেদী হইতে বর্বরোচিত ভাষায় তাঁহার বিরুদ্ধে প্রচার চালাইয়াছেন।

"এই অবস্থায় তিনি যদি আমাদিগকে আমাদের দোষের কথা কিছু বলিয়া থাকেন, তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে? বরং আমার মনে হয় তিনি অত্যন্ত শান্ত ও সংযত হইয়া চলিয়াছেন। অখ্রীষ্টানদের চোখে আমরা কিরূপ প্রতিভাত হই, তাহা যদি তাহারা আসিয়া আমাদের বলেন, তাহাতে আমাদের উপকারই হইবে। তাই, আমি চাই আরও কানন্দ আমাদের মধ্যে আসুন ও আমাদের দোষ দেখাইয়া দিন।"

আমরা দেখিয়াছি উপরি-বর্ণিত লেখনি-যুদ্ধের আক্রমণ-সমর্থনে স্বামীজী নিজে কোন অংশ গ্রহণ করেন না। তবে ডেট্রয়েটে তাঁহার উপর প্রতিপক্ষ হইতে যে শত শত নিন্দা-অভিশাপ বর্ষিত হয়, তাহার জবাবে তিনি ডেট্রয়েট পরিত্যাগের অব্যবহিতপূর্বে (২১শে ফেব্রুআরি) তাঁহার পঞ্চম বা শেষ বক্তৃতায় কয়েকটি স্পষ্ট কথা বলিয়া যান।

এই পঞ্চম বা সর্বশেষের বক্তৃতাটি তিনি দেন মিসেস ব্যাগলির বাড়ীতে। এবং ইহা শ্রবণ করিবার জন্য মিসেস ব্যাগলি ব্যবসায়ী,

আইন-ব্যবসায়ী, জজ, ডাক্তার, ধর্মযাজক, উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী প্রভৃতি ও তাহাদের স্ত্রীকন্যাগণ সহ বহু লোক নিমন্ত্রণ করেন। স্বামীজী পূর্ণ দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল "প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকগণ ও তাহাদের শিক্ষা।" সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুসারে স্বামীজীর ডেট্রয়েট বক্তৃতাবলীর মধ্যে এই বক্তৃতাটিই সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল। এবং এই বক্তৃতাতেই তিনি (খ্রীষ্টান ধর্মযাজক ও মিশনারীদের লক্ষ্য করিয়া) প্রসঙ্গক্রমে বলেন—

"একটি কথা আমি আপনাদের নিকট বলছি এবং তার দ্বারা আমি যে কোন সহানুভূতিহীন সমালোচনা করছি তা নয়। আপনারা লোককে শিক্ষা, শিক্ষণ, জামা-কাপড় ও অর্থ দেন,—কি জন্যে? না, আমার দেশে গিয়ে আমার সমস্ত পূর্বপুরুষ, আমার ধর্ম ও সব কিছুকেই নিন্দা ও অভিসম্পাত করবার জন্যে। তারা একটা মন্দিরের নিকট গিয়ে বলতে থাকে, 'তোমরা মূর্তিপূজক, তোমরা নরকে যাবে।' ······আর আপনারা যারা গালাগালি ও সমালোচনা করবার জন্যে লোককে শিক্ষা দেন,—আমি যদি সর্বোত্তম সদিচ্ছার সহিত আপনাদের সামান্যমাত্র সমালোচনাও করি, আপনারা সন্ত্রস্ত হয়ে চীৎকার করতে আরম্ভ করেন, 'আমাদের ছুঁয়ো না, আমরা আমেরিকান।'·········আপনাদের ধর্মযাজকগণ যখনই আমাদের সমালোচনা করেন, তখনই তারা যেন স্মরণ রাখেন 'যদি ভারতের সমস্ত অধিবাসীগণ উঠে দাঁড়িয়ে ভারত মহাসাগরের তলে যত কাদা আছে তা তুলে পাশ্চাত্য দেশগুলির বিরুদ্ধে ছুঁড়ে মারে, তা হলেও আপনারা আমাদের যা করছেন তার অনন্তাংশের একাংশও করা হবে না'।"

ইহার পর তিনি এই প্রসঙ্গেই আরও বলেন, "আপনারা ধর্মের গর্ব-বড়াই করেন, কিন্তু তরবারি বিনা আপনাদের খ্রীষ্টধর্মের প্রচার কোথায় সফল হয়েছে? সমস্ত জগতে আমাকে একটি মাত্র স্থান দেখান। খ্রীষ্টধর্মের সমগ্র ইতিহাসের মধ্যে আমি একটি মাত্র দৃষ্টান্ত চাই,—দুটি চাই না। আমি জানি আপনাদের পূর্বপুরুষগণ কিভাবে

ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। ধর্মান্তর বা মৃত্যু—এ দুটির একটি তাদের গ্রহণ করতে হয়েছিল।”

ইহার পর ২৩শে ফেব্রুআরি, শুক্রবার, সকালে স্বামীজী ডেট্রয়েট ত্যাগ করেন। এবং ঐ দিনই এ্যাডা শহরে (Ohio) পৌছিয়া সেখানে সন্ধ্যায় একটি বক্তৃতা দেন। এই ক্ষুদ্র শহরটিতে তিনি মাত্র একদিন কি দুইদিন থাকিয়া, তাঁহার চিকাগোর 'হোম' বা হেলদের বাড়ীতে ফিরিয়া যান।

(৫) ডেট্রয়েটে দ্বিতীয়বার :

আমরা দেখিয়াছি, ধর্মমহাসভায় কৃতকার্যতার ফলে স্বামীজী যে সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রচারিত অত্যুদার মত-বিশ্বাস শিক্ষিত জনসাধারণের নিকট হইতে যে সমর্থন ও প্রশংসা লাভ করিতেছিল, তাহা গোঁড়া খ্রীষ্টানগণ, বিশেষভাবে গোঁড়া পাদরী ও মিশনারীগণ, আর সহ্য করিতে পারেন নাই। ধর্মমহাসভার অধিবেশন শেষ হইলে চিকাগোর একটি খ্রীষ্টান সাম্প্রদায়িক কাগজের সম্পাদক "The Lying Hindoo" শিরোনাম দিয়া একটি প্রবন্ধে লিখেন, "ধর্মমহাসভায় তিনি (স্বামীজী) আমাদের অতিথি ছিলেন। কিন্তু এখন, ঐ সভা শেষ হওয়ায়, আমাদের কর্তব্য হইতেছে তাঁহাকে ও তাঁহার মিথ্যা মত-বিশ্বাসকে উদ্যমের সহিত আক্রমণ করা।" এবং এই উদ্দেশ্যে সেখানকার গোঁড়া পাদ্‌রী ও মিশনারীগণ শুধু তাঁহার মত-বিশ্বাসের নিন্দা ও খ্রীষ্টধর্মের উৎকর্ষতা প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তাহারা তাঁহাকে চূড়ান্তভাবে নিঃশেষ করিয়া দিবার জন্য তাঁহার সম্বন্ধে নানা মিথ্যা কুৎসাও রটনা করিতে লাগিলেন। অনেক পরে এ বিষয়ে স্বামীজী মিসেস বুলের নিকট এক পত্রে ২১শে মার্চ, (১৮৯৫) লিখিয়াছেন, "চিকাগোতে আমার বিরুদ্ধে এইরূপ মিথ্যা কুৎসা রোজই রটনা করা হইত।"

ইহার পর দেখা যায়, স্বামীজী চিকাগো হইতে আমেরিকার মধ্য-পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলের বক্তৃতা-সফরে বাহির হইয়া যেখানে

গিয়াছেন, সেখানেই স্থানীয় গোঁড়া ধর্মযাজকগণ গির্জার বেদী সকল হইতে তাঁহাকে অল্পাধিক আক্রমণ করিয়াছেন। মেম্ফিসে একটি ধর্মযাজক গির্জার বেদী হইতে (স্বামীজীকে লক্ষ্য করিয়াই) একথাও বলেন, "ধর্মমহাসভা হইতেছে উনবিংশ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা বড় প্রতারণা।" তবে এই আক্রমণ ডেট্রয়েটে চরমে উঠে। তাহার প্রথম পর্যায় আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করিয়াছি। দ্বিতীয় পর্যায়ের বিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে দেওয়া হইল।

আমরা দেখিয়াছি ২৩শে ফেব্রুআরি স্বামীজী ডেট্রয়েট ত্যাগ করেন। কিন্তু তৎপূর্বে ২১শে ফেব্রুআরি তিনি তাঁহার শেষ বক্তৃতায় যে কয়টি স্পষ্ট কথা বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহার জ্বালা ডেট্রয়েটের গোঁড়া ধর্মযাজক ও মিশনারীগণ আর ভুলিতে পারেন নাই। তাই, স্বামীজী চলিয়া গেলেও, তাহারা একযোগে শহরের গির্জাগুলির বেদী সকল হইতে তাঁহাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। উদ্দেশ্য যেভাবে হউক এই আপদের সকল প্রভাব সমূলে নষ্ট করিতে হইবে। কিন্তু এই কার্যে রত হইয়া তাহারা এত উগ্র ও অসংযত-ভাবে কথা বলিতে লাগিলেন যে, শহরের কোন কোন সংবাদপত্র উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া কিছু লিখিতে বাধ্য হইলেন। একটি কাগজ (Detroit Journal) বিদ্রূপ করিয়া লিখিলেন, "কানন্দ ডেট্রয়েটে আসায় অন্ততঃ একটি সুফল পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার নাম ও কথাগুলি অন্তত এক ডজন বা ততোধিক স্থানীয় ধর্মযাজকদের গতকল্যকার বক্তৃতার বিষয় যোগাইয়াছে।"

অপর একটি কাগজ (Detroit Tribune) লিখেন, "একজন হিন্দু যদি উত্তম ইংরেজিতে যুক্তির দ্বারা দেখান যে ভারতে প্রেরিত মিশনারীগণ তাঁহার দেশের ধর্মের প্রতি সুবিচার করেন নাই, তাহা হইলে তদ্দারা যে খ্রীষ্টান ধর্ম বিপন্ন হইতে পারে তাহা সাধারণ লোকের জ্ঞানবুদ্ধিতে আসে না। তাই তাহারা বুঝিতেই পারিতেছে না, কি করিয়া এক ডজন বা এক কুড়ি সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ধর্ম-যাজক মনে করিতেছেন যে একজন সহায়-সম্বলহীন মূর্তিপূজক তাঁহার

ধর্ম সমর্থন করিতেছে বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে গির্জা সকলের বেদী হইতে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করা আবশ্যক, বিশেষতঃ সে যখন এ দেশে একেবারে একা ও কোটি কোটি খ্রীষ্টানের দ্বারা পরিবেষ্টিত।"

উপরি-প্রদত্ত সংবাদপত্রের উদ্ধৃতি দুইটি হইতেই বোঝা যাইবে যে স্বামীজীর বিরুদ্ধে এই সময়ে ধর্মযাজক ও মিশনারীগণের আক্রমণ কি তীব্রভাবে চলিতেছিল। ডেট্রয়েটের জনসাধারণ সমাদরের সহিত তাহাদের এই শত্রুর বক্তৃতা শুনিয়াছেন বলিয়া তাহাদের অন্তর্দাহের আর সীমা ছিল না। একজন ধর্মযাজক তাহার অন্তরের এই জ্বালা ব্যক্ত করিয়া তাহার বক্তৃতার মুখবন্ধে বলেন, "আমি এই ধর্মবক্তৃতা দিচ্ছি, কারণ এমন অনেকে আছেন যারা কানন্দ যা কিছু বলে গেছেন তাই-ই বিশ্বাস করেছেন।" তারপর তিনি বলেন, "এই শহরের মেয়েরা যেভাবে কানন্দের পিছনে ছুটেছেন ও তাঁকে প্রশংসা করে আকাশে তুলেছেন, তা দেখে আমি যারপরনাই বিস্মিত হয়েছি।"

তাহাদের এই আক্রমণের দ্বারা ধর্মযাজকগণ যাহা প্রমাণ করিতে চাহিতেছিলেন তাহা সংক্ষেপতঃ এই। স্বামীজী মিথ্যাবাদী ও সয়তানের চর বা স্বয়ং সয়তানই। ভারতের নৈতিক অধঃপতনের সীমা নাই : মূর্তিপূজা, শিশুহত্যা, চরিত্রহীনতা, নারীনির্যাতন, জাতি-ভেদ ইত্যাদি যাহা কিছু মিশনারীগণ প্রচার করেন তাহা সবই সেখানে বীভৎস আকারে বর্তমান। এবং এই ঘোর অধঃপতিত জাতিকে একমাত্র খ্রীষ্টই রক্ষা করিতে পারেন। তাই, ইহাদের পরিত্রাণের জন্যই খ্রীষ্টান মিশনারীদিগকে ভারতে পাঠান একান্ত দরকার এবং আমেরিকানদের কর্তব্য তাহাদের অর্থের দ্বারা ভরণ-পোষণ ও অন্য সর্বপ্রকারে সাহায্য করা।

আর তাহাদের এই প্রচেষ্টা শুধু গির্জার বক্তৃতাতেই শেষ হইল না। শহরের কোন কোন খ্রীষ্টান সম্প্রদায় ও মিশনারী সোসাইটি বিভিন্ন স্থানে সভা করিয়া ভারত হইতে প্রত্যাগত মিশনারীদের দ্বারা সর্বসমক্ষে তাহাদের উক্তি সকল সমর্থন করাইতে লাগিলেন। আবার

ঠিক এই সময়েই ডেট্রয়েটে (২৮শে ফেব্রুআরি হইতে ৪ঠা মার্চ পর্যন্ত) "ছাত্র স্বেচ্ছাসেবকদের মিশনারী আন্দোলন" (The Student Volunteer Missionary Movement) সঙ্ঘের একটি জাঁকালো ধরনের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের অধিবেশন হইল— খুব উদ্যম ও উৎসাহের সঙ্গে। ইহাতে ১২০০ (ছাত্র) প্রতিনিধি যোগ দেন, যাহারা সকলেই বিদেশে গিয়া মিশনারীর কাজে জীবন নিয়োজিত করিতে উদগ্রীব। এই সভায় ভারতে কর্মরত মিশনারীগণও তারযোগে একটি উদ্দীপনাপূর্ণ বার্তা পাঠাইলেন : "ভারতের জন্য অবিলম্বে আর ১০০০ উৎসাহী স্বেচ্ছাসেবক মিশনারী দরকার।" সমস্ত উল্লেখ করিয়া একটি সাম্প্রদায়িক কাগজ সানন্দে লিখিলেন, "কানন্দ মনভুলানো মিথ্যা যুক্তির দ্বারা যে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা এই সম্মেলনের ফলে কুয়াশার ন্যায় মিলাইয়া গেল।"

এইভাবে প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে সম্মেলন শেষ হইল। এবং গোঁড়া খ্রীষ্টানগণ মনে করিলেন মিশনারীদের জয় হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক ভারত সম্বন্ধে মিশনারীদিগের গালগল্পের উপর স্বামীজী যে সন্দেহ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহা আর গেল না। এবং এই মহোদ্যমপূর্ণ সম্মেলনের হৈ চৈ'এর মধ্যেই অনেকে স্বামীজীকে সমর্থন করিয়া ও মিশনারীদের নিন্দা ও উপহাস করিয়া সংবাদপত্রে চিঠি ও ও প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। এবং একদিন একটি সংবাদপত্রে (The Evening News) "খ্রীষ্টান ও মূর্তিপূজক" শিরোনামায় একটি খুব মজার বিদ্রূপাত্মক কবিতাও বাহির হইল। উহার চুম্বক এইরূপ—

'মন্দের রাজা—যাহাকে সয়তান বলা হয়—পাগড়ি ও আলখাল্লা পরিয়া এই সহরে নিজেকে কানন্দ বলিয়া পরিচয় দেয় এবং তাহার হিন্দু যুক্তির দ্বারা আমাদের সৈন্যগণকে (অর্থাৎ, মিশনারীদের) সম্পূর্ণ রূপে পরাজয় করে।

'তারপর এখন নানা স্থান হইতে আমাদের অপর সৈন্যসকল—কলেজের সাহসী ছাত্র মিশনারীগণ—এখানে আসিয়া জড় হইয়াছেন এবং তাহাদের দেখিয়া আমরা আনন্দে অধীর হইয়াছি। কিন্তু থামো,

আমাদের এই আনন্দ সম্ভবতঃ একটু তাড়াতাড়ি প্রকাশ করা হইতেছে। কারণ, ভাইসব, কে জানে ইহার পর কি ঘটিবে।'

কার্যতঃ যাহা ঘটিল তাহা স্বামীজীর ডেট্রয়েটে প্রত্যাগমন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে স্থানীয় খ্রীষ্টান ধর্মযাজক ও মিশনারীগণ দলবদ্ধভাবে তাঁহার যে তীব্র নিন্দা ও সমালোচনা করিতেছিলেন, তাহারই একটা জবাব দিবার জন্য তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে তিনি ৯ই মার্চ রাত্রে (১৮৯৪) পুনরায় ডেট্রয়েট শহরে আসিলেন। এবং বন্ধুগণের মুখে সবিশেষ শুনিয়া এবার তাঁহার মধ্যে যোদ্ধার ভাব পূর্ণমাত্রায় জাগিয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন যে প্রতিদ্বন্দ্বী মিশনারীগণকে একটা চরম আঘাত দেওয়া দরকার। এবং তদুদ্দেশ্যে ১১ই মার্চ, রবিবার, রাত্রে তিনি স্থানীয় অপেরা হাউসে একটি বক্তৃতা দিলেন, বিষয়—"ভারতে খ্রীষ্টান মিশন সমূহ।"

সেদিন সভাগৃহ শ্রোতাদের ভিড়ে ঠাসাঠাসিভাবে পরিপূর্ণ। মিঃ পামার (Hon. T. W. Palmer) একটি ছোট বক্তৃতার দ্বারা স্বামীজীকে সভায় উপস্থিত করিয়া দিলে, স্বামীজী বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। পূর্ণ আড়াই ঘণ্টাকাল ধরিয়া ঐ বক্তৃতা চলিল। এবং শ্রোতাগণ ঘন ঘন উচ্চ করতালি ধ্বনির দ্বারা তাঁহাকে তাহাদের সংবর্ধনা ও সমর্থন জানাইতে লাগিলেন। পরদিন স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিতে বক্তৃতাটির উচ্চ প্রশংসা বাহির হইল এবং কোন কোন কাগজ লিখিলেন, 'কানন্দের ডেট্রয়েটে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির মধ্যে এইটিই সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে।' এ বিষয়ে স্বামীজী নিজেও মেরী হেলকে লিখেন, "আমি এ পর্যন্ত যত বক্তৃতা দিয়াছি, তন্মধ্যে গতরাত্রের বক্তৃতাটি সর্বোত্তম হইয়াছে। মিঃ পামার আনন্দে অভিভূত বোধ করেন এবং শ্রোতাগণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ছিলেন। বক্তৃতা শেষ হইবার পূর্বে আমি নিজেও বুঝিতে পারি নাই যে আমি এত দীর্ঘ সময় ধরিয়া বক্তৃতা দিয়াছি।"

বস্তুতঃ এই বক্তৃতাটি স্বামীজি তথ্য, যুক্তি ও উদার মনমাতানো

সত্য সকলের সমাবেশের দ্বারা এমন করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, এই এক বক্তৃতাতেই মিশনারী ও ধর্মযাজকগণ নিশ্চুপ হইতে বাধ্য হইলেন। তাহারা বুঝিয়াছিলেন এই বক্তৃতার পরে তাহারা যাহা বলিবেন তাহাই সাধারণের নিকট অসমর্থনীয় বলিয়া গণ্য হইবে। তাই, দেখা গেল পরের রবিবার (১৮ই মার্চ) কোন গির্জার বেদী হইতে কোন ধর্মযাজকই স্বামীজীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে একটি কথা বলিতেও সাহস করিলেন না। এবং তাহাদের অবস্থা যে এইরূপ দাঁড়াইবে তাহা পূর্বেই অনুমান করিয়া একটি সংবাদপত্র (Sunday News Tribune) এই দিনকার সংখ্যায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখেন, "কানন্দ প্রথমবার চলিয়া যাওয়ার পর ডেট্রয়েটের গির্জা সকলের বেদী হইতে যে প্রবল আক্রমণ ধ্বনি শোনা গিয়াছিল, সেরূপ কোন শব্দ যে আজ আর উত্থিত হইবে তাহা মনে করে যায় না। এবং যদিও কানন্দের গত রবিবারের (১১ই মার্চ) আড়াই ঘণ্টাকালব্যাপী বক্তৃতাটি ধর্মযাজকগণের পক্ষে তাঁহার পূর্বের ভাষণগুলি হইতে অধিক ক্রোধোদ্দীপক ও তাহাদের পূর্বের উক্তিগুলির জবাবেই প্রদত্ত, তাহা হইলেও এবার যে তাহারা সকলে একমত হইয়া ঐরূপ কোন তীব্র প্রত্যুত্তর দিবেন তাহার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ, এই শান্ত হিন্দু আমাদের একটি উত্তম শিক্ষা দিয়াছেন এবং তাঁহার এখানকার কাজের ফল এই হইবে যে, আমাদের অন্তরের সহানুভূতির বিস্তার সাধন হইবে এবং নূতন নূতন বিষয় সকল বুঝিতে আমাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে।"

এই বক্তৃতাটি সম্বন্ধে অপর একটি কাগজের (Evening News) একটি মন্তব্যও এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই বক্তৃতায় স্বামীজী ভারতবর্ষে মিশনারী প্রচেষ্টার প্রথম সময় হইতে বক্তৃতাকাল পর্যন্ত সমস্ত ইতিহাস লক্ষ্য করিয়া খ্রীষ্টান মিশনারীগণের সর্বপ্রকার দোষগুলি ফুটাইয়া তুলেন ও তাহার তীব্র নিন্দা করেন। কিন্তু তিনি এত উচ্চ স্তরে উঠিয়া উদার সর্বজনীন সত্যের আলোকে তাঁহার কথাগুলি বলিয়াছিলেন যে, তাহাতে উক্ত কাগজটি লিখেন, "কানন্দ

খ্রীষ্টানদের সম্মুখে যেভাবে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা দিবার অধিকার তাঁহার আছে।"

স্বামীজী দ্বিতীয়বার ডেট্রয়েটে আসিয়া প্রথম সপ্তাহ মিঃ ও মিসেস পামারের অতিথি হইয়া থাকেন। মিঃ পামার (Hon. T. W. Palmer) ডেট্রয়েটের একজন বড় ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। পরে তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করেন ও ক্রমে সেনেটের সভ্য ও অন্য আরও উচ্চ পদাধিকারি হন। তিনি চিকাগো বিশ্ব-প্রদর্শনীর সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং ধর্মমহাসভার অধিবেশনকালে স্বামীজীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়।

মিঃ পামার একজন খুব উদার ও স্ফূর্তিযুক্ত লোক ছিলেন। তিনি স্বামীজীকে খুবই আনন্দে রাখিতেন। এবং তাঁহার সম্বন্ধে স্বামীজী মেরী হেলের নিকট এক পত্রে লিখেন, "মিঃ পামার আমাকে সমস্ত দিন হাসাইতেছেন।" মিঃ পামার তাঁহার পুরাতন বন্ধুদের (তাঁহার নিজের ভাষায় তাঁহার Old Boys' Club) মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। ইহারা সকলেই অসম্ভব রকমের ধনী ছিলেন। স্বামীজীর সঙ্গে পরিচিত হইয়া ইহাদের অনেকে তাঁহার সম্মানার্থে ভোজ দেন। ইহার একটি ভোজ সভার বর্ণনায় একটি সংবাদপত্র লিখেন, "এই প্রকার মজলিসে কানন্দ যারপরনাই আনন্দে থাকেন। তিনি সকল প্রশ্নের দ্রুত উত্তর দেন এবং তাঁহার কথাবার্তা চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ।"

সম্ভবতঃ মিঃ পামারের বাড়ীতে থাকিতেই (অথবা অন্ততঃ এই দ্বিতীয়বার ডেট্রয়েট পরিত্যাগের পূর্বেই) স্বামীজী বক্তৃতা কোম্পানির সহিত তাঁহার চুক্তি ভাঙ্গিয়া দেন। আমরা দেখিয়াছি এই তিন বৎসরের চুক্তিটি শুধু যে তাঁহাকে স্বাধীনতাহীন করিয়া রাখিয়াছিল তাহা নয়। উক্ত বক্তৃতা কোম্পানি স্বার্থের জন্য একদিকে যেমন তাঁহাকে অসম্ভব রকম খাটাইয়া শেষ করিয়া আনিতেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি তাঁহার ন্যায্য পাওনা হইতেও তাঁহাকে প্রথম হইতেই বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছেন।

অবশ্য, এই (আইন-সিদ্ধ) চুক্তিটি বাতিল করা কোন সহজ ব্যাপার ছিল না। কিন্তু মিঃ পামার ও তাঁহার প্রভাবশালী ব্যবসায়ী বন্ধুগণের সাহায্যে ইহা সম্ভব হয়। তবে এই চুক্তি ভঙ্গকালে স্বামীজী ঐ সময় পর্যন্ত যাহা কিছু আয় করিয়াছিলেন, তাহা সবই তাঁহার ঐ বক্তৃতা কোম্পানির অনুকূলে ছাড়িয়া দিতে হয়। তাহা ছাড়া বোঝা যায়, মার্চ মাসের (১৮৯৪) যে অংশেই উক্ত চুক্তি রদ হইয়া থাকুক না কেন, বক্তৃতা কোম্পানির পূর্ব-স্থিরীকৃত প্রোগ্রাম অনুসারেই সমস্ত মার্চ মাসটা তাঁহার কাজ করিতে হয়।

এক সপ্তাহকাল মিঃ পামারের বাড়ীতে থাকিবার পর স্বামীজী মিসেস্ ব্যাগলির পীড়াপীড়িতে তাঁহার বাড়ীতে চলিয়া আসেন (১৭ই মার্চ, ১৮৯৪)। এবং বন্ধুগণের অনুরোধে ১৯শে মার্চ রাত্রে স্থানীয় অডিটেরিয়ামে আর একটি বক্তৃতা দেন (বিষয়—বৌদ্ধধর্ম)। তৎপর তিনি (সম্ভবতঃ বক্তৃতা কোম্পানির পূর্ব ব্যবস্থানুসারে) অদুরবর্তী ক্ষুদ্র বে সিটি ও স্যাগিন (Michigan) শহরে গিয়া যথাক্রমে ২০শে ও ২২শে মার্চ তারিখে একটি করিয়া বক্তৃতা দেন। তাহার পর তিনি (বন্ধুগণকে পূর্ব-প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুসারে) ডেট্রয়েটে ফিরিয়া আসেন এবং ২৪শে মার্চ সন্ধ্যায় ইউনিটেরিয়ান চার্চে আরও একটি বক্তৃতা দেন। (বিষয়—ভারতের নারীগণ)।

অন্যদিকে, এই কালের আর একটি জ্ঞাতব্য সংবাদ এই। আমরা দেখিয়াছি তিনি ১১ই মার্চ তারিখে "ভারতে খ্রীষ্টান মিশন সমূহ" বিষয়ে বক্তৃতা দিবার পর গোঁড়া ধর্মযাজক ও মিশনারীগণ নীরব হন ও প্রকাশ্যে তাঁহার বিরুদ্ধে আর একটি কথাও বলিতে সাহস করেন না। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার উপর তাহাদের আক্রোশ যে কিছু কমিয়াছিল তাহা নয়। প্রকাশ্য আক্রমণ নিষ্ফল ও ক্ষতিকর বুঝিয়া তাহারা এখন নিজেরা গোপন থাকিয়া দুইটি নূতন উপায়ে তাঁহাকে দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় করিবার প্রয়াস পাইলেন। একদিকে তাহারা ভারতবর্ষে (তাঁহার দেশবাসীর মন ভাঙ্গাইবার জন্য) তাঁহার আমেরিকার কার্যাবলী সম্বন্ধে নানা মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ

করিলেন, অন্যদিকে আমেরিকাতে তাহারা (কানাকানির দ্বারা) তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে নানা কুৎসা রটনা করিতে লাগিলেন। অবশ্য তাঁহার বিরুদ্ধে এইরূপ রটনা চিকাগো শহরে আগেও হইয়াছে। কিন্তু ডেট্রয়েটে উহা শুধু নূতনই ছিল না,—উহা অত্যন্ত বেপরোয়া ভাবে চালানো হয়। তবে এ সম্বন্ধে যে অধিক খুঁটিনাটি সংবাদ পাওয়া যায় তাহা নয়। এবং পাওয়া গেলেও তাহা যে এই অলোকসামান্য মহাপুরুষের জীবনীতে স্থান পাওয়ার যোগ্য মনে করা সম্ভব হইত তাহাও নয়। তাহা হইলেও দেখা যায়, একটি ঘটনা স্বামীজীর প্রায় সকল জীবনীতেই আলোচিত হইয়াছে। কারণ, তাহা হইতে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, তাঁহার বিরুদ্ধে কি সাংঘাতিক ও জাজ্বল্যমান মিথ্যা সকল প্রচার হইত এবং আমেরিকাতে তিনি কি ভয়ঙ্কর ঈর্ষা, দ্বেষ ও পীড়াদায়ক আঘাত সকল সহ্য করিয়া ঐ দেশবাসীগণেরই কল্যাণসাধনে নিজেকে তিলে তিলে নিঃশেষ করিয়াছিলেন।

ঘটনাটি এই। সরকারী রিপোর্ট সকলে এই ভাবের একটি সংবাদ বাহির হয়: "বিবেকানন্দের সাফল্য ও শিক্ষার জন্য ভারতীয় মিশনারী তহবিলগুলিতে চাঁদার পরিমাণ এক বৎসরে দশ লক্ষ পাউণ্ড কমিয়া গিয়াছে।" ইহাতে কতকগুলি মিশনারী উন্মত্তপ্রায় হইয়া বেপোরোয়াভাবে স্বামীজীর নামে নিম্নলিখিত কুৎসাটি রটনা করিয়া দেন: "বিবেকানন্দের জন্য (মিসিগ্যানের ভূতপূর্ব গবর্ণরের স্ত্রী) মিসেস ব্যাগলির একটি পরিচারিকাকে বরখাস্ত করিতে হইয়াছে। তিনি ভয়ানকভাবে ইন্দ্রিয়পরবশ।" সৌভাগ্যবশতঃ এই বিষয়েই মিসেস ব্যাগলির দুইখানা ও তাঁহার কন্যা হেলেন ব্যাগলির একখানা এই মোট তিনখানা চিঠি পাওয়া যায়, যাহার দ্বারা তাঁহারা অত্যন্ত তীব্রভাবে ঐ কুৎসার সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন। মিসেস ব্যাগলি তাঁহার প্রথম পত্রখানি লিখেন এনিস্কোয়াম হইতে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন তারিখে তাঁহার একটি মহিলা বন্ধুর নিকট। ইহাতে তিনি লিখেন—

"তুমি আমার প্রিয় বন্ধু বিবেকানন্দের কথা লিখিয়াছ। তাঁহার

চরিত্রের প্রশংসা করিবার সুযোগ পাইয়া আমি আনন্দিত। তাঁহার সম্বন্ধে কেহ কোন সন্দেহ প্রকাশ করিলে আমি যারপরনাই ক্রুদ্ধ বোধ করি। আমেরিকাতে তিনি আমাদের জীবনের উচ্চতর ভাবসকল দিয়াছেন, যাহা পূর্বে কোনদিনই আমাদের ছিল না। ডেট্রয়েটের মত রক্ষণশীল শহরের সমস্ত ক্লাবেই তিনি যে ভাবে সম্মানিত হন, তাহা আর কেহ কখন হন নাই এবং আমার শুধু ইহাই মনে হয়, যাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন তাহারা তাঁহার মহত্ব ও সুক্ষ্ম আধ্যাত্মিক অনুভূতি সকলের জন্য তাঁহার প্রতি ঈর্ষান্বিত।

"খ্রীষ্টানদিগের নিকট তিনি এক নূতন প্রকাশ। তিনি আমাদের পক্ষে একটা পুণ্যতর ও মহত্তর ব্যবহারিক জীবন যাপন করা সম্ভব করিয়াছেন। ধর্মপ্রচারক ও আদর্শ হিসাবে তাঁহার সমকক্ষ কেউ আছেন বলিয়া আমি জানি না। তিনি ইন্দ্রিয়পরবশ এ কথা বলা ঘোর অন্যায় ও অসত্য। যাহারাই কিছুদিন ধরিয়া তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাহারাই তাঁহার অমূল্য গুণাবলীর উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন।……আমার বাড়ীতে তিনি তিন সপ্তাহের অধিক কাল অতিথি ছিলেন এবং আমার পুত্রগণ, জামাতা এবং আমার সমস্ত পরিবারবর্গ তাঁহাকে একজন সুশীল ভদ্রলোক, প্রীতিকর সঙ্গী ও চির-অভ্যর্থনীয় অতিথি বলিয়াই জানিয়াছে। আমি তাঁহাকে আমার এনিস্কোয়ামের গ্রীষ্মাবাসে আসিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছি এবং আমার পরিবারে তিনি সকল সময়েই সম্মানিত ও সংবর্ধিত হইবেন।……তিনি একজন মহৎ শক্তিমান মানুষ ও সর্বদাই ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকেন। তিনি শিশুর মত সরল ও (অপরের প্রতি) বিশ্বাসপূর্ণ।………যেখানেই তিনি বক্তৃতা দিয়াছেন, সেখানেই লোকে তাঁহাকে আনন্দের সহিত শ্রবণ করিয়াছে ও বলিয়াছে, 'মানুষকে এইভাবে কথা বলতে আর কখন শুনিনি।' তিনি কাহারও বিরোধিতা করেন না, কিন্তু সকলকেই এক উচ্চস্তরে তুলিয়া দেন,—আর তখন তাহারা দলীয় নাম ও মতের অতীত কিছু দেখিতে পায় এবং তাহাদের মনে হয় তিনি ও তাহারা একই ধর্মে সমবিশ্বাসী।

"তাঁহাকে জানিয়া এবং তাঁহার সহিত এক বাড়ীতে বাস করিয়া প্রত্যেক মানুষই উন্নততর হইবেন।.........আমি চাই আমেরিকার প্রত্যেকেই তাঁহাকে জানুন এবং ভারতের যদি তাঁহার মত আরও লোক থাকে, তবে ভারত তাহাদেরও আমাদের নিকট প্রেরণ করুন।"

মিসেস ব্যাগলির দ্বিতীয় পত্রখানি ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ তারিখে ঐ একই মহিলাবন্ধুর নিকট লিখিত।[১] ঐ বন্ধুটি ঘটনাটি সম্বন্ধে কোনও স্ত্রীলোকের নিকট হইতে আরও কিছু শুনিয়া মিসেস ব্যাগলিকে তাহা জানাইয়াছিলেন। এবং তাহারই উত্তরে মিসেস ব্যাগলি তাঁহার এই দ্বিতীয় পত্রে লিখেন, "...... তোমার নিকট আমার প্রথম কথাই এই যে, স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে এই সকল রটনা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সর্বৈব মিথ্যা। এবং ইহার চাইতে অধিক মিথ্যা আর কিছু হইতে পারে না। তিনি আমাদের সহিত (মোট) যে ছয় সপ্তাহ[২] ছিলেন, তাহার প্রতিটি দিন আমরা সকলেই আনন্দে কাটাইয়াছি।.........গত গ্রীষ্মকালে আমার এনিস্কোয়ামের আবাসে আমরা পুনরায় তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলাম। এবং তিনি তিন সপ্তাহকাল আমাদের সহিত থাকিয়া শুধু যে আমাদেরই কৃতার্থ করিয়াছিলেন তাহা নয়, আমার প্রতিবেশী বন্ধুদেরও প্রচুর আনন্দ দিয়াছেন। আমার (মেয়ে-পুরুষ) সকল ভৃত্যই অনেক বৎসর আগেকার এবং তাহারা সকলেই এখনও আমার কাছেই আছে।...... এই সকল গল্প যে কি রকম সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন তাহা তুমি (এখন) বুঝিতে পারিতেছ। তুমি ডেট্রয়েটের যে স্ত্রীলোকটির কথা বলিয়াছ,

১। মিসেস ব্যাগলির এই দ্বিতীয় পত্রখানি যখন লিখিত হয়, তখন ব্রুকলিনের রমাবাই সার্কেল স্বামীজীর নামে এই সকল কুৎসা পুনঃপ্রচারে রত হন। ব্রুকলিনের ঘটনাবলী আলোচনাকালে আমরা ইহার হেতু বুঝিতে পারিব।

২। (পূর্ব পত্রে উল্লিখিত) তিন সপ্তাহ ডেট্রয়েটে ও তৎপর (এই পত্রে কথিত) এনিস্কোয়াম গ্রামে আর তিন সপ্তাহ, মোট ছয় সপ্তাহ।

তাহাকে আমি জানি না। আমি শুধু ইহাই জানি যে তাহার কাহিনীর প্রতিটি কথা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা।·········বিবেকানন্দকে আমরা সকলেই জানি। (কিন্তু) যাহারা এই ঘোর মিথ্যা বলিয়া বেড়াইতেছে তাহারা কাহারা?·········"

মিসেস ব্যাগলি যেদিন তাঁহার এই দ্বিতীয় পত্র লিখেন, তাহার পরের দিন (২১শে মার্চ, ১৮৯৫) তাঁহার কন্যা হেলেন ব্যাগলিও এক পত্রে লিখেন—

"আমি জানিয়া সুখী হইলাম যে R—এই কাহিনীটি রটনা করেন নাই। সম্ভব হইলে আমি মিসেস এস্—'এর সঙ্গে দেখা করিব এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব তিনি এই সকল কথা কাহার নিকট হইতে পাইয়াছেন। অবশ্য আমি ইহা ঠাণ্ডাভাবেই করিব, কিন্তু বিবেকানন্দ সম্বন্ধে এই সব মিথ্যা কে রটায় তাহা আমি সম্ভব হইলে বাহির করিবই। এই সকল কথা দ্রুত ছুটে এবং যদি একবার ইহার একটিরও মূলোৎপাটন করা যায়, তাহা হইলে হয়তো এই সকল স্ত্রীলোক একটু চিন্তা না করিয়া আর কোন কাহিনী অত দ্রুত রটনা করিতে অগ্রসর হইবে না। তাহারা শুধু যদি নিজেরা একটু অনুসন্ধান করে, তাহা হইলেই দেখিতে পাইবে এই সব কাহিনী কিরূপ মিথ্যা।"

এই পত্র কয়খানির পর, এই বিষয়টি আর অধিক অনুসরণ করা নিষ্প্রয়োজন। তবে এই সম্পর্কে স্বামীজীর লিখিত একখানি পত্র বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মার্চ তারিখে তিনি মিসেস্ সারা সি বুলের নিকট ক্ষোভের সহিত লিখিয়াছেন, "রমাবাই সার্কেল আমার নানা কুৎসা রটনা করিতেছে শুনিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। অপর নানা রটনার মধ্যে একটি এই, আমার অসচ্চরিত্রতার জন্য ডেট্রয়েটের মিসেস ব্যাগলির একটি পরিচারিকাকে বরখাস্ত করিতে হইয়াছে। মিসেস বুল, আপনি কি বুঝিতেছেন না, মানুষ যত ভালভাবেই চলুক না কেন, এমন সকল লোক সব সময়েই থাকিবে যাহারা তাহার নামে হীনতম মিথ্যা সকল রচনা করিবে। চিকাগোতে আমার বিরুদ্ধে এইরূপ সব মিথ্যা রোজই রটনা করা হইত।

"আর বিনাব্যতিক্রমে এই সকল (কুৎসারটনাকারী) স্ত্রীলোক-গণই হইতেছেন খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় খ্রীষ্টান!......"

ধর্মান্ধ খ্রীষ্টানদের শত্রুতাচরণ সম্বন্ধে আর একটি ভিন্ন ধরনের সংবাদ পাওয়া যায়। ডেট্রয়েটে একদিন একটি আহারের নিমন্ত্রণে স্বামীজী কফি খাইতে উদ্যত হইতেই দেখেন রামকৃষ্ণ তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "খেয়ো না, এ বিষ মিশ্রিত।"

যাহা হউক, এই সকল নিন্দা, কুৎসা ও হত্যার প্রচেষ্টার মধ্যেও স্বামীজী তাঁহার কর্মপথে অবিচল রহিয়াছেন। এবং এই সম্পর্কে তিনি ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ তারিখের এক পত্রে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের নিকট লিখেন, "ধর্মযাজকেরা আমাকে হীন প্রতিপন্ন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু গুরু আমার সঙ্গে আছেন, আমার কে কি করিতে পারে? আর সমস্ত আমেরিকান জাতি আমাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, আমার ব্যয় বহন করে এবং আমাকে গুরুর মত ভক্তি করে।"

ডেট্রয়েটের কাজের সঙ্গে স্বামীজীর মধ্য-পশ্চিম আমেরিকার কাজ শেষ হয়। এবং তিনি ৩১শে মার্চ বা তাহার দুই-এক দিন পরে ডেট্রয়েট ত্যাগ করিয়া খুব সম্ভবতঃ প্রথমে চিকাগো যান ও সেখানে তাঁহার আমেরিকান হোমে (হেলদের বাড়ী) প্রায় দেড় সপ্তাহকাল বিশ্রাম করেন।

(৬) ডেট্রয়েটে তৃতীয়বার :

দেখা যায়, (দুই বৎসর পরে) ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগে স্বামীজী নিমন্ত্রিত হইয়া পুনরায় একবার দুই সপ্তাহের জন্য ডেট্রয়েটে আসিয়া ক্লাস গ্রহণ ও বক্তৃতা দান করেন। এবং মেরী ফাঙ্কের বিবরণ হইতে জানা যায়, 'এইবার তাঁহার স্টেনোগ্রাফার বিশ্বাসী গুডউইন (J. J. Goodwin) তাঁহার সঙ্গে ছিলেন এবং তাহাকে লইয়া তিনি একটি (সপরিবারে থাকার) হোটেলে থাকেন। এই হোটেলের বড় বসিবার ঘরখানিতে তিনি ক্লাস করিতেন ও বক্তৃতা

দিতেন। উহাতে ভিড় এতো হইত যে ঐ ঘর এবং তৎসহ হল, সিঁড়ি ও লাইব্রেরি গাদাগাদিভাবে ভরিয়া যাইবার পরেও বহুলোকের ফিরিয়া যাইতে হইত। এইকালে স্বামীজী ভক্তির ভাবে পরিপূর্ণ ছিলেন।'

স্বামীজী ডেট্রয়েটে তাঁহার শেষ বক্তৃতা দেন ডাঃ গ্রসম্যানের গির্জায় (Temple Beth El)। এই বক্তৃতায় শঙ্কাজনক ভিড় হয় এবং স্থানাভাবে শত শত লোককে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। বক্তৃতার বিষয় ছিল "সর্বজনীন ধর্মের আদর্শ"। উহা অতি উচ্চাঙ্গের ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল এবং শ্রোতাগণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় উহা শ্রবণ করেন।

জানা যায়, স্বামীজীর তৃতীয়বারের আগমনকালে মিসেস্ ব্যাগলি (এবং সম্ভবতঃ মিঃ পামারও) ডেট্রয়েটে ছিলেন না। মিসেস ব্যাগলি এই সময়ে কোলোর‍্যাডোতে তাঁহার একটি অসুস্থ কন্যার কাছে ছিলেন। দুই বৎসর পরে ঐ কোলোর‍্যাডোতেই এ্যাপেণ্ডিসাইটিস রোগে তাহার মৃত্যু হয়।

যাহা হউক, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী এইভাবে পুনরায় একবার আমেরিকার মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলে আসিলেও, দ্বিতীয়বার ডেট্রয়েট ত্যাগের পর তিনি প্রধানতঃ আমেরিকার পূর্বাঞ্চলেই কাজ করিয়াছেন।

ছাব্বিশ

আমেরিকার পূর্বোপকূলে

ভ্রমণ—প্রথম পর্যায়

(১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল-মে)

(১) নর্দাম্পটন, লিন, নিউ ইয়র্ক ও বোষ্টন শহরে :

গত অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের শেষে স্বামীজী দ্বিতীয়বার ডেট্রয়েট ত্যাগ করিয়া প্রথমে চিকাগো যান। কিন্তু তৎপূর্বেই তিনি আমেরিকার পূর্বোপকূলে বক্তৃতা দিবার জন্য কয়েকটি নিমন্ত্রণ পাইয়া সেদিকে যাইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। তাই, তিনি এবার চিকাগো শহরে প্রায় দেড় সপ্তাহকাল বিশ্রাম লইয়া আমেরিকার পূর্বোপকূলে বক্তৃতা দিতে বাহির হন।

যতদূর বোঝা যায়, স্বামীজী চিকাগো হইতে সর্বপ্রথম বোষ্টন শহরে যান। সেখানে (সম্ভবতঃ ১১ই কি ১২ই এপ্রিল তারিখে) একটি মহিলা তাঁহাকে এক মজলিসে সংবর্ধিত ও আপ্যায়িত করেন। তারপর তিনি তথা হইতে ১৩ই এপ্রিল তারিখে নর্দাম্পটন শহরে (Massachusetts) যান। সেখানে তিনি ১৪ই এপ্রিল তারিখে শহরের সিটি হলে একটি এবং ১৫ই এপ্রিল তারিখে স্থানীয় স্মিথ কলেজে একটি, এই মোট দুইটি বক্তৃতা দেন।

নর্দাম্পটন হইতে স্বামীজী লিন শহরে (Massachusetts) যান। সেখানে তিনি প্রায় এক সপ্তাহকাল মিসেস ব্রীডের (Mrs. Francis W. Breed) অতিথি হইয়া থাকেন। নর্দাম্পটনের ন্যায় লিনেও তিনি দুইটি বক্তৃতা দেন—একটি ১৭ই এপ্রিল তারিখে একটি মহিলা ক্লাবে (North Shore Club) এবং অপরটি ১৮ই এপ্রিল তারিখে স্থানীয় অক্সফোর্ড হলে।

মিসেস ব্রীড লিনের একজন অত্যন্ত ধনী ব্যবসায়ীর স্ত্রী ও প্রভাবশালী সমাজনেত্রী ছিলেন। লিন শহর বোষ্টন হইতে মাত্র দশ মাইল দূরে অবস্থিত থাকায়, তিনি অনেক সময়ে বোষ্টনেও থাকিতেন। সেখানে তাঁহার বাড়ীতে স্বামীজীর অধ্যাপক রাইটের সঙ্গে দেখা হয় ও অনেক নূতন লোকের সহিত পরিচয় হয়।

স্বামীজীর লিনের বক্তৃতা দুইটির উল্লেখযোগ্য কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে তাঁহার নর্দাম্পটনের বক্তৃতা দুইটি সম্বন্ধে কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। সর্বত্র যেরূপ হইয়াছে, এখানেও সেইরূপই হয়। স্বামীজীর বক্তৃতায় গোঁড়ার দল ব্যতীত অপর সকল শ্রোতাই মুগ্ধ হন। প্রথম দিনের বক্তৃতার পর কতিপয় সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ-শিক্ষিত গোঁড়া মতের লোক তাঁহার বাসায় আসিয়া তাঁহার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হন। উদ্দেশ্য—খ্রীষ্টান ধর্মই যে একমাত্র সত্য ধর্ম তাহা প্রতিপন্ন করা। কিন্তু স্বামীজীর গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ উত্তরগুলি তাহাদের সম্পূর্ণরূপে নিরুত্তর করে। ইহাতে তাঁহার সমর্থকগণ যারপরনাই আনন্দিত হন। এবং এই বিষয়ে একটি মহিলা শ্রোতা লিখিয়াছেন, স্বামীজীর জয়ে তাহারা নিজেদের অন্তরের আকাঙ্ক্ষারই জয় অনুভব করিয়াছিলেন।

লিন হইতে স্বামীজী (সর্বপ্রথম) নিউ ইয়র্কে যান ও সেখানে ২৪শে এপ্রিল হইতে ৬ই মে পর্যন্ত থাকেন। এই সময়ে তিনি সেখানে কয়েকটি বক্তৃতা দেন, নানা ঘরোয়া বৈঠকে আলাপ-আলোচনা করেন এবং বহু লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন।

এই শহরে স্বামীজী তাঁহার প্রথম বক্তৃতা দেন ২৪শে এপ্রিল সন্ধ্যায় ওয়ালডর্ফ হোটেলে—মিসেস্ স্মিথের কথোপকথন চক্রের (Mrs. Smith's Conversation Circle) সভ্যদের নিকট। এবং তাঁহার দ্বিতীয় বক্তৃতা তিনি দেন ২রা মে রাত্রে মিস্ মেরী ফিলিপ্‌সের বাড়ীতে। মিস্ ফিলিপ্‌স্ স্বামীজীর ওয়ালডর্ফ হোটেলের প্রথম বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন। পরে তিনি তাঁহার বিশেষ বন্ধু ও সহায় হন। নিউ ইয়র্কে স্বামীজী মাঝে মাঝে তাহার আতিথ্য গ্রহণ

করিয়াছেন এবং কখন কখন তাহার বাড়ী (19, West Thirty-eighth Street) তাঁহার হেড কোয়ার্টাস-রূপে ব্যবহার করিয়াছেন। কারণ দেখা যায়, তিনি এই বাড়ীর ঠিকানা দিয়া ভারতে বহু চিঠিপত্র লিখিয়াছেন।

উপরি-বর্ণিত বক্তৃতা দুইটিতে যাহারা উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের মধ্যে উক্ত মিস্ ফিলিপ্স্ ব্যতীত আরও কেহ কেহ পরে স্বামীজীর কাজে বিশেষ সহায় হইয়াছেন। (উক্ত ওয়ালডর্ফ হোটেলের প্রথম বক্তৃতায় উপস্থিত) ডাঃ ও মিসেস গার্নসি (Dr. and Mrs. Guernsey) স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হন এবং নিউ ইয়র্কে তিনি অনেক সময়ে তাহাদের বাড়ীতেও রহিয়াছেন। (উক্ত উভয় বক্তৃতায় উপস্থিত ও প্রথম বক্তৃতার উদ্যোক্তা) মিসেস্ আর্থার স্মিথ ও (দ্বিতীয় বক্তৃতায় উপস্থিত) মিস্ এমা থার্সবি মিস্ ফিলিপ্সের সহিত স্বামীজীর (পরে স্থাপিত) নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির সভ্য হন। এবং (দ্বিতীয় বক্তৃতায় উপস্থিত) মিঃ লিওন ল্যাণ্ডসবার্গ স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইহারা ব্যতীত, মিস সারা ফার্মার নামে একটি বিশেষ উৎসাহী ও কর্মঠ মহিলার সঙ্গেও স্বামীজীর এই সময়ে পরিচয় হয়। এই মহিলাটি পরে তাঁহার নিউ ইয়র্কের কার্য-সংস্থাপনে বিশেষ সাহায্য করেন।

স্বামীজী নিউইয়র্কে থাকিতে মিসেস ব্রীড তাঁহার জন্য বোষ্টনে তিনটি এবং হার্ভার্ডে তিনটি, মোট ছয়টি বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করেন। তদনুসারে স্বামীজী ৬ই মে, রবিবার, নিউ ইয়র্ক হইতে রওনা হইয়া ঐ দিনই বোষ্টনে পৌঁছেন ও সেখানে একটি হোটেলে উঠেন।

বোষ্টনে তিনি তাঁহার প্রথম বক্তৃতাটি দেন একটি মহিলা ক্লাবে (Mrs. Howe's Women's Club) ৭ই মে, সোমবার। দ্বিতীয় বক্তৃতা দেন ৮ই মে, মঙ্গলবার, (হাভার্ড ইউনিভার্সিটির সঙ্গে সংযুক্ত) একটি মেয়ে কলেজে—প্রধানতঃ ছাত্রীদের জন্য। এবং তৃতীয় বক্তৃতা দেন বোষ্টনের একটি ভদ্রলোকের (Mr. Collidge) বাড়ীতে। এই তিনটি বক্তৃতার মধ্যে শেষের দুইটির কিছু সংবাদ পাওয়া যায়।

মিসেস রাইট লিখিয়াছেন, 'দ্বিতীয় বক্তৃতাটি খুবই কবিত্বপূর্ণ হইয়াছিল। তবে উহাতে এবং উহার পরের বক্তৃতাটিতেও তিনি (স্বামীজী) আমেরিকানদের নানা দোষের জন্য কৌতুক ও শ্লেষপূর্ণ ভাষায় তিরস্কার করেন।'

স্বামীজী তাঁহার চতুর্থ ও পঞ্চম বক্তৃতা দেন স্থানীয় এ্যাসোসিয়েসন হলে যথাক্রমে ১৪ই ও ১৬ই মে তারিখে। এই দুইটি বক্তৃতাই তিনি দেন দুইটি শিশু প্রতিষ্ঠানের (নাম যথাক্রমে Tyler Street Day Nursery ও Ward 16 Day Nursery) সাহায্যার্থে। আমরা দেখিয়াছি তিনি পূর্বেও একস্থানে (মেম্‌ফিসে) এইভাবে নিজের লভ্য তথাকার দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে দান করিয়াছেন। হয়তো বা এইরূপ দান তিনি (প্রার্থনামাত্রে) আমেরিকার আরও নানা স্থানে করিয়াছেন, যাহার কোন সংবাদ আমরা জানি না।

উপরি-কথিত বক্তৃতা কয়টি দিয়া স্বামীজী অতি অল্প সময়ের মধ্যে বোষ্টনে খুবই জনপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। এবং তাঁহার উক্ত (১৪ই মে তারিখের) চতুর্থ বক্তৃতার সমালোচনায় একটি সংবাদপত্র লিখেন, "এ্যাসেসিয়েসন হল মহিলাদের দ্বারা ভরিয়া গিয়াছিল।··· গত বৎসর চিকাগোতে স্বামী বিবেকানন্দ যেরূপ হইয়াছিলেন, বোষ্টনেও সেইরূপ তিনি সকলের একটি অতি প্রিয় সখের বস্তু হইয়াছেন। এবং তাঁহার সৎ, আন্তরিক ও মার্জিত ব্যবহারের দ্বারা তিনি বহু লোকের বন্ধুত্ব লাভ করিয়াছেন।"

দেখা যায়, স্বামীজী তাঁহার পূর্বোক্ত (১৬ই মে তারিখের পঞ্চম) বক্তৃতাটি দেন বৈকাল সাড়ে তিনটার সময়। তৎপর ঐ দিনই রাত্রি আটটার সময় তিনি তাঁহার ষষ্ঠ বা শেষ বক্তৃতাটি দেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। এবং তৎসম্বন্ধে পরের দিন একটি সংবাদপত্র লিখেন, "বক্তৃতাটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল এবং বক্তার পরিষ্কার উচ্চ কণ্ঠস্বর ও আন্তরিকতাপূর্ণ বক্তৃতাভঙ্গী তাঁহার প্রত্যেকটি কথাকে অসাধারণ প্রভাবযুক্ত করিয়া তুলিয়াছিল।"

বোষ্টনে স্বামীজী এইবার অনেক নূতন বন্ধু (ও কয়েকটি পুরাতন

বন্ধুর সহিত ঘনিষ্ঠতা) লাভ করেন। তাহাদের মধ্যে মিসেস সারা সি বুলের (Mrs. Ole Bull) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহার কথা আমরা পরে নানা অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে পাইব।

(২) চিকাগোয় পাঁচ সপ্তাহ (১৮৯৪, মে-জুন) :

বোষ্টনের কাজ শেষ হইলে, স্বামীজী তথা হইতে ২৪শে মে বা তাহার দুই-এক দিন পূর্বে চিকাগো পৌঁছেন। এবং তখন হইতে সমস্ত জুন মাসটা (অর্থাৎ, মোট পাঁচ সপ্তাহ) তিনি চিকাগো হেলদের বাড়ীতে থাকিয়া বিশ্রাম করেন।

তবে এইবার তাঁহার সেখানে যে প্রকৃত বিশ্রাম কিছু হয় তাহা মনে করা যায় না। কারণ দেখা যায়, এই সময়ে তাঁহার শত্রুদের একটি মিথ্যা প্রচার ও তাহা নিরাকরণ বিষয়ে তাঁহার ভারতের সমর্থক-গণের নিষ্ক্রিয়তার কথা চিন্তা করিয়া তিনি একটা দারুণ অশান্তি ও অসন্তোষের মধ্যে দিন কাটাইয়াছেন। এই মানসিক অবস্থায় যাহারা তাহাদের স্নেহ, প্রীতি ও প্রাণপূর্ণ কথাবার্তার দ্বারা তাঁহাকে প্রফুল্ল ও উৎসাহিত রাখিতে পারিতেন, সেই পুণ্যময়ী হেল ভগিনীগণও (অর্থাৎ, মেরী ও হ্যারিয়েট হেল এবং ইজাবেল ও হ্যারিয়েট ম্যাকইণ্ডলী) এই সময়ে চিকাগো ছিলেন না, ছুটিতে অন্যত্র গিয়াছিলেন।

দেখা যায়, স্বামীজীর আমেরিকায় অবস্থানকালে তিনটি পৃথক দল তাঁহার বিরুদ্ধে শত্রুতার কার্যে লিপ্ত হন। প্রথমটি গোঁড়া খ্রীষ্টান ধর্মযাজক ও মিশনারীর দল, দ্বিতীয়টি আমেরিকার থিওসফিক্যাল সোসাইটি এবং তৃতীয়টি ভারতীয় ব্রাহ্ম-সমাজ। ইহাদের মধ্যে খ্রীষ্টান ধর্মযাজক ও মিশনারীগণের আক্রমণের বিষয় আমরা ইতিপূর্বে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। তবে ঐ সম্বন্ধে আর একটি অতিরিক্ত সংবাদ এই যে, উহাদের কেহ কেহ স্বামীজীর আমেরিকান বন্ধু ও সমর্থন-কারীদের বাড়ী বাড়ী গিয়া, অথবা তাহাদের নিকট তাঁহার কুৎসাপূর্ণ বেনামা চিঠি পাঠাইয়া, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য তাহাদিগকে

অনুরোধ করিতেন। কিন্তু দেখা যায়, স্বামীজীর সুপরিচিত বন্ধুগণ কখন এই সকলের দ্বারা কিছুমাত্র প্রভাবিত হইতেন না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, উক্তরূপ একখানা বেনামা চিঠির দ্বারা মিঃ হেলকে সাবধান করিয়া দেওয়া হয় যে, তিনি যেন তাহার কন্যা ও ভাগ্নীদের হিন্দু সন্ন্যাসীর সহিত মিশিতে না দেন। মিঃ হেল ঐ চিঠিখানি পড়িয়া বিনাদ্বিধায় ও অবিলম্বে অগ্নিতে সমর্পণ করেন।

অন্যদিকে, থিওসফিক্যাল সোসাইটি[১] ও ব্রাহ্মসমাজের নিজেদের ঐভাবে কোন অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও, তাহাদের ঈর্ষা-প্রসূত সকল অপপ্রচারই গোঁড়া মিশনারীগণ সযত্নে সংগ্রহ করিয়া আমেরিকার খবরের কাগজগুলিতে ছাপাইয়া দিয়া স্বামীজীর বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইতেন। এবং তাহাদের ঐ কার্যে ব্রাহ্মগণের উক্তিগুলিই বিশেষ ফলপ্রদ হইত। কারণ ব্রাহ্মগণ ছিলেন স্বামীজীর স্বদেশবাসী। তাই, তাহারা যখন তাঁহাকে মিথ্যাবাদী, অসৎ, প্রতারক ইত্যাদি বলিয়া গালি দিতেন, তখন তাহা প্রতিবাদের অভাবে বিদেশী আমেরিকানদের নিকট সহজেই সত্য বলিয়া মনে হইত।

স্বামীজীর বিরুদ্ধে তাঁহার এই স্বদেশীয়দিগের শত্রুতাচরণের ইতিহাস এইরূপ। চিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁহার প্রথম দিনের সাফল্যের পরেই ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিদ্বয় কলিকাতার খ্যাতনামা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও বম্বের নাগরকার (এবং সোরাবজী নামে একটি খ্রীষ্টান মহিলাও) সকলকে বলিতে আরম্ভ করেন যে, স্বামীজী আদৌ সন্ন্যাসী নহেন, তিনি আমেরিকায় আসিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়াছেন এবং তিনি একজন নিছক প্রতারক। বিশেষভাবে উক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ঈর্ষার জ্বালায় তাঁহার পিছনে যেন লাগিয়াই রহিলেন। এবং তারপর ভারতে ফিরিয়াও তিনি ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকায় এবং

১। স্বামীজীর বিরুদ্ধে আমেরিকান থিওসফিষ্টদের শত্রুতার ইতিহাস সংক্ষিপ্ত এবং তাহা তিনি ভারতে ফিরিয়া তাঁহার একটি বিখ্যাত বক্তৃতায় (My Plan of Campaign) বর্ণনা করিয়াছেন।

মৌখিকভাবেও স্বামীজীকে এরূপভাবে আক্রমণ করিতে লাগিলেন, যাহা সত্যই এক অতি বেদনাদায়ক শোচনীয় ঘটনা।

এই বিষয়ে স্বামীজী ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ তারিখে মেরী হেলের নিকট লিখেন, "মজুমদার কলিকাতায় ফিরিয়াছেন এবং সেখানে তিনি প্রচার করিতেছেন যে সংসারে এমন পাপ নাই যাহা আমি আমেরিকায় বসিয়া না করিতেছি—বিশেষভাবে হীনতম চরিত্র-হীনতার পাপ।" পরে ঐ সনের ২৬শে এপ্রিল তারিখে ইজাবেল ম্যাকইণ্ডলীর নিকট তিনি লিখেন, "আমার নিজ দেশবাসীরাও আমার সম্বন্ধে কি বলিতেছে না বলিতেছে, তাহা একটি কারণ ব্যতীত অপর কিছুর জন্যই আমি গ্রাহ্য করি না। আমার একটি বৃদ্ধা মা আছেন। তিনি জীবনে অনেক কষ্ট পাইয়াছেন এবং তাহারই মধ্যে তিনি আমাকে ভগবান ও মানুষের সেবায় দান করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু কলিকাতায় মজুমদার যাহা বলিতেছেন—যে তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় সন্তান এক অতি দূর দেশে পশুর ন্যায় ঘৃণিত জীবন যাপন করিতেছে—তাহা শুনিলে ও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলে তাঁহার মৃত্যু ঘটিবে।"

তবে স্বামীজীর এই সময়কার অশান্তি-অসন্তোষের সর্বপ্রধান হেতু ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এবং তাহা হইতেছে ভারতবর্ষেরই তাঁহার নিজ শিষ্য ও অনুগামী ব্যক্তিগণের আচরণ। তিনি জানিতেন যে, আমেরিকাতে তাঁহার কুৎসা রটনাকারীগণ আমেরিকার জনসমাজে অতি অকিঞ্চিৎকর লোক এবং তাহাদের রটনা কোন ভদ্র বা বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহজে বিশ্বাস করেন না। তাই, উহার দ্বারা তাঁহার কার্যের প্রকৃত ক্ষতি যে কিছু হইয়াছে বা হইবে তাহা তিনি মনে করিতেন না। কিন্তু ইহা তিনি তীব্রভাবে অনুভব করিতেন, মিশনারীগণ যে প্রচার করিতেছে তিনি যথার্থ সন্ন্যাসী নহেন, কোন হিন্দু সমাজ বা সম্প্রদায়ই তাঁহাকে তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেন নাই এবং তাঁহার প্রচারিত ধর্মও প্রকৃত হিন্দুধর্ম নয়—তিনি একজন নিছক প্রতারক মাত্র, ইহার একটা প্রত্যুত্তর তাঁহার আমেরিকান বন্ধুগণ

তাঁহার স্বদেশবাসীদের নিকট হইতে প্রত্যাশা করিতেছেন। বিশেষতঃ তিনি ভারত হইতে কোন পরিচয় পত্র না লইয়াই আমেরিকায় আসিয়াছিলেন। তাই, তিনি দুই-তিন মাস পূর্বে তাঁহার প্রিয় শিষ্য মাদ্রাজের আলাসিঙ্গা ও অপর কাহারও কাহারও নিকট এই বিষয়ে কিছু করিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি চাহিতেছিলেন, মাদ্রাজ ও কলিকাতায় স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের একটি সভা করিয়া তাঁহার আমেরিকার কার্যের জন্য তাঁহাকে এবং তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আমেরিকানদিগকে ধন্যবাদ দিয়া প্রস্তাব পাশ করা হউক এবং ঐ প্রস্তাব সভার সম্পাদক বা সভাপতির দ্বারা আমেরিকার বিভিন্ন খবরের কাগজে ছাপাইবার অনুরোধ সহ ডাঃ ব্যারোজ, মিঃ স্নেল প্রভৃতি ধর্মমহাসভার কর্মকর্তাদের নিকট ও বোষ্টন, নিউ ইয়র্ক ও চিকাগোর সংবাদপত্র সমূহের সম্পাদকদিগের নিকট পাঠানো হউক। এই সামান্য কাজটি তিনি পুনঃ পুনঃ লিখিয়াও ভারতবাসীদের দিয়া করাইতে পারিতেছিলেন না। তাহারা তাঁহার জয়ের জন্য ভারতবর্ষেই আনন্দ প্রকাশ করিতে ও তাঁহাকে ভারতের কাগজেই প্রশংসা করিতে ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু কেহ উদ্যোগী হইয়া ও বুদ্ধি খাটাইয়া উহার একটি সংবাদও আমেরিকার কোন সংবাদপত্রে পাঠাইতেছিলেন না। এবং ইহার বেদনাই স্বামীজীকে যারপরনাই পীড়া দিতেছিল। এবং দেখা যায় তাঁহার স্বদেশবাসীগণের এই নিষ্ক্রিয়তার জন্য তিনি ২৯শে জুন তারিখে (১৮৯৪) চিকাগো হইতে একটি মাদ্রাজী শিষ্যের নিকট নিরাশভাবে লিখেন, "ও! আমার পৃষ্ঠপোষকতা করিবার জন্য ভারতবর্ষে যদি একটি বুদ্ধিমান ও প্রকৃত কার্যক্ষম লোকও থাকিত! কিন্তু ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। আমি এ দেশে প্রতারক হইয়াই রহিলাম। আমি বোকার মত পরিচয়-পত্র না লইয়া ধর্মমহাসভায় যোগ দিতে আসিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম উহা পরে অনেক পাওয়া যাইবে। এখন আমার (এখানেই) উহা ধীরে ধীরে তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে।" তারপর ঐ পত্রেই তিনি আরও লিখেন, "আমি প্রতিমুহূর্তেই ভারত হইতে একটি সংবাদ

প্রত্যাশা করিয়াছি। কিন্তু তাহা আর আসিল না। বিশেষভাবে গত দুই মাস আমি প্রতিক্ষণ একটা যাতনা অনুভব করিয়াছি। না, ভারত হইতে একখানা খবরের কাগজ পর্যন্ত আসিল না! আমার বন্ধুগণ মাসের পর মাস অপেক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু কিছুই আসিল না, এমন কি, একটি কণ্ঠস্বরও শোনা গেল না! এই জন্য আমার অনেক বন্ধু আমার বিষয়ে ক্রমশঃ আগ্রহহীন হইয়াছেন এবং পরিশেষে আমাকে পরিত্যাগই করিয়াছেন।"

দেখা যায়, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের জুনমাসে স্বামীজী এই সকল কথা অত্যন্ত আবেগের সহিত কয়েক পত্রে লিখিয়াছেন। কিন্তু বস্তুতঃ এই জুনেই মাদ্রাজবাসীগণ তাঁহার নির্দেশ অনুসারে মাদ্রাজ শহরে একটি বিপুল জনসভা করিয়া তাঁহাকে ও আমেরিকাবাসীদের অশেষ ধন্যবাদ দিয়া প্রস্তাব পাশ করেন এবং তাহা যথাযোগ্যভাবে প্রচারার্থ আমেরিকায় পাঠান। তবে তাহা দুই মাস পরে আগষ্ট মাসের শেষে আমেরিকার কাগজগুলিতে প্রকাশিত হয় এবং স্বামীজী তাহা (এনিস্কোয়াম গ্রামে থাকাকালে) ৩০শে আগষ্ট তারিখের বোষ্টনের একটি সংবাদপত্র (Boston Evening Transcript) পড়িয়া প্রথম জানিতে পারেন। এবং এই বিষয়ে ৩১শে আগষ্ট তারিখে অপর একটি সংবাদপত্র (The Chicago Interocean) মন্তব্য করেন, "ইহা খুবই আনন্দের বিষয় যে হিন্দু প্রচারক তাঁহার নিজ দেশে সম্মানহীন নহেন। অল্পপূর্বে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত একটি জনসভায় হিন্দুগণ আমেরিকাতে তাঁহার সকল প্রচেষ্টা সমর্থন করিয়াছেন এবং আমেরিকানগণ তাঁহাকে যে ভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন তজ্জন্য তাহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইয়াছেন।" এই রকম আরও কয়েকটি কাগজ স্বামীজীর এই জয়ে ও আমেরিকানদের প্রতি ভারতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশে আনন্দ প্রকাশ করেন।

মাদ্রাজ সভার পরে স্বামীজীর সমর্থনে ভারতের নানা স্থানে ঐরূপ জনসভা হইতে লাগিল। তবে ঐ সকলের মধ্যে সব চাইতে বড় ও উদ্দাম উৎসাহপূর্ণ সভা হয় স্বামীজীর জন্মস্থান কলিকাতা শহরের

বিখ্যাত টাউন হলে—৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে (১৮৯৪)। এই শহরে স্বামীজীর চরিত্র ও জীবন অনেকেই জানিতেন, আর এই স্থানই ছিল তাঁহার নিন্দাকারী প্রতিপক্ষ প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কর্মস্থল। সুতরাং এই সভার সমর্থনই হিন্দুগণ-কর্তৃক স্বামীজী ও তাঁহার কার্যের সর্বাপেক্ষা বড় ও চূড়ান্ত সমর্থন হয় এবং তদ্বিষয়ে উহা তাঁহার শত্রুদের সর্বকালের জন্য নীরব করিয়া দেয়। এই সভার সংবাদ সকলও যথাসময়ে আমেরিকার খবরের কাগজগুলিতে প্রকাশিত হয়।

স্বামীজী যখন কলিকাতা হইতে এই সভার প্রথম সংবাদ পান তখন তিনি নিউ ইয়র্কে ছিলেন। এবং তথা হইতে তিনি হেল ভগিনীদের নিকট লিখেন, "আমার ভগ্নীগণ, জগদম্বার জয় হউক! আমার আশাতিরিক্ত লাভ হইয়াছে। সাধু উদ্দামভাবে সম্মানিত হইয়াছেন। ভগবানের করুণা দেখিয়া আমি শিশুর মত অশ্রু বিসর্জন করিতেছি। ভগ্নীসকল, তিনি তাঁহার দাসকে কখন পরিত্যাগ করেন না। আমি তোমাদের যে পত্রখানি পাঠাইলাম তাহা হইতেই সকল বিষয় পরিষ্কার হইবে। ছাপানো কাগজগুলি শীঘ্রই আমেরিকানদের নিকট পৌঁছিবে।"

এইভাবে পরিশেষে স্বামীজী ও তাঁহার আমেরিকার কার্য ভারতের সর্বত্র যথাযোগ্যভাবে সমর্থিত হইলেও, (আমরা দেখিয়াছি) উহার সর্বপ্রথম সংবাদ (অর্থাৎ মাদ্রাজ-সভার বিষয়) তিনি পান ৩০শে আগষ্ট তারিখে। তাই, ভারত হইতে সমর্থন না পাওয়ার বেদনা তাঁহার বুকে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই-আগষ্ট মাসেও পূর্ণভাবেই চলিতে থাকে। তাহা হইলেও, তিনি ঐ জন্য তাঁহার আমেরিকার কার্য পরিত্যাগ করিবার কথা কখনও মনে স্থান দেন নাই। দেখা যায় পূর্বোক্ত ২৯শে জুন তারিখের পত্রেই তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক নৈরাশ্য প্রকাশ করেন, কিন্তু ঐ সুদীর্ঘ পত্রখানারই শেষের দিকে তিনি লিখেন, "কোন ভাব প্রচারের পক্ষে আমেরিকাই সর্বোত্তম ক্ষেত্র! সুতরাং আমি শীঘ্র আমেরিকা পরিত্যাগ করার কথা চিন্তা করিতেছি না।"

তদনুসারে অন্তরের গভীর অশান্তি-অসন্তোষ সত্ত্বেও, তিনি জুন মাস অন্তেই পুনরায় আমেরিকার পূর্বোপকূল ভ্রমণে বাহির হন। আগামী অধ্যায়ে আমরা তাঁহার ঐ ভ্রমণ-কাহিনী যথাসম্ভব সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইব

সাতাশ

আমেরিকার পূর্বাঞ্চল
ভ্রমণ—দ্বিতীয় পর্যায়
(১৮৯৪, জুলাই—১৮৯৫, এপ্রিল)

(১) নিউ ইয়র্ক, ফিস্‌কিল্‌ ল্যাণ্ডিং, সোয়াম্পস্কট, গ্রীনএকার, প্লাইমাউথ ও এনিস্কোয়াম :

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে মিসেস হেলের নিকট লিখিত স্বামীজীর একখানি পত্র হইতে জানা যায়, স্বামীজী জুন মাস অন্তে চিকাগো ত্যাগ করিয়া প্রথমে নিউ ইয়র্কে এবং তৎপর তথা হইতে ফিস্‌কিল্‌ ল্যাণ্ডিং'এ (N. Y.) যান। এই শেষোক্ত স্থানে তিনি মিঃ ও মিসেস্‌ গার্নসির অতিথি হইয়া থাকেন।

ফিস্‌কিল্‌ ল্যাণ্ডিং হইতে স্বামীজী (একটি ধনী মহিলার অতিথি হইয়া) সমুদ্র তীরবর্তী সোয়াম্পস্কটে (Massachusetts) যান এবং সেখানে অল্প কয়েক দিন থাকিয়া তিনি জুলাই মাসের শেষের দিকে মিস্‌ সারা ফার্মারের আমন্ত্রণে গ্রীনএকার (Maine) গমন করেন ও সেখানে একটি অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া দুই সপ্তাহ কাল থাকেন।

এই অনুষ্ঠানটি স্বামীজীর প্রচারিত ভাবের বিশেষ পরিপোষক ছিল। উহার ইতিবৃত্ত এই। মিস্‌ সারা ফার্মার চিকাগো ধর্মমহা-সভায় উপস্থিত ছিলেন। এবং ঐ সভার অনুপ্রেরণায় তিনি গ্রীন-একার সম্প্রদায় নামে একটি গ্রীষ্মকালীন উপনিবেশ গঠন করিয়া, সেখানে প্রতি বৎসর একটি ধর্ম সম্মিলনের (Greenacre Religious Conferences) ব্যবস্থা করেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম-সমন্বয়ের আদর্শ অনুশীলন করা। তাই, এই অনুষ্ঠানে একমাত্র অপরের ধর্ম আক্রমণকারী ব্যতীত অন্য সকলেই যোগদান করিতে

পারিতেন এবং যাহারা যোগ দিতেন তাহারা সকলেই তাহাদের নিজ নিজ ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা বা আলোচনা করিবার সুযোগ পাইতেন।

ফলে, গ্রীনএকার সম্মিলনে অল্প কিছু উদ্ভট ধর্মমতের লোক আসিয়া জুটিলেও, অনেক জ্ঞানী ও মনীষী ব্যক্তিও ইহাতে যোগ দেন এবং তাঁহারা সকলেই আন্তরিকতাপূর্ণ ছিলেন। স্বামীজী এই সম্মিলনের কাজকে বিশেষ মূল্যবান মনে করিতেন। এমন কি, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের এক পত্রে তিনি মিসেস বুলকে মিস্ ফার্মারের ঐ বৎসরের গ্রীনএকারের কার্যে অর্থ সাহায্য করিতে উপদেশ দেন।

এই সম্মিলনটির প্রথম বৎসরের (১৮৯৪) কাজের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা এইরূপ। গ্রীনএকার সম্প্রদায়ের ধনী লোকেরা গ্রীনএকার নামক হোটেলে থাকিতেন। এই হোটেলটি একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর অবস্থিত ছিল। অপর সকলে কতকগুলি ছোট ছোট তাঁবুতে বাস করিতেন। তদ্ব্যতীত, একটি বড় তাঁবু সম্মিলনের বক্তৃতা গৃহরূপে ব্যবহৃত হইত এবং তাহার চূড়ায় শান্তির প্রতীক-স্বরূপ একটি সাদা পতাকা উড়িত। এই তাঁবুগুলি উক্ত পাহাড়টির সন্নিকটস্থ নীচের সমতল ভূমির উপর অবস্থিত ছিল।

সকালবেলার প্রথমভাগে বক্তৃতার তাঁবুতে বক্তৃতা বা আলোচনা হইত। তারপর সকলে পাহাড়ের উপর দিয়া হাঁটিয়া এক মাইল দূরবর্তী একটি পাইন বনে যাইতেন। এই পাইন গাছগুলি ছিল অত্যন্ত উঁচু—গগন চুম্বী, আর উহার ডালগুলি ছিল এত নীচু পর্যন্ত বিস্তৃত যে কেহ উহার তলায় বসিলে অল্প দূর হইতেও তাহাকে দেখা যাইত না। এই পাইন বনেই গ্রীনএকার সম্মিলনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কার্য অনুষ্ঠিত হইত। এখানে প্রতিদিন ধর্মের ক্লাস বসিত এবং তখন এক একজন শিক্ষক (খ্রীষ্টান, ইহুদী বা হিন্দু) এক একটি পাইন গাছের নীচে বসিয়া তাঁহার ছাত্রদের ধর্মোপদেশ দিতেন। শ্রোতারা প্রায় সকলেই মাটিতে বসিতেন, শুধু কয়েকজন বয়স্ক লোকের জন্য চেয়ার থাকিত।

স্বামীজী যে পাইন বৃক্ষটির নীচে বসিতেন তাহা "স্বামীর পাইন"

(The Swami's Pine) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং স্বামীজীর পরে স্বামী সারদানন্দ ও তাঁহার পরে স্বামী অভেদানন্দও এইস্থানে ক্লাস করিয়াছেন। যাহা হউক, এই গাছটির তলায় বসিয়া স্বামীজী প্রতি দিন সকালে তাঁহার ছাত্রদিগকে উচ্চ আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক তত্ত্বসকল শিক্ষা দিতেন। এবং এখানেই তিনি সর্বপ্রথম আমেরিকান শিক্ষার্থীদের অদ্বয় তত্ত্বের উপদেশ দেন। এই বিষয়ে তিনি মেরী হেলের নিকট এক পত্রে লিখেন, "আমি উহাদের 'শিবোহম্ শিবোহম্' শিক্ষা দিই, আর ওরা সকলেই উহা জপ করে।" এই নির্জন স্থানে ঐ কার্যে নিযুক্ত থাকার ফলে, স্বামীজীর মন এইকালে সর্বদাই অতি উচ্চ স্তরে উঠিয়া থাকিত। এবং জানা যায়, তিনি তাঁহার ঐ পাইন গাছটির নীচে বসিয়া প্রচুর ধ্যান করতেন্ ও অন্ততঃ একরাত্রি তাঁহার ছাত্রদের লইয়া উহার তলায় শুইয়া নিদ্রা গিয়াছেন।

এইভাবে দুই সপ্তাহকাল গ্রীনএকারে থাকিবার পর, স্বামীজী (কর্ণেল হিগিন্‌সন্ কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া) ১১ই আগস্ট তারিখে গ্রীনএকার হইতে প্লাইমাউথ (Massachusetts) যান ও ১২ই আগস্ট তারিখে সেখানে (ফ্রি রিলিজিয়াস এ্যাসোসিয়েসনের) এক সভায় একটি বক্তৃতা দেন।

প্লাইমাউথ হইতে তিনি পুনরায় ফিস্‌কিল্ ল্যাণ্ডিং'এ যান ও সেখানে ডাঃ ও মিসেস্ গানসির অতিথি হইয়া কয়েক দিন থাকেন। তারপর তিনি তথা হইতে মিসেস্ ব্যাগ্‌লির নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ তাঁহার এনিস্কোয়ামের গ্রীষ্মাবাসে গিয়া তাঁহাদের সহিত (১৬ই আগস্ট হইতে ৪ঠা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট) তিন সপ্তাহ কাল বাস করেন।

আমরা দেখিয়াছি ইহার ঠিক এক বৎসর পূর্বে তিনি অধ্যাপক রাইটের অতিথি হইয়া প্রথম এই স্থানে আসিয়াছিলেন। তখন তিনি অজ্ঞাত, অখ্যাত ও অর্থাভাবে বিপন্ন। কিন্তু এখানে আসিয়াই ডাঃ রাইটের সাহায্যে তাঁহার ধর্মমহাসভায় যোগ দিবার পথ পরিষ্কার হইয়াছিল। ফলে, আজ তিনি জগদ্‌বিখ্যাত, অগণিত লোক তাঁহাকে ভালবাসে ও ভক্তি করে এবং বহু ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি তাঁহার

বন্ধু। তথাপি (ইহা আমরা গত অধ্যায়ে লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি) তাঁহার স্ব-দেশবাসীগণ কর্তৃক তাঁহার আমেরিকার কার্যের প্রকাশ্য সমর্থনের অভাব তাঁহাকে এইকালে যারপরনাই ব্যথিত ও অসুবিধাগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু দেখা যায়, এই দ্বিতীয়বার এনিস্কোয়ামে আসিয়া তিনি (বোষ্টনের ৩০শে আগষ্ট তারিখের একটি সংবাদপত্র হইতে) সর্বপ্রথম মাদ্রাজের সংবর্ধনা ও সমর্থন সভার সংবাদ প্রাপ্ত হন। বস্তুতঃ সমুদ্র তীরবর্তী এই ক্ষুদ্র গ্রামটি যেন ছিল তাঁহার পক্ষে সর্বথা শুভবর্ষী।

এইবার স্বামীজী যখন এনিস্কোয়ামে আসেন, তখন অধ্যাপক রাইট অন্যত্র ছিলেন। তবে তিনি দুই-এক দিনের মধ্যেই সেখানে আসিয়া পৌঁছেন এবং তখন স্বামীজীকে লইয়া সেখানে প্রতিবেশীদের একটি আনন্দের হাট বসে। একটি মহিলা তাঁহাকে কয়েকদিন ধরিয়া সামনে বসাইয়া তাঁহার একটি ছবিও অঙ্কন করেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে স্বামীজী স্থানীয় মেক্যানিক হলে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন।

জানা যায়, এইবার গ্রীষ্মকালে (১৮৯৪) সোয়াম্পস্কট, এনিস্কোয়াম প্রভৃতি সমুদ্রতীরবর্তী স্থানে গিয়া স্বামীজী স্ফূর্তির সঙ্গে ডুব দিয়া সমুদ্রস্নান করিয়াছেন। এবং যেখানে সম্ভব নৌকাতেও সমুদ্রে বেড়াইয়াছেন। এনিস্কোয়ামে তিনি নিজেও সমুদ্রের ভিতর ছোট ডিঙ্গি চালাইয়াছেন এবং একদিন তাহা উল্টাইয়া দিয়া ভাল স্যুট সহ ভিজিয়া উঠেন।

(২) বোষ্টন, মেলরোজ, ক্যামব্রিজ, বাল্টিমোর, ওয়াশিংটন, ফিলাডেলফিয়া, নিউ ইয়র্ক, ব্রুকলিন :

স্বামীজীর এইবারকার উপরি-বর্ণিত জুলাই-আগস্ট মাসের (১৮৯৪) ভ্রমণ ছিল (বন্ধুগণের আমন্ত্রণ রক্ষার্থে) গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণ। এই সময়ে স্কুল-কলেজ প্রভৃতির ছুটি থাকে এবং শহরবাসীরা সাধারণতঃ এই সুযোগে পাহাড়ের উপরিস্থিত অথবা সমুদ্রতীরবর্তী স্বাস্থ্যকর স্থান

সকলে গিয়া বাস করেন। কাজেই এই সময়টা শহরে বক্তৃতা দিবার উপযুক্ত সময় থাকে না। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাস পড়িতেই গ্রীষ্মকালীন ছুটি শেষ হয়। এবং লোক সকল শহরে প্রত্যাবর্তন করেন। তদনুসারে স্বামীজী গ্রীষ্মাবসানে (বক্তৃতা দিবার আমন্ত্রণ পাইয়া) ৫ই বা ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে এনিস্কোয়াম হইতে বোষ্টনে চলিয়া আসেন। এবং তৎসঙ্গে তাঁহার বক্তৃতা দিবার দ্বিতীয় বৎসর আরম্ভ হয়।

বোষ্টনে স্বামীজী একটি হোটেলে (Hotel Bellivue) উঠেন। এবং সেখানে থাকিয়া শহরের নানা স্থানে বক্তৃতা দেন। তবে এই বক্তৃতাগুলির কোন বিবরণ স্থানীয় সমসাময়িক খবরের কাগজে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই অনুমান হয়, তিনি এই সকল বক্তৃতা ঘরোয়া বৈঠক বা মজলিসে দিয়াছেন।

এইবার বোষ্টনে অবস্থানকালে তিনি তাঁহার মাদ্রাজ অভিনন্দন পত্রের বিখ্যাত উত্তর লিখেন। ইহা ব্যতীত, প্রায় দুই মাস পূর্ব হইতে তাঁহার ইচ্ছা হয় যে, তিনি তাঁহার চিন্তাগুলি একত্রে গুছাইয়া একখানি বই লিখিবেন। এবং তদুদ্দেশ্যে তিনি বোষ্টনের একটি দোকান হইতে ঐ বই লিখিবার আবশ্যকীয় নানা সরঞ্জামও খরিদ করেন। কিন্তু উহা শান্তিতে লিখিবার জন্য তাঁহার একটি নির্জন স্থানের অভাব ছিল। মিসেস বুল এই সময়ে নিউ ইয়র্কে ছিলেন এবং স্বামীজীর একখানি পত্র হইতে ঐ বিষয় জানিতে পারিয়া তিনি তাঁহাকে তাঁহার (বোষ্টনের সন্নিকটস্থ) ক্যামব্রিজের বাড়ীতে বসিয়া তাঁহার বই লিখিতে আমন্ত্রণ করেন। স্বামীজী এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। তবে দেখা যায়, সেখানে যাইবার পূর্বে তিনি দুইবার (বোষ্টনের নিকটবর্তী) মেলরোজ শহরে গিয়া দুইটি বক্তৃতা দেন। দ্বিতীয়বারের বক্তৃতাটি তিনি দেন ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে। তারপর ২রা অক্টোবর তারিখে তিনি বোষ্টন হইতে মিসেস বুলের ক্যামব্রিজের বাড়ীতে যান। তৎপূর্বে মিসেস বুলও নিউ ইয়র্ক হইতে সেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন।

মিসেস্ বুলের কথা আমরা গত অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি। ১৮৯৪

খৃষ্টাব্দে স্বামীজীর সহিত যখন তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁহার বয়স পয়তাল্লিশেরও কম। এবং তাঁহার চৌদ্দ বৎসর পূর্বে তিনি বিধবা হন। তাঁহার সহিত স্বামীজীর সাক্ষাৎ নানা দিক দিয়া সুফল-প্রদ হয়। স্বামীজী তাঁহাকে প্রথম হইতেই অতি উচ্চ আধ্যাত্মিকতা-সম্পন্ন স্ত্রীলোক বলিয়া নির্দেশ করেন এবং কিছু পরে তাঁহাকে দীক্ষাও দেন। মিসেস্ বুল অতি সত্বরই স্বামীজীর আমেরিকার সমস্ত কার্যের একটি বড় সহায় হইয়া দাঁড়ান। এবং তাঁহার শিষ্যা হইয়াও তিনি স্নেহময়ী জননীর ন্যায় (আবশ্যক বুঝিলেই) তাঁহাকে রক্ষা করিতে ও উপদেশ দিতে প্রয়াসী হইতেন। পরবর্তীকালে তিনি ভারতে আসেন এবং নূতন বেলুড় মঠ নির্মাণকালে প্রচুর অর্থসাহায্য করেন। তাহা ছাড়া, তিনিই সর্বপ্রথম শ্রীশ্রীমায়ের দুইখানি ফটোগ্রাফ তুলিয়া তাঁহার মধ্য বয়সের ছবি রক্ষা করেন। ঐ দুইখানি ছবিরই একখানির সর্বত্র পূজা হইতে দেখা যায়।

যাহা হউক, মিসেস বুল ছিলেন ধনী, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং ক্যামব্রিজের একজন খ্যাতি সম্পন্ন ও প্রভাবশালী মহিলা। তাঁহার সুবৃহৎ বৈঠকখানাটি ছিল সেখানকার মনীষীগণের একটি মিলনস্থান। এবং সেখানেই অধ্যাপক ডাঃ জেমস (Dr. William James) প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিতগণের সহিত স্বামীজীর আলাপ-পরিচয় হয়। বিশেষভাবে দার্শনিক ডাঃ জেমসের সহিত তাঁহার পরিচয় খুবই ঘনিষ্ঠ হয় এবং তিনি একদিন তাঁহার সম্মুখে সমাধিস্থ হইয়া তাঁহাকে সমাধি কি বুঝাইয়া দেন। পরবর্তীকালে ডাঃ জেমস তাঁহার 'The Variety of Religious Experience" নামক বিখ্যাত পুস্তকে অদ্বৈতবাদ সম্পর্কে স্বামীজীকে (চরম উৎকর্ষতাপূর্ণ) আদর্শ বৈদান্তিক বলিয়া উল্লেখ করেন।

দেখা যায়, স্বামীজী বই লিখিবার জন্য মিসেস বুলের বাড়ীতে আসিলেও, সেখানে বই আর তাঁহার লেখা হয় নাই। এবং তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণপূর্বক এইকালেও (অর্থাৎ ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগেও) পূর্বের ন্যায় সমভাবেই বক্তৃতা দিয়াছেন। মিসেস বুলের বাড়ীতে

মাত্র নয়-দশ দিন থাকিয়াই, তিনি বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়া বাল্টিমোর (Maryland) যান (১২ই, অক্টোবর, ১৮৯৪)। এবং সেখানে তিনি তাঁহার আমন্ত্রণকারী ভ্রুম্যান ভ্রাতৃগণের (Vrooman Brothers) অতিথি হন। ইহারা তিন ভাই এবং তিন জনেরই বয়স কুড়ি হইতে পঁচিশের মধ্যে ছিল। এই বয়সেই বড় দুই ভাই হইয়াছিলেন ধর্মযাজক এবং ছোটটি ছিলেন ঐ বৃত্তির জন্যই অধ্যয়নরত কলেজের ছাত্র। এই তিনটি ভাইই ছিলেন অত্যন্ত উদ্যমশীল ও সুবক্তা। এবং তাহাদের উপস্থিত উদ্দেশ্য ছিল বাল্টিমোর শহরে 'Dynamic Religion' বা 'গতিশীল ধর্ম' সম্বন্ধে কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতা দেওয়া। স্বামীজী বক্তা থাকিলে সভায় প্রচুর লোক যোগদান করিবে, এই আশায় তাহারা তাঁহাকেও ঐ বিষয়ে বক্তৃতা দিতে রাজি করান।

তবে এইভাবে বিশেষ চেষ্টা করিয়া স্বামীজীকে বাল্টিমোর আনিলেও, দেখা যায় ভ্রুম্যান ভ্রাতাগণ সেখানে তাঁহার থাকার জায়গা পূর্ব হইতে ঠিক রাখেন নাই। এবং তিনি শহরে পৌঁছিলে, তাহারা তাঁহাকে একটি তৃতীয় শ্রেণীর হোটেলে লইয়া যান। কিন্তু এইকালে বাল্টিমোরে বর্ণবিদ্বেষ থাকায়, উক্ত হোটেল তাঁহাকে জায়গা দিতে অস্বীকার করে। এবং একটি খবরের কাগজের বিবরণ হইতে জানা যায়, এইভাবে পর পর চারিটি হোটেল তাঁহাকে রাখিতে আপত্তি করিলে, ভ্রুম্যান ভ্রাতাদের বড় ভাই (Rev. Walter Vrooman) তাঁহাকে বাল্টিমোরের সর্বশ্রেষ্ঠ হোটেলে (Hotel Rennert) লইয়া যান। এবং সেখানে তাঁহার জন্য বিনাবাধায় একটি ঘর পাওয়া যায়। এই ঘটনা সম্বন্ধে স্বামীজী পরে ওয়াশিংটন হইতে মিসেস্ বুলের নিকট লিখিয়াছেন, "বাল্টিমোরে আমি একটি নিম্নশ্রেণীর হোটেলওয়ালার নিকট হইতে যে খারাপ ব্যবহার পাইয়াছি তজ্জন্য আপনি দুঃখিত হইবেন না। ইহা ভ্রুম্যান ভ্রাতাদের দোষেই ঘটে। তাহারা আমাকে কিজন্য একটি নিম্ন শ্রেণীর হোটেলে লইয়া গিয়াছিল? তারপর সর্বত্র যেমন ঘটিয়াছে, আমেরিকান নারীগণ আমার

সাহায্যে আসেন এবং আমি সেখানে ভালভাবেই থাকিতে পারিয়াছি।”

এই বিষয়ে প্রকৃত অবস্থা যাহাই হউক, স্বামীজী ক্রুম্যান ভ্রাতাদিগকে যে কথা দিয়াছিলেন তাহা তিনি রক্ষা করেন। এবং তাহাদের আশাও পূর্ণ হয়। স্বামীজী তাহাদের ‘গতিশীল ধর্ম’ বিষয়ক সভায় দুদিন বক্তৃতা দেন—১৪ই অক্টোবর ও ২১শে অক্টোবর। ব্যবস্থানুসারে প্রথম দিনের প্রধান বক্তা ছিলেন ক্রুম্যান ভ্রাতাগণ এবং স্বামীজী তাহাদের সাহায্যার্থে সংক্ষেপে কিছু বলেন। দ্বিতীয় দিন (২১শে অক্টোবর) স্বামীজী ছিলেন প্রধান বক্তা এবং সেদিন শ্রোতাদের ভিড়ে বক্তৃতা-গৃহের (Lyceum Theatre) কোথাও তিল ধারণের জায়গা ছিল না। সভায় পূর্ণ তিন হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজীর বক্তৃতার শেষে শ্রোতাগণ এক বিপুল হর্ষধ্বনির দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন।

২৩শে অক্টোবর তারিখে স্বামীজী বাল্টিমোর হইতে রওনা হইয়া ঐ দিনই ওয়াশিংটন পৌছেন এবং সেখানে মিসেস টটেনের (Mrs. Enoch Totten) অতিথি হন। মিসেস টটেন মিসেস হেলের এক বান্ধবীর ভাইঝি বা বোনঝি ছিলেন।

ওয়াশিংটনের একটি গির্জার (People’s Church) ধর্মযাজকের অনুরোধে স্বামীজী সেখানে ২৮শে অক্টোবর তারিখে (বিনাবিজ্ঞপ্তিতে) সকালে ও বিকালে দুইবার বক্তৃতা করেন। তৎপর তিনি ওয়াশিংটনের একটি হলে (Metzerott Hall) ১লা নভেম্বর তারিখে একটি ও ৬ই নভেম্বর তারিখে আর একটি মোট দুইটি বক্তৃতা দেন। ঐ দুই তারিখের মধ্যে তিনি পুনরায় বাল্টিমোর গিয়া সেখানেও আর দুইটি বক্তৃতা দিয়া আসেন—একটি ২রা নভেম্বর, আর একটি ৫ই নভেম্বর।

ওয়াশিংটন হইতে স্বামীজী ৭ই নভেম্বর তারিখে ফিলাডেলফিয়া রওনা হন। কিন্তু তারপর ঐ তারিখ হইতে ৪ঠা ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁহার অবস্থান ক্ষেত্রের আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। তবে

দেখা যায়, তিনি তৎপূর্বে ১লা নভেম্বর তারিখে ওয়াশিংটন হইতে মেরী হেলের নিকট এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "আমি অধ্যাপক রাইটের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য মাত্র কয়েকদিন ফিলাডেলফিয়া থাকিব। এবং তারপর আমি নিউ ইয়র্ক যাইব ও তখন অল্প কিছুকাল নিউ ইয়র্ক হইতে বোষ্টনে এবং বোষ্টন হইতে নিউ ইয়র্কে যাতায়াত করিতে থাকিব। এবং তারপর আমি ডেট্রয়েট হইয়া চিকাগো যাইব।" পরে তিনি ৩০শে নভেম্বর তারিখের একখানা (ঠিকানাহীন) পত্রে আলাসিঙ্গার নিকট লিখেন, "আমি ইতিপূর্বেই নিউ ইয়র্কে একটি সোসাইটি গঠন করিয়াছি। ইহার সহকারী সভাপতি সত্বরই তোমার নিকট পত্র লিখিবেন। ইত্যাদি।" সুতরাং বোঝা যায়, তিনি উক্ত সময়ের কতকাংশ নিউ ইয়র্কে কাটাইয়াছেন।

যাহা হউক, দেখা যায় (ঐ সময়ের পরে) ৫ই ডিসেম্বর তারিখে স্বামীজী মিসেস বুলের ক্যামব্রিজের বাড়ীতে পৌঁছেন। এবং ঐ দিন হইতে ২৮শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সেখানে থাকেন। এই তিন সপ্তাহাধিক কাল তিনি প্রতিদিন সকালে (১২টা-১টা পর্যন্ত) মিসেস বুলের সুবৃহৎ বৈঠকখানায় ক্লাস করিতেন ও তাহাতে তিনি বেদান্ত ও অপর নানা বিষয় আলোচনা করিতেন। এই সকল ক্লাসে বহু লোক যোগ দিতেন এবং তন্মধ্যে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণও থাকিত। স্বামীজীর এই ক্যামব্রিজ ক্লাসগুলিতে যোগদানকারী একজন লিখিয়াছেন, "তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্রের (অধ্যয়ন-কালীন) দার্শনিক সমস্যা সকল সমাধান করিতে সাহায্য করেন।"

এইকালে মিসেস বুলের অনুরোধে স্বামীজী ক্যামব্রিজে "ভারতীয় নারীদিগের আদর্শ" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তিনি হিন্দুনারী জীবনের মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য এবং হিন্দুদিগের অত্যুচ্চ মাতৃ-ভক্তি বর্ণনা করিয়া পরিশেষে বলেন, "আমি জীবনে যাহা কিছু করিতে পারিয়াছি তাহা আমার মায়ের জন্যই এবং তাঁহার নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও পবিত্রতাপূর্ণ জীবনই আমাকে সন্ন্যাসীর জীবন অবলম্বন করিতে উদ্বোধিত করিয়াছে।" এই চিত্তোন্মাদনকারী বক্তৃতাটি

ক্যামব্রিজ ও বোষ্টনের নারীদিগের মন এমনভাবে আলোড়িত করে যে, তাহারা সমাগত খ্রীষ্টমাস উপলক্ষে স্বামীজীকে না জানাইয়া তাঁহার পুণ্যময়ী জননীকে (কুমারী মেরী ও তাঁহার ক্রোড়স্থ শিশু খ্রীষ্টের একখানি সুন্দর ছবিসহ) একখানি অভিনন্দন পত্র পাঠান। পরে স্বামীজী এই সংবাদ শুনিয়া যারপরনাই আনন্দিত হন।

২৮শে ডিসেম্বর তারিখে স্বামীজী ক্যামব্রিজ হইতে নিউ ইয়র্ক ও তথা হইতে ঐ দিনই সন্ধ্যায় ব্রুকলিন পৌঁছেন। এবং সেখানে তখনই তাঁহার সম্মানার্থে অনুষ্ঠিত একটি অভ্যর্থনা পার্টিতে যোগ দেন।

এই শহরে তিনি আসেন ব্রুকলিন এথিক্যাল এ্যাসোসিয়েসনের আমন্ত্রণে। ঐ এ্যাসোসিয়েসনের সভাপতি নিউ ইয়র্কের ডাঃ জেন্‌স্ (Dr. Lewis G. Janes) ছিলেন স্বামীজীর পরম বন্ধু। তাঁহার সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয় নিউ ইয়র্কে এবং তারপর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয় মিস্ ফার্মারের গ্রীণএকারের ধর্মসম্মিলনে। ডাঃ জেন্‌স্ ঐ সম্মিলনে যোগ দেন। এবং তাঁহার সম্বন্ধে স্বামীজী গ্রীণএকার হইতে হেল ভগিণীগণের নিকট লিখেন, "নিউ ইয়র্কের ডাঃ জেন্‌স্ এখানে আছেন। তিনি ব্রুকলিন এথিক্যাল কালচার সোসাইটির সভাপতি। তিনি তাঁহার বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং আমার তাহা শুনিতে যাইতে হইবে। কারণ, তিনি ও আমি অনেক বিষয়ে একমত পোষণ করি।"

দেখা যায়, ব্রুকলিন এথিক্যাল এ্যাসোসিয়েসন স্বামীজীকে প্রথমতঃ ঐ শহরে একটিমাত্র বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কারণ, ঐ এ্যাসোসিয়েসনের অনেকের ধারণা ছিল যে, ভারতীয় ধর্মবিষয়ক বক্তৃতায় ব্রুকলিনের জনসাধারণ আকৃষ্ট হইবে না। এবং সম্ভবতঃ তজ্জন্যই উক্ত বক্তৃতায় কোন প্রবেশমূল্য ধার্য না করিয়া উহা সকলের জন্যই উন্মুক্ত রাখা হয়। ৩০শে ডিসেম্বর রাত্রে স্থানীয় পাউচ ম্যানসনে স্বামীজী ঐ বক্তৃতাটি দেন (বিষয়—

ভারতের ধর্মসমূহ)। সভায় কল্পনাতীত ভিড় হয় এবং তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া শ্রোতাগণ এত মুগ্ধ হঁন যে, সভার শেষেই তাহারা দাবী করিতে লাগিলেন যে ব্রুকলিনে স্বামীজীর নিয়মিত ক্লাস করিতে ও আরও কয়েকটি বক্তৃতা দিতে হইবে। স্বামীজী সম্মত হইলে, ব্রুকলিন এথিক্যাল এ্যাসোসিয়েসন এক বিজ্ঞপ্তির দ্বারা তাঁহার আরও তিনটি বক্তৃতার সংবাদ ঘোষণা করেন। উক্ত তিনটি বক্তৃতার জন্যই প্রবেশমূল্য ধার্য করা হয় এবং উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয় যে বক্তৃতাগুলির আয় স্বামীজীর শিক্ষার কার্য ও এথিক্যাল এ্যাসোসিয়েসনের প্রচার তহবিলের উপকারার্থে যাইবে।

উক্ত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, স্বামীজী ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের (১) ২০শে জানুআরি তারিখে একটি (বিষয়, নারীত্বের আদর্শ—হিন্দু, মুসলমানী ও খ্রীষ্টানী), (২) ৩রা ফেব্রুআরি তারিখে একটি (বিষয়, বৌদ্ধধর্ম —ভারত যেভাবে উহা বুঝিয়াছে) এবং (৩) ২৫শে ফেব্রুআরি তারিখে একটি (বিষয়, জগৎকে ভারতের দান), মোট তিনটি বক্তৃতা দেন। ইহার প্রথম দুইটি বক্তৃতার স্থান ছিল পূর্বোক্ত পাউচ ম্যানসন। তৃতীয় বক্তৃতাটি দেওয়া হয় স্থানীয় হিস্টরিক্যাল সোসাইটির হলে।

এই তিনটি বক্তৃতা ছিল স্বামীজীর (ব্রুকলিনের) দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বক্তৃতা। দ্বিতীয় বক্তৃতাটি সম্বন্ধে তিনি (নিউ ইয়র্ক হইতে) তাঁহার ২৪শে জানুআরি তারিখের এক পত্রে ইজাবেল ম্যাকইণ্ডলীর নিকট লিখেন, "(নারীত্বের আদর্শ সম্বন্ধে) আমার গত বক্তৃতাটি পুরুষদের তত মনে লাগে নাই, কিন্তু মেয়েদের ভয়ানক ভাল লাগিয়াছে। তুমি জানো ব্রুকলিন নারীদের অধিকার-বিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল। তাই, আমি যখন বলিলাম যে নারীগণ সকল প্রকার অধিকারের যোগ্য ও তাহা তাহাদের প্রাপ্য, তখন তাহারা (অর্থাৎ পুরুষেরা) স্বভাবতঃই উহা পছন্দ করিতে পারে নাই। তবে ঐ জন্য কিছু চিন্তা করিও না, মেয়েরা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল।"

(বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে) স্বামীজীর তৃতীয় বক্তৃতাটি পুরুষ-নারী সকলকেই সমভাবে মুগ্ধ করে। এই বক্তৃতাটি সম্বন্ধে একটি সংবাদপত্র লিখেন, "এই শহরে অবস্থানকালে স্বামী বিবেকানন্দকে পূর্বে কখন এত উচ্চ বাগ্মিতা ও প্রভাবপূর্ণ দেখা যায় নাই।.........এই বিখ্যাত হিন্দু সন্ন্যাসী তাঁহার বক্তৃতার মোহময় আন্তরিকতার দ্বারা শ্রোতাগণকে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন।"

এইরূপে স্বামীজীর চতুর্থ বক্তৃতাটিও (বিষয়—জগৎকে ভারতের দান) শ্রোতাগণ অত্যন্ত উৎসাহ-আনন্দের সহিত শ্রবণ করেন ও ঘন ঘন করতালি ধ্বনির দ্বারা তাঁহাকে সংবর্ধিত করেন। মিসেস্ ওলি বুল এই বক্তৃতাটি শুনিতে ক্যামব্রিজ হইতে ব্রুকলিন আসিয়াছিলেন।

উপরিবর্ণিত বক্তৃতা কয়টি ব্যতীত, স্বামীজী ব্রুকলিনে উক্ত সময় মধ্যে অন্ততঃ দুইটি এবং সম্ভবতঃ আরও অধিক সংখ্যক মজলিসী বক্তৃতাও দেন। এই শ্রেণীর বক্তৃতার প্রথমটি তিনি দেন ২৫শে জানুআরি অপরাহ্ণে মিসেস অয়েলের (Mrs. Charles Auel) বৈঠকখানায়। এই বক্তৃতাটির বিষয় ছিল "উপনিষদ্ ও আত্মা সম্বন্ধীয় মতবাদ।" ইহার পরের বৈঠকী বক্তৃতাটি স্বামীজী দেন ২৯শে জানুআরি তারিখে।

ব্রুকলিনে স্বামীজী যখন উক্তরূপে জনসভা ও বৈঠকখানায় বক্তৃতা দিতে রত ছিলেন, তখন তাঁহার পূর্বোক্ত ২০শে জানুআরি তারিখের (নারীত্বের আদর্শ সম্বন্ধীয়) বক্তৃতাটির একটি অতি সামান্য ও নির্দোষ উক্তি ব্রুকলিন রমাবাই সার্কেলের নারীদিগের মধ্যে এক তুমুল চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে এবং ঐ উক্তিটিকে নস্যাৎ করিবার জন্য তাহারা স্বামীজীকে আক্রমণ করিতে বদ্ধপরিকর হন।

ইহার হেতু এই। স্বামীজী তাঁহার ঐ ২০শে জানুআরি তারিখের বক্তৃতায় কথাপ্রসঙ্গে বলেন, "ভারতবর্ষের নারীগণ সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া বিত্তাধিকার উপভোগ করিতেছে। এখানে যে কোন লোক তাহার স্ত্রীকে উত্তরাধিকারের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষে মৃত স্বামীর (পুত্র-সন্তান না থাকিলে) সকল

সম্পত্তিই স্ত্রী পায়—অস্থাবর সম্পত্তি নিব্যূঢ় স্বত্বে এবং স্থাবর সম্পত্তি জীবন-স্বত্বে।" এই উক্তিটি নির্দোষ ও নিছক প্রসঙ্গক্রমে উক্ত হইলেও, ইহা ব্রুকলিন রমাবাই সার্কেলের পক্ষে বিষম ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়ায়। এই প্রতিষ্ঠানটির ইতিহাস সংক্ষেপে একটু লক্ষ্য করিলেই ইহা সুস্পষ্ট হইবে।

পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতী প্রথমে হিন্দু ছিলেন, পরে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আসিয়া ভারতের বালবিধবাদের জন্য একটি স্কুল স্থাপনের উদ্দেশ্যে সাহায্যের আবেদন করেন এবং যাহাতে সাহায্য বেশী পাওয়া যায় তজ্জন্য তিনি ভারতের বিধবাদের দুঃখ-দুর্দশা অত্যন্ত অতিরঞ্জিত করিয়া প্রচার করেন (১৮৮৭-৮৯)। ফলে বোষ্টন, ব্রুকলিন প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রের নানা শহরে রমাবাই সার্কেল (Ramabai Circle) নামে মোট পঞ্চান্নটি মহিলা ক্লাব স্থাপিত হয় এবং ঐ সকল ক্লাব প্রতিবৎসর চাঁদা তুলিয়া রমাবাই'এর স্কুলে প্রচুর সাহায্য পাঠাইতে থাকেন। এই অবস্থায় স্বামীজীর মত একজন খ্যাতি ও প্রভাবসম্পন্ন লোক প্রকাশ্য জনসভায় ভারতের বিধবাদের অবস্থা ভিন্নরূপ বলিলে, জনসাধারণের নিকট হইতে তাহাদের নামে চাঁদা তোলা রমাবাই ক্লাবের পক্ষে সুকঠিন হয়। বস্তুতঃ ইতিমধ্যেই অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ঐ ক্লাবের লোকদের বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, একজন বিশেষ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি প্রকাশ্য সভায় বলিয়াছেন যে তাহারা ভারতের যে শ্রেণীর লোকদের নামে চাঁদা চাহেন সে রকম কোন শ্রেণী ভারতে নাই।

এই পরিস্থিতিতে শঙ্কিত হইয়া ব্রুকলিন রমাবাই সার্কেলের সভাপতি মিসেস্ ম্যাক্‌কীন ২৪শে ফেব্রুআরি তারিখে (একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত) এক সুদীর্ঘ বর্ণনায় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, ভারতের বালবিধবাগণের দুর্দশার কোন সীমা নাই এবং তাহাদের সম্বন্ধে রমাবাই'এর কথাই ঠিক, স্বামীজী সত্য কথা বলেন নাই।

এই অভিযোগের স্বামীজী কোন জবাব দেন না। তবে ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া ব্রুকলিন এথিক্যাল এ্যাসোসিয়েসনের সভাপতি

ডাঃ জেন্‌স্‌ ঐ ২৪শে ফেব্রুআরি তারিখেই উক্ত সংবাদপত্রের সম্পাদকের নিকট এক পত্র লিখেন। এবং তাহাতে তিনি অপর নানা কথার মধ্যে বলেন, 'রমাবাই সার্কেলের স্বামী বিবেকানন্দকে আক্রমণ করিবার কোন কারণ নাই। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় পণ্ডিতা রমাবাই-এর নামও উল্লেখ করেন নাই, ভারতের বিধবাদের অবস্থা সম্বন্ধেও কিছু বলেন নাই, শুধু প্রসঙ্গক্রমে সামান্য দুই-চারিটি কথায় বলিয়াছেন ভারতের বিধবাদের বিত্তাধিকার এদেশের বিধবাদের অধিকারের চাইতে উৎকৃষ্ট।'

কিন্তু ইহার পর স্বামীজীর ২৫শে মে তারিখের বক্তৃতার শেষে একজন শ্রোতার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "হিন্দু-বিধবাগণ সাধারণতঃ নির্যাতিত হন না এবং তাহাদের বিত্তাধিকার আইনের দ্বারা সুরক্ষিত। দুই একটি ক্ষেত্রে নির্যাতন হওয়া অসম্ভব নয়, তবে তাহা ব্যতিক্রম ও কচিৎ ঘটে।" ফলে মিসেস্‌ ম্যাক্‌কীন ও ডাঃ জেন্‌সের মধ্যে আরও বাদানুবাদ চলে। এবং মিসেস্‌ ম্যাক্‌কীন্‌ ৬ই এপ্রিল তারিখে তাহার সর্বশেষের বর্ণনায় স্বামীজীকে অতি উগ্রভাবে আক্রমণ করিয়া বলেন, "বোষ্টনের কয়েকজন নারী বলিয়াছেন এই সুদর্শন হিন্দু তাহাদের সম্মোহিত করিয়া ফেলেন। তাই মনে করা যায়, তিনি ডাঃ জেন্‌সের উপরও তাঁহার ঐ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন।" তৎসঙ্গে তিনি ভারতের ব্রাহ্মসমাজ-কর্তৃক স্বামীজীর বিরুদ্ধে প্রচারিত কতকগুলি নিন্দা উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাকে সর্বথা হীন ও হেয় প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পান।

বস্তুতঃ মিশনারীদিগের ন্যায় (এবং সম্ভবতঃ তাহাদেরই প্ররোচনায়) ব্রুকলিনের রমাবাই সার্কেলও এই সময়ে স্বামীজীর নামে নানা মিথ্যা কুৎসা রটনা করিতে প্রবৃত্ত হন। এবং তখন তাহারা বিশেষভাবে ডেট্রয়েটের মিসেস ব্যাগ্‌লির পরিচারিকা-সংক্রান্ত গত বৎসরের মিথ্যা রটনাটিও পুনঃপ্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এই কুৎসাটি যে সর্বৈব মিথ্যা তাহা আমরা ডেট্রয়েটের ঘটনাবলী আলোচনাকালে বিস্তারিতভাবে দেখিয়াছি। এখানে এখন শুধু ইহাই

লক্ষণীয় যে, ঐ আলোচনায় আমরা (মিসেস ব্যাগ্‌লি, তাহার কন্যা হেলেন ব্যাগ্‌লি ও স্বামীজীর লিখিত) যে চারিখানি প্রতিবাদ পত্রের প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে মিসেস ব্যাগলির প্রথম পত্রখানির তারিখ ২২শে জুন, ১৮৯৪, এবং বাকী তিনখানা পত্রেরই তারিখ হইতেছে ২০শে বা ২১শে মার্চ, ১৮৯৫। অর্থাৎ, এই তিনখানা পত্র উক্ত প্রথম পত্রখানির প্রায় পূর্ণ নয় মাস পরে এবং ব্রুকলিন রমাবাই সার্কেল যখন স্বামীজীর নিন্দাপ্রচারে রত তখন লিখিত। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, উক্ত কুৎসাটি ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ডেট্রয়েটে প্রথম প্রচারিত হওয়ার সময় মিসেস ব্যাগ্‌লি তাঁহার প্রথম প্রতিবাদ পত্র লিখেন। এবং নয় মাস পরে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ঐ কুৎসাটি যখন ব্রুকলিনে পুনঃপ্রচারিত হয়, তখন তাঁহার দ্বিতীয় প্রতিবাদ পত্র (তারিখ ২০।৩।১৮৯৫) এবং হেলেন ব্যাগ্‌লি ও স্বামীজীর পত্র দুইখানা (এই উভয় পত্রের তারিখ ২১।৩।১৮৯৫) লিখিত হয়। ইহা ব্যতীত, স্বামীজীর পত্রখানি (আমরা দেখিয়াছি ইহা মিসেস বুলের নিকট লিখিত) হইতে আরও বোঝা যায় যে, এই কুৎসাটি এই শেষোক্ত কালেই স্বামীজীর কানে প্রথম পৌঁছে।

যাহা হউক, দেখা যায় মিসেস ম্যাক্‌কীনের ৬ই এপ্রিল তারিখের শেষ বর্ণনাটির কোন জবাব ডাঃ জেন্‌স্‌ দেন না। তবে উহার উত্তরে স্বামীজী ব্রুকলিন এথিক্যাল এ্যাসোসিয়েসনের উদ্যোগে ৭ই এপ্রিল তারিখে পাউচ ম্যানসনে একটি বক্তৃতা দেন। তাঁহার প্রস্তাবানুসারে এই বক্তৃতায় কোন প্রবেশমূল্য লওয়া হয় না, শুধু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বরাহনগরের বিধবা স্কুলের জন্য অর্থসাহায্য সংগ্রহ করা হয়।[১] বক্তৃতাটির বিষয় ছিল "ভারতের কতিপয় প্রথা : উহাদের অর্থ কি এবং কিভাবে উহাদের কদর্থ করা হয়।"

১। স্বামীজী বিধবাদের শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু রমাবাই সার্কেল প্রকারান্তরে প্রচার করিতেছিলেন যে তিনি বিধবাদের শিক্ষার বিরোধী। তাই, ঐ মিথ্যা প্রচার রোধ করিবার জন্য তিনি তাঁহার উক্ত ৭ই এপ্রিল তারিখের বক্তৃতার আয় শশীপদবাবুর স্কুলের সাহায্যার্থে দিবার প্রস্তাব করেন।

এই বক্তৃতায় স্বামীজী ব্রুকলিন রমাবাই সার্কেলের মেয়েদের কথার খুঁটিনাটি কোন জবাব দেন না। এমন কি, ভারতের বিধবাদের অবস্থা সম্বন্ধেও কিছু বলেন না। শুধু সাধারণভাবে হিন্দুদের জাতি-ভেদ প্রভৃতি কয়েকটি প্রথার অর্থ ও উদ্দেশ্য এবং উহাদের দোষগুণ বর্ণনা করিয়া দেখান, বিদেশীরা কিভাবে ঐ সকলের কদর্থ করিয়াছে। ক্রমে তিনি আরও দেখাইতে আরম্ভ করেন, বিদেশীরা হিন্দুদের প্রতি কি ভীষণ দুর্ব্যবহার করিয়াছে এবং কি প্রাণঘাতী আঘাত তাহাদের উপর এখনও করিতেছে। একটি সংবাদপত্র লিখিয়াছেন, এই বিষয় অতি দ্রুত বর্ণনা করিতে করিতে তিনি মঞ্চের উপর উত্তেজিতভাবে পায়চারি করিতে থাকেন এবং বক্তৃতার শেষে বলেন, "পাশ্চাত্য জগৎ আমাদের জন্য বস্তা বস্তা নিন্দা, কুৎসা ও গালাগালি না পাঠাইয়া, একটা ভালবাসার প্রবাহ প্রেরণ করুন। আমরা সকলেই মানুষ হই!"

বক্তৃতার পরে স্বামীজীকে ধন্যবাদ দিয়া সভায় সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গ্রহীত হয় ও শশীপদবাবুর বরাহনগরের বিধবা স্কুলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয়। পরে ডাঃ জেন্‌স্‌ নিজে ঐ সংগৃহীত অর্থ শশীপদবাবুর নিকট পাঠান।

দেখা যায়, স্বামীজীর এই শেষ বক্তৃতাটির পরে তাঁহার বিরুদ্ধে রমাবাই সার্কেলের প্রকাশ্য বিরোধিতার অবসান হয়। এক বৎসর পূর্বে ডেট্রয়েটে যাহা ঘটিয়াছিল ইহা ঠিক তাহারই পুনরাবৃত্তি। তখন স্বামীজী সেখানে (১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ তারিখে) এইরূপ একটি বক্তৃতা দিয়া তাঁহার ঘোর বিরোধী ও ক্ষিপ্তপ্রায় পাদরী ও মিশনারীদের নীরব হইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ঘটনা দুইটি হইতে বোঝা যায়, স্বামীজী আবশ্যক হইলেই ব্যক্তি ও সমষ্টিকে প্রভাবিত করিবার এক অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিতেন। তবে কার্যতঃ এই ক্ষমতা তিনি অতি অল্প ক্ষেত্রেই ব্যবহার করিয়াছেন।

আটাশ

আমেরিকার পূর্বাঞ্চল
ভ্রমণ—তৃতীয় পর্যায়
(১৮৯৫, জানুআরি-আগষ্ট)

নিউ ইয়র্ক, পার্সি ও থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্ক :

গত অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি, ব্রুকলিনে স্বামীজী তাঁহার প্রথম বক্তৃতা দেন ৩০শে ডিসেম্বর (১৮৯৪) এবং দ্বিতীয় বক্তৃতা দেন ২০শে জানুআরি (১৮৯৫)। এই দুই তারিখের মধ্যে সময়ের ব্যবধান প্রায় তিন সপ্তাহ। এই তিন সপ্তাহ তিনি চিকাগো গিয়া হেলদের বাড়ীতে থাকেন। ইহার সমর্থনে মিসেস বুলের নিকট লিখিত তাঁহার দুইখানি পত্র হইতে জানা যায়, তিনি ১লা জানুআরি তারিখে চিকাগো পৌঁছেন ও ১৯শে জানুআরি তারিখে তথা হইতে ব্রুকলিনে ফিরিয়া আসেন। তৎপর এই শেষোক্ত স্থানে (ইহাও আমরা দেখিয়া আসিয়াছি) তিনি ২০শে জানুআরি হইতে ৭ই এপ্রিল তারিখের মধ্যে (দুইটি মজলিসী বক্তৃতা সহ) আরও ছয়টি বক্তৃতা দেন।

তাহা হইলেও দেখা যায়, তাঁহার মন ঐ সময়ে নিউ ইয়র্কের উপরই নিবদ্ধ ছিল। এবং তাহার হেতু এই। পূর্ণ পনর মাসকাল নিরবচ্ছিন্নভাবে নানাস্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বক্তৃতা দিয়া তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এবং ঐ কার্যের উপর তাঁহার এইকালে একটা বিরাগও আসিয়াছিল। ইতিপূর্বে উহার দ্বারা তিনি ভারতের ধর্ম, সমাজ ও রীতিনীতির একটা পরিচয় আমেরিকানদের দিতে পারিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, তাঁহার দেহ, মন ও বাক্য হইতে যে আধ্যাত্মিক শক্তি নিয়ত বিচ্ছুরিত হইত, তাহাও ঐ সময়ে (তাঁহার জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে) এক অমর অক্ষয় মহাবীজের ন্যায় দিকে দিকে

ছড়ানো হইয়াছে। তাহা এখন আমেরিকার আকাশে বাতাসে সঞ্চরণ করিতেছে এবং বহু নরনারীর হৃদয়ভূমিতে বৃদ্ধি-বিকাশের উপায় খুঁজিতেছে। ফলে, তিনি স্বতঃই অনুভব করিতেছিলেন, তাঁহার আমেরিকার কাজ স্থায়ী করিতে হইলে এখন সর্বাগ্রে এই সকল লোকদেরই ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করা একান্ত প্রয়োজন। তাই পরিশেষে (এবং প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরেরই ইচ্ছাতেই) তাঁহার আমেরিকার কার্য মোড় ফিরিল এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগেই তাহার সূচনা দেখা দিল।

আমরা দেখিয়াছি, গ্রীণএকারে একটি পাইন বৃক্ষের তলে বসিয়া স্বামীজী সর্বপ্রথম দুই সপ্তাহ কাল (১৮৯৪, জুলাই-আগষ্ট) ছাত্রদের ধর্মশিক্ষা-দানের ক্লাস করিয়াছেন। এবং তাহার পর তিনি আরও তিন সপ্তাহকাল (১৮৯৪, ৫ই ডিসেম্বর হইতে ২৮শে ডিসেম্বর মধ্যে) মিসেস বুলের ক্যামব্রিজের বাড়ীতেও ঐরূপ ক্লাস করেন। এই দুইটি অভিজ্ঞতা তাঁহার চক্ষু খুলিয়া দেয় ও তাঁহার অন্তর যাহা চাহিতেছিল তাহাকে রূপ দান করিতে সাহায্য করে। তিনি সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিলেন, এই ক্লাসই তাঁহার আমেরিকার কার্যকে সফলতা দান করিবার প্রকৃষ্টতম উপায়। এবং উহা চালাইবার স্থান সম্বন্ধে তিনি পূর্বেই ধারণা করিয়া রাখিয়াছিলেন, (আমেরিকার প্রাণকেন্দ্র) নিউ ইয়র্কই ঐ কার্যের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত জায়গা। তাই, ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে (১৮৯৪) তিনি (ক্যামব্রিজ হইতে) নিউ ইয়র্ক হইয়া বক্তৃতা দিবার জন্য ব্রুকলিন চলিয়া গেলেও, তাঁহার মনে নিউ ইয়র্কে ক্লাস স্থাপনের চিন্তাই প্রবল হইয়া থাকে। এবং তারপর ৩০শে ডিসেম্বর হইতে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল মধ্যে তিনি তাঁহার ব্রুকলিনের বক্তৃতাগুলি দিলেও, বস্তুতঃ ঐ কালেই তিনি নিউ ইয়র্কে তাঁহার উক্ত ক্লাস গ্রহণের কার্যও চালু করেন। উহার ইতিহাস এইরূপ।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে স্বামীজী যখন মিসেস্ বুলের বাড়ীতে ক্লাস করিতেছিলেন, তখন তাঁহার নিউ ইয়র্কের বন্ধুগণ (মিস্

ফিলিপ্‌স্‌, মিস্‌ ফার্মার, মিস্‌ থার্স্‌বি ও গার্নসি দম্পতি প্রভৃতি) তাঁহার সহিত আলোচনা-পূর্বক তাঁহার নিউ ইয়র্কের কার্যের ব্যবস্থা করিতে রত হন। এই কার্য-ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ ছিল নিউ ইয়র্কে তাঁহার ধর্মশিক্ষার ক্লাস স্থাপনের একটা সন্তোষজনক বন্দোবস্ত করা। অর্থাৎ, ক্লাস কোথায় করা যাইতে পারে, তজ্জন্য আবশ্যকীয় অর্থ কিভাবে সংগ্রহ হইবে এবং ক্লাস ও স্বামীজীর অপর কার্য সংক্রান্ত লেখাপড়া ও হিসাবাদি রাখার কাজ কে করিবে, ইত্যাদি বিষয় স্থির করা। অনেক আলাপ-আলোচনার পর মিস্‌ থার্স্‌বি ও মিস্‌ ফার্মার প্রভৃতি স্বামীজীর মজলিসী বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন এবং তাঁহার ক্লাস স্থাপনের কাজ কার্যকরী করেন তাঁহার আমেরিকান শিষ্য লিয়ন ল্যাণ্ড্‌স্‌বার্গ (Leon Landsberg)। ল্যাণ্ড্‌স্‌বার্গ উদ্যোগী হইয়া নিউ ইয়র্কের ৫৪ নং ওয়েষ্ট থার্টিথার্ড ষ্ট্রীটে (54, West 33rd Street) দুইখানা ঘর ভাড়া করেন—একখানা তাহার নিজের জন্য অপরখানা স্বামীজীর ক্লাস করিবার ও হেডকোয়ার্টার্সরূপে ব্যবহারের জন্য। ইহা ছাড়া, ল্যাণ্ড্‌স্‌বার্গ স্বেচ্ছায় অগ্রবর্তী হইয়া স্বামীজীর ক্লাস ও অফিস সংক্রান্ত সকল লেখাপড়া ও হিসাবাদি রাখার কাজও গ্রহণ করেন। এবং ব্যবস্থা হয় যে, স্বামীজী গার্নসি দম্পতির বাড়িতে আহার করিবেন ও রাত্রে সেখানেই শুইবেন। (ইজাবেল ম্যাক-ইণ্ডলীর নিকট ল্যাণ্ড্‌স্‌বার্গের লিখিত ২৩শে জানুআরি তারিখের পত্র)।

এই সময়টা ছিল শীতকাল এবং স্বামীজী পুনঃপুনঃ সর্দিতে আক্রান্ত হইতেছিলেন। তৎসত্ত্বেও তিনি ২৭শে জানুআরি (১৮৯৫) তাঁহার উক্ত ভাড়াটিয়া ঘরে প্রবেশ করেন এবং খুব সম্ভবতঃ ২৮শে জানুআরি তারিখ হইতেই তিনি সেখানে বেদান্ত ও রাজযোগের ক্লাস গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন।

কিন্তু ৫৪ নং ওয়েষ্ট থার্টিথার্ড ষ্ট্রীট ধনী বা সম্ভ্রান্ত পাড়ায় অবস্থিত ছিল না। তাই স্বামীজীর কয়েকজন শুভার্থী উক্ত ঘর দুইখানি তাঁহার কাজের অনুপযুক্ত মনে করেন। তাহারা বলিলেন, 'ঐ দরিদ্র পাড়ায়

তাঁহার ক্লাস করা নিষ্ফল হইবে এবং কোন ভদ্র মহিলাই ঐ পাড়ায় আসিয়া তাঁহার ক্লাসে যোগ দিবেন না।' (মিসেস বুলের বন্ধু) মিস হ্যামলিন স্বামীজীকে তাঁহার নিউ ইয়র্কের কার্যে বিশেষ সহায়তা করেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "যে লোক দীন গৃহে বাস করে, তাহার কথা শুনিতে তিনি নিজে বা অন্য 'ভাল শ্রেণীর লোকেরা' (right kind of people) কখন আসিতে পারেন না।" তিনি তাঁহাকে উক্ত ভাল শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিবার প্রস্তাব করেন।

স্বামীজীর দরিদ্র পাড়ায় ঘর লইবার দুইটি বিশেষ হেতু দেখা যায়—একটি অর্থাভাব, অপরটি স্থানীয় বর্ণবিদ্বেষ। অনেক বাড়ীওয়ালী তাঁহাকে বলেন, 'তাঁহাকে ঘর দিতে তাহাদের নিজেদের আপত্তি নাই, কিন্তু তাহাদের আশঙ্কা হয় একজন এসিয়াবাসীকে বাড়িতে রাখিলে তাহাদের অপর ভাড়াটিয়ারা চলিয়া যাইবেন।' এবং ইহা বলিয়াই তাহারা তাঁহাকে ঘর দিতে অস্বীকার করেন।

যাহা হউক, কিছু পরে (১১ই এপ্রিল তারিখে) স্বামীজী মিস্ হ্যামলিন ও তাহার উক্তি সম্বন্ধে মিসেস বুলের নিকট যাহা লিখেন তাহার মর্ম এই, 'মিস্ হ্যামলিন আমাকে খুবই সাহায্য করিতেছেন। তিনি আমাকে "ভাল শ্রেণীর লোকদের" সহিত পরিচয় করাইয়া দিতে চান। কিন্তু প্রকৃত ভাল লোক তাহারাই যাহাদের ভগবান পাঠান। মাত্র তাহারাই আমাকে সাহায্য করিতে পারে ও করিবে।

'আমার প্রত্যেকটি বন্ধু মনে করিয়াছিলেন যে আমার দরিদ্র পাড়ায় থাকা ও কাজ করা বিফল হইবে এবং কোন ভদ্র মহিলাই এখানে আসিবেন না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও "ভাল শ্রেণীর লোকেরা", এমন কি, মিস্ হ্যামলিন নিজেও দিনরাত এখানে আসিতেছেন। ইত্যাদি।'

বস্তুতঃ স্বামীজীর এই দরিদ্র পাড়ার ক্লাসে প্রায় প্রথম হইতেই ভিড় হইতে থাকে। এবং তৎসম্বন্ধে ব্রুকলিনের মিস্ ওয়াল্ডো (Miss Ellen Waldo) লিখিয়াছেন, "ব্রুকলিনে যাহারা স্বামীর

বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন, তাহাদের কয়েকজন এখন তিনি নিউ ইয়র্কে যেখানে বাস করিতেন সেখানে যাইতে আরম্ভ করেন। এই স্থানটি ছিল একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীর ত্রিতলের একটি সাধারণ ধরনের ঘর। ক্লাস বিস্ময়কর দ্রুততার সহিত বাড়িয়া উঠে। এবং ক্ষুদ্র ঘরটি লোকে ভরিয়া গেলে ছবির মত সুন্দর দেখাইত। স্বামী নিজে এবং শ্রোতাদের অধিকাংশ মেঝের উপর বসিতেন। ক্রমে আরও লোক আসিলে, রান্নার টেবিল, সোফার হাতল, এমন কি, কোণে অবস্থিত কাপড় কাচার স্ট্যাণ্ডটি পর্যন্ত বসার আসনরূপে ব্যবহৃত হইত। দ্বার খোলা রাখা হইত এবং যাহাদের ঘরে জায়গা হইত না, তাহারা (বাড়ীর সকলেরই ব্যবহার্য) হলঘরে ও তাহা ভরিয়া গেলে সিঁড়ির উপরে বসিতেন। আর ঐ প্রথম ক্লাসগুলি! উহা কি তীব্রভাবে চিত্তাকর্ষক ছিল! যাহাদের ঐ ক্লাসে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হইয়াছিল, তাহারা জীবনে কি উহা কখন ভুলিতে পারিবেন! স্বামী কি গরিমাসম্পন্ন ছিলেন! অথচ কত সরল, কত গভীরভাবে আন্তরিক ও কি বাগ্মিতাপূর্ণ! ছাত্রগণ তাহাদের সমস্ত অসুবিধার কথা ভুলিয়া রুদ্ধনিঃশ্বাসে তাঁহার প্রত্যেকটি কথা শুনিতে নিযুক্ত থাকিতেন।

"...স্বামী তাঁহার এই ক্লাসের শিক্ষা বাতাসের ন্যায় বিনামূল্যে দান করিতেন। বাড়ীভাড়া স্বেচ্ছাপ্রদত্ত চাঁদার সাহায্যে দেওয়া হইত। এবং তাহাতে না কুলাইলে স্বামী একটি হল ভাড়া করিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ঐহিক বিষয়ক বক্তৃতা দিতেন এবং তাহার আয় ক্লাস চালাইবার কাজে ব্যয় করিতেন।...

"এই ক্লাস ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরি (?) মার্সে আরম্ভ হয় এবং জুন মাস পর্যন্ত চলে। কিন্তু তাহার অনেক পূর্বেই উহা অনেক বড় হইয়া উঠায়, উহা নীচের একটি সমগ্র বৈঠকখানা ঘর ও তৎসংলগ্ন একটি বিস্তৃত অংশে বসিতে আরম্ভ করে। ক্লাসগুলি প্রায় প্রত্যেক দিন সকালে এবং সপ্তাহে কয়েকদিন বৈকালেও বসিত। কয়েকটি রবিবাসরীয় বক্তৃতাও দেওয়া হয় এবং স্বামীজীর শিক্ষাসকল অত্যন্ত নূতন ধরনের বলিয়া যাহারা উহার অতিরিক্ত ব্যাখ্যা শুনিবার

সুযোগ চাহিতেন, তাহাদের সাহায্যের জন্য 'প্রশ্নের' ক্লাসও লওয়া হইত।"

স্বামীজীর এই ক্লাস সম্বন্ধে আর একটি বিবরণদাতা হইতেছেন তাঁহার পরবর্তীকালের একনিষ্ঠ বন্ধু (ও শিষ্যের ন্যায় অনুগামী) মিস্ জোসেফাইন ম্যাকলাউড। তিনি তাঁহার বিধবা ভগ্নীর (মিসেস্ স্টার্জিস) সহিত নিউ ইয়র্ক হইতে ৩০ মাইল দূরবর্তী ডব্‌স্ ফেরিতে বাস করিতেন। তাহার নিউ ইয়র্কের একটি বন্ধু তাহাকে ও তাহার ভগ্নীকে নিউ ইয়র্কে আসিয়া ভারতবর্ষের একটি আশ্চর্য মানুষকে দেখিতে ও তাঁহার কথা শুনিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে তিনি ও তাহার ভগ্নী ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জানুআরি তারিখে স্বামীজীর ৫৪নং ওয়েষ্ট থার্টিথার্ড ষ্ট্রীটের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি অপর নানা কথার মধ্যে লিখিয়াছেন—

"(উক্ত ২৯শে জানুআরি তারিখে স্বামীর বসিবার ঘরে পৌঁছিয়া দেখিলাম) পনর-কুড়িজন ভদ্র মহিলা ও দুই-তিনজন ভদ্রলোক সেখানে সমবেত হইয়াছেন। (তাহাতেই) ঘরটি ভরিয়া গিয়াছে। কোন চেয়ার খালি না থাকায় আমরা মেঝের উপর সামনের সারিতে বসিলাম। স্বামী একটি কোণে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি কিছু বলিলেন যাহার শব্দগুলি এখন আমার স্মরণ হয় না। কিন্তু উহা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হইল উহা সত্য এবং তাঁহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্যও মনে হইল সত্য। এইভাবে সাত বৎসর ধরিয়া আমি তাঁহার কথা শুনিয়াছি। এবং তিনি যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহাই আমার মনে হইয়াছে সত্য।······

"ঐ বৎসর সমস্ত শীতকালটা আমি সপ্তাহে তিন দিন করিয়া সকালে ১১টার সময় আসিয়া তাঁহার বাণী শুনিয়াছি। আমি কখন তাঁহার সহিত কথা বলি নাই, কিন্তু আমরা এত নিয়মিতভাবে আসিতাম যে আমাদের জন্য সামনের দুইটি আসন সর্বদাই খালি রাখা হইত। একদিন তিনি আমাদের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা দুজনে কি বোন?' আমরা 'হ্যাঁ' বলিলে তিনি

পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, 'তোমরা কি অনেক দূর থেকে আস?' আমরা কহিলাম, 'না, বেশী দূর নয়, হাডসন নদীর ধার দিয়া ত্রিশ মাইল।' তিনি বলিলেন, 'এত দূর? এ বিস্ময়কর!' মাত্র ঐ কয়টি কথাই আমি প্রথম তাঁহার নিকট বলি।..."

যদিও গোড়ার দিকে ঠিক ছিল যে, স্বামীজী গার্নসি দম্পতির বাড়ীতে আহার করিবেন ও নিদ্রা যাইবেন, তাহা হইলেও দেখা যায় তাঁহার ঐ কাজ দুইটি তিনি সাধারণতঃ তাঁহার উক্ত দরিদ্র আবাসেই সমাধা করিতেন, মাত্র কখন কখন গার্নসি দম্পতির বাড়ীতে গিয়া ঘুমাইতেন। এই বিষয়ে ১৪ই ফেব্রুআরি তারিখে তিনি মিসেস্ বুলের নিকট লিখেন, "আমি এখন খুব আনন্দে আছি। আমি ও ল্যাণ্ড্স্বার্গ কিছু ভাত ও ডাল বা যব রান্না করিয়া নিঃশব্দে আহার করি এবং কিছু লিখি, পড়ি বা কিছু শিখিবার জন্য সমাগত দরিদ্র লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। এইরূপে আমি আমেরিকাতে এখন পূর্ব হইতে নিজেকে অধিক পরিমাণে সন্ন্যাসী অনুভব করিতে পারিতেছি।"

ল্যাণ্ড্স্বার্গ তেজস্বী, উদ্যমশীল, সুপণ্ডিত এবং অবিবাহিত ছিলেন। পূর্বে তিনি জাতিতে রুশদেশীয় ইহুদী ছিলেন, পরে আমেরিকান নাগরিক হন। তাহার নিজ বেশের প্রতি উদাসীনতা, তাহার উগ্র ধর্মভাব ও গরীবের প্রতি তাহার তীব্র সহানুভূতি স্বামীজীকে তাহার প্রতি আকৃষ্ট করে। কিন্তু দেখা যায়, উক্তরূপে কিছুকাল ক্লাস চলিবার পর, ল্যাণ্ড্স্বার্গ এপ্রিল মাসের শেষার্ধে স্বামীজীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যান। ইহার সঠিক কারণ কিছু জানা যায় না। তবে সকল অবস্থা লক্ষ করিলে অনুমান হয় যে, ঐ কারণ ল্যাণ্ড্স্বার্গের মানসিক চাঞ্চল্যের অতিরিক্ত কিছু নয়। এবং জুন মাসে (১৮৯৫) স্বামীজী তাহার সম্বন্ধে মিসেস বুলের নিকট এক পত্রে লিখেন, "ল্যাণ্ড্স্বার্গ যেখানেই থাকুক, ভগবান যেন তাহাকে আশীর্বাদ করেন! তাহার মত আন্তরিকতাসম্পন্ন লোক আমি খুব কমই দেখিয়াছি। সবই মঙ্গলের জন্য।...আশা করি

আমি একাকীই উত্তমভাবে কাজ চালাইতে সক্ষম হইব। মানুষের সাহায্য যত কমে, ভগবানের সাহায্য তত বাড়ে।”

তবে ইহার অল্প পরেই ল্যাণ্ড্সবার্গ তাহার গুরুর নিকট ফিরিয়া আসেন। স্বামীজী তাহাকে ক্ষমা করেন ও পরে থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে (Thousand Island Park) তাহাকে সন্ন্যাস দিয়া কৃপানন্দ নাম দান করেন। কিন্তু ইহার প্রায় এক বৎসর পরে, ল্যাণ্ড্সবার্গ পুনরায় একবার তাহার গুরুকে পরিত্যাগ করেন ও পুনরায় তাঁহার নিকট ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার ক্ষমা ও আশীর্বাদ লাভ করেন।

আমরা দেখিয়াছি স্বামীজী তাঁহার ছাত্রদের শিক্ষা দিয়া কোন পয়সা লইতেন না। এবং ক্লাস চালাইতে টাকার অভাব হইলে, তিনি সাধারণের নিকট বক্তৃতা দিয়া আবশ্যকীয় অর্থ রোজগার করিতেন। এইভাবে তিনি মার্চ মাসের (১৮৯৫) শেষের দিকে তাঁহার নীচের তলার ঘরে প্রবেশমূল্য গ্রহণ করিয়া কয়েকটি বক্তৃতা দেন। তাঁহার ঐ ঘরে প্রায় একশত লোক বসিতে পারিত। পরে ঐ সনের এপ্রিল মাসে তিনি তাঁহার বার্বার হাউস বক্তৃতাবলী (Barbar House Lectures) দিয়া একশত ডলার প্রাপ্ত হন; এবং মে মাসে তিনি ঐভাবেই মট্স্ মেমোরিএ্যাল বিল্ডিং'এর (Mott's Memorial Building) উপরের হলে দুইটি বক্তৃতা দেন। এই দুইটি বক্তৃতার বিষয় ছিল 'ধর্মবিজ্ঞান' ও 'যোগের যুক্তিভিত্তি'।

অর্থসংগ্রহের জন্য স্বামীজী এইকালে সম্ভবতঃ আরও নানা জায়গায় বক্তৃতা দিয়াছেন। এবং অনুমান হয় যে এই সকল সংবাদহীন সভারই একটিতে সিষ্টার দেবমাতা তাঁহাকে প্রথম দর্শন করেন। তিনি লিখিয়াছেন, “আমি একদিন ম্যাডিসন এ্যাভিনিউ দিয়া যাইবার সময় দেখিলাম একটি বাড়ীর (Hall of the Universal Brotherhood) জানালায় একটি বিজ্ঞাপন: পরের রবিবারে বেলা তিনটার সময় স্বামী বিবেকানন্দ এখানে 'বেদান্ত কি?' ও তৎপরের রবিবারে 'যোগ কি?' বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন।

আমি নির্দিষ্ট সময়ের কুড়ি মিনিট পূর্বে গিয়া দেখিলাম, হলটি অর্ধেকের বেশী ভরিয়া গিয়াছে।···হলটি দ্বিতলে অবস্থিত ছিল এবং যখন তিনটা বাজিল তখন হল, সিঁড়ি, জানালার চৌকাঠ এবং রেলিং প্রভৃতি সবই ঠাসাঠাসিভাবে ভরিয়া গিয়াছে। এমন কি, অনেকে নীচের তলায় দাঁড়াইয়া আশা করিতেছিলেন যে হয়তো উপরের হলের বক্তৃতার কিছু সেখান হইতে ক্ষীণভাবে শোনা যাইবে।

"সহসা সকল শব্দ থামিয়া গেল। সিঁড়ির উপর শান্ত পদশব্দ হইতে লাগিল এবং স্বামী বিবেকানন্দ হলমধ্যস্থ পথের উপর দিয়া সটানভাবে রাজকীয় গরিমায় মঞ্চে গিয়া উঠিলেন। তিনি বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন এবং দেশ, কাল, লোক ও স্মৃতি সবই মুছিয়া গেল, শুধু একটি কণ্ঠস্বর শূন্যের মধ্য দিয়া ধ্বনিত হইতে লাগিল।

"খালি হলের নীরবতা আমার সম্বিৎ ফিরাইয়া দিল। তখন সকলেই চলিয়া গিয়াছে, কেবল স্বামী ও অপর দুই ব্যক্তি মঞ্চের নিকট দাঁড়াইয়া ছিলেন। পরে আমি জানিয়াছি ঐ দুইটি লোক ছিলেন স্বামীজীর উৎসাহী শিষ্য মিঃ ও মিসেস্ গুডইয়ার। দুইটি সভাতেই মিঃ গুডইয়ার ঘোষণা পরিবেশন করেন।"

জানা যায়, স্বামীজী তাঁহার নিউ ইয়র্ক ক্লাসে প্রথম কয়মাস প্রধানতঃ জ্ঞানযোগ ও রাজযোগের আলোচনা করেন। কারণ, তাঁহার এই ক্লাস করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, কতিপয় উপযুক্ত ছাত্রকে এমন ভাবে তৈয়ার করা যাহাতে তাহারাই তাঁহার আমেরিকার কার্যের সকল ভার গ্রহণ করিতে ও তাহা এক ছেদহীন অক্ষয় ধারায় চালু রাখিবার পথ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হয়। তাই, তিনি তাহাদের প্রথম হইতেই যুক্তিসিদ্ধ শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানের সহিত আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের (ধ্যান-জপাদি) উপায় সকল সম্বন্ধে বিশেষভাবে শিক্ষা ও শিক্ষণ দেন। আবশ্যকমত তিনি তাহাদের ব্যক্তিগতভাবেও উপদেশ দিতেন এবং যাহার যে পথ তাহাকে সেই পথেই চালিত করিতেন। তিনি দৃষ্টি-মাত্রে প্রত্যেক লোকের পথ ও প্রয়োজন বুঝিয়া লইতে পারিতেন।

এই কাজে স্বামীজী কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত হন। এবং ইহার

সংসিদ্ধির জন্য তিনি অমানুষিক পরিশ্রম করিতেন। এই জন্য একদিকে তিনি যেমন প্রচুর অধ্যয়ন করিতেন[১], অন্যদিকে তেমনি গভীর চিন্তা এবং (জপ, ধ্যান ও সঙ্গীতাদি সহায়ে) কঠোর তপস্যায় রত হন। ফলে, এইকালে তিনি সর্বদাই এক উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে বিচরণ করিতেন এবং যখন তখন সামান্য উদ্দীপনাতেই সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। সময়ে সময়ে ক্লাসের মধ্যেও তাঁহার এইরূপ হইত। ইহাতে তাঁহার শিক্ষাদানের কার্যে বাধা পড়ে বলিয়া তিনি ঐ জন্য নিজের উপরে বিরক্ত হইতেন। এবং ঐ বাধা যাহাতে না হয়, তজ্জন্য তিনি দুই-এক জনকে শিখাইয়া দেন কিভাবে একটি শব্দ বা নাম উচ্চারণ করিয়া তাঁহার সমাধি ভাঙ্গিতে হইবে।

স্বামীজী ও তাঁহার ক্লাস সম্বন্ধে এইকালের আর কয়েকটি জ্ঞাতব্য কথা এই। পূর্বে তিনি যখন নানাস্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বক্তৃতা দিতেন, তখন সাধারণতঃ ধনী ও পদস্থ লোকেরাই তাঁহাকে অভ্যর্থনাদি করিয়াছেন এবং তাঁহার বক্তৃতা দিবার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তিনি যখন লোক তৈয়ারী করিবার উদ্দেশ্যে নিউ ইয়র্কে ক্লাস স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন, তখন তিনি ঐ ধনী ও পদস্থ শ্রেণীর লোকদের উপর নির্ভরতা ও তাহাদের পরিচালনা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন। এবং ঐ মনোভাবের বশেই তিনি ঐকালে নিউ ইয়র্কের ধনী লোকদের বৈঠকখানায় খুব কমই বক্তৃতা দিয়াছেন। তৎসম্পর্কে তিনি মিসেস বুলের নিকট (২১শে মার্চ তারিখে) লিখেন, "পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও কি দেখা গিয়াছে যে ধনী লোকের দ্বারা কোন বড় কাজ হইয়াছে? চিরদিনই হৃদয় ও মস্তিষ্কের দ্বারাই ঐ কাজ সাধিত হয়, অর্থের দ্বারা নয়।" বস্তুতঃ তাঁহার এখন প্রয়োজন ছিল প্রধানতঃ তাহাদেরই যাহারা আধ্যাত্মিক সাধনায় উন্নতি লাভ করিয়া আমেরিকাতে তাঁহার আরব্ধ কার্যের ভার গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে। এবং তাহারই জন্য তিনি ধনীদের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিয়া

১। অধ্যয়ন ও কাজের সুবিধার জন্য স্বামীজী মাঝে মাঝে ভারতবর্ষে চিঠি লিখিয়া নানা শাস্ত্র ও ধর্মপুস্তকাদি আনাইয়া লইতেন।

স্বাধীনভাবে সমাগত সর্বশ্রেণীর ছাত্রদের মধ্য হইতে লোক বাছিতে ও তাহাদের তৈয়ার করিতে যত্নবান হন।

তবে দেখা যায়, ক্লাসের প্রথমদিকে তাঁহার পশ্চাতে অন্য এক শ্রেণীর উপদ্রবকারী লোক ছুটিয়াছিল। এই সকল লোকেরা ছিল ভূত, প্রেত ও মহাত্মা প্রভৃতিতে ঘোর বিশ্বাসী। তাহারা চাহে স্বামীজী তাহাদের মত-বিশ্বাস সমর্থন করুন এবং তিনি তাহা করিতে অস্বীকার করায়, তাহারা তাঁহার অনিষ্ট করিবে বলিয়া ভয়ও দেখায়। কিন্তু স্বামীজী অটল দৃঢ়তার সহিত তাহাদের সকল কথার একই উত্তর দেন "আমি সত্যের পক্ষে—মিথ্যার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই।" পরিশেষে তাহারা নিরাশ হইয়া তাঁহার নিকট আসা বন্ধ করে।

বস্তুত স্বামীজী তাঁহার নিউ ইয়র্ক ক্লাসের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও ভাব কোন কিছুর দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইতে দিতেন না। এবং উহার কাজে কাহারও হস্তক্ষেপ বা ভিন্ন রকমের উপদেশও তিনি সহ্য করিতেন না। ইহা ব্যতীত আরও দেখা যাইত, এইকালে বন্ধুদের বাড়ীতে বা অপর কোথাও কেহ তাঁহার সহিত তর্কে লিপ্ত হইলে তিনি তাঁহার প্রতিপক্ষের সকল অন্যায় কথারই যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিতেন না। ইহা তাঁহার কাজের পক্ষে ক্ষতিকর মনে করিয়া তাঁহার কল্যাণকামী বন্ধুগণ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠেন। এমন কি, মিসেস বুল, মেরী হেল ও তাহার মহীয়সী জননী মিসেস হেল পর্যন্ত মনে করিতে আরম্ভ করেন যে স্বামীজী বদ্‌লাইয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার পূর্বের বিনয়, প্রেম, মিষ্টত্ব প্রভৃতি আর নাই। বিভিন্ন ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া তাহারা তিন জনেই তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া চিঠি লিখেন। মেরী হেলের পত্রের উত্তরে স্বামীজী (১লা ফেব্রুআরি তারিখে) লিখেন—

"...তোমার সমালোচনায় আমি বিশেষ সুখী হইয়াছি এবং একটুও দুঃখিত হই নাই। কয়েকদিন পূর্বে মিস্ থার্সবির বাড়ীতে একটি প্রেস্‌বিটেরিয়ান ভদ্রলোকের সহিত আমার তুমুল তর্ক হয়। তিনি অত্যন্ত গরম ও ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া আমাকে গালি দিতেছিলেন।

যাহা হউক, এই সকল ঘটনা আমার কাজের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া মিসেস্ বুল আমাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিয়াছেন। তোমার মতও ঐরূপই দেখিতেছি।

"...আমি খুব ভাল করেই জানি যে মিষ্ট হওয়া সাংসারিক উন্নতি লাভের পক্ষে কিরূপ কল্যাণকর, কিন্তু উহা যখন অন্তরের সত্যকে খর্ব করে, তখন আমি থামিয়া যাই। আমি দীনতায় বিশ্বাসী নই, আমি সমদর্শনে বিশ্বাসী—সকলের সম্পর্কে একই মনোভাব। সাধারণ লোকের কর্তব্য তাহাদের সমাজরূপ ঈশ্বরের আদেশ মানিয়া চলা, কিন্তু যাহারা আলোকের সন্তান তাঁহারা ঐরূপ করেন না। ইহা একটি শাশ্বত নিয়ম।...

"প্রেজবিটেরিয়ান ধর্মযাজকের সঙ্গে আমার গত যুদ্ধ এবং মিসেস্ বুলের সহিত তৎপরের সুদীর্ঘ সংগ্রাম আমাকে পরিস্কারভাবে সন্ন্যাসীর প্রতি মনুর বাক্যের অর্থ উপলব্ধি করাইয়া দিয়াছে—'একা থাক, একা থাক।' সকল সখ্য, সকল ভালবাসা, শুধু বন্ধন মাত্র।...হে মহান ঋষিগণ! তোমরাই ঠিক। অপরের উপর নির্ভরশীল থাকিয়া কেহ সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের সেবা করিতে পারে না।...জীবন কিছুই নয়! মৃত্যু একটা ভ্রম মাত্র! একমাত্র ঈশ্বরই সত্য! হে আমার আত্মা, ভয় ক'রো না! একা থাক। বোন, পথ দীর্ঘ, সময় অল্প, রাত্রি আগতপ্রায়। আমার শীঘ্রই বাড়ী ফিরিতে হইবে। আমার আচরণকে মার্জিত করার সময় আমার নাই। (এমন কি) আমি আমার বাণী প্রদানেরও সময় দেখিতেছি না। তুমি সৎ ও কত দয়াশীল, তোমার জন্য আমি সবই করিতে পারি। কিন্তু রাগ করো না, আমি তোমাদের সকলকেই নেহাৎ শিশুর মত দেখি।

"হে আমার আত্মা, আর স্বপ্ন দেখো না! আহা! আর স্বপ্ন দেখো না! এক কথায়, আমার একটি বাণী দান করিতে হইবে, জগতের কাছে মিষ্ট হইবার সময় আমার নাই।...মিসেস বুলের মত তুমি যদি মনে করিয়া থাক যে আমার একটা কাজ আছে, তাহা হইলে তুমি অতি গুরুতর ভুল করিয়াছ। এই ব্রহ্মাণ্ডে বা তাহার

বাহিরে আমার কোন কর্ম নাই। শুধু আমার একটি বাণী দান করিতে হইবে এবং তাহা আমি আমার নিজের ভাবেই দিব।··· স্বাধীনতা—মুক্তি, ইহাই আমার ধর্মের সবটুকু এবং যাহা কিছু ইহাকে ক্ষুণ্ণ করিতে উদ্যত হয় তাহা আমি যুদ্ধ বা পলায়নের দ্বারা এড়াইয়া চলি। ছিঃ! আমি পুরোহিতদের ঠাণ্ডা করিতে যাইব! ভগ্নী, এ কথাটা ভুল বুঝিও না। কিন্তু তোমরা শিশু এবং শিশুদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। তোমরা সে ঝরণাবারি পান কর নাই, যাহা যুক্তিকে অযুক্তি—মরণশীলকে অমর—এই জগৎকে শূন্য এবং মানুষকে দেবতা করে। যদি পার এই জগৎরূপ মিথ্যা মায়াজাল হইতে বাহির হইয়া আস। তাহা হইলেই আমি তোমাকে সাহসী ও মুক্ত বলিব। যদি তাহা না পার, তবে যাহারা এই সমাজরূপ মিথ্যা ঈশ্বরকে ভূমিসাৎ করিতে ও তাহার নগ্ন কপটতাকে পদদলিত করিতে সাহসী হয় তাহাদের উৎসাহ দাও। আর তাহাও যদি না পার, তবে নীরব হও, আপোষ এবং ভাল মিষ্ট হওয়ার কথা বলিয়া তাহাদের পুনরায় পঙ্কের মধ্যে টানিয়া আনিতে চেষ্টা করিও না।···”

দেখা যায়, স্বামীজীর পূর্বোক্ত পত্রের উত্তরে মেরী হেল তাঁহাকে যাহা লিখেন তাহার জবাব, প্রতিজবাব ও তাহাদের উভয়ের আরও দুইখানি পত্র আনন্দের ভরে কবিতায় লেখা। এবং স্বামীজী ও হেল ভগ্নীদের মধ্যে যে অপূর্ব প্রীতির সম্বন্ধ ছিল তাহা অম্লানই থাকিয়া যায়। কিন্তু স্বামীজীর জননীস্বরূপা মিসেস্ হেলের মনোব্যথা উহাতে দূর হয় না। তিনি ২৬শে ফেব্রুআরি তারিখে স্বামীজীকে (অপর নানা কথার মধ্যে) লিখেন,

“তোমার প্রথম পত্রের জবাব দিতে ইচ্ছা হয় নাই।···কিন্তু এখন তোমার দ্বিতীয় পত্র আসিয়াছে। ইহাও সেই একই কাহিনীর দ্বারা আরম্ভিত, একই ভাবপূর্ণ এবং সে ভাব ভালবাসার ভাব নয়, ঘৃণার—গালাগালি, তিক্ততা ও বিদ্বেষের। প্রিয় ভাই, আমি ভীষণ নৈরাশ্যের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি—এক বৎসর পূর্বে তোমার হস্ত দ্বারা এ রকম পত্র লিখিত হওয়া সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব ছিল। আমি

সেই কথা স্মরণ করিয়া এখন আনন্দ পাই। সেই মহান মহিমময় আত্মা কোথায়, যিনি ধর্মমহাসভায় যোগ দিয়াছিলেন, যিনি ঈশ্বর-প্রেমে এরূপ পরিপূর্ণ ছিলেন যে তাঁহার মুখমণ্ডল দিব্যজ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত থাকিত, যাহার বাক্যাবলী অগ্নিসম ছিল এবং যাহার উপস্থিতিমাত্রে একটি সাম্য ও পবিত্রতার আবহাওয়া সৃষ্টি হইত ও তাহা অপর সকলকে তাঁহার নিকট আকর্ষণ করিয়া লইত?···প্রিয় স্বামী, বিদায়—আমার এই দীর্ঘ পত্রের জন্য আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাহিব না এবং আমি আশা করি তুমি আমার মনের দুই-একটি সংশয়-সন্দেহের উপর একটা আলোক নিক্ষেপ করিবা—তোমার স্বাস্থ্য ভাল হউক, ইত্যাদি।"

পত্রখানি তিরস্কারপূর্ণ হইলেও, ইহাতে স্বামীজীর প্রতি মিসেস্ হেলের অন্তরের সুগভীর স্নেহ সুপরিস্ফুট। ইহার উত্তরে স্বামীজী তাঁহাকে কি লিখিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। তাহা হইলেও হেল ভগিনীগণের নিকট লিখিত তাঁহার পরবর্তীকালের পত্রগুলি হইতে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে হেল পরিবারের সকলের সঙ্গেই তাঁহার প্রীতির সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত অটুট ও অক্ষতই ছিল।

যাহা হউক, যে উদ্দেশ্যে স্বামীজী তাঁহার নিউ ইয়র্কের ক্লাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার সফলতার উপর নির্ভর করিতেছিল তাঁহার আমেরিকার কার্যের স্থায়িত্ব ও ভবিষ্যৎ প্রসার। তাই, এই ক্লাসের কাজের উৎকর্ষতা সাধনের নিমিত্ত তিনি অবিশ্রান্ত-ভাবে খাটিতেন। আর যাহাদের জন্য তাঁহার এই শ্রম, সেই জ্ঞান-সত্যকামী ছাত্রছাত্রীদের জন্য তাঁহার প্রাণে জাগিত কি গভীর ভালবাসা, কি অনুক্ষণের আশীর্বাদ! তাহারা অবাক হইয়া দেখিতেন, যে মহান সুদুর্লভ পুরুষ তাঁহার অমেয় শক্তিবলে তাহাদের অতি নির্মম, উচ্চতম জ্ঞানদান করিতে ও মহা ত্যাগবৈরাগ্যের পথে চালিত করিতে প্রবৃত্ত, তিনিই আবার তাহাদের দেহ-মন প্লাবিত করিয়া এক অপার্থিব স্নেহবারি ঢালিয়া দিতেছেন। আর যে শিক্ষা তিনি তাহাদের দিতেন তাহাতে তাহাদের অন্তর আপনা হইতেই নির্মল,

বিধৌত ও জ্ঞানোজ্জ্বল হইয়া উঠিত, কেহ কেহ নানা দিব্যানুভূতি লাভ করিয়া ধন্য বোধ করিতেন। তাহাদের আনন্দের আর সীমা ছিল না। প্রতিদিন নূতন কথা, নূতন রাজ্যের আলোক! আর ঐ কথাগুলি কি অনবদ্য, কি অনুপম উৎকর্ষতাপূর্ণ! প্রাণ আপনি টানিয়া লয়—মন স্বতঃই উহার মধ্যে মিশিয়া যায়। এমন উপদেশ কেহ আর কখন কি শুনিয়াছে! কি আনন্দ! তাহাদের মনে হইত এ যেন এক দিব্যধামের দিব্যালোকে বাস করিতেছি। দিন কি ভাবে আসিয়া যাইতেছে তাহার খোঁজ তাহাদের কেহ রাখিতেন না।

এইভাবে কয়েক মাস ক্লাস চলিবার পর জুন মাস আগত হইল (১৮৯৫)। তখন গ্রীষ্মাবকাশের সময়, ছাত্রদের অনেকে শহরের বাহিরে গিয়া থাকিবেন। আর অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে স্বামীজী নিজেও এই সময়ে ছিলেন ক্লান্ত ও ভগ্নস্বাস্থ্য। তাই, শরীর ভাল করিবার জন্য তাঁহার কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে যাওয়া খুবই আবশ্যক হইল। কিন্তু ঐ জন্য যে তাঁহার ক্লাসের অমূল্য শিক্ষা বন্ধ হইবে, তাহা তাঁহার ছাত্রদের কেহ কেহ পছন্দ করিতে পারিলেন না। এবং তাহাদের একজন (মিস্ ডাচার) বলিলেন যে, সেণ্ট লরেন্স নদের থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্ক নামক একটি দ্বীপে তাহার যে একখানি ছোট বাড়ী আছে, তাহা তিনি স্বামীজী ও তাঁহার যে কয়টি ছাত্রের সেখানে জায়গা হইতে পারে তাহাদের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিবেন। সকলে সেখানে গিয়া থাকিলে সমস্ত গ্রীষ্মকালটাতেই ক্লাস চলিতে পারিবে। স্বামীজী তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

ইতিমধ্যে স্বামীজীর নিউ ইয়র্কের ধনী বন্ধু ও শিষ্য মিঃ লেগেট (Mr. Francis Leggett) তাঁহাকে তাহার পারসির (Percy, New Hampshire) বাড়ীতে যাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। তদনুসারে তিনি বিশ্রামের জন্য জুন মাসের ৭ই তারিখে সেখানে গিয়া ঐ মাসেরই ১৭ই তারিখ পর্যন্ত (মোট দশ দিন) তথায় বাস করেন। তখন তিনি সেখানকার বার্চ (ভূর্জ) বৃক্ষের বনে ও লেকের

পারে একাকী বেড়াইতে গিয়া ধ্যান ও গীতাপাঠ করিতেন। এই সময়ে মিস ম্যাকলাউড ও তাহার বিধবা ভগ্নী মিসেস্ স্টার্জিসও (Mrs. William Sturges) মিঃ লেগেটের অতিথি হইয়া সেখানে ছিলেন। এবং মিস্ ম্যাকলাউডের বিবরণ হইতে জানা যায়, স্বামীজী একদিন উক্তরূপে একাকী লেকের পারে গিয়া নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেন। একটি মালী তাঁহাকে ঐ অবস্থায় মৃতবৎ দেখিতে পায়। সংবাদ পাইয়া মিঃ লেগেট, মিস্ ম্যাকলাউড ও তাহার ভগিনী সেখানে ছুটিয়া যান এবং অনেকে চেষ্টা করিয়াও স্বামীজীর জ্ঞান সম্পাদন করিতে না পারিয়া, তাহারা মনে করেন তাঁহার সম্ভবতঃ মৃত্যুই ঘটিয়াছে। ঠিক ঐ সময়েই স্বামীজীর মধ্যে জীবনের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করে ও তিনি ক্রমশঃ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হন। পারসির শান্ত আবহাওয়ায় কয়েকদিন বিশ্রাম করিয়া স্বামীজী দেহমনে বেশ সুস্থ বোধ করেন।

১৮ই জুন তারিখে তিনি পারসি হইতে নিউ ইয়র্কে ফিরিয়া আসেন ও তথা হইতে থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে যান। তিনি ঐ স্থানে পৌঁছিবার পূর্বেই কয়েকজন ছাত্র সেখানে পূর্বব্যবস্থানুসারে মিস্ ডাচারের (Miss Dutcher) বাড়ীতে একত্র হইয়াছিলেন। এবং মিস্ ডাচার স্বামীজীর থাকিবার সুবিধার জন্য ঐ বাড়ীর একটি নূতন অংশ নির্মাণ করিয়াছিলেন। বাড়ীটি একটি পাহাড়ের উপরে অবস্থিত ছিল এবং উহার নূতন অংশটি ঐ পাহাড়ের খাড়া ঢালু পৃষ্ঠের উপর নির্মিত হওয়ায় বাড়ীটি পিছনের দিক হইতে ত্রিতল এবং সামনের দিক হইতে দ্বিতল ছিল। উহার সর্বনিম্ন ঘরটিতে একটি ছাত্র থাকিতেন। তাহার উপরের ঘরটি বড় ও বাড়ীর পুরাতন অংশের সহিত কতিপয় দরজার দ্বারা সংযুক্ত ছিল। তাই, সেখানে সকাল বেলায় ক্লাস বসিত। এই ঘরের উপরের ঘরটিতে স্বামীজী থাকিতেন। সেই ঘরটির সামনে একটি ছাদযুক্ত প্রশস্ত বারান্দা ছিল। স্বামীজী ঐ বারান্দায় তাঁহার ঘরের দরজার নিকটে বসিয়া ছাত্রদের তাঁহার সায়ংকালীন উপদেশ দিতেন।

থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্ক দ্বীপটি দৈর্ঘ্যে নয় মাইল এবং প্রস্থে এক হইতে দুই মাইল। আলোচ্যকালে উহাতে বসতি খুবই কম ছিল। তদ্ব্যতীত, মিস ডাচারের বাড়ীটি ছিল ঘন বনে ঘেরা এবং সেখান হইতে বিস্তৃত গ্রামটির একটি বাড়ীও দেখা যাইত না। বনের প্রান্ত দিয়া বহু দ্বীপ-সমন্বিত বিশাল সেণ্ট লরেন্স নদ প্রবাহিত। দূরে দূরে উহার ঐ দ্বীপগুলির হোটেল বা বোর্ডিং বাড়ীর আলো দেখা যাইত। আশেপাশে চারিদিকের সবই নিস্তব্ধ। কোনও মনুষ্যশব্দ কানে আসে না—শুধু মাঝে মাঝে শোনা যায় ঝিল্লীরব, পাখীর গান ও পাতার মর্মর। আর সারাদিন চোখে পড়ে দিবসের মন-উদাসকরা উদার প্রশান্ত দৃশ্যমালা, অথবা রাত্রিকালের কখন অন্ধকারাচ্ছন্ন কখন বা জ্যোৎস্নাবিধৌত দ্বীপটির ধ্যান-স্তিমিত মায়াময় রূপ। সবই সুন্দর, ছবির মত, স্বপ্নঘেরা।

এই শান্ত স্বপ্নাচ্ছন্ন দ্বীপটিতে স্বামীজীর প্রিয়তম ছাত্রগণ সাত সপ্তাহকাল তাঁহার সহিত একই বাড়ীতে থাকিয়া তাঁহার অমৃতময় দিব্যবাণী শ্রবণ করেন। নিউ ইয়র্কে থাকিতে তিনি বলিয়াছিলেন, যে সকল ছাত্র অপর সকল আকর্ষণ পরিত্যাগ করিয়া তিন শত মাইল দূরবর্তী থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে গিয়া বেদান্তের কথা শুনিবে, তাহারা প্রকৃতই আন্তরিক এবং তাহাদের তিনি শিষ্য গণ্য করিয়া সর্বপ্রকারে সাহায্য করিবেন। অবশ্য এইভাবে বহু ছাত্র যে সেখানে যাইবে তাহা তিনি আশা করেন নাই। এবং কার্যতঃ মোট মাত্র বারো জন ছাত্র সেখানে যায় এবং তাহারাই (একই সময়ে দশজনের অনধিক) তাঁহার অহেতুক কৃপায় ঐ সাত সপ্তাহকাল (বহু জন্মের বহু তপস্যা-সম্ভব) এক দিব্যজ্যোতির্ময় অমৃতরাজ্যে বাস করে। স্বামীজী এইকালে সর্বদাই অতি উচ্চ আধ্যাত্মিকভাবে থাকিতেন এবং তিনি পুনরায় এখানে একদিন সেণ্ট লরেন্স নদের তীরে নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেন।

১৯শে জুন হইতে ৬ই আগষ্ট পর্যন্ত (মোট সাত সপ্তাহ) প্রতিদিন সকালে স্বামীজীর ক্লাস বসিয়াছে। তখন তিনি গীতা,

উপনিষদ্, বেদান্ত-সূত্র, নারদের ভক্তি-সূত্র, বাইবেল ইত্যাদি নানা ধর্মপুস্তকের যে কোন একখানি অবলম্বন করিয়া কথা আরম্ভ করিতেন। প্রথম দিন তিনি বাইবেল হাতে করিয়া আসেন ও বলেন, 'ছাত্রদের সকলেই খৃষ্টান, তাই তাহাদের ধর্মপুস্তকের দ্বারাই তিনি ক্লাস আরম্ভ করিবেন।'

আবার শুধু ক্লাসের সঙ্গেই তাঁহার দৈনিক শিক্ষাদানের কার্য শেষ হইত না। প্রতিদিন বৈকালে বেড়াইবার সময়, আহারের সময় এবং কোন কোন দিন ছাত্রদের জন্য তাঁহার সখের রন্ধনের কালেও, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা অবলম্বনে তিনি তাঁহার শিক্ষা চালাইতেন। ইহা ব্যতীত, প্রতিদিন সান্ধ্য ভোজনের পরে ছাত্রেরা সকলেই উপরের তলায় (স্বামীজীর ঘরের সম্মুখস্থ) বারান্দায় আসিয়া জড় হইতেন। অল্প পরেই স্বামীজীর ঘরের দরজা খুলিত এবং তিনি বাহিরে আসিয়া তাঁহার নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিতেন। এই সময়ে তিনি অন্ততঃ দুই ঘণ্টাকাল এবং প্রায়ই আরও অনেক অধিক রাত্রি পর্যন্ত ছাত্রদের সহিত কাটাইতেন। (পূর্ণিমার দুই এক দিন পূর্বে) এক উজ্জ্বল জ্যোৎস্না রজনীতে তিনি চন্দ্রাস্ত পর্যন্ত তাহাদের নিকট কথা বলেন। সেদিন বক্তা ও শ্রোতাগণ সকলেই এত তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তাহাদের খেয়ালই হয় নাই যে কত সময় কাটিয়া গেল।

এইভাবে দিনের পর দিন স্বামীজীর নিকট জ্ঞানভক্তির কথা শুনিয়া ও তাঁহার দেহ-মন নিঃসৃত অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবধারায় সুস্নাত হইয়া, তাঁহার ছাত্রগণের প্রাণে সত্বরই অতি মহৎ অভিলাষ সকল জাগিয়া উঠিল। এবং সেই অভিলাষ পূর্ণ করিয়া স্বামীজী তাহাদের সকলকেই মন্ত্রদীক্ষা দিলেন। এবং তাহাদের মধ্যে পাঁচজনকে ব্রহ্মচর্য ও দুইজনকে সন্ন্যাসও দান করিলেন। যে দুইজন সন্ন্যাস পাইলেন, তাহাদের একজন হইতেছেন লিওন ল্যাণ্ড্স্বার্গ, অপর জন হইতেছেন একটি (আমেরিকার নাগরিক অধিকার প্রাপ্ত) ফরাসী মহিলা, নাম ম্যাডাম মেরী লুই (Madam Marie Louise)। ইহাদের সন্ন্যাস নাম হয় যথাক্রমে স্বামী কৃপানন্দ ও স্বামী অভয়ানন্দ।

স্বামীজীর এই প্রথম আমেরিকান শিষ্য কয়টি সংখ্যায় বারোজন ছিলেন। এবং তাহাদের উক্তরূপে আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষা, ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস দিয়া তিনি তাঁহার আমেরিকার কাজ স্থায়ী করিবার আকাঙ্ক্ষিত পথ মুক্ত করেন। এই সুদুষ্কর কাজটি সুসম্পন্ন করিবার জন্য তিনি যে শক্তি ও শ্রম খরচ করেন, তাহা বিপুল। অবসর তিনি প্রায় লইতেন না। অবিশ্রাম শিক্ষাদানের সঙ্গে, তিনি ফাঁক পাইলেই গভীর ধ্যান অথবা নিবিষ্ট শাস্ত্রাধ্যয়নে রত হইতেন। আবার, ঐ সকলের মধ্যেই তিনি ছাত্রদের লইয়া সময়ে সময়ে অনাবিল আমোদ-কৌতুকও করিতেন। এইভাবে থাউজ্যাণ্ড আউল্যাণ্ড পার্কের ঐ ক্ষুদ্র বাড়ীতে তিনি যে শান্তি, শক্তি ও আনন্দময় অপূর্ব আধ্যাত্মিক আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ছাত্রদের উন্নতি খুবই সহজ ও ক্ষিপ্র করিয়া তুলে। যাহারা ঐ আবহাওয়ায় বাস করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, তাহাদের কেহ কেহ তাহাদের ঐকালের অভিজ্ঞতার বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। প্রধানতঃ তাহা হইতেই আমাদের উপরি-প্রদত্ত তথ্যগুলি সংগৃহীত। বর্ণনাগুলি দীর্ঘ। তাই, অবস্থা সুস্পষ্ট করিবার জন্য আমরা উহার কয়েকটি হইতে আরও কিছু তথ্য নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে সন্নিবেশিত করিলাম।

ছাত্রী মিস্ ওয়াল্ডো লিখিয়াছেন, "যে সকল ভাগ্যবান লোক নিউ ইয়র্ক হইতে সেণ্ট লরেন্স নদের ঐ দ্বীপে আসিয়া স্বামীর সঙ্গে ছিলেন, তাহাদের নিকট ঐ আনন্দের সময়টি যে কি ছিল (ও এখনও আছে) তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তখন তাহারা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের এক অসাধারণ সুযোগ পান। স্বামী তাঁহার সকল প্রাণ দিয়া আদিষ্ট পুরুষের ন্যায় শিক্ষা দিতেন।

"এই সকল উপদেশের নোট লওয়া সম্ভব ছিল না। উহা শুধু তাঁহার শ্রোতাদের হৃদয়েই রক্ষিত হইয়া আছে। অনেক সময়ে তিনি যেন আমাদের উপস্থিতির কথা ভুলিয়া যাইতেন এবং তাঁহার চিন্তা-প্রবাহে বাধা জন্মাইবার ভয়ে আমরা রুদ্ধশ্বাসে থাকিতাম। ঐ সময়ে তিনি তাঁহার আসন হইতে উঠিয়া বারান্দার উপরে পায়চারি করিতে

করিতে ঝড়ের মত বাগ্মিতার এক উৎকৃষ্টতম প্রবাহ ঢালিতে থাকিতেন।

"আবার এই ক্লাসের সময়েই তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা অধিক শান্ত ও অধিক মিষ্ট। তাঁহার সহিত বাস করিয়া আমরা অনুক্ষণ অনুপ্রাণিত থাকিতাম। সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত ঐ একই ভাব। অনেক সময়ে তিনি রহস্যপ্রিয় হইতেন, কিন্তু তখনও তাঁহার জীবনের মূল সুর ঠিকই থাকিত। তাঁহার শিক্ষা আমাদের নিকট নূতন ও সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত ধরনের থাকায়, তাহা আত্মস্থ করিতে আমাদের সময় লাগিত। কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার ধৈর্য কখন নষ্ট হইত না। তাঁহার উৎসাহও কমিত না। বৈকালে তিনি আমাদের সহিত নিকটতরভাবে কথা বলিতেন এবং তখন আমরা সাধারণতঃ অনেক দূর পর্যন্ত বেড়াইতে যাইতাম।"

ছাত্রী মিসেস্ ফাঙ্কে (Mrs. Funke) ও মিস্ ক্রিষ্টিন (Miss Christine) ডেট্রয়েটের অধিবাসী। তাহারা স্বামীজীর নিউ ইয়র্কের ক্লাসের কোন খবর রাখিতেন না। কিন্তু অতি আশ্চর্যভাবে তাহারা তাঁহার থাউজ্যাণ্ড আইলাণ্ড পার্কের ক্লাসে যোগ দিতে সক্ষম হন। ঘটনাটি বর্ণনা করিয়া মিসেস্ ফাঙ্কে লিখিয়াছেন—

"স্বামীজী যখন ডেট্রয়েটে যান তখন তাঁহার সহিত ব্যক্তিগতভাবে দেখা করিবার সুযোগ আমাদের (আমার ও আমার বন্ধু মিস্ ক্রিষ্টিনের) ছিল না। কিন্তু আমরা তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম এবং তাহা আমাদের অন্তরে ধ্যান-চিন্তা করিয়া আমরা স্থির করি, যেভাবে হয় তাঁহাকে আমরা খুঁজিয়া বাহির করিব, এমন কি, প্রয়োজন হইলে ঐ জন্য আমরা সারা পৃথিবী ঘুরিব। দেড় বৎসর কাল আমরা তাঁহার সন্ধান হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম এবং আমাদের মনে হইয়াছিল তিনি হয়তো ভারতে ফিরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু একদিন বৈকালে একটি বন্ধু আমাদের বলিলেন, তিনি এখনও এদেশেই আছেন এবং এই গ্রীষ্ম তিনি থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে কাটাইতেছেন। শুনিয়া আমরা স্থির করিলাম, আমরা তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাঁহার

নিকট শিক্ষা প্রার্থনা করিব এবং তদুদ্দেশ্যে আমরা পরদিনই সকালে রওনা হইলাম।

"অতি ক্লান্তিকর অনুসন্ধানের পর আমরা তাঁহার সন্ধান পাইলাম। তখন অন্ধকার রাত্রি, বৃষ্টি হইতেছিল। একটি ঠিকা লোক তাহার লণ্ঠন হাতে করিয়া আমাদের পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছিল। আমাদের তখন ভয় হইতেছিল, যিনি আমাদের অস্তিত্বের খবর পর্যন্ত রাখেন না, তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য কয়েক শত মাইল দূর হইতে আসা হয়তো একটা বোকামি হইয়াছে। আমরা কোন্ সাহসে তাঁহার বিশ্রামে বাধা জন্মাইতে যাইতেছি? যাহা হউক, আমরা বৃষ্টি ও অন্ধকারের মধ্যে পাহাড়ের উপর উঠিতে লাগিলাম। তাঁহাকে আমরা কি বলিব তাহা আমরা চিন্তা করিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার সম্মুখে গিয়া আমরা সে সব ভুলিয়া গেলাম। আমাদের একজন বলিল, 'আমরা ডেট্রয়েট হইতে আসিয়াছি, মিসেস পি— আমাদের পাঠাইয়াছেন।' অপর জন কহিল, "যীশু যদি এখনও এই পৃথিবীতে থাকিতেন তাহা হইলে আমরা যেভাবে তাঁহার নিকট শিক্ষা প্রার্থনা করিতাম, আমরা ঠিক সেইভাবে আপনার নিকট আসিয়াছি।' তিনি আমাদের প্রতি শান্ত করুণার দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, 'শুধু যদি যীশুর ন্যায় তোমাদের এখনই মুক্তি দিবার ক্ষমতা আমার থাকিত!' তিনি দাঁড়াইয়া ক্ষণেকের জন্য একটু চিন্তা করিলেন এবং তারপর গৃহকর্ত্রীকে বলিলেন, 'এই মহিলারা ডেট্রয়েট হইতে আসিয়াছেন, ইহাদের উপরে লইয়া এই সন্ধ্যাটা আমাদের সহিত কাটাইতে দিন।' আমরা সেদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত গুরুর কথা শুনিলাম এবং তারপর যখন আমরা তাহাদের সকলের নিকট বিদায় চাহিলাম, তখন পরদিন সকালে নয়টার সময় আমাদের আসিতে বলা হইল। তদনুসারে আমরা আসিলে, আমাদের অন্তরে অপার আনন্দ জাগাইয়া গুরু আমাদের গ্রহণ করিলেন এবং ঐ বাড়ীতে থাকিবার জন্য আমরা সাদরে আমন্ত্রিত হইলাম।"

ইহার পরের ঘটনাবলী সম্বন্ধে মিসেস্ ফাঙ্কে তাহার এক বান্ধবীর নিকট কয়েকখানি পত্রে লিখেন—

"সকাল ৮টা হইতে অনেক রাত্রি পর্যন্ত আমরা বিবেকানন্দের কথা শুনি। ও! তাঁহার শিক্ষা কি মহান! কোন বাজে কথা নয়, কোন ভূত, প্রেত বা সূক্ষ্মদেহীর কথা নয়, শুধু ঈশ্বর, যীশু ও বুদ্ধ। আমি অনুভব করিতেছি আমি আর কখন পূর্বের ন্যায় হইব না, কারণ আমি সত্যের এক পলক দর্শন লাভ করিয়াছি।

"একবার ভাবিয়া দেখ, সকালে, রাত্রে ও প্রতিবার আহারের সময় বিবেকানন্দের মত লোকের কথা শোনা কি ব্যাপার! বৈকালে আমরা অনেক দূর পর্যন্ত বেড়াইতে যাই এবং তখন প্রত্যেকটি দৃশ্য বস্তু উপলক্ষ করিয়া তিনি আমাদের উপদেশ দেন। আবার এই স্বামীই কি স্ফূর্তিযুক্ত! কি কৌতুক প্রিয়! আমরা এক এক সময়ে (আনন্দে) উন্মত্তপ্রায় হই।

"এখানে থাকিয়া পত্র লেখার সময় করা সুকঠিন। স্বামী শীঘ্রই ইংলণ্ডে যাইবেন। তাই, আমরা একটুও অবকাশ লইতে পারি না। এমন কি, আমরা উপযুক্তভাবে পোশাক পরিবারও সময় পাই না, ভয়—পাছে আমরা তাঁহার অতি মূল্যবান মুক্তার মত কথাগুলির একটিও হারাই।

"আমরা তাঁহার কথার নোট লইবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু উহা শুনিতে শুনিতে আমি আত্মহারা হইয়া নোট লওয়ার কথা ভুলিয়া যাই। তাঁহার কণ্ঠস্বর অদ্ভুত সুন্দর। উহার দিব্যঝঙ্কার মানুষকে আত্মহারা করিয়া দেয়। যাহা হউক, মিস্ ওয়াল্ডো তাঁহার উপদেশের পরিপূর্ণ নোট লইতেছেন এবং তদ্বারা উহা রক্ষিত হইবে।"

মিসেস্ ফাঙ্কের সঙ্গিনী ভগ্নী ক্রিষ্টিন লিখিয়াছেন, "আমরা (আমি ও মিসেস্ ফাঙ্কে) থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে ৬ই জুলাই, শনিবার, পৌঁছিয়াছিলাম। তাহার পূর্বেই স্বামী বিবেকানন্দ সোমবার দিন তাঁহার কতিপয় ছাত্রদের দীক্ষা দেওয়া স্থির করিয়াছিলেন। রবিবার

বিকালে তিনি আমাদের বলিলেন, 'আমি তোমাদের এখনও ভাল করে জানি না, তাই তোমরা দীক্ষার উপযুক্ত কিনা তৎসম্বন্ধে আমি নিশ্চিত নই।' তারপর তিনি কতকটা সংকোচের সহিত কহিলেন, 'আমার একটা ক্ষমতা আছে—লোকের মন পড়বার ক্ষমতা। উহা আমি ক্বচিৎ ব্যবহার করি। তোমরা যদি অনুমতি দাও, তা হলে আমি তোমাদের মন প'ড়ে দেখ্‌ব। কারণ, অপর সকলের সঙ্গে আমি আগামী কাল তোমাদেরও দীক্ষা দিতে চাই।' আমরা সানন্দে মত দিলাম। এই মন পড়ার ফলে তিনি নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কারণ পরদিন অপর সকলের সহিত তিনি আমাদেরও মন্ত্রদীক্ষা দিয়া শিষ্য করিয়া লইলেন। পরে আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তিনি আমাদের মন পড়িয়া কি দেখিতে পাইয়াছিলেন। উত্তরে তিনি বলেন, তিনি দেখিয়াছেন আমরা ধর্মে নিষ্ঠাবান হইব এবং আমরা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিব। আমাদের একজন প্রাচ্য দেশ সকলে প্রচুর ভ্রমণ করিবে ও একজন ভারতের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত হইবে। এবং আমরা যে সকল গৃহে বাস করিব, যে লোকদের দ্বারা পরিবৃত থাকিব এবং যে সকল প্রভাব আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করিবে তাহাও তিনি বর্ণনা করেন। (এইভাবে) আমাদের জীবনের যে সকল ছোট-বড় ঘটনার ভবিষ্যদ্‌বাণী তিনি করিয়াছিলেন, তাহা প্রায় সবই ঘটিয়াছে।"

এই বিষয়টি বর্ণনা করিয়া ভগ্নী ক্রিষ্টিন লিখিয়াছেন, "দীক্ষার পরে যেসকল অপূর্ব সপ্তাহ আসিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কিছু লেখা কঠিন। কারণ, তখন আমাদের মন যে উচ্চ স্তরে উন্নীত হইয়াছিল, মাত্র তাহা ফিরিয়া পাইলেই আমাদের ঐ অভিজ্ঞতা পুনরায় ধারণায় আনা সম্ভব হইত। আমরা আনন্দে পরিপূর্ণ ছিলাম। এবং আমরা বুঝি নাই যে আমরা তাঁহার আলোকেই বাস করিতেছি। যে উচ্চধাম তাঁহার স্বাভাবিক আবাসভূমি ছিল, তিনি আমাদের সেখানে তুলিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল, আমাদের মুক্তির পথ দেখান—আমাদের মুক্ত করা। করুণার স্বরে তিনি বলিতেন, 'আহা,

আমি যদি তোমাদের শুধু স্পর্শ দ্বারাই মুক্ত করে দিতে পারতাম!' তাঁহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, তাঁহার আমেরিকার কাজ চালাইবার জন্য আমাদের শিক্ষা ও শিক্ষণ দেওয়া। তাঁহার উপরের বারান্দায় তিনি প্রায়ই আমাদের প্রত্যেককে ডাকিয়া বক্তৃতা দিতে বলিতেন। উহা এক কঠিন পরীক্ষা ছিল। কিন্তু উহা এড়াইবারও কোন উপায় ছিল না। এই সকল খোলাভাবের সান্ধ্য সম্মিলনে রাত্রি বাড়িলে তিনি প্রায়ই ভাবের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতেন। এবং তখন রাত্রি দুইটা বাজিলে বা তদধিক হইলেও কিছু আসিয়া যাইত না। তখন আমাদের নিকট স্থান-কাল লোপ পাইত।

"রাত্রের এই সকল অধিবেশনে তিনি উপরের বারান্দার এক প্রান্তে তাঁহার ঘরের দরজার নিকট একখানি বড় চেয়ারে বসিতেন। তখন কোন কোন দিন তিনি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন। ঐ সকল সময়ে আমরাও ধ্যান করিতাম, অথবা নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিতাম। ধ্যান দীর্ঘ সময় স্থায়ী হইলে তিনি তাহার পরে সেদিন আর কথা বলিতেন না। যেদিন উহা অল্পক্ষণ স্থায়ী হইত, সেদিন তিনি উহার পরে আমাদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে বলিতেন এবং প্রায়ই আমাদের একজনকে উহার উত্তর দিতে আহ্বান করিতেন। আমরা ভুল করিতে থাকিলে, তিনি পরিশেষে অল্প কয়েকটি কথায় বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া দিতেন। আমরা আমাদের কোন নূতন ধারণা বা দৃষ্টিকোণ সম্বন্ধে তাঁহার সমর্থন চাহিলে, তিনি কয়েকবার আমাদের আরও চিন্তা করিবার জন্য ফিরাইয়া দিতেন এবং আমরা আমাদের ক্ষমতার শেষ সীমায় পৌঁছিলে, তিনি আমাদের ভুল দেখাইয়া দিতেন। এইরূপ ধৈর্য ও দাক্ষিণ্যের সহিত তিনি আমাদের শিক্ষণ দিতেন। এ ছিল একটি মহা আশীর্বাদের মত।

"থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে যাহারা তাঁহার চারিপার্শ্বে জড় হইয়াছিলেন, তাহারা ছিলেন একটি বিচিত্র দল। এবং ঐ দ্বীপে পৌঁছিয়া যে দোকানির নিকট আমরা খোঁজ লইতে গিয়াছিলাম সেও বলিয়াছিল—'হাঁ, ঐ পাহাড়ের উপর কতকগুলি অদ্ভুত ধরনের লোক

বাস করে এবং তাদের মধ্যে একজনকে বিদেশী বলে মনে হয়।' এই দলে তিন বন্ধু ছিলেন—মিস ওয়াল্ডো, মিস্ এলিস্ (Miss Ellis) ও ডাঃ রাইট। তাহারা একত্রে স্বামীজীর নিউ ইয়র্কের ক্লাসে যোগ দিয়াছিলেন। আমরা নূতন আসিয়াছিলাম, তাই ডাঃ রাইট গম্ভীর-ভাবে আমাদের বলেন, তাহারা গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া দর্শনশাস্ত্রের প্রত্যেকটি বক্তৃতা শুনিয়াছেন, কিন্তু তাহার কিছুই ইহার (অর্থাৎ স্বামীজীর কথার) কাছে দাঁড়াইতে পারে না। বস্তুতঃ ঐ দ্বীপে কি মহান বাক্য সকল উক্ত হইয়াছিল! কি ভাবের আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছিল, কি শক্তি বিকশিত হইয়াছিল! এ ছিল একটি স্বর্গীয় অভিজ্ঞতা! এবং তাহা লক্ষ করিয়াই মিস্ ওয়াল্ডো বিস্ময়ের সহিত বলেন, 'এ পাবার জন্যে আমরা কি পুণ্য করেছিলাম?' আর আমরা প্রত্যেকেই ঐরূপ অনুভব করিয়াছি।

"(প্রতিদিন গৃহকার্য শেষ হইবার পর) আমরা ক্লাসঘরে অর্ধ-বৃত্তাকারে বসিয়া অপেক্ষা করিতাম। তখন ভাবিতে থাকিতাম, আজ আমাদের জন্য অনন্তধামের কোন্ দ্বার উন্মুক্ত হইবে? কোন্ দিব্য দৃশ্যরাজি আমাদের চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিবে? আর প্রতিদিনই আমাদের প্রাপ্তি আশাতিরিক্ত হইত। বিবেকানন্দের মনের ক্ষিপ্র ঊর্ধ্বগতিগুলি তাঁহার সহিত আমাদেরও অতীন্দ্রিয় রাজ্যে লইয়া যাইত। এবং পরবর্তীকালে আমাদের কোন প্রকার উপলব্ধি হইয়া থাকুক বা না থাকুক, আমরা ঐ সময়ে প্রতিশ্রুত দিব্যধাম দেখিয়াছিলাম। আমরাও দিব্য দর্শনের উচ্চ শিখরে উন্নীত হইয়া-ছিলাম এবং তারপর এই পৃথিবীর দুঃখ-কষ্ট আর কখন আমাদের নিকট সম্পূর্ণরূপে সত্য বলিয়া মনে হয় নাই।

"তিনি যখন দেখিতেন তাঁহার শিক্ষা আমাদের মনের উপর কি গভীর দাগ কাটিয়াছে, তখন তিনি হাসিয়া বলিতেন—'তোমাদের কেউটে সাপে কামড়িয়েছে। তোমাদের আর পালাবার উপায় নেই।' আবার কখন বা বলিতেন, 'আমি তোমাদের আমার জালে ধরে ফেলেছি। তোমরা (তা থেকে) আর কখন বের হতে পারবে না'।"

৬ই আগষ্ট তারিখে স্বামীজী তাঁহার শেষ ক্লাস করেন। তৎপরদিন ৭ই আগষ্ট, বুধবার, তিনি নিউ ইয়র্কে রওনা হইয়া যান। এই শেষ দিনটির ঘটনা সম্পর্কে মিসেস্ ফাঙ্কে তাঁহার পূর্বোক্ত বান্ধবীর নিকট লিখেন, "এই দিন সকালে কোন ক্লাস ছিল না। তাই, ঐ সময়ে স্বামীজী আমার ও ক্রিষ্টিনের সহিত কিছুক্ষণ একাকী থাকিতে ইচ্ছা করিয়া আমাদের তাঁহার সহিত বেড়াইতে যাইতে বলিলেন। আমরা আধ মাইল দূরবর্তী একটি বনাচ্ছন্ন নির্জন পাহাড়ের উপর গিয়া উঠিলাম। সেখানে তিনি একটি নীচু শাখা-বিশিষ্ট বৃক্ষ বাছিলেন এবং আমরা উহার নীচু শাখাগুলির তলে বসিলাম। কিন্তু আমাদের প্রত্যাশিত উপদেশের পরিবর্তে তিনি হঠাৎ বলিলেন, 'আমরা এখন ধ্যান করব। আমরা বোধিদ্রুমতলের বুদ্ধের ন্যায় হব।' ধ্যানে বসিয়া তিনি ব্রোঞ্জের মূর্তির ন্যায় নিশ্চল হইয়া গেলেন। তারপর প্রবল ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হইলে, আমি তাঁহাকে আমার ছাতার দ্বারা যতটা সম্ভব রক্ষা করিতে লাগিলাম কিন্তু তিনি তাঁহার সমাহিত অবস্থায় উহার কিছুই টের পাইলেন না। ইতিমধ্যে আমরা দূরে শব্দ শুনিতে পাইলাম। এবং অপর সকলেও ছাতা ও বৃষ্টির জামা লইয়া আসিয়া পড়িলেন। স্বামীজী চক্ষু মেলিয়া দুঃখের সহিত চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কারণ আমাদের তখনই ফিরিতে হইল।

"রাত্রি নয়টার সময় তিনি স্টীমারযোগে ক্লেটন রওনা হইলেন। সেখান হইতে তিনি রেলগাড়ীতে নিউ ইয়র্ক যাইবেন ও তথা হইতে ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন।

"এই শেষের সমস্ত দিনটি তিনি যার-পর-নাই কোমল ও স্নেহশীল হইয়া ছিলেন। এবং স্টীমারটি যখন নদীর বাঁক ঘুরিতেছিল, তখন তিনি বালকের ন্যায় আনন্দভরে তাঁহার হ্যাট দোলাইয়া আমাদের নিকট হইতে বিদায় লইলেন।"

স্বামীজীর থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কের অমূল্য উপদেশাবলীর অধিকাংশেরই কোন নোট লওয়া সম্ভব হয় নাই। তবে উহার

কতকাংশের নোট তাঁহার কয়েকটি ছাত্রী, প্রধানতঃ মিস্ ওয়াল্ডো, লইয়াছিলেন। এবং তাহা পরে "Inspired Talks" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করা হয়। ঐ পুস্তকের বঙ্গানুবাদ (উদ্বোধন কার্যালয় হইতে) 'দেববাণী' নামে বাহির হইয়াছে। স্বামীজীর অতুলনীয় রচনা "The Song of the Sannyasin" ("সন্ন্যাসীর গীতি") একদিন এক প্রবল ভাবের আবেশে থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কেই রচিত হয়।

উনত্রিশ

প্রথমবার ইংলণ্ডে গমন

(১৮৯৫, আগস্ট—নভেম্বর)

প্রায় পূর্ণ দুই বৎসরকাল বিপুল পরিশ্রমের পর, স্বামীজী তাঁহার আমেরিকার কাজ স্থায়ী করিবার জন্য থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে যে শিষ্য গ্রহণ ও তাহাদের শিক্ষাদানের কার্য সমাপন করিলেন, তাহা তাঁহাকে যারপরনাই ক্লান্ত করিয়া তুলিলেও তাঁহার অন্তরকে অনেক হালকা করিয়া দিল। তিনি এখন মনে করিতে পারিলেন, তাঁহার আমেরিকার কাজ চালাইবার ভার তাঁহার ঐ শিষ্যগণের উপর রাখিয়া তিনি কিছুদিনের জন্য ইংলণ্ড ভ্রমণে যাইতে পারেন। এবং আশা করিলেন, ঐ জন্য তাঁহার যে সমুদ্র-যাত্রা করিতে হইবে তাহা তাঁহার ক্লান্ত মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীকে পুনরায় সুস্থ করিয়া তুলিবে।

ইংলণ্ডে যাইবার কথা অনেক দিন ধরিয়া তাঁহার মনে উদয় হইতেছিল। তবে তজ্জন্য কোন উপযুক্ত সুযোগ তিনি ইতিপূর্বে দেখিতে পান নাই। কিন্তু এখন (১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মাবকাশের শেষে) তাঁহার আমেরিকার কার্যভার গ্রহণ করিবার লোক তৈয়ারী হইয়াছে। এবং (উহার কিছু পূর্বেই) ইংলণ্ডের একটি সম্ভ্রান্ত মহিলা, মিস্ হেনরিয়েটা মুলার (ইহার সহিত স্বামীজীর পূর্বে আমেরিকায় সাক্ষাৎ হইয়াছিল), তাঁহাকে তাঁহার অতিথি হইয়া লণ্ডন আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আর স্বামীজী আসিতেছেন জানিয়া লণ্ডনের মিঃ ই টি স্টাডিও (ইহার সহিত স্বামীজীর পত্রালাপ চলিতেছিল) তাঁহাকে আসিতে লিখিয়া তাহার সহিত বাস করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। আবার, এই সময়েই স্বামীজীর নিউ ইয়র্কের বন্ধু মিঃ লেগেট তাঁহাকে তাহার সহিত প্যারিসে বেড়াইতে যাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। পর পর এতগুলি নিমন্ত্রণ পাইয়া স্বামীজী উহা ভগবানেরই প্রেরিত মনে করিয়া সাগ্রহে গ্রহণ করিলেন।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগস্ট তারিখে স্বামীজী মিঃ লেগেটের সহিত নিউ ইয়র্ক হইতে প্যারিস যাত্রা করেন। প্যারিসে তিনি মোট এক সপ্তাহকাল বাস করেন। ঐ সময়ে তিনি সেখানে মিঃ লেগেটের সহিত (মিস্ ম্যাকলাউডের বিধবা ভগ্নী) মিসেস স্টার্জিসের বিবাহে উপস্থিত থাকেন এবং প্যারিসের গির্জা, ক্যাথেড্রাল, মিউজিয়াম, কলা-ভবন, ইত্যাদি দর্শন করেন। ইহা ব্যতীত, তিনি মিঃ লেগেটের কতিপয় বিদ্বান বন্ধুদের সহিত পরিচিত হন ও তাহাদের সহিত ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলাপ করেন।

প্যারিস হইতে স্বামীজী লণ্ডনে পৌঁছিলে, মিস মুলার, মিঃ স্টার্ডি ও অপর বন্ধুগণ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। সেখানে অল্প কয়েকদিন বিশ্রামের পর, তিনি প্রথমে মিস মুলারের বাড়ীতে ও তৎপর মিঃ স্টার্ডির গৃহে থাকিয়া প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় ছোট ধরনের ক্লাস চালাইতে লাগিলেন। এই সংবাদ প্রচারিত হইলে, অনেকে এই 'হিন্দু যোগীকে' দর্শন করিতে আসেন এবং সংবাদপত্র সকল তাঁহার সহিত তাহাদের প্রতিনিধিগণের সাক্ষাতের বিবরণ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ইহা ব্যতীত, লণ্ডনের জনসাধারণ যাহাতে তাঁহার বাণী শুনিতে পায়, তজ্জন্য তাঁহার বন্ধুগণ প্রিনসেস্ হলে ২২শে অক্টোবর সন্ধ্যাকালে তাঁহার একটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। বক্তৃতাটির বিষয় ছিল 'আত্মজ্ঞান'। উহা শ্রবণ করিবার জন্য লণ্ডনের কতিপয় মনীষী সহ বহু লোক সভায় উপস্থিত হন। বক্তৃতাটি সকলকেই মুগ্ধ করে এবং পরদিন সকালে খবরের কাগজগুলিতে উহার উচ্চ প্রশংসা বাহির হয়।

এইভাবে স্বামীজী লণ্ডনের কয়েকটি ক্লাব, পাবলিক হল ও ধনী লোকের বৈঠকখানায় ক্লাস গ্রহণ করিয়া অথবা বক্তৃতাদি দিয়া সমস্ত অক্টোবর ও নভেম্বর মাস অতিবাহিত করিলেন। এই সকল কার্যের ব্যবস্থা করিতে মিঃ স্টার্ডি তাঁহাকে প্রচুর সাহায্য করেন। মিঃ স্টার্ডি বিদ্বান, পদস্থ ও সঙ্গতিসম্পন্ন লোক ছিলেন। এবং প্রথম জীবনে তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া আলমোড়ায় থাকিয়া কিছুকাল কঠোর

তপস্যাও করিয়াছিলেন। তাহার নাম তাহার বন্ধুগণকে স্বামীজীর ক্লাসে আসিতে আকৃষ্ট করে। এবং তিনি স্বামীজীকে লণ্ডনের বহু সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তির সঙ্গেও পরিচয় করাইয়া দেন। বস্তুতঃ তাহারই যত্ন, চেষ্টা ও অর্থসাহায্যে স্বামীজীর লণ্ডনের কাজ দ্রুত প্রসার লাভ করে। নিউ ইয়র্ক হইতে রওনা হইবার সময় স্বামীজীর ধারণা ছিল, এবার তিনি শুধু লণ্ডনের ক্ষেত্রটি দেখিয়া ও বুঝিয়া আসিবেন। কিন্তু সেখানে আসিয়া দেখিলেন, তিন সপ্তাহ না যাইতেই তিনি নিউ ইয়র্কের ন্যায় এখানেও কঠোর পরিশ্রমে নিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ক্লাস, বক্তৃতা, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর দান, সংবাদপত্রের প্রতিনিধি ও অপর সমাগত ব্যক্তিবর্গের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ ইত্যাদি অবিশ্রাম চলিতে লাগিল। আর উহারই মধ্যে যাহারা তাঁহার নিকট শিক্ষার জন্য আসিতেন, তাহাদের তিনি সর্বরকমে ও সর্বোত্তমভাবে সাহায্য করিতে চেষ্টা করিতেন।

এইরূপ অবিশ্রাম পরিশ্রমের ফলে স্বামীজীর লণ্ডনের কার্য যেরূপ দাঁড়াইল, তৎসম্বন্ধে তিনি তাঁহার ১৮ই নভেম্বর তারিখের এক পত্রে তাঁহার একটি মাদ্রাজী শিষ্যের নিকট লিখেন, "ইংলণ্ডে আমার কাজ সত্যই চমৎকার হইয়াছে। দলে দলে লোক সকল আমার নিকট আসিতেছে, কিন্তু অত লোককে আসন দিবার জায়গা আমার নাই। তাই তাহারা, এমন কি, সম্ভ্রান্ত মহিলারা পর্যন্ত, জোড়াসন করিয়া মেঝেতে বসেন।...আগামী সপ্তাহে আমার চলিয়া যাইতে হইবে এবং তজ্জন্য তাহারা খুবই দুঃখিত।...অবিশ্রাম কাজ করার ফলে আমি সত্যই ক্লান্ত। আমার যে কঠোর শ্রম করিতে হয়, তাহা আর কোনও হিন্দু করিলে তাহার মৃত্যু ঘটিত।...দীর্ঘ বিশ্রামের জন্য আমি ভারতে আসিতে চাই।...।"

দেখা যায়, লণ্ডনে স্বামীজী হিন্দুধর্মের গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বসকল ও বিশেষভাবে বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধেই অধিক আলোচনা করেন। এবং তাঁহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি একটি সংবাদপত্রের (The West-

minister Gazette) প্রতিনিধির নিকট বলেন, "আমি কোনও দল গঠন করিতে বা দলীয় মত প্রচার করিতে আসি নাই। আমি আসিয়াছি শুধু বেদান্তের সর্বজনীন সত্য সকল বুঝাইয়া দিতে, যাহাতে সকলেই তাহা নিজ নিজ ধর্ম বা মত-বিশ্বাসের উপর প্রয়োগ করিতে পারে।" তাঁহার মহান শিক্ষা ও উদার আধ্যাত্মিক ভাবে মুগ্ধ হইয়া মিঃ স্টার্ডি তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। এবং অনেকে, এমন কি, কতিপয় সত্যপ্রিয় ধর্মযাজকও, বেদান্তের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া উহার তত্ত্ব সকল নিজ নিজ মত বিশ্বাসের উপর প্রয়োগ করিতে সচেষ্ট হইলেন। তবে এইরূপে স্বামীজীর দ্বারা বহু লোক নানাভাবে প্রভাবিত ও উপকৃত হইলেও, তাঁহার প্রথমবার ইংলণ্ডে আগমনের সর্বপ্রধান ঘটনা হইতেছে তাঁহার একটি অল্পবয়স্কা, মেধাবী ও অতি তেজস্বিনী আইরিশ নারীর সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহার মনের উপর এক গভীর ছাপ অঙ্কন। এই মেয়েটি এই সময়ে ছিলেন তাহার নিজেরই স্থাপিত লণ্ডনের একটি স্কুলের প্রধানা শিক্ষিকা, নাম মিস্ মারগারেট নোব্‌ল্ (পরে, ভগ্নী নিবেদিতা)। এবং তাহার পরবর্তী জীবনের ইতিহাস লক্ষ্য করিলে মনে হয় যেন প্রধানতঃ তাহাকে আকৃষ্ট করিবার জন্যই ভগবান স্বামীজীকে আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে টানিয়া আনিয়াছিলেন। তাহাদের এই প্রথম সাক্ষাতের কাহিনীটি লক্ষণীয় ও তাহা সংক্ষেপে এইরূপ।

মিস নোব্‌ল্ আন্তরিকভাবে সত্যান্বেষী ছিলেন। তিনি ঈশ্বরেও বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে এক রকমের সংশয়বাদী হইয়া উঠিয়াছিলেন—সহজে কিছু গ্রহণ করিতেন না। কিন্তু আধ্যাত্মিক সত্য ও শান্তির জন্য তাহার বুকের ভিতর একটা মৃদু হাহাকার সর্বদাই চলিত।

মনের এই অবস্থায় একজন বন্ধু একদিন তাহাকে বলিলেন "লেডি ইজাবেল মার্গ্‌সন্ (Lady Isabel Margesson) কয়েকজন বন্ধুকে তার বাড়ীতে যেতে বলেছেন—সেখানে এক হিন্দু সন্ন্যাসী কিছু বলবেন। তুমি যাবে?" সিসেম্ ক্লাবের মাধ্যমে মিস্ নোব্‌ল্

লেডি মার্গসনের বন্ধুত্ব অর্জন করিয়াছিলেন। তাই, শুধু কৌতূহল-বশতঃই তিনি এই নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন।

নির্ধারিত দিনে মিস্ নোব্‌ল্ লেডি মার্গসনের বাড়ীতে গেলেন। এবং সেখানে যাহা দেখিলেন ও শুনিলেন তৎসম্বন্ধে তাহার নিজের বিবরণ এইরূপ :

'সেদিন নভেম্বর মাসের এক হিমেল রবিবারের অপরাহ্ণ এবং স্থানটি ছিল লণ্ডনের পশ্চিমাংশের একটি (সৌখীন) ড্রইং রুম। স্বামীজী অর্ধ-বৃত্তাকারে উপবিষ্ট শ্রোতাদের সম্মুখে বসিয়া, তাঁহার পশ্চাতে অগ্নিকুণ্ড। তিনি প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তর দিয়া যাইতে-ছিলেন, আর মাঝে মাঝে তাঁহার কথার দৃষ্টান্ত দিয়া সংস্কৃত শ্লোক সুর করিয়া আবৃত্তি করিতেছিলেন। আমরা অভ্যাগতগণ সংখ্যায় মাত্র পনর-ষোল জন ছিলাম এবং আমাদের মধ্যে তিনি গেরুয়া আলখাল্লা ও কোমরবন্ধ পরিয়া এক দূরদেশের বার্তাবহরূপে বসিয়া-ছিলেন ও মধ্যে মধ্যে "শিব! শিব!" ধ্বনি করিতেছিলেন। আর তাঁহার মুখমণ্ডলে ফুটিয়া ছিল অন্তরের একটি শান্ত গরিমাময় ভাব।'

এই সন্ধ্যার কথোপকথনের কিছু বিবরণ মিস নোব্‌ল্ তাহার "The Master as I Saw Him" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে দিয়াছেন। উহা শ্রবণকালে তিনি অনুভব করিতেছিলেন স্বামীজীর কথাগুলি অপূর্ব, অমূল্য ও বিশেষভাবে অনুধাবনের যোগ্য। তাহা হইলেও, তাহার মন এই সময়ে ছিল সংশয়বাদী। এবং অপর অভ্যাগতগণের অধিকাংশও ছিলেন ঐরূপ—ধর্ম সম্বন্ধীয় কোন প্রচারে আস্থা স্থাপন করিতে অনিচ্ছুক। তাই, সেদিন ড্রইং রুমের আসর ভাঙ্গিলে, তাহারা সকলেই যাইবার পূর্বে আমন্ত্রয়িতা লেডি মার্গসন্ ও তাহার স্বামীর সহিত কথা বলিতে গিয়া গর্বের সহিত একে একে মত প্রকাশ করিলেন, "বক্তার কথাগুলিতে নূতন কিছু নেই। এ সবই পূর্বেই বলা হয়েছে।"

কিন্তু তাহা হইলেও, মিস্ নোব্‌ল্ স্বামীজীর আকর্ষণ হইতে রেহাই পাইলেন না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এমন

একটি নূতন মন ও সংস্কৃতির বার্তা ঐভাবে অগ্রাহ্য করা শুধু অনুদারতাই নয়, অন্যায়ও বটে। এবং তিনি মনে মনে স্বীকার করিলেন, 'যদিও ওঁর এক একটি উপদেশ পৃথকভাবে নানা স্থানে শোনা গিয়েছে, তা হলেও আমি এমন একটি মনীষী পূর্বে আর কখন দেখিনি, যিনি মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে আমার প্রাণের সমস্ত শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলিকে প্রকাশ করতে পেরেছেন।'

সুতরাং তিনি স্বামীজীর কথা আরও শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। এবং উক্ত প্রথম সাক্ষাতের পর স্বামীজী আর যে দুইটি বক্তৃতা দিলেন, তাহা তিনি আগ্রহের সহিত শুনিলেন ও তাহার নোট লইলেন। ইহা ব্যতীত, লেডি মার্গ্সন্ আরও যে সকল ঘরোয়া বৈঠকের ব্যবস্থা করিলেন, তাহার একটিও যাহাতে বাদ না যায় তাহার ব্যবস্থাও তিনি করিয়া লইলেন। এইভাবে যত্নের সহিত স্বামীজীর উপদেশগুলি শ্রবণ, অধ্যয়ন ও অনুধাবন করিয়া তিনি বুঝিলেন উহা সবই সুসম্বন্ধ। তাহা হইলেও, তাহার তেজস্বী ও সংশয়বাদী মন, পরীক্ষা বা উপলব্ধির অভাবে, সবই সত্য বলিয়া মানিতে পারিল না। তাই, সমগ্রভাবে উহা তিনি সন্দেহের চক্ষেই দেখিতে লাগিলেন।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের দুর্বার আকর্ষণী শক্তি তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিল। এবং স্বামীজী ইংলণ্ড ত্যাগ করিবার পূর্বেই তিনি তাঁহাকে 'আচার্যদেব' বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সম্বন্ধে মিস্ নোবল্ পরে লিখিয়াছেন, 'তিনি যে বীরের ধাতে গড়া তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম এবং তাঁহাকে তাঁহার স্বদেশবাসীগণের জন্য পরিকল্পিত কাজে সাহায্য করিতে আমি ইচ্ছুক হইয়াছিলাম। কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার মত-বিশ্বাস আমি তখনও মানিয়া লই নাই। তবে ইহা বুঝিয়াছিলাম যে, তিনি যদি কখন দেখেন যে তাঁহার মত-বিশ্বাসের কোন অংশ অসত্য, তাহা হইলে তিনি তখনই তাহা পরিত্যাগ করিবেন। এবং এই বিষয়ে ও মাত্র এই পর্যন্তই আমি তখন তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলাম। আমার জানা

জগতের অন্য যেকোনও মনীষী বা প্রতিভাশালী ব্যক্তির চাইতে তিনি যে বহুগুণে বড় ছিলেন, তাহা আমি তখনও কিছু বুঝিতে পারি নাই।'

এই সময়ে স্বামীজীর আমেরিকার শিষ্যগণ তাঁহাকে সত্বর আমেরিকায় ফিরিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চিঠি লিখিতেছিলেন। অন্য দিকে, তাঁহার ইংরেজ বন্ধুগণ তাঁহাকে স্থায়ীভাবে লণ্ডনে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্বামীজী উপস্থিত আমেরিকায় যাওয়াই স্থির করিলেন। এবং তৎসঙ্গে (মিঃ স্টার্ডি প্রভৃতি) কয়েকটি বন্ধুর উপর তাঁহার লণ্ডনের কার্য চালু রাখিবার ভার অর্পণ করিয়া, তিনি তাহাদের কথা দিলেন যে, আগামী গ্রীষ্মে তিনি পুনরায় ইংলণ্ডে আসিয়া তাঁহার ঐ আরব্ধ কাজ চালাইতে থাকিবেন।

২৭শে নভেম্বর তারিখে স্বামীজী লণ্ডন হইতে আমেরিকায় রওনা হন ও ৬ই ডিসেম্বর তারিখে নিউ ইয়র্কে পৌঁছেন।

তিরিশ

আমেরিকা ভ্রমণের শেষ চারি মাস ঃ

আমেরিকার কার্য সংগঠন ও বিদায়

(১৮৯৫, ডিসেম্বর—১৮৯৬, এপ্রিল)

অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে, স্বামীজী লণ্ডন হইতে ফিরিবার সময় ক্লান্ত ছিলেন। তদুপরি পথে দুরন্ত ঝড়ঝঞ্ঝায় জাহাজ প্রবলভাবে আন্দোলিত হইতে থাকায়, তিনি (এইবারই প্রথম) সমুদ্রভ্রমণ-জনিত অসুস্থতায় (sea-sickness) বিশেষ কষ্ট পান। তাহা হইলেও, নিউ ইয়র্কে পৌঁছিয়া তিনি মাত্র অল্প কয়েকদিন বিশ্রাম লইয়াই আমেরিকার কার্য সম্পূর্ণ করিতে উদ্যোগী হইলেন। তাঁহার এইবার-কার এই অবশিষ্ট কাজের ইতিহাস সংক্ষেপতঃ এইরূপ।

তিনি লণ্ডন হইতে ফিরিবার পূর্বেই তাঁহার নিউ ইয়র্কের বন্ধুগণ সেখানে তাঁহার থাকার ও ক্লাস করিবার জন্য ২২৮নং ওয়েষ্ট থার্টিনাইন্থ্ ষ্ট্রীটে কয়েকখানা ঘর ভাড়া করিয়াছিলেন। ইহার দুইখানি ঘর খুবই বড় ছিল। স্বামীজী এখন স্বামী কৃপানন্দকে লইয়া সেখানে থাকিতে ও ক্লাস করিতে আরম্ভ করিলেন।

লণ্ডন গমনের জন্য তিনি যে কয় মাস (১৭ই আগষ্ট হইতে ৫ই ডিসেম্বর, ১৮৯৫) অনুপস্থিত ছিলেন, তখন তাঁহার শিষ্যগণ, বিশেষ-ভাবে স্বামী কৃপানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দ ও মিস্ ওয়াল্ডো, তাঁহার আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের কাজ বিশেষ কৃতকার্যতার সহিত চালাইয়াছিলেন। তাহারা নিউ ইয়র্কে নিয়মিতভাবে প্রতি সপ্তাহে একটি করিয়া বেদান্তের সভা আহ্বান করিয়াছেন এবং তাহাতে বহু লোক যোগ দিয়াছে। তদ্ব্যতীত, তাহারা স্বামীজীর বাণী অপর নানা শহরেও প্রচার করিয়াছেন এবং বাফেলো, ডেট্রয়েট প্রভৃতি স্থানে নূতন আলোচনা-কেন্দ্র সকল স্থাপন করিতেও সক্ষম

হইয়াছেন। শিষ্যদের এই কর্মতৎপরতায় স্বামীজী বিশেষ আশান্বিত হইয়াছিলেন। এবং স্থির করিয়াছিলেন যে, শীত অন্তেই (অর্থাৎ, আর মাত্র চারি মাস পরেই) তিনি তাঁহার আমেরিকার কার্যভার তাহাদের হস্তে অর্পণ করিয়া পুনরায় ইংলণ্ডে যাইবেন ও তথা হইতে দীর্ঘ বিশ্রামের জন্য ভারতে ফিরিবেন। তাই ঐ উদ্দেশ্যে তিনি এখন দ্রুত তাঁহার আমেরিকার কার্য সমাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তিনি প্রথম তিন মাস—অর্থাৎ, ডিসেম্বর (১৮৯৫), জানুয়ারী ও ফেব্রুআরি (১৮৯৬)—নিউ ইয়র্কে কাটাইলেন। ঐ সময়ে তিনি সাধারণতঃ প্রতিদিন দুইবার করিয়া ক্লাস লন, তাঁহার কর্মযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ এই চারিখানি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন,[১] সাক্ষাৎকামী অগণিত লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন এবং কোন প্রবেশমূল্য না লইয়া দুই প্রস্থ রবিবাসরীয় বক্তৃতা দেন। প্রথম প্রস্থের বক্তৃতাগুলি তিনি দেন একটি অপেক্ষাকৃত ছোট হলে (Hardeman Hall)। সেখানে মাত্র ছয়শত লোক বসিতে ও আর তিনশত লোক দাঁড়াইতে পারিত এবং দাঁড়াইবার জায়গাও না পাইয়া প্রায় আরও তিনশত লোক ফিরিয়া যাইত। তাই, তাঁহার দ্বিতীয় প্রস্থ বক্তৃতার সময় অপর একটি খুব বড় হল (Madison Square Garden) ভাড়া করা হয়। এই হলটিতে পনর শতের অধিক লোক বসিতে পারিত। এই দুই প্রস্থ বক্তৃতাগুলির কয়েকটি স্বামীজীর "জ্ঞানযোগ" নামক পুস্তকে সন্নিবেশিত করা হয়। নিউ ইয়র্কের এই সকল বক্তৃতা ব্যতীত, স্বামীজী এইকালে হার্টফোর্ড শহরে

১। এই চারিখানি পুস্তক মধ্যে একমাত্র "রাজযোগ"ই স্বামীজীর স্বহস্তে লিখিত। বাকী তিনখানির মধ্যে "কর্মযোগ" ও "ভক্তিযোগ" তাঁহার ক্লাসের ভাষণের দ্বারা রচিত। এবং "জ্ঞানযোগ" তাঁহার কতকগুলি সাধারণ বক্তৃতার সংগ্রহ মাত্র। স্বামীজী নিজ হস্তে "রাজযোগ" অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করেন। পরে তাঁহার "জ্ঞানযোগ"ও বহুল পরিমাণে পরিবর্ধিত হয়। তিনি দ্বিতীয়বার লণ্ডনে গিয়া যে সকল বক্তৃতা দেন তাহার অনেকগুলি উহাতে সন্নিবেশিত হয়

(Connecticut) দুইটি এবং ব্রুকলিন এথিক্যাল এ্যাসোসিয়েসনে আর একটি বক্তৃতা দেন।

স্বামীজী তাঁহার বক্তৃতা ও ক্লাসের ভাষণ সকল উপস্থিত মত দিতেন এবং উহা রক্ষা করিবার জন্য তিনি নিজে কোন চেষ্টা করিতেন না। তাই, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁহার শিষ্য ও বন্ধুগণ তাঁহার বক্তৃতা ও ভাষণ সকল রিপোর্ট করাইবার জন্য একটি উপযুক্ত স্টেনোগ্রাফার নিযুক্ত করিতে সচেষ্ট হন। কিন্তু পর পর দুইজন স্টেনোগ্রাফার রাখিয়া তাহারা দেখিলেন যে, স্বামীজীর বক্তৃতার বিষয়ের সঙ্গে পরিচয় না থাকায় উহারা তাঁহাকে অনুসরণ করিতে পারিতেছেন না। পরিশেষে দৈবক্রমে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরি মাসের মধ্যভাগে জে জে গুডউইন (J. J. Goodwin) নামে ইংলণ্ড হইতে নবাগত একজন অল্পবয়স্ক ও অবিবাহিত ইংরেজ স্টেনোগ্রাফার পাওয়া গেল এবং তিনি স্বামীজীর বক্তৃতা ও ক্লাসের ভাষণ সকল পরিপূর্ণ ও নির্ভুলভাবে লিখিয়া লইতে সক্ষম হইলেন।

শুধু ইহাই নহে। স্বামীজীর সংস্পর্শে আসিয়া গুডউইন অত্যল্পকালের মধ্যে সংসারে বিরাগসম্পন্ন হইয়া তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা লইলেন এবং ফেব্রুআরি মাসের শেষের দিকে স্বামীজী তাহাকে ব্রহ্মচর্য দান করিলেন। গুডইনের গুরুভক্তির কোন সীমা ছিল না। তিনি স্বামীজীর বক্তৃতা ও ভাষণগুলি লইয়া দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেন। প্রতিদিন ঐগুলি সঙ্কেতলিপিতে লিখিয়া লইয়া, তিনি উহা ঐ একদিনেই টাইপ করিয়া সংবাদপত্রে ছাপাইবার জন্য পাঠাইয়া দিতেন। ইহা ব্যতীত, তিনি স্বামীজীর কায়িক সেবাও করিতেন। এবং তাঁহার সহিত তিনি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে ডেট্রয়েট ও বোষ্টনে এবং পরে ইংলণ্ডে ও ভারতে যান। ভারতে গিয়া তাহার মৃত্যু হয়।(১৮৯৮, ২রা জুন)। স্বামীজী তাহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন ও তাহার সম্বন্ধে অনেক সময়ে বলিয়াছেন, “আমার বিশ্বাসী গুডউইন (my faithful Goodwin)।” গুডউইনের মৃত্যু হইলে তিনি দুঃখের সহিত বলেন, “আমার ডান হাত ভেঙ্গে গেল।

আমার ক্ষতি অমেয়।" বস্তুতঃ স্বামীজীর বক্তৃতাবলী প্রধানতঃ গুডউইনই রক্ষা করেন এবং তাহারই পুণ্যকর্মের ফলে আমরা তাঁহার সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলীর (complete works) অতুলনীয় বক্তৃতা সকল পাঠ করিয়া ধন্য হইতে পারিতেছি।

যাহা হউক, স্বামীজী তাঁহার পূর্বোক্ত দ্বিতীয় প্রস্থ রবিবাসরীয় বক্তৃতা ২৪শে ফেব্রুআরি তারিখে শেষ করেন। তৎপূর্বে ২০শে ফেব্রুআরি, বৃহস্পতিবার, তিনি কতিপয় যুবক ও যুবতীকে মন্ত্রদীক্ষা দেন। এবং উহার পূর্ববর্তী বৃহস্পতিবার (১৩ই ফেব্রুআরি) তিনি ডাঃ স্ট্রীট[১] নামে একজন ভক্তিমান শিষ্যকে সন্ন্যাস দিয়া যোগানন্দ নাম দান করেন। আর এই সময়েই তাঁহার রাজযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ সম্বন্ধীয় ক্লাসের ভাষণও শেষ হয়। এবং গুডউইন তাহা টাইপ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখেন।

এই পুস্তকগুলি সম্বন্ধে ইহার পরের সংবাদ স্বামীজীর দুইখানা পত্র হইতে পাওয়া যায়। তিনি তাঁহার ২৯শে ফেব্রুআরি তারিখের এক পত্রে লিখিয়াছেন, "'কর্মযোগ' প্রকাশিত হইয়াছে, 'রাজযোগ' ছাপা হইতেছে।" তৎপর তিনি তাঁহার ১৭ই মার্চ তারিখের একখানি পত্রে লিখেন, "'কর্মযোগ', 'রাজযোগ' ও 'জ্ঞানযোগ' এবং তাঁহার রবিবাসরীয় বক্তৃতাবলী প্রকাশিত হইয়াছে।" 'ভক্তিযোগ' এইগুলির অল্প পরেই বাহির হয়।

উক্ত পত্র দুইখানি হইতে আরও জানা যায় যে, এই পুস্তকগুলি প্রকাশ করিবার জন্য নিউ ইয়র্কে একটি কমিটি গঠিত হয়। এবং তাহারাই ঐ সকল সঙ্কেতলিপিতে লেখাইবার, টাইপ করাইবার ও ছাপাইবার সকল খরচ দেন। এই জন্য স্বামীজী ঐ পুস্তকগুলির সকল স্বত্ব ঐ কমিটিকে দান করেন। কমিটির প্রধান অর্থসাহায্যকারী ছিলেন মিসেস বুল ও মিসেস লেগেট।

১। ডাঃ স্ট্রীট স্বামীজীর নিউ ইয়র্কের ক্লাসের একজন উৎসাহী ছাত্র ছিলেন।

এই পুস্তক কয়খানি প্রকাশ হইলে স্বামীজীর ঘাড়ের একটি বড় বোঝা নামিয়া যায়। এই জন্য তিনি কিরূপ ব্যাকুল ছিলেন তাহা তাঁহার ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখের একখানি পত্র হইতে বোঝা যায়। ঐ সময়ে তিনি একটি বক্তৃতা দিবার জন্য হার্ভার্ড (বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ছাত্রদের) ফিলজফিক্যাল ক্লাবের দ্বারা নিমন্ত্রিত হইলে, তাহা রক্ষা করিবার উপস্থিত অসুবিধা সম্বন্ধে তিনি ঐ পত্রে লিখেন, "আমি (ধর্মের প্রধান মার্গগুলি সম্বন্ধে) কয়েকখানি পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি, যাহা আমি (এ দেশ হইতে) চলিয়া গেলে এখানকার কাজের ভিত্তিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারিবে। আমি যাইবার পূর্বে চারিখানি ছোট বই আমার দ্রুত শেষ করিতে হইবে।"

যাহা হউক, স্বামীজী তাঁহার রবিবাসরীয় বক্তৃতা সমাপ্ত করিবার পর, তিনি তাঁহার আমেরিকার কার্যের জন্য এক দিকে যেমন উক্তরূপে তাঁহার বই কয়খানি প্রকাশ করিলেন, অন্যদিকে তেমনি (ঐ কার্যেরই দায়িত্ব বহনের জন্য) তিনি নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি (The Vedanta Society of New York) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিলেন। ইহার কাজ হইল বেদান্ত প্রচার করা, উহা ব্যবহারিক জীবনে অনুশীলন করা এবং উহার তত্ত্বসকল সকল ধর্মের উপর প্রয়োগ করা। তাই, এই সোসাইটি সকল ধর্মের লোককেই ইহার সদস্য হইতে সাদর আহ্বান জানাইলেন। এবং পরধর্ম-সহিষ্ণুতা ও সকল ধর্মকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা ইহার মূল কর্মনীতি হইল। ইহার সভ্যগণ "বৈদান্তিক" (Vedantins) বলিয়া পরিচিত হইলেন এবং তাহারা নিয়মিতভাবে একত্রিত হইয়া ইহার কার্য চালাইতে লাগিলেন। এই প্রতিষ্ঠানটি আজিও বিদ্যমান আছে ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুগণের সাহায্যে পরিচালিত হইতেছে।

এইভাবে নিউ ইয়র্কের প্রধান কাজগুলি সুসাধিত হইলে, স্বামীজী আমন্ত্রিত হইয়া মার্চ মাসে দুই সপ্তাহের জন্য ডেট্রয়েটে গিয়া সেখানে ক্লাস করেন ও বক্তৃতা দেন। ইহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা ইতিপূর্বে ডেট্রয়েটের ঘটনাবলী আলোচনাকালে দিয়াছি।

ডেট্রয়েট হইতে স্বামীজী (সম্ভবতঃ নিউ ইয়র্ক হইয়া) বোষ্টন ও উহার উপকণ্ঠস্থিত ক্যামব্রিজে যান। আমরা দেখিয়াছি, ক্যামব্রিজের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিলজফিক্যাল বিভাগের গ্রাজুয়েট ছাত্রদের ক্লাবে (Graduate Philosophical Society of Harvard University) বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিবার জন্য তিনি গত ডিসেম্বর মাসে (১৮৯৫) আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এখন ঐ আমন্ত্রণ রক্ষার্থই তিনি সেখানে গিয়া ২৫শে মার্চ তারিখে ঐ বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাটি এত উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল যে উহা শ্রবণ করিয়া ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে সেখানে প্রাচ্য-দর্শনের চেয়ার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু স্বামীজী সন্ন্যাসী বলিয়া উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন।

জানা যায়, ঐ বক্তৃতাটির পূর্বে বা পরে স্বামীজী বোষ্টনে আরও একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। (বিষয়—সর্বজনীন ধর্মের আদর্শ : The Ideals of a Universal Religion)।

বোষ্টন হইতে স্বামীজী চিকাগো যান এবং সেখানে কিছুদিন থাকিয়া ক্লাস গ্রহণ করেন ও সম্ভবতঃ কয়েকটি বক্তৃতাও দেন। এবার তাঁহার চিকাগো যাইবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হেল পরিবার ও শহরের অপর বন্ধুগণের সহিত আমেরিকা ত্যাগের পূর্বে একবার শেষ সাক্ষাৎ করিয়া যাওয়া।

চিকাগো হইতে স্বামীজী এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে নিউ ইয়র্কে ফিরিলেন। এবং আমেরিকা ত্যাগের পূর্বে তিনি তাঁহার ধনী শিষ্য ও বিশ্বস্ত বন্ধু মিঃ লেগেটকে তাঁহার নব-গঠিত নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির সভাপতি করিলেন। সোসাইটির অপর পদগুলিতেও তাঁহার অপর দীক্ষিত শিষ্যগণই নিযুক্ত রহিলেন। উহার এই কালের উৎসাহী কর্মীদের মধ্যে মিস্ মেরী ফিলিপ্স্, মিসেস্ আর্থার স্মিথ, মিঃ ও মিসেস ওয়ালটার গুড্ইয়ার এবং বিখ্যাত গায়িকা মিস্ এমা থার্সবি প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

স্বামীজীর অনুপস্থিতিকালে এই সোসাইটির কার্য যাহাতে উত্তম-

ভাবে চলিতে পারে তজ্জন্য তিনি গত কয়েকমাস ধরিয়া তাঁহার উপযুক্ত শিষ্যগণকে বিশেষভাবে প্রস্তুত করিতেছিলেন। এবং তাহার ফলাফল লক্ষ্য করিয়া তিনি এখন মিস্ ওয়াল্ডোকে (পরে, সিষ্টার হরিদাসী) রাজযোগ শিক্ষাদানের ভার ও ক্ষমতা অর্পণ করিলেন। এবং স্বামী কৃপানন্দ, অভয়ানন্দ, যোগানন্দ ও কতিপয় ব্রহ্মচারীকে বেদান্ত প্রচারে নিযুক্ত থাকিতে উপদেশ দিলেন। এই সকল ব্যতীত, তিনি তাঁহার আমেরিকার কাজ সুষ্ঠুভাবে চালাইবার জন্য আরও একটি পাকা ব্যবস্থা করিলেন।

ইংলণ্ডে থাকিতে তিনি সেখানে তাঁহার অনুপস্থিতিকালে কাজ করিবার জন্য তাঁহার একটি সন্ন্যাসী গুরুভাইকে লণ্ডনে আসিতে চিঠি লিখেন ও তাহার খরচ বাবদ কিছু টাকাও পাঠান। তারপর তিনি সেখানে থাকিতেই অপর এক পত্রে লিখেন, তাহার আমেরিকার কাজের জন্যও আর একজন সন্ন্যাসীকে দরকার হইবে। এখন তাঁহার আমেরিকা ত্যাগের সংকল্পে সে প্রয়োজন জরুরী হইয়াছে। তাই, কিছুদিন পূর্বে তিনি শিষ্যগণের অনুরোধে স্বামী সারদানন্দকে আবশ্যকীয় উপদেশ সহ অবিলম্বে লণ্ডনে রওনা হইতে লিখেন। এবং তিনি আমেরিকা থাকিতেই তাহার রওনা হইবার সংবাদ পাইয়া স্থির করেন যে, তিনি লণ্ডনে পৌঁছিয়া তাহাকে সেখানে কিছু শিক্ষা ও শিক্ষণ দিয়া আমেরিকায় পাঠাইবেন। এইভাবে তিনি সকল দিক দিয়া তাঁহার অনুপস্থিতির সময়ে আমেরিকার কাজ চালাইবার সুব্যবস্থা করেন। এবং তারপর তিনি শিষ্য ও বন্ধুগণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া ও গুডউইনকে সঙ্গে করিয়া ধার্য দিনে (১৫ই এপ্রিল, ১৮৯৬) ইংলণ্ডে রওনা হইলেন।

এই যাত্রার সঙ্গে স্বামীজীর জীবনের একটি বড় অধ্যায় শেষ হইল। পৌনে তিন বৎসর পূর্বে তিনি নামহীন, পরিচয়হীন ও সম্পূর্ণ নির্বান্ধব অবস্থায় আমেরিকার চিকাগো মহানগরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। নূতন অপরিচিত দেশ,—অতুল পার্থিব শক্তি, ঐশ্বর্য

ও জ্ঞান-গরিমার ঔজ্জ্বল্যে ঝল্‌মল্‌ করিতেছে। চতুর্দিকে প্রাচুর্য, ভোগের অপার সম্ভার; জনগণ ক্ষিপ্র, সাহসী, কর্মতৎপর, মহাবুদ্ধিমান। দেখিয়া স্বামীজী বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। তিনি কোন্‌ দুর্বল, নিরন্নের দেশ হইতে এই মহৈশ্বর্যশালী দেশে ধর্ম প্রচার করিতে আসিয়াছেন!

কিন্তু তবুও তিনি ফিরেন নাই—ফিরিতে পারেন নাই। কারণ, তিনি আসিয়াছিলেন তাঁহার গুরু ও ঈশ্বরের আদেশে এবং তাঁহার নিজ অন্তরেরও এক অপার অহেতুক করুণার প্রেরণায়। লক্ষ্য—ভারত ও সর্বজগতের কল্যাণের জন্য বেদান্ত সত্যের দ্বারা সমগ্র পৃথিবী বিজয়। তাই, ঘোর নৈরাশ্যের মধ্যেও দৃঢ় থাকিয়া তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের পথ খুঁজিতে লাগিলেন।

অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে ও ঈশ্বরের কৃপায়, তাঁহার সে পথ কিভাবে ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইয়াছিল তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। তাঁহার প্রথম পর্যায়ে আমরা দেখিয়াছি তিনি এক বিস্ময়কর ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া চিকাগোর ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্ম বা বেদান্তের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। এবং তারপর তিনি বিদ্যুৎ-গতিতে আমেরিকার স্থান হইতে স্থানান্তরে গিয়া বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আমেরিকার সর্বশ্রেণীর জনগণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার বার্তা শুনিল, হিন্দুধর্ম ও বেদান্ত যে কি তাহা জানিল এবং জানিয়া তাঁহার জয়ধ্বনিতে দিক মুখরিত করিল। তাঁহার এই জয়-যাত্রার পথে যে কোন বাধা উঠে নাই তাহা নয়। কিন্তু তাহা সবই তাঁহার প্রবল শক্তিস্রোতের খরপ্রবাহে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গেল। তিনি জয়ী হইলেন।

এ জয়ের উপস্থিত ফল কি দেখা গেল? আমেরিকার শত শত নরনারীর হৃদয়ে তাঁহার নিক্ষিপ্ত এক নূতন আধ্যাত্মিক শক্তিবীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। তাহারা ভারতের এই সন্ন্যাসীর নিকট হইতে আরও জ্ঞান, আরও নিকটতর শিক্ষা ও সাহায্য কামনা করিতে আরম্ভ করিল। এই আশ্চর্য পরিণতি শুধু যে তাঁহার বক্তৃতার বাহ্য উৎকর্ষতার

দ্বারা সম্ভব হইয়াছিল তাহা নয়। তাঁহার বক্তৃতার সহিত ছুটিয়া চলিত (ইহা আমরা পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি) তাঁহার প্রাণ বা প্রাণের দুর্বার আধ্যাত্মিক শক্তি। এবং এই মহা প্রাণ-শক্তিরই স্পর্শ-প্রভাবে তাঁহার শ্রোতাগণ নিমেষেই বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিত্তে এক উচ্চ অজানা অনুভূতির লোকে আরোহণ করিত। এই আশ্চর্য বিষয়টি সম্বন্ধে আমেরিকার বহু নরনারী তাহাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতার বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা এখানে উহার মাত্র একটি হইতে কিছু উদ্ধৃতি নিম্নে দিলাম।

মিসেস্ এলা হুইলার উইল্‌কক্স (Mrs. Ella Wheeler Wilcox) আমেরিকার একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও লেখক। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আমেরিকার একটি সংবাদপত্রে লিখেন—

"বারো বৎসর পূর্বে এক সন্ধ্যায় আমি শুনিলাম, আমার নিউ ইয়র্কের বাড়ীর সন্নিকটে বিবেকানন্দ নামে ভারতের একজন দার্শনিক বক্তৃতা দিবেন।

"কৌতূহলবশতঃ আমি ও আমার স্বামী ঐ বক্তৃতা শুনিতে গেলাম এবং শ্রোতাদের মধ্যে বসিয়া দশ মিনিট না যাইতেই আমরা এমন এক সূক্ষ্ম, প্রাণময়, আশ্চর্য স্তরে উন্নীত হইলাম যে, আমরা মন্ত্রমুগ্ধ ও প্রায় রুদ্ধশ্বাস হইয়া বক্তৃতার শেষ পর্যন্ত বসিয়া রহিলাম।

"বক্তৃতাটি যখন সমাপ্ত হইল, তখন আমরা জীবনের দৈনন্দিন ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হইতে নূতন সাহস, নূতন আশা, নূতন বল, ও নূতন বিশ্বাস লইয়া বাহিরে আসিলাম। আমার স্বামী বলিলেন, 'এই সেই দর্শন, ভগবানের সেই ধারণা, সেই ধর্ম, যা আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি।' এবং তারপর মাসের পর মাস তিনি আমার সহিত স্বামী বিবেকানন্দের পুরাতন ধর্মের ব্যাখ্যা শুনিতে ও তাঁহার আশ্চর্য মন হইতে সত্যের মণি সকল এবং শক্তি ও আত্মনির্ভরতার চিন্তা সমূহ কুড়াইতে গিয়াছেন। এই সময়টা ছিল সেই ভীষণ আর্থিক বিপর্যয়ের ভয়ঙ্কর শীতকাল, যখন বহু ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছে, স্টকের দাম নামমাত্র দাঁড়াইয়াছে, ব্যবসায়ীগণ নৈরাশ্যের অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং

মনে হইতেছে সমস্ত জগতে যেন একটা ওলটপালট ঘটিয়াছে। (এই অবস্থায়) কখন কখন দুঃশ্চিন্তা ও উদ্বেগে কয়েকটি বিনিদ্র রজনী কাটাইবার পর আমার স্বামী আমার সহিত স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছেন এবং তাহা শুনিয়া বাহিরে আসিয়া শীতের অন্ধকারে রাস্তায় চলিতে চলিতে হাসিয়া বলিয়াছেন, 'এখন সব ঠিক হয়ে গেছে। আর দুশ্চিন্তা করবার কিছু নেই।' আর আমিও আত্মার ঐ একই উচ্চতর অনুভূতি ও প্রসারিত দৃষ্টি লইয়া আমার কর্তব্য ও সখের কাজগুলির মধ্যে ফিরিয়া গিয়াছি।"

এইভাবে স্বামীজী নিজ অমেয় আধ্যাত্মিক শক্তির প্রবাহ ছুটাইয়া আমেরিকার জীবনে এক যুগান্তর আনিবার পথ করিলেন বটে। কিন্তু এই অপরিমিত শক্তি-খরচের গুরুশ্রমে তিনি নিজে—তাঁহার দেহ-যন্ত্রের দিক দিয়া—নিঃশেষ হইয়া চলিলেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি যখন প্রথম আমেরিকায় পদার্পণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি ছিলেন পূর্ণ যৌবনের স্বাস্থ্য, শক্তি ও সৌন্দর্যের অপূর্ব মূর্তি। আর তাহার মাত্র পৌনে তিন বৎসর পরে তিনি যখন ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল তারিখে দেশে ফিরিবার পথে দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন, তখন তিনি গুরুতররূপে ক্লান্ত, অসুস্থ ও ভগ্নস্বাস্থ্য। অত্যধিক পরিশ্রমে ও অপরিমিত শক্তিব্যয়ে তাঁহার স্নায়ুগুলি এমন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল যে তাঁহার স্বাস্থ্য আর ফিরিতে পারে নাই। আমেরিকার ডাক্তারগণ বলেন তিনি স্নায়বিক দৌর্বল্যে ভুগিতেছেন। তথাপি দেখা যাইত, তাহারই মধ্যে প্রয়োজন হইলেই তিনি বিপুল উদ্যমে তাঁহার কাজে নিযুক্ত হইয়াছেন।

যাহা হউক, আমরা দেখিয়াছি বৎসরাধিক কাল নিরবচ্ছিন্নভাবে নানা স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বক্তৃতা দিবার পর, তিনি ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরি মাসে তাঁহার কার্যধারা পরিবর্তন করিয়া নিউ ইয়র্ক শহরে থাকিয়া (লোক তৈয়ারীর জন্য) নিয়মিতভাবে ক্লাস করিতে আরম্ভ করেন। এবং তৎসঙ্গেই তাঁহার আমেরিকার কার্যের দ্বিতীয় স্তর আরম্ভ হয়। এই স্তরের কার্যে তিনি যে সফলতা লাভ করেন তাহা

অতীব বিস্ময়কর। মাত্র ৭।৮ মাস ক্লাস করিয়াই তিনি ভোগৈশ্বর্যপূর্ণ আমেরিকার মাটিতে ভারতীয় ধারায় অন্ততঃ দ্বাদশ জনকে মন্ত্রশিষ্য করিলেন এবং তাহাদের মধ্যে কয়েকজনকে ব্রহ্মচর্য ও দুইজনকে সন্ন্যাসও দিলেন। এবং তৎপর ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল তারিখে ইংলণ্ডে যাত্রা করিবার পূর্বে, তাঁহার দীক্ষিত ও ব্রহ্মচর্য-প্রাপ্ত শিষ্যের সংখ্যা হয় প্রায় দ্বিগুণ কি আরও বেশী এবং সন্ন্যাসী শিষ্যের সংখ্যা হয় তিন।

ইহা ছাড়া, আমেরিকায় এইকালে তাঁহার সমর্থক, সাহায্যকারী বা অনুগামী ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল অগণিত। ইহাদের মধ্যে খ্যাতনামা কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, চিকিৎসক, আইনজীবী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর অনেক পদস্থ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিও ছিলেন। এই সকল হইতে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, স্বামীজীর প্রচার আমেরিকার উপর কি গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এবং আমরা দেখিতে পাই, ঐ প্রভাব আজিও এক অক্ষয় আশীর্বাদের মত ঐ দেশের মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে সমভাবে ক্রিয়াশীল হইয়া আছে।

দেখা যায় ১৮৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী পূর্বোক্তরূপে নিউ ইয়র্কে ক্লাস করিয়া ও মাঝে মাঝে বক্তৃতা দিয়া যে আশ্চর্য সফলতা অর্জন করেন, তাহার বর্ণনা ও প্রশংসায় নিউ ইয়র্কের সংবাদপত্রগুলি মুখর হইয়া উঠে এবং তৎসম্বন্ধে তিনি নিজে (১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুআরি তারিখের) এক পত্রে লিখেন, "আমি আমেরিকান সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র নিউ ইয়র্ককে জাগাইতে পারিয়াছি। কিন্তু ইহার জন্য আমার প্রচণ্ড সংগ্রাম করিতে হইয়াছে।...আমার যাহা কিছু ছিল তাহা প্রায় সবই আমি এই নিউ ইয়র্কের কাজে ও (প্রথমবার) ইংলণ্ডে গিয়া ব্যয় করিয়াছি। এখন কাজের অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে উহা আপনিই চলিতে থাকিবে।"

তাই অসুস্থ হইলেও, এই সফলতার তৃপ্তি লইয়াই তিনি (ভারতবর্ষে ফিরিবার পথে) দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। তাঁহার আশা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র লণ্ডনেও যদি তিনি নিউ

ইয়র্কের ন্যায় সাফল্য অর্জন করিতে পারেন, তাহা হইলে ইংরেজিভাষা-ভাষী পাশ্চাত্য জগতের সমস্ত জনগণের নিকট তাঁহার বাণী পৌঁছাইবার পথ সুপ্রশস্ত হইবে এবং কালে—যথাসময়ে—তাহা তাঁহাদের নিকট ও পৃথিবীর সর্বত্রই পৌঁছিবেই।

একত্রিশ

স্বামীজীর আমেরিকা-বাসকালীন কয়েকটি অবশিষ্ট কথা

প্রথমবার আমেরিকায় আসিয়া স্বামীজী পৌনে তিন বৎসর (১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭/২৮ জুলাই হইতে ১৮৯৬ সনের ১৪ই এপ্রিল পর্যন্ত) বাস করেন। মাঝে মাত্র সাড়ে তিন মাস (১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগস্ট হইতে ৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত) ইংলণ্ড ভ্রমণের জন্য বাহিরে ছিলেন। তাঁহার এই আমেরিকা বাস ও তথাকার জয়-যাত্রার কাহিনী আমরা যথাসম্ভব ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এবং ঐ বর্ণনা যাহাতে সরল ও স্বচ্ছ থাকে তজ্জন্য আমরা ঐকালের কতকগুলি আনুসঙ্গিক ঘটনা উহাতে উল্লেখ করি নাই। তাই, এখন এই অধ্যায়ে ঐ সকলের কিছু কিছু যথাসম্ভব সংক্ষেপে সন্নিবেশিত করিয়া আমরা আমেরিকার কাহিনী সম্পূর্ণ করিবার প্রয়াস পাইলাম।

ভারতবর্ষে ফিরিয়া স্বামীজী তাঁহার কতিপয় অন্তরঙ্গ শিষ্যের নিকট কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, আমেরিকা থাকাকালে তাঁহার মধ্যে কতকগুলি সূক্ষ্ম শক্তি বা অনিমাদি বিভূতি প্রকাশ পায়। তবে তিনি তাহা ক্বচিৎ ব্যবহার করিয়াছেন এবং তাহাও গুরুতর প্রয়োজন ব্যতীত কখন করেন নাই। তিনি ইচ্ছা করিলেই শুধু স্পর্শ দ্বারাই লোকের জীবনের গতি পরিবর্তন করিয়া দিতে পারিতেন। দূরে যাহা ঘটিতেছে তাহা তিনি দেখিতে পাইতেন এবং লোকের চিন্তা বা অভিসন্ধি সুস্পষ্টভাবে জানিতে পারিতেন। অনেক সময়ে তাঁহার ছাত্রগণ যে সকল প্রশ্ন, সমস্যা বা সংশয় তাঁহার দ্বারা মিটাইয়া লইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা তাহারা মুখে প্রকাশ করিবার পূর্বেই

তিনি তাহার জবাব ও মীমাংসা দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহা ব্যতীত, তিনি অপরের অতীত জীবন অধ্যয়ন করিতে পারিতেন। এবং দৃষ্টি মাত্রে লোকের সঞ্চিত মনোভাবগুলি বুঝিতে পারিতেন।

আমরা পূর্বে প্রসঙ্গক্রমে দেখিয়াছি, স্বামীজী থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে কিভাবে মিসেস্ ফাঙ্কে ও মিস্ ক্রিষ্টিনের মন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইহার আর একটি দৃষ্টান্ত এইরূপ। চিকাগোর একটি ধনী নাগরিক স্বামীজীর কথিত যোগ-শক্তিতে বিদ্রূপের সহিত অবিশ্বাস প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে তাহা প্রমাণ করিতে আহ্বান করেন। বলেন, 'মশাই, আপনি যা বলছেন তা যদি সত্য হয়, তা হ'লে আমার মনের গঠন বা অতীত জীবন বলুন।' স্বামীজী মুহূর্তের জন্য একটু ইতস্ততঃ করিয়া, ঐ লোকটির চোখের উপর চোখ রাখিলেন এবং এমন অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন যে ভদ্রলোকটি নিমেষে ভয় পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "স্বামীজী, আপনি আমার কি করছেন? আমার মনে হচ্ছে আমার সমস্ত আত্মা মথিত হচ্ছে এবং আমার জীবনের সকল গোপন জিনিসই উজ্জ্বল রঙে উপরে উঠে আসছে?" তাহাকে ঐরূপ সন্ত্রস্ত দেখিয়া স্বামীজী সম্ভবতঃ সেদিন ঐ কার্য হইতে বিরত হন। কারণ ঘটনাটির বিবরণ ঐখানেই শেষ হইয়াছে।

যাহা হউক, ঐরূপ সব শক্তিবিকাশের মূল্য যে খুব বেশী তাহা নয়। স্বামীজী বলিতেন উহা আধ্যাত্মিকতার কোন লক্ষণ নয় এবং তিনি নিজে ঐ সকল শক্তি ব্যবহার করিতে বরাবরই উদাসীন রহিয়াছেন। তাহা হইলেও ঐ সংক্রান্ত আর একটি কাহিনী নানা কারণে এখানে উল্লেখযোগ্য।

জগদ্‌বিখ্যাত ফরাসী অভিনেত্রী সারা বার্ণহার্ড (Sarah Bernhardt) এবং ঐরূপ বা ততোধিক খ্যাতিসম্পন্না ফরাসী গায়িকা ম্যাডাম এমা কাল্‌ভে (Madame Emma Çalve)[১] বিভিন্ন কারণে

১। এইকালে কাল্‌ভের অতুলনীয় গীতাভিনয়ের মোহচ্ছটায় সমস্ত পাশ্চাত্য জগৎ তাহার পদানত। এবং তিনি সর্বত্রই স্থানীয় উচ্চতম শ্রেণীর ব্যক্তিগণের দ্বারা নিমন্ত্রিত ও আপ্যায়িত হইতেছিলেন।

স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। সারা বার্নহার্ড (গুণমুগ্ধ জনগণের দেওয়া নাম—the Divine Sarah) স্বামীজীর নিকট তাঁহার প্রচারিত দর্শনের মহান শিক্ষার বিশেষ প্রশংসা করেন। আর ম্যাডাম কালভে উহার আরও উচ্চ প্রশংসার সহিত তাহার জীবনের একটি মর্মস্পর্শী কাহিনী রাখিয়া গিয়াছেন। কাহিনীটি সংক্ষেপতঃ এই—

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে একটি অপেরা কোম্পানির সহিত ম্যাডাম কালভে চিকাগো আসেন। তখন নানা ব্যক্তিগত কারণে তাহার মন ছিল গুরুতররূপে ক্ষতবিক্ষত। তদুপরি চিকাগো আসার অল্প পরেই তাহার একমাত্র কন্যা হঠাৎ একদিন আগুনে পুড়িয়া মারা যায়। ইহাতে কালভে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়েন এবং মনের অসহ্য দুঃখ-অবসাদে আত্মহত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। ঠিক এই সময়েই তাহার একটি চিকাগোর বান্ধবী তাহাকে ঐ কার্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া শান্তির জন্য স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপদেশ দিতে থাকেন। স্বামীজী তখন তাহাদের বাড়ীতেই (সম্ভবতঃ হেলদের বাড়ী নয়) অবস্থান করিতেছিলেন। পরিশেষে কালভে একদিন স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত ঐ বাড়ীতে যান এবং ঐ সাক্ষাতের বর্ণনা তিনি নিজে এইভাবে দিয়াছেন :

"আমি এমন একটি লোককে জানার সৌভাগ্য ও আনন্দ লাভ করিয়াছি, যিনি সত্যই ঈশ্বরের সঙ্গে চলিতেন—এক মহান পুরুষ, ঋষি, দার্শনিক ও খাঁটি বন্ধু। আমার আধ্যাত্মিক জীবনের উপর তাঁহার প্রভাব ছিল সুগভীর। তিনি আমার সম্মুখে নূতন দৃষ্টিক্ষেত্র সকল খুলিয়া দিয়া আমার আধ্যাত্মিক ভাব ও আদর্শসকল প্রসারিত ও একীভূত করিয়া দিয়াছেন। আমার আত্মা চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।

"এক বৎসর তিনি যখন চিকাগোতে বক্তৃতা দিতেছিলেন, তখন আমি সেখানে ছিলাম। এবং ঐ সময়ে আমি শরীর-মনে অত্যন্ত অবসন্ন থাকায়, আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা স্থির করিলাম। কারণ, আমি দেখিয়াছিলাম আমার কয়েকটি বন্ধুকে তিনি কিভাবে

সাহায্য করিয়াছিলেন। আমার সাক্ষাতের জন্য একটি দিন ধার্য করা হইল এবং আমি তাঁহার বাসায় পৌঁছিলে আমাকে অবিলম্বে তাঁহার বসিবার ঘরে লইয়া যাওয়া হইল। আমাকে পূর্বেই বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তিনি আমার সহিত কথা না বলা পর্যন্ত আমি যেন কোন কথা না বলি। তাই আমি একটু কালের জন্য নীরবে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তিনি তখন ধ্যান করিবার ভাবে বসিয়া ছিলেন, তাঁহার গৈরিক পোশাকটি সরলরেখায় মেঝের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, তাঁহার পাগড়িপরা মাথাটি সামনের দিকে ঝুঁকিয়া ছিল এবং তাঁহার চোখ দুটি ছিল ভূমির উপর নিবদ্ধ। একটু পরে তিনি চোখ না তুলিয়াই বলিলেন, 'বাছা, কি (ভীষণ) কষ্টদায়ক অবস্থা তোমাকে ঘিরেছে! শান্ত হও, এ একান্ত প্রয়োজন।'

"তারপর এই লোকটি, যিনি আমার নামও জানিতেন না, অতি ধীর, অনাসক্ত ও অনুচ্চ স্বরে আমার জীবনের গোপন সমস্যা ও উদ্বেগগুলির কথা বলিলেন। আর তিনি এমন সব কথা বলিলেন যাহা আমার নিকটতম বন্ধুগণও জানিতেন না। আমার মনে হইল এ এক অদ্ভুত, অলৌকিক ব্যাপার!

"আমি পরিশেষে প্রশ্ন করিলাম, 'আপনি কি করে এসব কথা জানলেন? আমার বিষয় কে আপনাকে বলেছে?'

"তিনি ঈষৎ হাসিয়া আমার দিকে চাহিলেন, যেন আমি একটি শিশু ও বোকার মত একটি প্রশ্ন করিয়াছি। শান্তভাবে বলিলেন, 'তোমার কথা কেউ আমাকে বলেনি। তুমি কি মনে কর, তা বলা প্রয়োজন? আমি ঐ সব একখানা খোলা বই'এর মত তোমার ভিতর পড়েছি।'

"পরিশেষে আমি বিদায়ের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলে তিনি বলিলেন, 'ও সব ভুলে যাও। আবার স্ফূর্তি ও আনন্দযুক্ত হও। তোমার স্বাস্থ্য গড়ে তোলো। নীরবে দুঃখের কথা ভেবো না। তোমার অন্তরের আবেগগুলিকে কোন আকারের একটা শাশ্বত প্রকাশ দান

কর। তোমার আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের জন্য ইহা দরকার। তোমার ব্যবসার বিদ্যাও এ চায়।'

"তাঁহার কথা ও ব্যক্তিত্বের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়া আমি চলিয়া আসিলাম। আমার মনে হইল তিনি আমার মস্তিষ্ক হইতে সমস্ত দুশ্চিন্তা বাহির করিয়া লইয়াছেন এবং তৎস্থলে সেখানে তিনি তাঁহার পরিচ্ছন্ন ও শান্তিদায়ক চিন্তা সকল রাখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার শক্তিশালী ইচ্ছার ফলকে ধন্যবাদ—আমি আবার সজীব ও প্রফুল্ল হইয়া উঠিলাম।..."

ইহার পর ম্যাডাম কালভে স্বামীজীর সহিত নানা স্থানে আরও অনেকবার দেখা-সাক্ষাৎ করিয়াছেন। এবং পূর্ব ইওরোপ, তুরস্ক ও মিশর প্রভৃতি দেশ ভ্রমণে তাঁহার সাথী হইয়াছেন। অনেক পরে স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠ দর্শন করিতে তিনি একবার ভারতবর্ষেও আসিয়াছিলেন।

উপরি-বর্ণিত শক্তি সকল ব্যতীত, স্বামীজীর ভিতর ঐকালে আর একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের ক্ষমতাও প্রকাশ পায়। বক্তৃতা সফরকালে তাঁহার প্রায়ই সপ্তাহে বারো হইতে চৌদ্দটি বা আরও অধিক সংখ্যক বক্তৃতা দিতে হইত। ইহাতে একদিকে তাঁহার শরীর-মন যেমন ভয়ানকভাবে ক্লান্ত হইয়া পড়িত, অন্যদিকে তেমনি তাঁহার শ্রোতাদের প্রতিদিন নূতন কথা শুনানোও একটা কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিত। পরিশ্রান্ত দেহ-মনের অবসাদের মধ্যে তাঁহার অনেক সময়ে অনুভব হইত তাঁহার মস্তিষ্কও যেন নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। তাই চিন্তিত হইয়া ভাবিতেন, "কি করি। কালকের বক্তৃতায় কি নূতন কথা বলব!" এই রকম সব সময়ে তিনি নানা অত্যাশ্চর্য উপায়ে সাহায্য পাইয়াছেন। কখন কখন তিনি গভীর রাত্রে শয্যায় শুইয়া শুনিতেন, পরের দিন যে সকল চিন্তার উপর তাঁহার বক্তৃতা করিতে হইবে তাহা একটি কণ্ঠস্বর উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে বলিয়া দিতেছে। এক একদিন মনে হইত ঐ স্বর যেন দূর হইতে আসিতেছে এবং তারপর ক্রমশঃ নিকট হইতে নিকটতর হইতেছে। আবার কোন কোন দিন উহা

শুনিয়া মনে হইত, কেহ যেন তাঁহার পার্শ্বে থাকিয়া বক্তৃতা দিয়া যাইতেছে। অপর অনেক রাত্রে তিনি শুনিতেন দুইটি কণ্ঠস্বর তাঁহার সম্মুখে নানা বিষয়ে সুদীর্ঘ তর্ক-আলোচনা করিতেছে এবং পরের দিন তিনি দেখিতেন তাহার বক্তৃতায় তিনি ঐ সকল কথাই বলিয়া যাইতেছেন। কখন কখন ঐ সকল তর্ক-আলোচনায় এমন সব কথা থাকিত যাহা তিনি পূর্বে কখন চিন্তা বা শ্রবণ করেন নাই।

এরূপ হইলেও, স্বামীজী বলিতেন, ঐ সকল ব্যাপারের মধ্যে অলৌকিক কিছু নাই। উহা মনের উচ্চতর বৃত্তি সকলেরই স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ, তাই সম্পূর্ণরূপে মানসিক। ঐ সকল সময়ে মনই মনের গুরু হইয়া কাজ করিয়া যায়। কিন্তু তিনি এই ব্যাখ্যা দিলেও দেখা যায়, ঘটনার পরের দিন পার্শ্বের ঘরের লোকেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, "স্বামী, কাল রাত্রে আপনি কার সঙ্গে কথা বলছিলেন? আমরা অবাক হয়ে শুন্‌ছিলাম আপনি উচ্চৈঃস্বরে ও উৎসাহের সঙ্গে কথা বলছেন।" তাহাদের এই কথা শুনিয়া স্বামীজী শুধু হাসিয়াছেন, কোন সুস্পষ্ট উত্তর দেন নাই। তবে তিনি তাঁহার শিষ্যদের বুঝাইয়াছেন, ঐ সকল ঘটনা আত্মারই অপার শক্তির নিদর্শন মাত্র, উহাতে অলৌকিক কিছু নাই।

পূর্বদেশীয় লোক বলিয়া, অনেক অপরিচিত আমেরিকান তাঁহাকে নিগ্রো মনে করিত। এই ভুলের বশে, তাঁহার বক্তৃতা সফর-কালে কোন কোন স্থানের হোটেলওয়ালারা তাঁহাকে তাহাদের হোটেলে স্থান দিতে অস্বীকার করিয়াছে। এবং এই কারণে তাঁহার বক্তৃতা কোম্পানির ম্যানেজার অনেক স্থানে তাঁহার থাকার জন্য অন্য বন্দোবস্ত করিয়াছেন। আমেরিকার উত্তরাংশের কোন কোন নাপিতের দোকানেও এই ব্যাপার ঘটিয়াছে। অনেক পরে তাঁহার একটি পাশ্চাত্য শিষ্য তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, ঐ সকল ঘটনার সময়ে তিনি কেন নিজের প্রকৃত পরিচয় দেন নাই। তাহাতে তিনি বলেন, "আর একজনের ক্ষতি করে ওপরে ওঠা! আমি সে জন্যে পৃথিবীতে আসিনি!" স্বামীজীর অন্তরের এই অপার সহানুভূতির আর একটি

সুন্দর দৃষ্টান্ত এই। একস্থানে স্বামীজী যখন রেলগাড়ী হইতে নামিলেন, তখন রেলের একটি নিগ্রো কুলি দেখিতে পাইল যে একটি অভ্যর্থনা সমিতি তাঁহাকে সংবর্ধনার সহিত গ্রহণ করিয়া লইল। ইহাতে সে স্বামীজীর নিকট আসিয়া বলিল, "আমি শুনেছি আপনাতে কিভাবে আমার একজন স্বজাতীয় বড় হয়েছে, তাই আমি আপনার সঙ্গে করমর্দন করতে চাই।" ইহাতে স্বামীজী সাগ্রহে তাহার হাত দুইটি ধরিয়া বলিলেন, "ভাই, তোমাকে ধন্যবাদ! তোমাকে ধন্যবাদ!"

অন্যদিকে দেখা যায়, কেহ তাঁহার কোন উপকার করিলে তিনি তজ্জন্য সর্বদাই কৃতজ্ঞ থাকিতেন। আমেরিকাবাসের প্রথম দিকে যাহারা তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছেন ও সাহায্য করিয়াছেন, তাহাদের তিনি সুযোগ পাইলেই প্রতিদানে কিছু দিবার চেষ্টা করিতেন। এবং ঐ সকল বন্ধুদের উপহার দিবার জন্য তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে জুনাগড়ের দেওয়ান ও মহীশূরের মহারাজা ভারত হইতে মাঝে মাঝে কাশ্মীরী শাল, মূল্যবান ভারতীয় কার্পেট, রেশমী কাপড় ও মস্‌লিন থান প্রভৃতি তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছেন। ইহা ছাড়া, তাঁহার দুই-একখানি পত্র হইতে জানা যায়, তিনি তাঁহার অতি প্রিয় হেল ভগিনীগণকে আমেরিকার কোন কোন স্থান হইতে দুই একটি সৌখীন জিনিস কিনিয়া উপহার পাঠাইয়াছেন। অবশ্য এই সকল সৌখীন জিনিস তিনি তাঁহার গৃহী বন্ধুদেরই দিয়াছেন। তাঁহার ত্যাগ-তপস্যা-পরায়ণ প্রিয় আমেরিকান শিষ্যদের তিনি ভারত হইতে আনাইয়া দিয়াছেন তাহাদের আবশ্যকীয় রুদ্রাক্ষের মালা ও কুশাসন।

আমরা দেখিয়াছি, ভারতবাসী বলিয়া স্বামীজীর অন্তরে এক প্রবল গর্বানুভূতি ছিল। তাই দেখা যাইত, আমেরিকাতে তাঁহার সম্মুখে তাঁহার দেশের নিন্দা করিয়া কেহ কখন নিস্তার পায় নাই। তিনি বজ্রের ন্যায় অত্যুগ্র ভাষায় তাহার মাথার উপর ভাঙিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার এই গভীরভাবে আন্তরিক ও সুতীব্র দেশপ্রীতি দেখিয়া আমেরিকার অনেকে মুগ্ধ, বিস্মিত ও স্তব্ধ হইয়াছেন। একটি

সংবাদপত্র লিখেন, "তাঁহার দেশপ্রীতি অতি তীব্র। তিনি যেভাবে তাঁহার 'আমার দেশের' কথা বলেন তাহা যারপরনাই মর্মস্পর্শী। এই একটি বাক্য হইতেই বোঝা যায়, তিনি শুধু সন্ন্যাসী নন, তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীগণের আপন লোক।"

তবে ইহা স্মরণীয় যে, স্বামীজীর এই দেশপ্রীতি ও তাঁহার অন্তরের সকল ভাব ও সকল সুরই ছিল এক মহাসমন্বয়ে অবস্থিত। এবং তাঁহার সকল কাজ ও সকল কথারই মূল ভিত্তি ছিল শক্তি। তাই, আমেরিকাতে তিনি শুধু ধর্মপ্রচারক ছিলেন না। তিনি তৎসঙ্গে ছিলেন শক্তি-সঞ্চারক ও আরও বেশী। তিনি সেখানে বিচরণ করিয়াছেন চিরজয়ী যোদ্ধার ন্যায়। কখন একটি স্থান হইতেও তাঁহার পরাজয়ের বার্তা পাওয়া যায় নাই। কোন একটি লোকও তাঁহার সম্মুখে মাথা নত না করিয়া থাকিতে পারে নাই। এবং তাঁহার বক্তৃতা, কথোপকথন ও সব কিছুতেই শোনা যায় একটা যুদ্ধের দুন্দুভি। তাঁহার প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি যুক্তি যেন একটা অস্ত্র-নিক্ষেপ। এবং যুদ্ধ-বিজয়ী বীরের ন্যায়ই তিনি আমেরিকাতে বেদান্তের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি প্রকৃতই ছিলেন যোদ্ধা-সন্ন্যাসী (warrior-monk)। যেখানে গিয়াছেন সেখানেই একটি তোলপাড় উঠিয়াছে। এবং বহু স্থানে তিনি আখ্যা পাইয়াছেন—"Cyclonic Hindu," "Lightning Orator" "An Orator by Divine Right," ইত্যাদি।

বত্রিশ

দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে

(১৮৯৬, এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর)

আমরা দেখিয়াছি, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল তারিখে স্বামীজী গুডউইনকে সঙ্গে করিয়া নিউ ইয়র্ক হইতে দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। পাঁচ ছয় দিন পরে (ইংলণ্ডের রাজধানী) লণ্ডনে পৌঁছিয়া তিনি দেখিলেন তাঁহার গুরুভাই স্বামী সারদানন্দ তাঁহার পূর্বেই কলিকাতা হইতে (১লা এপ্রিল তারিখে) সেখানে আসিয়া মিঃ স্টার্ডির অতিথি হইয়া আছেন। এখন তাঁহারা দুইজনে ৬৩নং সেণ্ট জর্জেস রোডে মিস্ মুলার ও মিঃ স্টার্ডির অতিথিরূপে বাস করিতে লাগিলেন।

স্বামীজী লণ্ডনে পৌঁছিতেই তাঁহার পূর্ববারের পরিচিত বন্ধুগণ আসিয়া তাঁহাকে সাদরে তাহাদের অভ্যর্থনা জানাইলেন। এবং তাহাদের লইয়া মে মাসের (১৮৯৬) প্রারম্ভেই তিনি উক্ত সেণ্ট জর্জেস্ রোডের বাড়ীতে জ্ঞানযোগের ক্লাস চালাইতে আরম্ভ করিলেন। অত্যল্পকালের মধ্যেই তাঁহার ও তাঁহার শিক্ষার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং নূতন নূতন লোক (ইহাদের মধ্যে অনেক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিও ছিলেন) আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে বা তাঁহার ক্লাসে যোগ দিতে লাগিলেন। এই ক্লাস সপ্তাহে পাঁচ দিন বসিত। তন্মধ্যে শুক্রবার সায়াহ্নের ক্লাসটি প্রশ্নোত্তরের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। অপর চারি দিন স্বামীজী উপরিকথিত জ্ঞানযোগ ব্যতীত ক্রমে রাজযোগ ও তৎপর ভক্তিযোগ সম্বন্ধেও শিক্ষা দিতেন। গুডউইন তাঁহার ক্লাসের সমস্ত বক্তৃতাই সঙ্কেতলিপিতে লিখিয়া লইতেন।

অন্যদিকে, মে মাস অন্তে স্বামীজী (নিউ ইয়র্কের ন্যায়) লণ্ডনেও কতকগুলি রবিবাসরীয় বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার প্রথম

তিনটি বক্তৃতা তিনি দেন পিকাডিলির একটি গ্যালারিতে (one of the galleries of the Royal Institute of Painters in Water-Colours)। এই বক্তৃতা তিনটির বিষয় ছিল : (১) ধর্মের প্রয়োজনীয়তা (The Necessity of Religion), (২) একটি সর্বজনীন ধর্ম (A Universal Religion) এবং (৩) সত্য ও আপাত-প্রতীয়মান মানুষ (The Real and Apparent Man)। বক্তৃতাগুলি অতি উচ্চাঙ্গের ও উচ্চ-প্রশংসিত হওয়ায়, জুন মাসের শেষ হইতে জুলাই মাসের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রিন্সেস্ হলে তাঁহার আর একপ্রস্থ রবিবাসরীয় বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। এইবার তিনি ভক্তিযোগ, ত্যাগ (Renunciation) ও উপলব্ধি (Realisation) সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। এই উভয়বারের (রবিবাসরীয়) বক্তৃতাগুলি তাঁহার সমগ্র গ্রন্থাবলীতে (complete works) সন্নিবেশিত হইয়াছে।

দেখা যায়, উক্তরূপে ক্লাস চালাইয়া, (রবিবাসরীয়) বক্তৃতা দিয়া ও সমাগত লোকদিগের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়াই স্বামীজীর কাজ শেষ হইত না। বহু ক্লাব, সোসাইটি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বৈঠক-খানায়ও বক্তৃতা দিবার জন্য তিনি নিমন্ত্রিত হইতেন এবং ঐ সকল নিমন্ত্রণ তিনি সাধ্যানুসারে রক্ষা করিতেন। জানা যায়, তিনি এই-ভাবে সিসেম ক্লাবে এবং মিসেস্ এনি বেসাণ্ট, মিসেস্ মার্টিন ও মিসেস্ হাণ্ট প্রভৃতির বাড়ীতে বক্তৃতা দিয়াছেন। এই সকল স্থানের বক্তৃতার বর্ণনায় মিঃ এরিক হ্যামণ্ড (Mr. Eric Hammond) লিখিয়াছেন, "তাঁহার শ্রোতাগণ তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া আরও শুনিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেন। একস্থানে বক্তৃতার শেষে একটি খ্যাতিযুক্ত পক্বকেশ দার্শনিক স্বামীকে বলেন 'মহাশয়, আপনি চমৎকার বক্তৃতা দিয়েছেন! এবং তজ্জন্য আমি আপনাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই, কিন্তু আপনি আমাদের নূতন কিছু বলেননি।' উত্তরে স্বামীর সঙ্গীতময় উচ্চ কণ্ঠস্বরের ঝঙ্কার ঘরের ভিতর ছড়াইয়া পড়িল, 'মহাশয়, আমি আপনাদের নিকট সত্য কীর্তন করেছি। এবং তা,

অর্থাৎ সত্য, স্মরণাতীতকালের পাহাড় যত প্রাচীন, মানবজাতি, সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড এবং মহান ঈশ্বর যত প্রাচীন, ঠিক তত প্রাচীন। আমি যদি তা এমন ভাষায় বলে থাকি, যা ঐ বিষয়ে আপনাদের চিন্তা করতে প্রবৃত্ত করবে, আপনাদের ঐ চিন্তানুযায়ী জীবন-যাপন করতে উদ্বুদ্ধ করবে, তা হলে আমি তা বলে কি ভালো করি না?' (কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গে) 'শুনুন, শুনুন' রব ও উচ্চতর করতালি ধ্বনি হইতে বোঝা গেল স্বামী কিরূপ পরিপূর্ণভাবে তাঁহার শ্রোতাদের হৃদয় জয় করিয়া ফেলিয়াছেন। একটি উপস্থিত মহিলা (যিনি পূর্বে স্বামীজীর আরও অনেক বক্তৃতা শুনিয়াছেন) বলিলেন, 'আমি সারাজীবন নিয়মিত ভাবে গির্জার অনুষ্ঠান সকলে যোগ দিয়েছি। ঐ সবের প্রাণহীন একঘেয়ে ভাব ওগুলিকে নিষ্ফল ও বিস্বাদপূর্ণ করে রেখেছিল।...কিন্তু স্বামীকে শোনা অবধি ধর্মের ভিতর আলোক সঞ্চারিত হয়েছে। এবং তা (এখন) সত্য, প্রাণবন্ত ও আনন্দময় অর্থপূর্ণ এবং আমার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত'।"

জানা যায়, লণ্ডনের ভারতীয় ছাত্রগণও এইকালে স্বামীজীর নিকট যাতায়াত করিতেন ও নানা বিষয়ে তাঁহার উপদেশ চাহিতেন। ফলে, লণ্ডন হিন্দু এ্যাসোসিয়েসনের উদ্যোগে ১৮ই জুলাই তারিখে ইংলণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডের ভারতীয় অধিবাসীগণের যে সামাজিক সম্মিলন হয়, তাহাতে তাঁহাকেই সভাপতি করা হয়। এই সম্মিলনে তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল "The Hindus and Their Needs" (হিন্দুজাতি ও তাহাদের অভাব সমূহ)। এই সভায় অনেক ইংরেজ মহিলা ও ভদ্রলোকও উপস্থিত ছিলেন।

এইকালের একটি স্মরণীয় ঘটনা এই। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জগদ্‌বিখ্যাত বেদবিৎ অধ্যাপক ম্যাক্স মুলারের আমন্ত্রণে স্বামীজী ২৮শে মে তারিখে তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান। অধ্যাপক পূর্ব হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের অপূর্ব জীবন ও শিক্ষার বিষয় কিছু কিছু জানিতেন ও তাঁহার উপর বিশেষ ভক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি স্বামীজী ও তাঁহার সঙ্গী মিঃ স্টার্ডিকে যত্নপূর্বক আহার করান ও

তাঁহাদের অক্সফোর্ডের কয়েকটি কলেজ ও একটি লাইব্রেরি দেখান। এবং স্বামীজী যখন বিদায় লইলেন, তখন তিনি তাঁহার সহিত স্টেশন পর্যন্ত আসিলেন ও তাঁহার হেতু সম্বন্ধে বলিলেন, "রামকৃষ্ণ পরমহংসের একটি শিষ্যের দর্শন মানুষ রোজই পায় না।"

অধ্যাপক স্বামীজীর নিকট ঠাকুরের বিষয় আরও জানিতে চাহেন এবং তাঁহার জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে একখানি বই লিখিতেও ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাই, স্বামীজী স্বামী সারদানন্দকে ভারতবর্ষে পত্র লিখিয়া ঠাকুরের বাণী ও তাঁহার জীবনের ঘটনা সকলের যতটা সম্ভব সংগ্রহ করিতে উপদেশ দেন। তাহা জোগাড় করিয়া অধ্যাপককে দেওয়া হইলে, তিনি অবিলম্বে তাঁহার ঈপ্সিত পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। এই বইখানি "The Life and Sayings of Sri Ramkrishna" (শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী) নামে প্রকাশিত হয়।[১] ইহা ইংরেজি ভাষা-ভাষী লোকদের মধ্যে স্বামীজীর প্রভাব ও কাজকে দৃঢ়তর করিতে বিশেষ সাহায্য করে।

স্বামীজীর দ্বিতীয়বার লণ্ডনে অবস্থানকালের আর একটি বিশেষ ঘটনা হইতেছে—তাঁহার মিঃ ও মিসেস সেভিয়ারের সহিত সাক্ষাৎ ও তাহাদিগকে শিষ্যরূপে গ্রহণ। এই দুই স্বামী-স্ত্রী আন্তরিকভাবে সত্যকামী ছিলেন এবং সত্যের অন্বেষণে তাঁহারা নানা সম্প্রদায়ের মত-বিশ্বাসও আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কোনটিই তাঁহাদের সন্তোষ দান করিতে পারে নাই। স্বামীজী দ্বিতীয়বার লণ্ডনে আসার অল্প পরেই তাঁহারা একটি বন্ধুর নিকট হইতে জানিতে পারিলেন যে একটি হিন্দু প্রচারক প্রাচ্য দর্শন সম্বন্ধে ক্লাস গ্রহণ করিবেন। শুনিয়া তাঁহারা আগ্রহের সহিত ঐ ক্লাসে যাইতে লাগিলেন। সেখানে স্বামীজীর ভাষণগুলি তাহাদের মনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিল

১। ইহা ছাড়া, স্বামীজীর সহিত সাক্ষাতের অল্প পরেই অধ্যাপক ম্যাক্স মুলার "A real Mahatman" নামে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধও প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধের উপাদান সকল অধ্যাপক নিজেই পূর্বে সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

তাহা মিস্ ম্যাকলাউডের (ইনি এই সময়ে আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন) একটি বর্ণনা হইতে জানা যায়। তিনি বলিয়াছেন,

"স্বামীর একটি ভাষণশেষে বাহিরে আসিয়া মিঃ (ক্যাপ্টেন) সেভিয়ার আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি এই যুবককে জানেন? ওঁকে দেখে যা মনে হয় উনি সত্যিই কি তাই?' 'হ্যাঁ।' 'তা হলে তো লোকের ওঁকেই অনুসরণ করা ও ওঁর সাহায্যে ঈশ্বর লাভ করা উচিত।' তারপর বাড়ি ফিরিয়া তিনি তাঁহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি আমাকে স্বামীর শিষ্য হতে মত দেবে?' স্ত্রী উত্তর দিলেন; 'হ্যাঁ' এবং তৎসঙ্গে প্রশ্নও করিলেন, 'তুমি কি আমাকে স্বামীর শিষ্য হতে মত দেবে?' মিঃ সেভিয়ার স্নেহপূর্ণ রহস্যের সহিত বলিলেন, 'আমি জানি না'।..."

বস্তুতঃ স্বামীজীর ভাষণ শুনিয়া তাঁহাদের দুইজনেই অন্তরের অন্তরে যুগপৎ অনুভব করিতেছিলেন, "এই সেই লোক এবং এই সেই দর্শন যা আমরা সারা জীবন বৃথাই খুঁজে বেড়িয়েছি।" তারপর তাঁহারা যেদিন প্রথম স্বামীজীর সহিত নিরালায় সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, সেদিন তিনি মিসেস্ সেভিয়ারকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিলেন ও বলিলেন, "আপনাদের কি ভারতে যেতে ইচ্ছা করবে না? আমার সর্বোত্তম উপলব্ধি সকল থেকে আমি আপনাদের দেব।" সেই দিন হইতেই তাহারা তাঁহাকে শুধু গুরুই মনে করিতেন না, তাঁহাকে তাহারা আপন সন্তানের ন্যায়ও দেখিতেন। এবং এইভাবে তাহাদের মধ্যে যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাহা অচিরেই স্বামীজীর পাশ্চাত্য অভিযানের একটি উদ্দেশ্যকে এক অপূর্ব রূপ ও সফলতা দান করে।

আমরা দেখিয়াছি আমেরিকা থাকিতেই স্বামীজীর স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তাই, লণ্ডনে তিনমাস কাল গুরুতর পরিশ্রম করিয়া তিনি যারপরনাই ক্লান্ত ও নিঃশেষিত বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়ার ও মিস্

হেনরিয়েটা মুলার তাঁহাকে বিশ্রাম জন্য তাহাদের সহিত সুইজারল্যাণ্ডে যাইতে অনুরোধ করিলেন। এই সময়টা ছিল গ্রীষ্মকাল, তাই ছুটির সময় এবং স্বামীজীর ছাত্র ও অনুরাগী লোক সকল ইতিমধ্যেই লণ্ডন হইতে সমুদ্রতীর বা শৈলাবাসে যাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই জন্য স্বামীজী আগ্রহের সহিত তাঁহার উক্ত বন্ধুগণের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। বলিলেন, "আহা! তুষার দর্শন ও পার্বত্য পথে ভ্রমণের জন্য আমি ব্যাকুল!"

যথাসময়ে ছাত্র ও শিষ্যগণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া তিনি ১৯শে জুলাই তারিখে একদিন বৈকালে তাঁহার উক্ত বন্ধুগণের সহিত লণ্ডন হইতে রওনা হইলেন। ডোভার ও ক্যালে হইয়া তাঁহারা প্রথমে প্যারিসে গেলেন এবং সেখানে একরাত্রি থাকিয়া পরদিন তথা হইতে জেনেভা পৌঁছিলেন। জেনেভার বলসঞ্চারী শীতল বাতাস, হ্রদজলের গাঢ় নীল রং, বাড়ীগুলির চিত্রোপম সৌন্দর্য এবং তথাকার আকাশ, প্রান্তর ও সম্পূর্ণ নূতন পরিবেশ স্বামীজীর খুবই ভাল লাগিল। এখানে তিনি দুইদিন হ্রদে স্নান করিলেন ও একদিন চিলোনের দুর্গ দেখিতে গেলেন। মাত্র তিন দিন জেনেভাতে থাকিয়া, তাঁহারা তথা হইতে চল্লিশ মাইল দূরবর্তী বিখ্যাত বিশ্রামস্থান স্যামুনিক্সে (Chamounix) যান। সেখানে তুষার-মণ্ডিত মণ্ট ব্লাঙ্ক পর্বতের অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া স্বামীজী যারপরনাই মুগ্ধ হন। এবং এই প্রদেশের চাষীদের দেখিয়া তিনি বলেন, "এই সকল লোকদের হাব-ভাব ও পোশাক-পরিচ্ছদ অনেকটা হিমালয় পর্বতবাসী চাষীদের ন্যায়! যে সকল ঝুড়ি (basket) এরা পিঠে করে নেয়, তা ঠিক আমার দেশে পাহাড়ী অঞ্চলে ব্যবহৃত ঝুড়ির ন্যায়।" ইহা ব্যতীত জানা যায়, এই আল্পস্ পর্বতমালার উপরে বাসকালেই তিনি সর্বপ্রথম সেভিয়ার দম্পতীর নিকট তাঁহার হিমালয়ের কোন স্থানে একটি মঠ করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। বলেন, "আহা! এই রকম একটি মঠই আমি চাই, যেখানে আমি কর্ম হতে অবসর গ্রহণ করে জীবনের

অবশিষ্ট কাল ধ্যান-জপে কাটাতে পারব। এই মঠটি একটি ধ্যান ও কর্মের কেন্দ্র হবে। এখানে আমার ভারতীয় ও পাশ্চাত্য শিষ্যগণ একসঙ্গে থাকবে এবং আমি তাদের কর্মী হিসাবে শিক্ষণ দেব। শিক্ষণান্তে আমার ভারতীয় শিষ্যগণ পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে বেদান্ত প্রচার করবে, আর আমার পাশ্চাত্য শিষ্যগণ ভারতের কল্যাণে তাদের জীবন নিয়োগ করবে।" প্রস্তাবটি শুনিয়া মিঃ সেভিয়ার উৎফুল্ল হইয়া উঠেন ও বলেন, "এ করতে পারলে খুবই চমৎকার হবে, স্বামীজী। এ রকম একটি মঠ আমরা করবই।" আমরা পরে দেখিতে পাইব, সেভিয়ার দম্পতি তাহাদের এই সঙ্কল্প সিদ্ধ করেন এবং ঐ কাজে তাহাদের জীবন উৎসর্গ করেন।

স্যামুনিক্‌স হইতে ভ্রমণকারীগণ লিট্‌ল্ সেণ্ট বার্নার্ড গ্রামে যান ও তথা হইতে তাহারা (মিস মুলারের অনুরোধে) কয়েক মাইল দূরবর্তী একটি নির্জন ও তুষারাবৃত পাহাড়ে পরিবেষ্টিত গ্রাম্য-নিবাসে গিয়া দুই সপ্তাহ থাকেন।

এই শান্ত সুন্দর স্থানটিতে স্বামীজীর শরীর মনের সমস্ত ক্লান্তি-অবসাদ দূর হইল এবং তাঁহার স্বাস্থ্য প্রচুর উন্নতি লাভ করিল। ইহা ছাড়া জানা যায়, এখানে তিনি সর্বদাই এক অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবে থাকিতেন। তৎসম্বন্ধে তাঁহার একজন সঙ্গী বলিয়াছেন, "ঐ সময়ে তিনি যেন এক অত্যুজ্জ্বল আলোকে মণ্ডিত ছিলেন এবং একটা মহিমাময় শান্তি ও শান্তভাব তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখিত। আমি আর কখন তাঁহাকে এরূপ অবস্থায় দেখি নাই। মনে হইত তিনি যেন শুধু একটা দৃষ্টি বা স্পর্শ দ্বারাই আধ্যাত্মিকতা সঞ্চার করিয়া দিতেছেন।"

এই নির্জন শান্তিময় স্থানের পার্বত্য পথে স্বামীজী তাঁহার বন্ধুগণের সহিত বেড়াইতে যাইতেন। তখন অনেক সময়ে তিনি নীরবে পথ চলিতেন, আর (তাঁহার ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া) তাঁহার বন্ধুগণের মনে হইত তাহাদের উপর যেন একটা ধ্যান ও শান্তির ভাব নামিয়া আসিয়াছে। একদিন এইভাবে বেড়াইবার সময়ে স্বামীজীর

পাহাড়ে চলিবার লাঠিগাছা হঠাৎ একটা বরফে ঢাকা গভীর ছিদ্রের মধ্যে ঢুকিয়া যাওয়ায়, তিনি খাড়া পাহাড়টির উপর হইতে পার্শ্বের ভীষণ খাদের মধ্যে পড়িয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু অত্যাশ্চর্যভাবে রক্ষা পান। পরে সেদিন ফিরিবার পথে একটি ক্ষুদ্র ভজনালয় দেখিয়া তিনি বলিলেন, "এসো আমরা মেরীর চরণে কিছু ফুল দি।" বলিয়া তিনি একটি বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া কিছু পার্বত্য ফুল তুলিয়া আনিলেন এবং তাহা তিনি (নিজে অখ্রীষ্টান বলিয়া আপত্তি হইবার ভয়ে) মিসেস্ সেভিয়ারের হাতে দিয়া বলিলেন, "আমার অন্তরের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ আপনি এইগুলি মেরীর চরণে দিন।" বলিয়া তিনি পুনরায় কহিলেন, "কারণ, ইনিও সেই বিশ্ব-জননী।"

এই ক্ষুদ্র গ্রামটিতে থাকাকালে স্বামীজী জার্মানির কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত প্রাচ্যদর্শনবিদ্ অধ্যাপক ডাঃ পল ডয়সনের (Dr. Paul Deussen) নিকট হইতে একখানি আমন্ত্রণ পত্র পাইলেন। অধ্যাপক ঐ পত্রে তাঁহাকে তাহার কিয়েলের বাড়ীতে আসিয়া দেখা করিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। তদনুসারে স্বামীজী কিয়েলে যাওয়া স্থির করিয়া তাঁহার সুইজারল্যাণ্ড ভ্রমণ দ্রুত শেষ করিতে উদ্যোগী হইলেন। তাঁহারা উক্ত গ্রামটি হইতে প্রথমে লুসার্ণ যান। লুসার্ণ হইতে মিস্ মুলার জরুরী প্রয়োজনে লণ্ডনে ফিরিয়া গেলেন। এবং স্বামীজী মিঃ ও মিসেস সেভিয়ারের সহিত (সুইজারল্যাণ্ডের বিখ্যাত সৌন্দর্যময় স্থান) জারম্যাট গমন করিলেন। তৎপর তাঁহারা ঐ স্থান হইতে স্যাফহসেন যান ও সেখানে রাইন নদের জলপ্রপাত দর্শন করেন।

ইহার পর তাহারা জার্মানিতে প্রবেশ করিয়া পর পর হিডেল্‌বার্গ, কবলেন্‌জ, কলোন ও বার্লিনে যান। হিডেল্‌বার্গে তাঁহারা দুই দিন থাকিয়া সেখানকার বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ও দুর্গ দর্শন করেন। কবলেন্‌জে তাঁহারা মাত্র একরাত্রি বাস করেন ও তৎপর তথা হইতে কলোনে গিয়া কয়েকদিন থাকেন। কলোনের সুবিখ্যাত বিরাট

গির্জা দেখিয়া স্বামীজী বিস্মিত হন এবং একদিন সেখানকার উপাসনায় যোগ দেন। বার্লিনে গিয়া তিনি তথাকার প্রশস্ত রাস্তা, মনোরম উদ্যান ও সুন্দর স্মৃতিচিহ্ন সকলের বিশেষ প্রশংসা করেন।

বার্লিন হইতে তাঁহারা কিয়েলে যান ও সেখানকার একটি হোটেলে উঠেন। সংবাদ পাইয়া অধ্যাপক ডয়সন তাঁহাদের সকলকেই পরের দিন তাহার বাড়ীতে প্রাতর্ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। অধ্যাপক একজন উৎসাহী বৈদান্তিক ছিলেন। তাই, পরদিন সকালে তাঁহারা তাহার বাড়ীতে আসিলে, তিনি পরম আগ্রহে স্বামীজীর সহিত বেদান্ত সম্বন্ধে নানা আলোচনা করিতে লাগিলেন। পরে একটি সামান্য ঘটনা ঘটিল, যাহাতে অধ্যাপক না বুঝিয়া প্রথমটা সম্ভবতঃ একটু ক্ষুণ্ণই হইয়াছিলেন। স্বামীজী তাহার লাইব্রেরী ঘরে বসিয়া একখানি কবিতার বই পড়িতেছিলেন। অধ্যাপক তখন তাঁহার নিকট কিছু বলিয়া কোন সাড়া পাইলেন না। পরে স্বামীজী যখন ইহা জানিতে পারিলেন, তখন তিনি তাহার নিকট ক্ষমা চাহিয়া বলিলেন, তিনি পাঠে এত নিবিষ্ট ছিলেন যে তাহার কথা শুনিতে পান নাই। অধ্যাপক তাঁহার এই কৈফিয়তে প্রথমটা সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। কিন্তু পরে স্বামীজী যখন ঐ বইখানি হইতে কবিতা সকল আবৃত্তি করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, তখন তাহার বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। এবং ঐ বিষয় আলোচনা-প্রসঙ্গে ভারতীয় যোগীগণ কিরূপ পরিপূর্ণভাবে তাহাদের মনের একাগ্রতা সাধন করেন তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্বামীজী বলেন, তিনি তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারেন যে ঐ অবস্থায় একখানি জ্বলন্ত অঙ্গার হাতের উপর রাখিলেও তাহা টের পাওয়া যায় না।

এই সময়ে কিয়েলে একটি প্রদর্শনী চলিতেছিল। তাই, চা খাইবার পর অধ্যাপক স্বামীজী ও তাঁহার সঙ্গীদের উহা দেখাইতে লইয়া গেলেন। সেখানে কিছু সময় জার্মানির শিল্প, কলা ইত্যাদি অধ্যয়নে কাটাইয়া, তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন। অধ্যাপকের

প্রস্তাবানুসারে তাঁহারা পরদিন তাহার সহিত কিয়েল বন্দর ও অন্যান্য দর্শনীয় স্থান সকল দেখিতে যান।

এইভাবে প্রায় দুইমাস কাল ভ্রমণে অতিবাহিত করিয়া স্বামীজী এখন লণ্ডনে ফিরিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ডাঃ ডয়সন তাঁহাকে আরও কয়েক দিন কিয়েলে থাকিতে অনুরোধ করিলে তিনি তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, তিনি সত্বর ভারতে ফিরিতে মনস্থ করিয়াছেন, তাই তৎপূর্বে তাঁহার লণ্ডনের কাজের ভিত্তি দৃঢ়তর করিতে হইবে। এই কথা শুনিয়া অধ্যাপক আর আপত্তি না করিয়া বলিলেন, "বেশ, আমি আপনার সঙ্গে হ্যামবুর্গে দেখা করব এবং সেখান থেকে আমরা একত্রে হল্যাণ্ড হয়ে লণ্ডনে যাব। সেখানে আমি আপনার সঙ্গে অনেক সময় আনন্দে কাটাতে পারব, আশা করি।"

যথাসময়ে অধ্যাপক ডয়সন স্বামীজীর সহিত হ্যামবুর্গে মিলিত হইলেন। এবং তথা হইতে ইংলণ্ডে যাইবার পথে তাঁহারা হল্যাণ্ডের রাজধানী এ্যামস্টারডামে তিন দিন থাকিয়া সেখানকার মিউজিয়াম, কলা গৃহ ও দেখিবার মত অপর স্থান সকল দর্শন করিলেন।

১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে (অর্থাৎ, প্রায় পূর্ণ দুই মাস পরে) লণ্ডনে ফিরিয়া স্বামীজী মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়ারের সহিত তাহাদের হ্যাম্পস্টেডের বাড়ীতে গেলেন এবং অধ্যাপক ডয়সন সেণ্ট জন্স্ উডে তাহার বন্ধুদের সহিত রহিলেন।

কয়েকদিন হ্যাম্পস্টেডে কাটাইয়া স্বামীজী তাঁহার কার্যারম্ভ করিলেন। প্রথম দুই সপ্তাহে তিনি মিস্ মুগারের উইম্‌বিল্‌ডনের বাড়ীর (Airlie Lodge, Ridgway Gardens) বৈঠকখানা ঘরে দুইটি ভাষণ দিলেন। এবং ৮ই অক্টোবর হইতে তিনি (নিম্নোক্ত স্থানে) নিয়মিতভাবে ক্লাস করিয়া ব্যক্তিগত ও সাধারণভাবে রাজযোগ ও ধ্যানাভ্যাসের শিক্ষা দিতে লাগিলেন। লণ্ডনের সকলেই যাহাতে তাঁহার কথা ও বক্তৃতাগুলি শুনিবার সুযোগ পায়, তজ্জন্য মিঃ স্টার্ডি ৩৯ নং ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটে একটি সুবৃহৎ ঘর ভাড়া

করিয়াছিলেন। এই ঘরে দুই শতাধিক লোক ধরিত। স্বামীজী এখন এই ঘরেই তাঁহার ক্লাসের ভাষণ ও সাধারণ বক্তৃতা দুইই দিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার ও (তাঁহার আহ্বানে) তাঁহার নবাগত গুরুভাই স্বামী অভেদানন্দের বাসের জন্য মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়ার সন্নিকটস্থ ১৪নং গ্রে কোট গার্ডেন্সে (Westminster) একটি ফ্লাট ভাড়া লইয়াছিলেন।

পূর্বের ন্যায় এবারেও স্বামীজী তাঁহার সাধারণ বক্তৃতাগুলি বেদান্ত সম্বন্ধেই দেন। এবং উহার প্রায় সমস্তগুলিই তাঁহার "জ্ঞানযোগ" নামক পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই বক্তৃতাগুলি[১] পাঠ করিলে বোঝা যায়, উহা কিরূপ স্বচ্ছ, জ্ঞানোজ্জ্বল, কবিত্বময় ও এক দুর্জ্ঞেয় প্রভাবযুক্ত। স্বামীজীর মুখে উহা শুনিতে শুনিতে তাঁহার শ্রোতাগণের মনে হইত কথাগুলি যেন বজ্রের ন্যায় এক দুর্বার শক্তির সহিত তাহাদের উপর বর্ষিত হইতেছে ও উহার প্রভাবে তাহারা নিমেষে এক অজানা ঊর্ধ্বলোকে নীত হইয়াছেন। 'মায়া' বিষয়ক একটি বক্তৃতা শ্রবণকালে তাঁহার সমস্ত শ্রোতা এত ঊর্ধ্বে উন্নীত হন যে, তাহারা নিজেদের ব্যক্তিত্ব ভুলিয়া এক মহা বিশ্বচৈতন্যানুভূতিতে সমাহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সকল সময়ে তাঁহার শ্রোতাগণ স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন যে, শিক্ষক তাহার মুখোচ্চারিত বাক্যের দ্বারা তাহার নিজ অনুভূতি সকল তাহার ছাত্রদের মধ্যে সংক্রামিত করিতে পারেন। ইহা ব্যতীত দেখা যায়, এই সকল বক্তৃতাই স্বামীজী দিয়াছিলেন উপস্থিত মত, বিনা প্রস্তুতিতে। এবং তিনি

১। এইগুলির বিষয় এই—মায়া ও ভ্রান্তি (Maya and Illusion), মায়া ও ঈশ্বর-ধারণার ক্রমবিকাশ (Maya and the Evolution of the Conception of God), মায়া ও মুক্তি (Maya and Freedom), ব্রহ্ম ও সৃষ্টি (The Absolute and Manifestation), সর্ববস্তুতে ঈশ্বর দর্শন (God in Everything), উপলব্ধি (Realisation), বহুর মধ্যে একত্ব (Unity in Diversity), আত্মার স্বাতন্ত্র্য (Freedom of the Soul), ব্যবহারিক বেদান্ত (Practical Vedanta—চারিটি বক্তৃতায় সমাপ্ত)।

যে সত্যই প্রকট জ্ঞানমূর্তি ছিলেন, এই অমূল্য বক্তৃতাগুলিই তাহার একটি অতি সুস্পষ্ট নিদর্শন।

এই বক্তৃতাগুলি স্বামীজী দেন অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে (১৮৯৬)। আবার এই সময়েই তিনি বহু বৈঠকখানা, ক্লাব এবং লণ্ডন ও অক্সফোর্ডের বিশিষ্ট সুধীগণের আসরেও বক্তৃতা করেন। সিসেম ক্লাবে তিনি কয়েকবার বলেন। এই সকলের মাধ্যমে তাঁহার এডোয়ার্ড কার্পেণ্টার, ফ্রেডারিক মায়ার্স, ক্যানন উইলবারফোর্স প্রভৃতি বহু বিখ্যাত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। এবং ক্যানন উইলবারফোর্স তাঁহাকে তাহার ওয়েষ্টমিনস্টারের বাড়ীতে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়াছেন এবং নিজে সযত্নে বেদান্ত অধ্যয়ন করিতেও রত হইয়াছেন। ইহা ব্যতীত, অনেক প্রসিদ্ধ ধর্মযাজকগণও স্বামীজীর সহিত দেখা করেন ও বেদান্তের তত্ত্ব সকলের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হন। অন্যদিকে, স্বামীজী নিজেও কখন কখন গির্জায় গিয়া তাঁহার চিন্তাবলীর সমর্থক উদার ধর্মযাজকগণের বক্তৃতা শুনেন।

অন্যদিকে, আমরা দেখিয়াছি অধ্যাপক ডয়সন শুধু তাঁহার সঙ্গ লাভের জন্যই তাঁহার সহিত জার্মানি হইতে ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন। তিনি দুই সপ্তাহকাল লণ্ডনে থাকিয়া রোজই, দিনে বা রাত্রে, স্বামীজীর নিকট আসিয়া তাঁহার সহিত বেদান্তের তত্ত্ব সকল আলোচনা করিতেন ও তদ্দ্বারা ঐ বিষয়ে নিজের ধারণা সকল পরিচ্ছন্ন ও সুসংস্কৃত করিয়া লইতেন। আবার ঠিক এই সময়েই অধ্যাপক ম্যাক্স মুলারও নানা বিষয়ে তাঁহার সহিত পত্রালাপ করিতে রত ছিলেন। এইভাবে খ্যাত-অখ্যাত বহু লোকের আসা-যাওয়া ও পত্রালাপের প্রয়োজন তাঁহাকে নিয়তই মিটাইতে হইত। এবং বস্তুতঃ আমেরিকার ন্যায় ইংলণ্ডেও তাঁহার কাজের যেন কোন অন্ত ছিল না।

আমরা দেখিয়াছি তাঁহার অনুপস্থিতিকালে তাঁহার আমেরিকার কার্য পরিচালনার জন্য তিনি স্বামী সারদানন্দকে ভারত হইতে ইংলণ্ডে আনাইয়াছিলেন। তৎপর তিনি তাহাকে যথোচিত শিক্ষণ

ও উপদেশাদি দিয়া জুন মাসের শেষের দিকে (২৭শে জুন, ১৮৯৬) গুডউইনের সহিত আমেরিকায় পাঠাইয়া দেন। এবং তৎসঙ্গেই (তিনি সত্বর দেশে ফিরিবেন বলিয়া) তাঁহার ইংলণ্ডের কার্য পরিচালনা করিবার জন্য তিনি ভারতে জরুরী সংবাদ পাঠাইয়া স্বামী অভেদানন্দকে লণ্ডনে আনয়ন করেন। তাই, এখন তাঁহার এই নবাগত গুরুভাইটির শিক্ষণের প্রতিও তাঁহার মন দিতে হইল। এই শিক্ষণ তিনি যে কি যত্ন ও আগ্রহের সহিত দিতে লাগিলেন, তাহা নিম্নের ক্ষুদ্র ঘটনাটি হইতে সুস্পষ্ট হইবে।

২৭শে অক্টোবর তারিখে ব্লুমস্‌বেরি স্কোয়্যারের একটি ক্লাবে তাঁহার বক্তৃতা দিবার কথা ছিল। কিন্তু তাহা তিনি নিজে না দিয়া স্বামী অভেদানন্দকে দিতে বলিলেন। এবং কথাটা সভায় ঘোষণা করাইয়া তিনি নিজে উপস্থিত থাকিয়া তাহার বক্তৃতা শুনিলেন। যখন দেখিলেন যে স্বামী অভেদানন্দ বেশ কৃতকার্যতার সহিত তাহার ঐ বক্তৃতা শেষ করিলেন, তখন তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। এবং ঐ আনন্দের বশেই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া শ্রোতাগণকে বলিলেন, "আমার প্রিয় গুরুভাই এই প্রথম ইংরেজিতে ও ইংরেজ শ্রোতাগণের সমক্ষে বক্তৃতা দিলেন।" এবং তাঁহার এই মন্তব্যে যে করতালি ধ্বনি উঠিল, তাহাতে তিনি আরও উল্লসিত হইলেন। ঘটনাটি বর্ণনা করিয়া এরিক হ্যামণ্ড লিখিয়াছেন, "এই সময়ে তিনি যেন ইহাই চিন্তা করিয়াছিলেন ও সত্য বলিয়া জানিয়াছিলেন, আমার যদি মৃত্যুও ঘটে তাহা হইলেও এই সকল প্রিয় ওষ্ঠপুট হইতে আমার বার্তা ধ্বনিত হইতে থাকিবে ও জগৎ তাহা শুনিবে।"

যাহা হউক, আমেরিকার পত্র ও খবরের কাগজের কাটিং ইত্যাদি হইতে স্বামীজী বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার আমেরিকার কাজ এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। যাহাদের হাতে ঐ কাজ তিনি ন্যস্ত করিয়া আসিয়াছিলেন তাহারা উহা উত্তমভাবেই চালাইতেছেন। তৎসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ সেখানে যাওয়ায় তাহা আরও সুষ্ঠু ও সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে চলিতেছে। আমেরিকায় পৌঁছিবার অল্প পরেই, তিনি গ্রীনএকার

সম্মিলনের একজন শিক্ষকরূপে আমন্ত্রিত হইয়া সেখানে বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন ও "স্বামীর পাইনের" তলে বসিয়া যোগদর্শন সমূহের ক্লাস লইয়াছেন। এই সম্মিলনের কাজ শেষ হইলে, তিনি বোষ্টন, ব্রুকলিন ও নিউ ইয়র্ক হইতে আমন্ত্রিত হইয়া ঐ সকল স্থানেও বিশেষ কৃতকার্যতার সহিত বক্তৃতা দিয়াছেন। এবং পরিশেষে তিনি নিউ ইয়র্কে স্থায়ীভাবে অবস্থান করিয়া নিয়মিতভাবে তথাকার বেদান্ত সোসাইটির ক্লাস গ্রহণ ও বেদান্ত প্রচারের কার্য করিতে রত হইয়াছেন। ফলে, নিউ ইয়র্কের কতক লোকের মধ্যে তাহার একটা প্রভাব ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে। এবং বিশেষভাবে তাহার ছাত্রগণ তাহার শিক্ষায় খুবই সন্তোষ লাভ করিয়াছে। ইহা ব্যতীত, স্বামীজীর আরও একটি বিশেষ আনন্দের বিষয় হইয়াছিল, তাঁহারই ইচ্ছানুসারে তাঁহার সর্বাপেক্ষা উন্নত ও ক্ষমতাশালী শিষ্য মিস্ ওয়াল্ডো তাহার নিজের একটি পৃথক ক্লাস গঠন করিয়া তাহা বিশেষ দক্ষতার সহিত চালাইতেছিলেন। তদুপরি, নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে (১৮৯৬) স্বামী সারদানন্দ যখন কার্যোপলক্ষে ক্যামব্রিজে গিয়াছিলেন, তখন মিস্ ওয়াল্ডোই নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির ক্লাসগুলিও গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন।

আমেরিকার কাজের ন্যায়, স্বামীজী এইকালে তাঁহার ইংলণ্ডের কাজের ফল দেখিয়াও বিশেষ আশান্বিত হইলেন। এখানে তাঁহার অনুপস্থিতিকালে তাঁহার আরব্ধ কার্য চালাইবার জন্য তিনি অত্যল্প কালের মধ্যে মিঃ স্টার্ডি, মিস্ মুলার, মিস নোব্‌ল্ প্রভৃতি কয়েক জন উৎসাহী ও কর্মদক্ষ কর্মী পাইয়াছিলেন। তাহারা সকলেই ছিলেন তাঁহার শিষ্য বা শিষ্যের ন্যায় অনুগামী। আর ঐ সঙ্গে তিনি ভারত হইতে স্বামী অভেদানন্দকে আনাইয়া তাহাদের সাহায্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত, একটি আশ্চর্য ব্যাপারও তিনি লক্ষ্য করিলেন। ইংলণ্ড তাঁহার নিকট হইতে শুধু গ্রহণই করিল না, দানও করিল—এক অমূল্য ও অবিস্মরণীয় দান। সে তাহার চারিটি মহাপ্রাণ সন্তানকে ভারতের সেবার জন্য তাঁহার হাতে তুলিয়া দিল। তাহাদের

নাম—গুডউইন, মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার এবং মিস মারগারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল্‌ (পরে ভগ্নী নিবেদিতা)। ভারতের সেবায় ইহাদের প্রত্যেকের আত্মবলিদান চিরমহিমান্বিত হইয়া আছে। মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়ার বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবার এবং (ব্রহ্মচারী) গুডউইন সন্ন্যাসী হইবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া স্বামীজীর সহিত ভারতবর্ষে রওনা হন। সেখানে গিয়া (১৮৯৭, জানুআরি) গুডউইন স্বামীজীর ভারতে প্রদত্ত বক্তৃতা সকল রক্ষা করিয়া ভারত-কল্যাণে এক মহাকাজ সুসম্পন্ন করেন। এবং মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার গুরুর ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া ভারত ও জগতের হিতার্থে হিমালয়ের ক্রোড়ে মায়াবতীতে অদ্বৈত আশ্রম নামে তাহাদের সঙ্কল্পিত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এইভাবে নিজ নিজ বিধিনির্দিষ্ট কার্য সমাপনের অল্প পরেই গুডউইন ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে এবং মিঃ সেভিয়ার ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ভারতের মাটিতেই দেহ রক্ষা করেন। মিঃ সেভিয়ারের মৃত্যুর পর মিসেস্ সেভিয়ার বহু বৎসর মায়াবতী ও শ্যামলাতালে বাস করেন। পরে বার্ধক্যহেতু ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান ও সেখানেই তাঁহার দেহত্যাগ হয় (১৯৩১)।

মিস নোব্‌ল্‌ ইহাদের এক বৎসর পরে ভারতে আসেন (১৮৯৮, জানুআরি)। তাহার কাহিনী আরও উজ্জ্বল—আরও মর্মস্পর্শী। আমরা দেখিয়াছি স্বামীজী প্রথমবার ইংলণ্ডে আসিলে মিস্ নোব্‌ল্‌ তাঁহার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে তাঁহাকে 'আচার্যদেব' বলিয়া সম্বোধন করেন বটে, কিন্তু তাঁহার শিক্ষা তখনও মানিয়া লইতে পারেন নাই। তারপর স্বামীজী যখন দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে আসেন, তখন তিনি তাঁহার ও তাঁহার শিক্ষার অনুধ্যানের ফলে বহুল পরিমাণে রূপান্তরিত। তিনি তখন অন্তরে অন্তরে তাঁহার অনুগামী হইয়া চলিতে একান্ত ইচ্ছুক। কিন্তু তাহার মনের সংশয়-সন্দেহ তখনও কাটে নাই। তাই, শুক্রবারের প্রশ্নোত্তরের ক্লাসে তিনি তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে থাকিতেন ঠিক প্রতিপক্ষের ন্যায়। তবে স্বামীজী তাহার সকল প্রশ্নেরই জবাব দিতেন সযত্নে একটা চাপা স্নেহ ও

আশার সঙ্গে। কারণ, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন এটি যে-সে মেয়ে নয়। ইহার তেজ, বুদ্ধি, ঐকান্তিকতা, স্নেহ-করুণা ইত্যাদির কোন তুলনা নাই। তাই ভাবেন, ইহাকে কি (সেভিয়ার দম্পতির ন্যায়) ভারতের কাজের জন্য পাওয়া যায় না? অন্যদিকে, মিস্ নোব্‌ল্‌ও প্রধানতঃ তাঁহার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণেই তাঁহার নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিলেন। এবং তাহার মনে হইত তাহার জীবন স্বামীজীর কোন কাজেই চির-সংযুক্ত থাকিবে। এই অবস্থায় স্বামীজী একদিন কথোপকথনকালে হঠাৎ তাহার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "আমার দেশের মেয়েদের জন্যে আমার পরিকল্পনা আছে। এবং আমার মনে হয় তাতে তুমি আমাকে অনেক সাহায্য করতে পারো।" মিস্ নোব্‌ল্ জানিতেন এ আহ্বান তিনি পূর্বেই তাহার অন্তরে শুনিয়াছেন। তাহা হইলেও, তিনি সেদিন কোন সাড়া দিতে পারিলেন না। তারপর কয়েকদিন চিন্তার একটা ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে অতিবাহিত করিয়া, তিনি (সম্ভবতঃ মনের ক্লান্তি ও সঙ্কোচের বশে) তাহার সিদ্ধান্ত স্বামীজীকে জানাইবার জন্য মিস্ মুলারকে অনুরোধ করিলেন। মিস মুলার একদিন সন্ধ্যাকালে (নভেম্বর, ১৮৯৬) তাহাদের উভয়কে নিজ বাটিতে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া স্বামীজীকে বলিলেন, 'মারগারেট আপনার কাজে জীবন উৎসর্গ করতে চায়।' শুনিয়া বিস্মিত স্বামীজী শুধু কহিলেন, "আমার নিজের কথা এই, আমার দেশবাসীদের মধ্যে আমার এই আরব্ধ কাজ করতে প্রয়োজন হলে আমি দুশো বার জন্মাব।" ইহার পর মিস্ নোব্‌ল্ লণ্ডন হইতে ভারতে রওনা হইবার কিছু পূর্বে স্বামীজী তাহাকে অপর নানা কথার মধ্যে লিখেন, 'ভারতের জন্যে দরকার একটি সিংহিনীর। এবং তুমি ঠিক সেইরূপ নারী যাকে আজ প্রয়োজন। তা হলেও, এ কাজে বিঘ্ন ও কষ্ট-অসুবিধা আছে। তাই, কর্মে ঝাঁপ দেবার পূর্বে তুমি ভাল করে চিন্তা ক'রো। আর কাজে নেমে যদি বিফল হও বা কখন কর্মে বিরক্তি আসে, তা হলেও আমার দিক থেকে নিশ্চয় জেনো—তুমি ভারতবর্ষের কাজ কর বা না কর, তুমি বেদান্ত ধরে থাক বা ত্যাগ

কর, আমি আমরণ তোমার পাশে থাকব। হাঁতীর দাঁত বেরিয়ে আসে, কিন্তু তা আর কখন ফিরে ভিতরে যায় না। মানুষের কথাও ঠিক তেমনি।'

অর্থাৎ, এই স্বেচ্ছায় উৎসর্গিতা মহাতেজস্বিনী মেয়েটিকে ভারতের জন্য গ্রহণ করিবার সময়েও স্বামীজী তাহার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ভারতে আসিবার অল্প পরেই মিস্ নোব্‌ল্ স্বামীজীর নিকট হইতে ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করিয়া 'নিবেদিতা' নাম প্রাপ্ত হন। এবং অচিরেই তিনি তাহার নিজেকে ও নিজের সব কিছুই গুরুর চরণে ও তাঁহার ঈপ্সিত ভারতমাতার সেবাকার্যে নিবেদন করিয়া তাহার ঐ নাম সার্থক করেন। অবিশ্রাম কর্ম করিয়া তিনি শ্রান্ত, ক্লান্ত ও ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া মাত্র চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে (দার্জিলিঙে) দেহ রাখেন। কিন্তু ইহার মধ্যেই এক অপূর্ব কর্মময় নিষ্কলুষ ও নিঃস্বার্থ জীবন যাপনের ফলে, তিনি চিরকল্যাণময়ী দেবীর ন্যায় ভারত-বাসীদের এক মহান আদর্শে পরিণত হইয়াছেন। তাহার স্মৃতি আজ তাহাদের পক্ষে এক মহা অনুপ্রেরণা। ভারতের হিতে ও গুরুর বাণী রক্ষার্থ তাহার অবদান অবিস্মরণীয় ও অতুলনীয়। তাহার জীবনী সকলেরই পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য।

ইংলণ্ডের নিকট হইতে ভারতের জন্য এই সকল অমূল্য দান লাভ করিয়া ও পূর্ববর্ণিতরূপে সেখানকার কার্য পরিচালনার সুব্যবস্থা করিয়া, স্বামীজী ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে (১৮৯৬) ভারতবর্ষে রওনা হইবার দিন স্থির করিলেন। সংবাদ পাইয়া তাঁহার ছাত্রগণ বিষণ্ণ হৃদয়ে তাঁহাকে তাহাদের বিদায়-সংবর্ধনা জানাইবার জন্য ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে পেণ্টারদিগের পিকাডিলির রয়াল সোসাইটিতে একটি সভা আহ্বান করিলেন। স্বামীজীকে দেখিবার জন্য ও তাঁহার শেষ বক্তৃতা শুনিবার জন্য সভায় অসম্ভব রকমের ভিড় হইল। সভাপতি মিঃ স্টার্ডি তাঁহাকে একটি অভিনন্দন পত্র প্রদান করিলেন। এবং আরও অনেক বক্তা, নারী ও পুরুষ, স্বামীজীকে তাহাদের অন্তরের সম্মান, ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বক্তৃতা করিলেন। স্বামীজী

আবেগের সহিত অতি মর্মস্পর্শী ভাষায় ঐ সকলের উত্তর দিলেন। এবং তারপর তাঁহার বিষণ্ণ শ্রোতা ও বন্ধুদের আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "আবার দেখা হবে।" কিন্তু আমরা পরে দেখিতে পাইব, সে দেখা কেবল নামেই হইয়াছিল।

ইহার পর নির্দিষ্ট দিনে (১৬ই ডিসেম্বর, ১৮৯৬) স্বামীজী ও সেভিয়ার দম্পতি ডোভার ও ক্যালে হইয়া নেপ্‌ল্‌স্ পর্যন্ত স্থলপথে এবং গুডউইন সাউদামটন্ হইতে জলপথে ভারত অভিমুখে রওনা হইলেন। গুডউইনের জাহাজ নেপ্‌ল্‌সে পৌঁছিলে, তাঁহারা সকলে একসঙ্গে ঐ জাহাজেই ভারতে যান।

তেত্রিশ

ভারতের পথে

(ডিসেম্বর, ১৮৯৬—জানুয়ারি, ১৮৯৭)

আমরা দেখিয়াছি স্বামীজীর অনুপস্থিতিকালে তাঁহার পাশ্চাত্য দেশের কাজ যাহাতে সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা করিয়াই তিনি লণ্ডন হইতে ভারতে রওনা হইয়াছিলেন। তাই, তাঁহার ঐ কাজের গুরুদায়িত্ব হইতে তিনি এখন বহুল পরিমাণে মুক্ত। এবং তাহারই আনন্দে তিনি মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়ারকে বলেন, "আমার এখন এক চিন্তা ভারতবর্ষ। আমি শুধু সেদিকেই চেয়ে আছি।"

থাকিবারই কথা। কারণ, একদিকে ভারতের পুনরুত্থান সাধন যেমন তাঁহার জীবনের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য, অন্যদিকে তেমনি তাঁহার আরব্ধ পাশ্চাত্য দেশের কাজের ভবিষ্যতও নির্ভর করিতেছে ভারতের ঐ কার্যের সফলতার উপর। তাই, উক্ত উভয় কার্যের জন্যই সর্বাগ্রে ও সর্বাধিক প্রয়োজন ভারতকে জাগ্রত করা, সবল করা, ক্রিয়াশীল করা।

কিন্তু স্বদেশে থাকিয়া এই কাজ করা সম্ভব ছিল না। কারণ, ভারত তখন ছিল সম্মোহিত, আত্মপ্রত্যয়হীন ও অর্থবলশূন্য। তাই, প্রধানতঃ ভারতকে জাগাইবার জন্য ও তাহার আবশ্যকীয় অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত তিনি সর্বাগ্রে একাকী পৃথিবী-বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন। তিনি এখন তাঁহার ঐ বিরাট দিগ্‌বিজয়ের প্রথম অভিযানের কাজ সুসিদ্ধ করিয়া দেশে ফিরিতেছেন। ভারতের চিঠিপত্রাদি হইতে তিনি পূর্বেই সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাঁহার আমেরিকা ও ইংলণ্ডের কাজের অপূর্ব সাফল্যে তাঁহার স্বদেশবাসীগণ কিরূপ উল্লসিত হইয়া তাঁহাকে সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিবার

জন্য উন্মুখভাবে অপেক্ষা করিতেছে। তাই তিনি স্থির করিলেন, ভারতে পৌঁছিয়া তাহাদের সহিত প্রথম সাক্ষাতের উল্লাস-উৎসবের শুভক্ষণেই তিনি তাহাদের তাঁহার বাণী শুনাইবেন—তাহাদের পুনরুত্থানের বার্তা প্রচার করিবেন।

ফলে, ইংলণ্ড ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ভারত সম্বন্ধে অতি কঠিন চিন্তা সকল ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া তাঁহার মস্তিষ্ক জুড়িয়া বসিল। ঐ চিন্তামুখে তিনি দেখিলেন ভারতের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান, লক্ষ্য করিলেন পাশ্চাত্য জগতের গরিমাময় বিকাশ ও তাহার ধ্বংসোন্মুখ গতি এবং তুলনা করিতে লাগিলেন উক্ত উভয় দেশের সভ্যতার দোষগুণ। তারপর ঐ সুগভীর চিন্তাসকল ছাঁকিয়া তিনি বাহির করিলেন ভারতের বাঁচিবার পথ, তাহার পুনরুত্থানের উপায় ও তাহার সকল সমস্যার সমাধান। তাহার সারা জীবনব্যাপী প্রয়াসের ফল! আমরা দেখিতে পাইব ভারতের মাটিতে পা দিয়াই তিনি উহা বজ্রনির্ঘোষে তাঁহার স্বদেশবাসীগণকে শুনাইতে আরম্ভ করেন।

উপরি-বর্ণিত চিন্তা ও সমাধান সকল বুকে করিয়া স্বামীজী ইংলণ্ড হইতে ভারতের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার এই ভ্রমণ পথের বিবরণ এইরূপ। লণ্ডন হইতে ডোভার হইয়া ক্যালে পৌঁছিয়া, তিনি ও তাঁহার সঙ্গীগণ (মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়ার) তথা হইতে রেলগাড়ীতে ফ্রান্সের মধ্য দিয়া (ইটালির অন্তর্গত) মিলানে পৌঁছেন। মিলান হইতে তাঁহারা পর পর পিসা, ফ্লোরেন্স ও রোমে যান। মিলান ও পিসাতে স্বামীজী ঐ দুই শহরের বিখ্যাত গির্জা প্রভৃতি দর্শন করেন ও উক্ত উভয় স্থানের পাথরের কাজের বিশেষ প্রশংসা করেন। সুন্দর ফ্লোরেন্স শহরে তাঁহারা তথাকার কলাগৃহ ও ঐতিহাসিক স্মৃতিস্থান সকল দেখিয়া এবং উহার উদ্যান সকলে ভ্রমণ করিয়া বিশেষ প্রীত হন।

ফ্লোরেন্সে একদিন উদ্যান ভ্রমণকালে চিকাগোর মিঃ ও মিসেস্ হেলের সহিত স্বামীজীর হঠাৎ সাক্ষাৎ হয়। ইহাতে উভয় পক্ষই বিশেষ বিস্মিত ও আনন্দিত হন। এবং স্বামীজী সেদিন কয়েক

ঘণ্টাকাল সানন্দে তাহাদের সহিত পুরাতন দিনের স্মৃতি ও তাঁহার ভারতের কাজের পরিকল্পনা সম্বন্ধে নানা আলাপ-আলোচনা করেন।

ফ্লোরেন্স হইতে স্বামীজী ও তাঁহার সঙ্গীগণ রোমে যান। এই অতীত গৌরবপূর্ণ সুবিখ্যাত প্রাচীন শহরটিতে তাঁহারা সাত দিন থাকিয়া উহার বহু দর্শনীয় স্থান, প্রাসাদ, সৌধ, গির্জা ও স্মৃতিচিহ্ন সকল দর্শন করেন। ঐ সকল দর্শনকালে স্বামীজী তাঁহার সঙ্গীদের নিকট রোমান সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস এমন জ্বলন্তভাবে কীর্তন করিতেন, যেন ঐ সকল সময়ে তিনি নিজে উপস্থিত থাকিয়া সব কিছু দেখিয়াছিলেন।

রোমে স্বামীজী মিস্ এডওয়ার্ডস্ নামে একটি মহিলার বাড়ীতে মিস্ ম্যাকলাউডের ভাইঝি মিস্ এলবার্টা স্টার্জিসের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই দুইটি মহিলাই স্বামীজী ও তাঁহার শিক্ষার উৎসাহী ভক্ত হইয়া উঠেন। এবং রোমের অনেক স্থান দর্শনকালে তাহারা স্বামীজী ও তাহার সঙ্গী মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়ারের সহিত যোগদান করেন।

রোম হইতে ভ্রমণকারীগণ নেপ্‌ল্‌সে যান। তাঁহাদের জাহাজ নেপল্‌সে আসিতে তখনও কয়েকদিন বিলম্ব থাকায়, তাঁহারা এই শহরের দর্শনীয় স্থান ও (মিউজিয়াম প্রভৃতি) প্রতিষ্ঠান দেখিতে প্রবৃত্ত হন। এবং তখন তাঁহারা একদিন অদূরবর্তী ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরি ও অপর একদিন ঐ আগ্নেয়গিরির দ্বারা বিধ্বংসিত পম্‌পিয়াই (Pompeii) নগর দর্শন করিতে যান। পরিশেষে নির্দিষ্ট দিনে গুডউইনকে লইয়া তাহাদের জাহাজ নেপ্‌ল্‌সে পৌঁছিল। এবং ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে (১৮৯৬) তাহারা সকলে মিলিয়া ঐ জাহাজে ভারতে রওনা হইলেন।

নেপ্‌ল্‌স্ হইতে জাহাজ ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়া সুয়েজ খালের দিকে চলিল। এই সময়ে একদিন রাত্রে স্বামীজীর একটি আশ্চর্য স্বপ্ন দর্শন হইল। তিনি দেখিলেন, একটি বৃদ্ধ শ্মশ্রুধারী ঋষির ন্যায় পুরুষ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিতেছেন, "আমি যে জায়গাটা দেখাচ্ছি তা ভাল করে দেখ। তুমি এখন ক্রীট দ্বীপে। খ্রীষ্টধর্ম এখানেই প্রথম

প্রচারিত হয়।" তারপর তিনি বলিলেন, "যে সকল থেরপুত্তিরা (বৌদ্ধ থেরদিগের পুত্র, অর্থাৎ শিষ্য) এখানে বাস করতেন, আমি তাদেরই একজন। আমরা যে সকল সত্য ও আদর্শ প্রচার করতাম, তাই এখন খ্রীষ্টানগণ যীশুর প্রচারিত বলে প্রচার করছে। কিন্তু যীশু বলে কেউ কখনও জন্মগ্রহণ করেন নি। এ জায়গা খুঁড়লে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।" এই ঋষিকল্প পুরুষটি স্বামীজীর নিকট থেরপুত্তি ব্যতীত আরও একটি শব্দ উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামীজী পরে আর সেটি স্মরণ করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, নিদ্রাভঙ্গে তিনি ছুটিয়া ডেকে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে একজন জাহাজের অফিসারকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, তখন মধ্যরাত্রি এবং জাহাজ ক্রীট দ্বীপ হইতে মাত্র পঞ্চাশ মাইল দূরে অবস্থিত।

এই আশ্চর্য ঐক্যে স্বামীজী চমকিত হন। বিশেষ, এই স্বপ্নের পূর্বে তিনি যীশু খ্রীষ্টের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে কখন কোন সন্দেহ পোষণ করেন নাই। স্বপ্নটি স্বামীজীকে খুবই প্রভাবিত করে এবং উহার পর হইতে তিনি যীশু খ্রীষ্টের ঐতিহাসিক অস্তিত্বে আর আস্থা রাখিতে পারেন নাই। তাহা হইলেও দেখা যায়, ঐ স্বপ্নের পরেও তিনি খ্রীষ্ট ও তাঁহার কাল্পনিক জীবনের কাহিনী সকলের উপর পূর্বের ন্যায়ই অবিচল ভক্তিশ্রদ্ধা-সম্পন্ন ছিলেন। এবং একদিন একটি পাশ্চাত্য মহিলার প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "মহাশয়া, নেজারেথের যীশুর জীবনকালে আমি যদি প্যালেস্টাইনে থাকতাম, তা হ'লে আমি তাঁর পা আমার চোখের জলে নয়, আমার বুকের রক্ত দিয়ে ধুয়ে দিতাম।"

স্বামীজীর এইবারকার ভারতের পথের আর একটি উল্লেখযোগ্য কাহিনী এই। দুইজন খ্রীষ্টান মিশনারী তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন। তাহারা তাঁহার সহিত হিন্দু ও খ্রীষ্টান ধর্মের পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চাহেন। কিন্তু তাহাদের তর্ক করিবার ধরণ ছিল যারপরনাই আপত্তিকর। তারপর প্রত্যেক বিষয়েই স্বামীজীর নিকট পরাজিত হইয়া তাহারা ধৈর্যহারা হইলেন এবং উন্মত্তের ন্যায় যা-তা বলিয়া

হিন্দুদিগকে ও তাঁহাদের ধর্মকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করিলেন। স্বামীজী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া সহ্য করিলেন। তারপর তাহাদের একজনের নিকট অগ্রসর হইয়া তিনি দৃঢ়ভাবে তাহার গলাবন্ধ ধরিয়া বলিলেন, "তুমি যদি ফের আমার ধর্মকে গাল দাও, তা হলে আমি তোমাকে জাহাজ থেকে (সমুদ্রের ভিতর) ছুঁড়ে ফেলব।" ইহাতে মিশনারীটি ভয়ে কাঁপিতে আরম্ভ করিলেন এবং মিনতির স্বরে বলিলেন, "আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আর কখনও এমন কাজ করব না।" ইহার পর হইতে মিশনারীটি স্বামীজীর সম্মুখে বিশেষ নত হইয়া চলিতেন এবং তাহার পূর্বের দুর্ব্যবহার সংশোধনের জন্য অতি মিষ্ট আচরণের দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার প্রয়াস পাইতেন।

জাহাজ এডেন বন্দরে পৌঁছিলে স্বামীজী তাঁহার ইংরেজ শিষ্যগণসহ তীরে নামিয়া শহরের ভিতর বেড়াইতে গেলেন। তখন একস্থানে দূর হইতে একটি লোককে হুঁকায় তামাক খাইতে দেখিয়া তিনি দ্রুত তাহার নিকট গিয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন ও তাহার হুঁকাটি চাহিয়া লইয়া পরমানন্দে তামাক খাইতে লাগিলেন। দেখিয়া মিঃ সেভিয়ার রহস্যের সহিত বলিলেন, "এখন আমরা বুঝতে পারলাম আপনি কেন আমাদের ফেলে অত তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসেছিলেন।" স্বামীজী বহু বৎসর হুঁকায় তামাক খান নাই। আর ঐ লোকটিও ছিল ভারতের একজন হিন্দুস্থানী পান-বিক্রেতা। তাই, সে ও তাহার হুঁকাটি দুইই তাঁহাকে প্রচুর আনন্দ দান করে। কিন্তু লোকটি যখন জানিতে পারিল স্বামীজী কে, তখন সে তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িল।

অতঃপর জাহাজ ক্রমশঃ ভারতের নিকটবর্তী হইয়া, ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুআরি তারিখে কলম্বো বন্দরে প্রবেশ করিল। তখন ডেক হইতে স্বদেশের দিকে তাকাইয়া ও তাহার বায়ুজলের স্পর্শ অনুভব করিয়া স্বামীজী আনন্দে অধীর হইলেন।

চৌত্রিশ

প্রত্যাগমন ও জয়যাত্রা ঃ

সিংহল, দক্ষিণ ভারত ও বঙ্গদেশে

(১৫ই জানুআরি হইতে মার্চের ১ম ভাগ, ১৮৯৭)

স্বামীজীর ধারণা ছিল যে ভারতে পৌঁছিয়া তিনি নানাস্থানে প্রচুর সমাদর ও সংবর্ধনা লাভ করিবেন। কিন্তু তাহা যে ভারতের প্রত্যেকটি শহর, নগর ও গ্রামব্যাপী হইবে তাহা তিনি কল্পনায়ও অনুমান করিতে পারেন নাই। ইউরোপ হইতে তাঁহার রওনা হইবার সংবাদ ভারতে পৌঁছিলে, তাঁহাকে যথোচিতভাবে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কলম্বো হইতে মাদ্রাজ পর্যন্ত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানেই কমিটি গঠন ও নানা রকমের নানা ব্যবস্থা পরিকল্পিত হয়। কিন্তু স্বামীজীর যাত্রাপথের উভয়পার্শ্বস্থ গ্রাম ও ছোট ছোট নগরের সরল স্বতঃস্ফূর্ত সংবর্ধনা সকল যেন আরও উচ্ছ্বসিত আকারে প্রকাশ পায়। দেখিয়া স্বামীজী বুঝিতে পারেন তিনি দেশের মর্ম স্পর্শ করিতে পারিয়াছেন এবং তাঁহার এই যাত্রা সত্য সত্যই একটি জয়যাত্রা। ইহার বিবরণ সংক্ষেপতঃ এইরূপ।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুআরি সন্ধ্যাবেলায় স্বামীজী (তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য সমাগত) তাঁহার গুরুভাই স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও অপর কয়েকজনের সহিত একখানি স্টীম লঞ্চ্ হইতে কলম্বো বন্দরে অবতরণ করিলেন। এবং তখনই তাঁহাকে স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের এক প্রচণ্ড অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের সম্মুখীন হইতে হইল। চতুর্দিকে লোকে লোকারণ্য এবং উচ্চ জয়ধ্বনি, আনন্দ কোলাহল ও করতালি শব্দে দিক মুখরিত। ব্যবস্থানুসারে অনারেবল পি কুমারস্বামী ও তাহার ভ্রাতা অগ্রসর হইয়া স্বামীজীর গলায় মাল্যদান করিলেন। তারপর তাঁহাকে দুইটি তেজস্বী অশ্ব-বাহিত গাড়ীতে

করিয়া নির্দিষ্ট পথে এক বিরাট বিজয়-তোরণের মধ্য দিয়া একটি সুসজ্জিত প্যাণ্ডালের নিকট লওয়া হইল। সেখানে তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া বিস্তৃত সাদা বস্ত্রের উপর দিয়া বাদ্যধ্বনির মধ্যে হাঁটিয়া পতাকাদি-শোভিত এক বিরাট মিছিলে ঐ প্যাণ্ডালে প্রবেশ করিলেন ও অল্প পরে তথা হইতে (সিকি মাইল দূরবর্তী) আর একটি সুসজ্জিত প্যাণ্ডালে পৌঁছিলেন। সেখানে তিনি ও তাঁহার শিষ্যগণ পুষ্প-বৃষ্টির মধ্যে আসন গ্রহণ করিলে, অভ্যর্থনা সভার কার্য আরম্ভ হইল। সর্বপ্রথম একজন সুদক্ষ বাদ্যকার অতি মধুর সুরে বেহালা বাজাইলেন। তারপর একটি প্রাচীন তামিল ভজন ও স্বামীজীর সম্মানে রচিত একটি সংস্কৃত সঙ্গীত গীত হইলে, অনারেবল পি কুমার-স্বামী কলম্বোর হিন্দুদিগের পক্ষ হইতে স্বামীজীকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়া একটি মানপত্র পাঠ করিলেন। স্বামীজী বিপুল আনন্দ-ধ্বনির মাধ্য উঠিয়া উহার একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন এবং ঐ প্রথম সুযোগেই তিনি তাঁহার মনের একটি বড় কথাকে রূপ দিয়া বলিলেন, "এই বিপুল সংবর্ধনা অনুষ্ঠান কোন বড় রাজনীতিক, বা কোন বড় যোদ্ধা বা কোন ধনকুবেরের জন্যে হয় নি, শুধু একটি ভিখিরী সন্ন্যাসীর সম্মানার্থে করা হয়েছে। এবং তাতেই ধর্মের প্রতি হিন্দু মনের ঝোঁক সুস্পষ্ট। তাই, জাতিকে বাঁচতে হলে ধর্মকেই তার মেরুদণ্ড করতে হবে।"

এই সভার প্যাণ্ডালটি ছিল স্বামীজীর অস্থায়ী বাসের জন্য নির্মিত একটি বাংলোর সম্মুখে। তাই, অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান শেষ হইলে, তিনি সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। সেখানে তাঁহাকে পুনরায় মাল্যদান করা হইল। এবং তাঁহাকে আর একবার দেখিবার জন্য বাহিরে জনতা অপেক্ষা করিতে থাকায়, তিনি পুনরায় বাহিরে আসিয়া তাহাদের সকলকেই তাঁহার নমস্কার ও আশীর্বাদ জানাইলেন।

ইহার পরের কয়েকদিন স্বামীজীর (এই সময় হইতে 'বিবেকানন্দ লজ' নামে অভিহিত) বাংলোটিতে দর্শনপ্রার্থী লোকের ভিড় নিয়তই লাগিয়া রহিল। এবং উহার চাপের মধ্যেই ১৬ই জানুআরি সন্ধ্যায়

তিনি 'ফ্লোরাল হলে' একটি বক্তৃতা দেন। এই সভায় দারুণ ভিড় হয়; বক্তৃতার বিষয় ছিল "পুণ্যভূমি ভারত"। পরের দিন রবিবার সন্ধ্যাকালে তিনি একটি শিবমন্দির দর্শন করিতে যান। বহু লোক তাঁহার সঙ্গে যায় এবং পথে ঘন ঘন তাঁহার গাড়ী থামাইয়া তাঁহাকে মাল্যদান, ফলোপহার প্রদান ও তাঁহার গায়ে গোলাপজল সিঞ্চন করা হয়। স্থানীয় প্রথানুসারে পথিপার্শ্বের প্রতি গৃহদ্বারেই প্রজ্বলিত দ্বীপ ও ফল রক্ষিত ছিল। শিবমন্দিরে স্বামীজীকে "জয় মহাদেব" ধ্বনিতে অভ্যর্থনা করা হয়। সেখানে তিনি পূজা দিয়া ও পুরোহিতদের সহিত কিছু কথাবার্তা বলিয়া তাঁহার বাংলোতে ফিরিয়া আসেন ও তথায় রাত্রি দুইটা পর্যন্ত কয়েকটি ব্রাহ্মণের সহিত আলাপ করেন।

সোমবার স্বামীজী মিঃ চেল্লিয়ার বাড়ীতে যান। এই উপলক্ষে তাহার বাড়ী অতি সুন্দরভাবে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। এবং স্বামীজী আসিবেন সংবাদ পাইয়া হাজার হাজার লোক সেখানে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার গাড়ী নিকটবর্তী হইতেই তাহাদের সম্মিলিত কণ্ঠের তুমুল জয়ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত হইতে লাগিল এবং অজস্র পুষ্প ও পুষ্পমাল্য তাঁহার উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। স্বামীজী তাঁহার নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলে তাঁহার গায়ে গঙ্গার পবিত্র বারি ছিটাইয়া দেওয়া হইল এবং তিনি সকলকে পবিত্র যজ্ঞভস্ম বিতরণ করিলেন। সভায় শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি ছবি রক্ষিত হইয়াছে দেখিয়া তিনি উঠিয়া উহার সম্মুখে পরম ভক্তিভরে প্রণত হইলেন। পরে কয়েকটি ভজন গানের সহিত এই সুন্দর সভাটি শেষ হইল।

এই দিনই সন্ধ্যাকালে স্বামীজী কলম্বোর পাব্লিক হলে বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে আর একটি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাটি যারপরনাই প্রাঞ্জল ও চিত্তাকর্ষক হয়।

প্রথমে স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল যে, তিনি কলম্বো হইতে স্টীমারে সোজা মাদ্রাজ যাইবেন। কিন্তু সিংহলে পৌঁছিয়া তিনি সিংহল ও দক্ষিণ ভারতের শহরগুলিতে যাইবার জন্য এত টেলিগ্রাম পাইতে

লাগিলেন যে, তিনি পরিশেষে জলপথে না গিয়া স্থলপথে যাওয়াই স্থির করিলেন। তদনুসারে ১৯শে জানুআরি সকালবেলায় তিনি তাঁহার গুরুভাই ও ইংরেজ শিষ্যগণ সহ কলম্বো হইতে রেলগাড়ীর একখানা স্পেসাল সেলুনে কাণ্ডি গমণ করেন। সেখানে এক বিপুল জনতা ভারতীয় ব্যাণ্ড বাদ্য সহ তাঁহাকে রেল স্টেশন হইতে একটি বাংলোতে লইয়া যায়। তথায় তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া একটি মানপত্র পড়া হয় এবং তিনি সংক্ষেপে তাহার উত্তর দেন।

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা তিনি মাতালে পৌঁছেন। এবং পরের দিন সকালে (বুধবার, ২০শে জানুআরি) তিনি তথা হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে দুইশত মাইল দূরবর্তী জাফ্না অভিমুখে রওনা হন। পথে একস্থানে একটি ছোট পাহাড় হইতে নামিবার সময় গাড়ীর সম্মুখের দিকের একটি চাকা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, তাঁহারা সেখানে তিনঘণ্টাকাল অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। তৎপর একখানা গরুর গাড়ী পাইয়া তাহাতে মালপত্র সহ মিসেস্ সেভিয়ারকে উঠাইয়া দিয়া, অপর সকলে হাঁটিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইভাবে কয়েক মাইল পথ চলিবার পর, তাঁহারা আর কয়েকখানি গরুর গাড়ী পাইয়া তাহাতে উঠিয়া পড়িলেন। সেদিন রাত্রিটা তাহারা গরুর গাড়ীতেই কাটাইলেন এবং (কানাহারি ও তিনপানির মধ্য দিয়া) পরদিন প্রায় আট ঘণ্টা বিলম্বে বৌদ্ধপ্রধান অনুরাধাপুরে পৌঁছিলেন।

সেখানে (স্থানীয় হিন্দুদের সংবর্ধনার উত্তরে) তিনি পবিত্র বোধিদ্রুম তলে দুই-তিন হাজার লোকের সম্মুখে একটি বক্তৃতা দেন। তখন দোভাষীগণ সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উক্তিগুলি তামিল ও সিংহলী ভাষায় অনুবাদ করিয়া বলিতে থাকেন। এই বক্তৃতার বিষয় ছিল 'উপাসনা'। কিন্তু বক্তৃতাটি কিছুক্ষণ চলিবার পর, বৌদ্ধদের একটি ধর্মান্ধ জনতা স্বামীজীর চারিপার্শ্বে চাক, ঢোল, কানেস্তারা ইত্যাদি এমনভাবে পিটাইতে আরম্ভ করে যে তিনি তাঁহার বক্তৃতা হঠাৎ শেষ করিতে বাধ্য হন। এবং তৎসঙ্গে তিনি হিন্দুদের শান্ত থাকিতে অনুরোধ করিয়া বলেন, "ঈশ্বরকে শিব, বিষ্ণু, বুদ্ধ ইত্যাদি যে নামেই

উপাসনা কর না কেন, তিনি সর্বক্ষেত্রেই এক এবং সকল ধর্ম একই লক্ষ্যগামী। এই জন্য শুধু পরধর্ম সহিষ্ণুতাই নয়, বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি থাকাও প্রয়োজন।”

অনুরাধাপুর হইতে (একশত কুড়ি মাইল দূরবর্তী) জাফ্‌নার পথে বাবুনিয়া নামক স্থানে স্বামীজী বিশেষভাবে সংবর্ধিত হন এবং সেখানে তাঁহাকে একখানি মানপত্র দেওয়া হয়। তিনি সংক্ষেপে তাহার উত্তর দেন।

তারপর তাঁহারা সিংহলের সৌন্দর্যময় জঙ্গলের মধ্য দিয়া পুনরায় জাফ্‌নার পথে চলিতে আরম্ভ করেন। পরদিন ভোরবেলায় তাঁহারা (জাফ্‌নার সন্নিকটস্থ) এলিফ্যাণ্ট পাসে পৌঁছেন। সেখানে স্বামীজীকে (ঘরোয়াভাবে) অভ্যর্থনা করা হয়। তারপর ঐ স্থান হইতে একটি সেতুর উপর দিয়া তাঁহারা জাফ্‌না দ্বীপে প্রবেশ করেন। জাফ্‌নার এক শত সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় হিন্দু শহর হইতে বারো মাইল দূরবর্তী একটি স্থানে অগ্রসর হইয়া আসিয়া স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে একখানি ল্যান্‌ডতে উঠাইয়া এক বিরাট ঘোড়ার গাড়ীর মিছিলে জাফ্‌না শহরে লইয়া যান। তখন বেলা সাড়ে এগারোটা। সেদিন স্বামীজীর সম্মানে শহরের প্রতিটি রাস্তা ও প্রতিটি গৃহ সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। রাত্রি সাড়ে আটটার সময় বাদ্যাদি সহ মশাল আলোকের এক বিরাট মিছিলে তাঁহাকে (শহর হইতে দুই মাইল দূরবর্তী) হিন্দু কলেজের কম্পাউণ্ডে উত্তোলিত এক বিরাট প্যাণ্ডালে লইয়া যাওয়া হয়। এই দীর্ঘ পথটির দুই ধারে শত শত কলাগাছ পুঁতিয়া, উহা আলোকিত ও পত্র-পুষ্পের মাল্য ও পতাকার দ্বারা সুশোভিত করা হইয়াছিল। রাস্তার দুই পার্শ্বের প্রত্যেকটি বাড়ীর গেটও আলোকাদির দ্বারা সজ্জিত ছিল। মিছিলটিতে পনর হাজারের অধিক লোক যোগদান করে। পথে একস্থানে স্বামীজী গাড়ী হইতে নামিয়া দুইটি মন্দিরে পূজা দেন। এবং রাত্রি দশটার সময় তিমি প্যাণ্ডালে পৌঁছেন। তাহার কয়েক ঘণ্টা পূর্বেই প্যাণ্ডালটি এমনভাবে ভরিয়া গিয়াছিল যে, বহুলোক

উহার ভিতর প্রবেশ করিতে অসমর্থ হন। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, মুসলমান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকই এই সভায় যোগদান করেন। ট্রাভাঙ্কোরের অবসর-প্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মিঃ চেল্লাপ্পা পিল্লাই স্বামীজীকে গেট হইতে মঞ্চে লইয়া যান ও সেখানে তাঁহাকে মাল্যে ভূষিত করেন। তৎপর স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিয়া একটি মানপত্র পাঠ করা হয় এবং তাহার উত্তরে তিনি এক ঘণ্টাকালব্যাপী একটি বক্তৃতা দেন।

ইহার পরের দিন সন্ধ্যা সাতটার সময় স্বামীজী হিন্দু কলেজে চারি হাজার লোকের একটি সভায় বেদান্ত সম্বন্ধে (এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট ব্যাপী) আর একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। উহা শুনিয়া শ্রোতাগণ সকলেই যারপরনাই মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত বোধ করেন। পরে সভার অনুরোধে মিঃ সেভিয়ার তিনি কেন হিন্দু হইয়াছেন এবং কেন স্বামীজীর সহিত ভারতে আসিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কিছু বলেন।

জাফ্‌নার হিন্দু কলেজের এই বক্তৃতাটির সহিত স্বামীজীর সিংহল ভ্রমণ শেষ হয়। এই অল্প সময়েই এই দ্বীপের হিন্দুগণ তাঁহার দ্বারা এত প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত বোধ করিয়াছে যে, তাঁহার-ভ্রমণ পথের প্রত্যেক স্থানেই শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচারের জন্য তাঁহার সঙ্ঘের একটি লোক পাঠাইতে তাঁহাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হইয়াছে। আর যে সকল শহরে তিনি যাইতে পারেন নাই, সে সকল স্থানেও যাইবার জন্য বহু আমন্ত্রণ-পত্র ও টেলিগ্রাম তাঁহার নিকট আসিয়াছে, কিন্তু সময়াভাবে ঐ সকল আমন্ত্রণ তিনি অস্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আর তিনি ক্লান্তও ছিলেন। সিংহল-বাসীদের আদর-আপ্যায়ন সম্বন্ধে তাঁহার একজন সঙ্গী বলিয়াছেন, "স্বামীজী আর কিছুদিন সিংহলে থাকলে, তারা তাঁকে আদর-যত্নের দ্বারাই মেরে ফেলতো।"

২৬শে জানুআরি সকালবেলায় স্বামীজী তাঁহার সঙ্গীগণসহ জাফ্‌না হইতে স্টীমারে রওনা হইয়া বেলা ৩টার সময় (পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী)

পাম্বান রোডে পৌঁছেন। তাঁহার মন্ত্রশিষ্য রামনাদের রাজা (ভাস্কর সেতুপতি) পূর্বে তাঁহাকে রামেশ্বর আসিতে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু স্টীমার পাম্বান রোড ত্যাগ করিবার পূর্বেই রাজা স্বয়ং সেখানে আসিয়া তাঁহাকে স্টীমার হইতে তাঁহার স্টেটবোটে (রাজতরী) নামাইয়া লইলেন। স্বামীজী ঐ বোটে প্রবেশ করিবামাত্র রাজা ও তাঁহার কর্মচারীবৃন্দ তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। স্বামীজীর সহিত রাজার এই সাক্ষাৎ বিশেষ মর্মস্পর্শী হয় এবং তখন স্বামীজী আবেগের সহিত বলেন, "পাশ্চাত্য দেশে যেতে যারা আমাকে সর্বপ্রথম উৎসাহ দিয়েছেন ও সাহায্য করেছেন, রাজা তাদেরই একজন। সুতরাং ভারতবর্ষের মাটিতে আমি সর্বপ্রথম তার সঙ্গেই দেখা করবো ইহাই ঠিক।" বোটখানি তীরে লাগিলে পাম্বানবাসীগণ গগনভেদী জয়ধ্বনি তুলিয়া তাঁহাকে তাহাদের সংবর্ধনা জানাইল। পরে সেখানেই একটি সুসজ্জিত প্যাণ্ডালে তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়া একটি মানপত্র পাঠ করা হইল এবং রাজা নিজেও ব্যক্তিগতভাবে আবেগের সহিত তাঁহাকে তাহার ঐকান্তিক অভ্যর্থনা জানাইলেন। স্বামীজী তাঁহার সংক্ষেপ উত্তরে প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন, "রাজনীতি, সামরিক শক্তি, বাণিজ্য-প্রাধান্য বা যান্ত্রিক প্রতিভা ভারতের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড নয়। একমাত্র ধর্মই তার ঐ মেরুদণ্ড এবং উহা একমাত্র ভারতই জগতকে দিতে পারে।" পরিশেষে তিনি পাম্বানবাসীদের ধন্যবাদ দিয়া ও রাজাকে তাঁহার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া তাঁহার বক্তৃতা শেষ করিলেন।

সভা ভঙ্গ হইলে স্বামীজী রাজগাড়ীতে এবং রাজা ও তাহার কর্মচারীগণ হাঁটিয়া রাজবাংলো অভিমুখে রওনা হইলেন। পথে রাজার আদেশে স্বামীজীর গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া লওয়া হইল এবং রাজা ও তাহার প্রজাগণ একত্রে তাহা শহরের ভিতর দিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন।

স্বামীজী তিনদিন পাম্বানে ছিলেন। দ্বিতীয় দিন তিনি রাজ-গাড়ীতে রামেশ্বর শিবের বিরাট মন্দির দর্শনে যান। পাঁচ বৎসর

পূর্বে তিনি যখন এখানে আসিয়াছিলেন তখন তিনি ক্লান্ত, ক্ষতপদ ও অজ্ঞাত-অখ্যাত সন্ন্যাসী। কিন্তু এখন অবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। তাঁহার গাড়ী মন্দিরের নিকটবর্তী হইতেই, বাদ্য, মন্দির-পতাকা এবং বহু হাতী, ঘোড়া ও উট সহ একটি বিরাট মিছিল আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। সেদিন (পূজান্তে) স্বামীজী ও তাঁহার শিষ্যগণকে ঐ বিরাট মন্দিরের অদ্ভুত স্থাপত্য কার্য ও উহার সঞ্চিত মণি-রত্ন সকল দেখানো হইল। তৎপর সমবেত জনগণকে কিছু বলিবার জন্য স্বামীজী অনুরুদ্ধ হইলে, তিনি ঐ শিব মন্দিরের পবিত্র ভূমিতে দাঁড়াইয়া 'প্রকৃত উপাসনা' সম্বন্ধে একটি উদ্দীপনাময় বক্তৃতা দিলেন এবং তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন, "সকল উপাসনারই সার কথা হচ্ছে পবিত্র হওয়া ও অপরের কল্যাণ সাধন করা। যে শিবকে শুধু প্রতীকের মধ্যে নয়, দরিদ্র, দুর্বল ও পীড়িতদের মধ্যেও দেখতে পায় সেই তাঁর প্রকৃত উপাসনা করে।" রামনাদের রাজা তাঁহার এই বক্তৃতা শুনিয়া এত প্রভাবিত হইয়াছিলেন যে, পরের দিনই তিনি হাজার হাজার দরিদ্রকে আহার করান ও বস্ত্র দান করেন। ইহা ব্যতীত, পাম্বানের যে স্থানে স্বামীজী তাঁহার ইংরেজ শিষ্যগণ সহ স্টীমার হইতে নামিয়া প্রথম ভারতভূমি স্পর্শ করিয়াছিলেন, রাজা সেখানে চল্লিশ ফুট উঁচু একটি স্মৃতিস্তম্ভ তুলিয়া তাহার গায়ে ঐ সংবাদ ক্ষোদিত করাইয়া দেন।

পাম্বান হইতে স্বামীজী ও তাঁহার শিষ্যগণ রামনাদের রাজার সহিত ২৯শে (বা ৩০শে) জানুআরি সকালবেলায় ভারতের মূল ভূভাগে পৌঁছেন। এবং প্রাতরাশের পরে তাঁহারা সমুদ্র-তীর হইতে গরুর গাড়ীতে রামনাদ অভিমুখে রওনা হন। পথে তিরুপ্পুল্লানিতে স্বামীজীকে ঘরোয়াভাবে অভ্যর্থনা করা হয়। সন্ধ্যাকালে রামনাদের সন্নিকটে আসিয়া তাঁহারা সকলে গরুর গাড়ী হইতে নামিয়া, স্টেট্-বোটে একটি হ্রদের ন্যায় বিশাল দীঘির অপর তীরে পৌঁছেন। সেখানে সহস্র সহস্র লোক স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য তীরে অপেক্ষা করিতেছিল। এই অভ্যর্থনায় রাজা প্রধান অংশ গ্রহণ

করেন এবং স্বামীজীকে রামনাদ শহরের প্রধান নাগরিকদের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন।

স্বামীজী ঐ স্থানে পৌঁছিলে একটি কামান ধ্বনির দ্বারা তাহা সকলকে জানাইয়া দেওয়া হইল। এবং তিনি তীরে অবতরণ করিতেই তাঁহার অভ্যর্থনায় উচ্চধ্বনিতে বিলিতি ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল ও অসংখ্য হাউইবাজি আকাশ রাঙা করিয়া তুলিল। তারপর তাঁহাকে একখানি স্টেটগাড়ীতে তুলিয়া, দেশী-বিলাতি বাদ্য-সহ এক বিরাট শোভাযাত্রায় তাঁহাকে লইয়া সকলে রামনাদ শহরে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে রাজার দেহরক্ষীগণ তাঁহার ভ্রাতার নেতৃত্বে স্বামীজীর গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন এবং রাজা নিজে পায়ে হাঁটিয়া শোভাযাত্রা পরিচালনায় নিযুক্ত হইলেন। তখন রাস্তার উভয় পার্শ্বে অসংখ্য মশাল জ্বলিয়া উঠিল এবং স্বামীজীর (দীঘিতটে অবতরণ কালের ন্যায়) শহরে প্রবেশকালেও বিলিতি ব্যাণ্ডে বিজয়ী বীরের অভ্যর্থনা-সঙ্গীত বাজিতে লাগিল। এইভাবে অর্ধপথ অতিক্রান্ত হইলে, স্বামীজী রাজার অনুরোধে গাড়ী হইতে নামিয়া একখানি অতি সুন্দর রাজপালকিতে উঠিলেন।

সেইদিন রাত্রেই রাজপ্রাসাদে সহস্র সহস্র লোকের সম্মুখে স্বামীজীকে রামনাদবাসীদিগের পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা ও অভিনন্দিত করা হইল। স্বামীজী সভা-হলে প্রবেশ করিতেই, বিপুল জয়ধ্বনিতে ঘর ভরিয়া গেল। রাজা একটি বক্তৃতার দ্বারা সভার উদ্বোধন করিয়া তাঁহার ভ্রাতা রাজা দিনকর সেতুপতিকে মানপত্র পাঠ করিতে আহ্বান করিলেন। এবং তাহা পঠিত হইলে, একটি কারুকার্য-খচিত বহুমূল্য ভারী সোনার আধারে উহা স্বামীজীকে উপহার দেওয়া হইল। উত্তরে স্বামীজী অপূর্ব বাগ্মিতার সহিত যে প্রাণ-মাতানো বক্তৃতা দিলেন তাহার সর্বময় বার্তা ছিল—নব ভারতের উত্থান। তাহাতে তিনি তারস্বরে বলেন, "ভারত জাগিতেছে, সে আর ঘুমাইবে না। কেউ আর তাহাকে দাবাইয়াও রাখিতে পারিবে না। ভবিষ্যৎ ভারত তাহার অতীতের সকল মহিমা অতিক্রম করিয়া আরও মহান ও

গৌরবোজ্জ্বল হইবে।" সভাভঙ্গের পূর্বে রাজা ঘোষণা করিলেন, জনসাধারণের মধ্য হইতে "মাদ্রাজ দুর্ভিক্ষ রিলিফ ফাণ্ডের" জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিয়া স্বামীজীর রামনাদ আগমনের স্মৃতি রক্ষা করা হইবে।

রামনাদ অবস্থানকালে স্বামীজী বহু সাক্ষাৎকামীদের সহিত দেখা করেন, ক্রিশ্চিয়ান মিশনারী স্কুলবাড়ীতে একটি বক্তৃতা দেন এবং তাঁহার সম্মানে অনুষ্ঠিত একটি রাজদরবারে উপস্থিত থাকেন। এই দরবারে স্বামীজীকে তামিল ও সংস্কৃত ভাষায় আর দুইটি মানপত্র দেওয়া হয়। উহার উত্তরে তিনি যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে তিনি রাজার গুণাবলীর জন্য তাহাকে 'রাজর্ষি' উপাধি দান করেন। পরে রাজার অনুরোধে তিনি ফোনোগ্রাফ রেকর্ডের জন্য "ভারতে শক্তি-পূজার প্রয়োজনীয়তা" সম্বন্ধে আর একটি ছোট বক্তৃতা দেন।

রামনাদ হইতে স্বামীজী রাজগাড়ীতে পরপর পরমকুডি, মনমাদুরা ও মাদুরায় যান। ইহার প্রথম দুইটি স্থানে তিনি সহস্র সহস্র লোকের জনতা-কর্তৃক বিপুলভাবে সংবর্ধিত হন এবং তাহারা তাঁহাকে এক বিরাট মিছিলে অভ্যর্থনাস্থানে লইয়া গিয়া মানপত্র দান করে। এই দুইটি মানপত্রেরই স্বামীজী সংক্ষিপ্ত উত্তর দেন। মনমাদুরায় তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য এক বিপুল আয়তনের প্যাণ্ডাল উত্তোলিত হইয়াছিল। এবং সেখানকার মানপত্র মনমাদুরা ও শিবগঙ্গা শহরের জনগণের পক্ষ হইতে মিলিতভাবে দেওয়া হয়। মাদুরায় পৌঁছিয়া স্বামীজী রামনাদের রাজার মনোরম বাংলোতে তাহারই অতিথি হইয়া বিশ্রাম গ্রহণ করেন। বৈকালে মাদুরা কলেজে তাঁহার অভ্যর্থনায় একটি সভা হয়। ঐ সভায় মাদুরার অধিবাসীগণের পক্ষ হইতে একটি ভেলভেট আধারে তাঁহাকে একখানি মানপত্র দেওয়া হয় এবং তাহার উত্তরে তিনি অগ্নিময় ভাষায় একটি প্রাণমাতানো বক্তৃতা করেন। মাদুরায় স্বামীজী মীনাক্ষীর বিরাট সুবিখ্যাত মন্দির দর্শন করেন। এবং তাঁহার গুরুভাই স্বামী শিবানন্দ (স্বামীজীর কতিপয় ত্যাগী শিষ্যসহ) এখানে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন।

মাদুরা হইতে স্বামীজী ট্রেনে কুম্ভকোণম্ রওনা হন। পথে যে

সকল স্টেশনে গাড়ী থামিবার কথা, তাহার প্রত্যেক স্টেশনেই বহুলোকের জনতা সকল তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে। এমন কি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম সকল হইতেও অনেক লোক এই অভ্যর্থনায় যোগ দিতে আসে। এবং প্রত্যেক স্টেশনেই তাঁহাকে মাল্য ও মানপত্র দান করা হয়। স্বামীজী তাহাদের ঐ সকল মানপত্রের প্রত্যেকটিরই সংক্ষিপ্ত উত্তর দেন এবং দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, সময়াভাবে তাহাদের অনুরোধানুসারে প্রত্যেক স্থানেই এক দিন করিয়া অপেক্ষা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। ত্রিচিনোপলিতে রাত্রি চারিটার সময় প্রায় এক হাজার লোক স্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে একটি মানপত্র প্রদান করে। তাহা ছাড়া, ঐ স্থানের জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের কার্য-পরিষদ ও সমস্ত ছাত্র-সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে আরও দুইটি পৃথক মানপত্র তাঁহাকে দেওয়া হয়। স্বামীজী এই তিনটি মানপত্রেরই সংক্ষেপে ও পৃথকভাবে উত্তর দেন। ইহার পর, তাঞ্জোর স্টেশনের সংবর্ধনাও এইরূপ বড় রকমের হয়।

কুম্ভকোণমে পৌঁছিয়া স্বামীজী বিপুলভাবে অভ্যর্থিত হন। এখানে তিনি তিন দিন বিশ্রাম করেন। এবং তখন হিন্দু জনসাধারণ ও হিন্দু ছাত্রদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে দুইটি পৃথক মানপত্র দেওয়া হয়। উত্তরে স্বামীজী 'বেদান্তের মিশন' সম্বন্ধে তাঁহার একটি দীর্ঘ ও বিখ্যাত বক্তৃতা দেন।

কুম্ভকোণম হইতে মাদ্রাজ যাইবার পথেও স্বামীজী পূর্বের ন্যায় প্রত্যেক স্টেশনেই সমভাবে অভ্যর্থনা পাইতে থাকেন। ইহার মধ্যে মায়াবরম স্টেশনের জনসমাবেশ সর্বাপেক্ষা অধিক ও বিপুল ধরনের হয়। এবং মিঃ ডি, এন আয়ারের নেতৃত্বে একটি (অভ্যর্থনা) কমিটি তাঁহাকে একটি মানপত্র উপহার দেন ও স্বামীজী তাহার সংক্ষিপ্ত উত্তর দেন। গাড়ী স্টেশন ত্যাগ করিবার সময় "জয় স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজজীকী জয়" ধ্বনিতে আকাশ কম্পিত হইতে থাকে।

গাড়ী মাদ্রাজ হইতে কয়েক মাইল দূরে থাকিতে একটি ক্ষুদ্র স্টেশনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। গাড়ীখানা এই স্টেশনে

থামিবার কোন কথা ছিল না। কিন্তু স্বামীজীকে দর্শন করিবার নিমিত্ত বহু লোক সেখানে জড় হইয়া স্টেশন-মাস্টারকে উহা কয়েক মিনিটের জন্য থামাইতে অনুরোধ করিল। স্টেশন-মাস্টার তাহাতে অস্বীকৃত হওয়ায়, গাড়ী আসিবার সময়ে শত শত লোক সটান হইয়া রেল লাইনের উপর শুইয়া পড়িল। দেখিয়া স্টেশন-মাস্টার শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন এবং গাড়ীর গার্ড অবস্থা বুঝিতে পারিয়া গাড়ী থামাইয়া দিলেন। তখন তাহারা সকলে ছুটিয়া স্বামীজীর গাড়ীর সম্মুখে গিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল ও তাঁহার জয়ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিল। এই মর্মস্পর্শী ঘটনাটিতে স্বামীজী বিচলিত হইলেন এবং কয়েক মিনিটের জন্য জনতার সম্মুখে আসিয়া স্নেহের সঙ্গে হাত তুলিয়া তাহাদের আশীর্বাদ করিলেন ও সংক্ষেপে তাহাদিগকে তাঁহার অন্তরের ধন্যবাদ জানাইলেন।

মাদ্রাজে স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিবার আয়োজন-উত্তেজনা তিনি সেখানে পৌঁছিবার কয়েক সপ্তাহ পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছিল। বিরাট—অদৃষ্টপূর্ব আয়োজন। শহরের বড় বড় সমস্ত রাস্তাগুলিকে সুসজ্জিত করিয়া তাহার উপর মোট সতরটি বিরাট বিজয়-তোরণ উত্তোলিত করা হয়। এবং উহার গায়ে গায়ে অভ্যর্থনা ও সংবর্ধনা-সূচক বাণী সকল লিখিত হয়, যথা "Long Live the Venerable Vivekananda," "Welcome, Prince of Men," "Hail, Harbinger of Peace," "Hearty Greetings of Awakened India," ইত্যাদি। এইভাবে লিখিত সংস্কৃত শ্লোকের মধ্যে একটি ছিল "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।" আর প্রত্যেকের মুখে তাঁহার নাম। স্কুল, কলেজ, হাইকোর্ট, রাস্তা, বাজার—সর্বত্রই লোকের মুখে প্রশ্ন "স্বামী বিবেকানন্দ কবে আসিতেছেন?" এবং শহরের সংবাদপত্রগুলিতেও তাঁহার সম্বন্ধীয় সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রচুর পরিমাণে বাহির হইতেছিল।

৬ই ফেব্রুআরি সকাল সাড়ে সাতটার সময় স্বামীজী মাদ্রাজ স্টেশনে পৌঁছিলেন। কিন্তু তাহার বহু পূর্বে শেষ রাত্রি হইতেই

হাজার হাজার লোক—বালক, বৃদ্ধ, ছাত্র, শিক্ষক, উকীল, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সর্বশ্রেণীর হিন্দুগণ এবং অনেক নারীও—ফুল, মাল্য ও পতাকা হস্তে রেল স্টেশনের দিকে ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অত্যধিক ভিড়ের দরুণ প্লাটফর্মে প্রবেশ টিকিটের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হইল। সমস্ত প্লাটফর্মটি লোকে ভরিয়া গেল এবং সেখানে উপস্থিত ব্যক্তি-দিগের মধ্যে অনারেব্‌ল বিচারপতি শ্রীসুব্রহ্মণ্য আয়ার প্রভৃতি মাদ্রাজের প্রায় সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণই ছিলেন। গাড়ী স্টেশনে থামিতেই সমবেত জনতা বিপুল জয়ধ্বনি ও করতালিশব্দে স্বামীজীকে তাহাদের সংবর্ধনা জানাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি ভারতীয় ব্যাণ্ডপার্টি একটি আনন্দসূচক বাজনা বাজাইতে আরম্ভ করিল। স্বামীজী গাড়ী হইতে নামিলে, অভ্যর্থনা কমিটির সভ্যগণ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন তাঁহার গুরুভাই স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ এবং তাঁহার ইংরেজ শিষ্য মিঃ জে জে গুডউইন। মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়ার পূর্বদিন (কলম্বোর বৌদ্ধ ও স্বামীজীর ভক্ত) মিঃ ও মিসেস হ্যারিসনের সহিত মাদ্রাজ আসিয়াছিলেন।

গাড়ী হইতে অবতরণকালে স্বামীজীর একটা প্রাথমিক সংবর্ধনার জন্য প্লাটফর্মটি পত্র, পুষ্প ও পতাকার দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া উহার মেঝের উপর লাল বস্ত্র বিস্তৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এবং উহার এক পার্শ্বে একটি মঞ্চ ও উহা হইতে বাহির হইবার পথের সম্মুখে একটি বিরাট বিজয়-তোরণ নির্মিত করা হইয়াছিল। ঐ তোরণের উপর লেখা ছিল—"Welcome to the Swami Vivekananda"। স্বামীজীকে মঞ্চের উপর লওয়া হইলে, সেখানে মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়ারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তারপর একটি শোভাযাত্রা বাদ্য ও জয়ধ্বনির মধ্যে তাঁহাকে লইয়া প্ল্যাটফর্মের উপর দিয়া উক্ত তোরণের সম্মুখে আসিল। সেখানে তাঁহাকে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া হইলে, একটি অতি সুমিষ্ট বাদ্যধ্বনির সহিত তাঁহাকে মাল্যদান করা হইল। তখন

অনারেবল বিচারপতি শ্রীসুব্রহ্মণ্য আয়ার স্বামীজী ও তাঁহার গুরুভাইদের লইয়া একখানা গাড়ীতে উঠিয়া বহু সহস্র লোকের এক সুদীর্ঘ মিছিলে (এটর্নি মিঃ বিলিগিরি আয়াঙ্গারের বিরাট প্রাসাদোপম বাড়ী) "ক্যাস্‌ল্ কার্নান" অভিমুখে রওনা হইলেন। স্বামীজীর মাদ্রাজ অবস্থানকালে এই বাড়ীতে তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। মিছিল চলার সঙ্গে সঙ্গে ভিড় ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর হইতে লাগিল। এবং স্বামীজীর গাড়ী ঘন ঘন থামাইয়া লোকদের (স্থানীয় প্রথানুসারে) তাঁহাকে ফল, নারিকেল ও কর্পূর উপহার দিবার সুযোগ দিতে হইতেছিল। ইহা ব্যতীত, তাঁহার গাড়ীর উপর পুষ্প বৃষ্টি অবিশ্রান্তভাবেই চলিতেছিল।

এইভাবে ধীরে ধীরে চলিয়া স্বামীজী একস্থানে গাড়ী হইতে নামিয়া (সিটি স্টেব্‌ল্‌সের বিপরীত দিকে অবস্থিত) একটি খোলা প্যাণ্ডালে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন ও সেখানে তাঁহাকে মাল্য ও কয়েকটি মানপত্র দান করা হইল। তৎপর মিছিল পুনরায় অগ্রসর হইতে থাকিলে, ছাত্রগণ এক অবসরে তাঁহার গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া নিজেরাই টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। পরিশেষে বেলা সাড়ে নয়টার সময় গাড়ী একটি বিরাট বিজয়-তোরণের মধ্য দিয়া ক্যাস্‌ল্ কার্নানে প্রবেশ করিল। তখন সেখানে বাড়ীর মেয়েরা স্বামীজীকে ধূপ, দীপ ও পুষ্প দ্বারা আরতি করিয়া গ্রহণ করিলেন। পরে হাইকোর্টের উকীল শ্রীকৃষ্ণমাচারিয়ার "মাদ্রাজ বিদ্বানমনোরঞ্জিনী সভার" পক্ষ হইতে সংস্কৃত ভাষায় রচিত একটি মানপত্র পাঠ করিলেন। তৎপর ক্যানারিজ ভাষায় স্বামীজীকে আরও একটি মানপত্র দেওয়া হইল। পরিশেষে বিচারপতি শ্রীসুব্রহ্মণ্য আয়ার তাঁহাকে (পথশ্রান্তির পর) বিশ্রাম করিবার সুযোগ দিবার জন্য সকলকে চলিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে সকলে বিদায় হইলে, স্বামীজীকে ক্যাস্‌ল্ কার্নানের দ্বিতলে একটি জমকালো-ভাবে সজ্জিত সুবৃহৎ ঘরে থাকিতে দেওয়া হইল।

এই সকল বিবরণ দিয়া মাদ্রাজের একটি প্রধান সংবাদপত্র লিখেন "শোভাযাত্রার পথে পথে গাড়ী থামিলে স্বামীজী যে অভ্যর্থনা পান তাহা রাজ-অভ্যর্থনার চাইতে কম নয়।" "শহরের প্রথম কাল হইতে মাদ্রাজ কখন কোন ইউরোপীয় বা ভারতীয় ব্যক্তির জন্য এইরূপ উৎসাহ-উদ্দীপনাময় অভ্যর্থনা দেখে নাই। মাদ্রাজে এই পর্যন্ত যত সরকারী অভ্যর্থনা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার কোনটিই স্বামী বিবেকানন্দের অভ্যর্থনার সমতুল্য হইতে পারে নাই।"

যাহা হউক, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে স্বামীজীকে মানপত্র দিবার ও তাঁহার বক্তৃতা প্রদানের একটি প্রোগ্রাম অবিলম্বে প্রস্তুত করা হইল। তাহাতে স্থির হইল, তিনি তাঁহার প্রথম বক্তৃতা দিবেন মাদ্রাজের হিন্দু অধিবাসীগণের মানপত্রের উত্তরে। এবং তারপর তিনি নিম্নলিখিত বিষয়ে পর পর আর চারিটি বক্তৃতা দিবেন ঃ

(১) আমার যুদ্ধনীতি (৯ই ফেব্রুআরি) ;
(২) ভারতের মহাপুরুষগণ (১১ই ফেব্রুআরি) ;
(৩) ভারতীয় জীবনে বেদান্তের প্রয়োগ (১৩ই ফেব্রুআরি) ;
(৪) ভারতের ভবিষ্যৎ (১৪ই ফেব্রুআরি)।

স্বামীজী এই প্রোগ্রাম অনুমোদন করেন। তৎসঙ্গে তিনি ত্রিপ্লিকেন সাহিত্য সোসাইটিতে "আমাদের বর্তমান কর্তব্য" সম্বন্ধে আর একটি বক্তৃতা দিতে সম্মত হন। ইহা ব্যতীত জানা যায়, তিনি 'ক্যাস্‌ল্‌ কার্নানে' দুইদিন সকালবেলা আসরে বসিয়া জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের প্রশ্নের উত্তর দেন, একদিন একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের (চেন্নাপুরী অন্নদান সমাজম্‌) বাৎসরিক সভায় সভাপতিত্ব করেন ও 'দান' সম্বন্ধে একটি ছোট বক্তৃতা দেন এবং অপর একদিন "মাদ্রাজ সমাজ-সংস্কার" এ্যাসোসিয়েসনের বাড়ী পরিদর্শন করেন।

দেখা যায়, স্বামীজী মাদ্রাজে (৬ই ফেব্রুআরি হইতে ১৪ই ফেব্রুআরি পর্যন্ত) মোট নয়দিন ছিলেন। ঐ সময়ে ইংরেজি, সংস্কৃত, তামিল ও তেলেগু ভাষায় মোট চব্বিশটি মানপত্র তাঁহাকে দেওয়া হয়। তন্মধ্যে উপরি-কথিত প্রোগ্রাম অনুসারে তাঁহার মাদ্রাজ

আসার তৃতীয় দিন (৮ই ফেব্রুআরি) ভিক্টোরিয়া হলে তাঁহাকে মাদ্রাজের হিন্দু অধিবাসীগণের পক্ষ হইতে একটি ও খেতড়ির মহারাজা কর্তৃক প্রেরিত তাহার নিজ পক্ষের একটি, মোট দুইটি মানপত্র দেওয়া হয়। এই সভার সভাপতিত্ব করেন স্যার ভি ভাস্যম্ আয়াঙ্গার ও মানপত্র পাঠ করেন মিঃ পার্থসারথি আয়াঙ্গার। কিন্তু সভা আরম্ভ হইবার পূর্বেই হলটি এমনভাবে ভরিয়া গিয়াছিল যে, উহাতে আর তিল ধারণের জায়গা ছিল না। তাই, বাহির হইতে এক বিপুল জনতা অনবরত চীৎকার করিয়া বলিতেছিল, 'খোলা জায়গায় সভা করা হউক' এবং উহাতে সভার কার্যে বাধা পড়িতেছিল। এই অবস্থায় অত লোককে নিরাশ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া স্বামীজী বাহিরে আসিয়া জনতার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। কিন্তু তখন এমন ভীষণ জয়ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল যে, তাঁহার কথা আর শোনা গেল না। তখন তিনি বাধ্য হইয়া একখানি গাড়ীর উপর হইতে (তাঁহার রহস্যপূর্ণ ভাষায়) "গীতা-ফ্যাসানে" বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু অল্প কিছুক্ষণ বলার পরেই গোলমাল এত অধিক হইতে লাগিল যে, তিনি উপস্থিত লোকদিগকে তাহাদের উৎসাহের জন্য ধন্যবাদ দিয়া ও ঐ উৎসাহ স্থায়ী করিবার উপদেশ দিয়া বলিলেন "এই সভার কার্য আর চালানো অসম্ভব হয়েছে। এখন বিদায়। আমার এই বক্তৃতা আমি পরে কোন উপলক্ষে দিব।" ইহার পর তিনি পূর্বোক্ত প্রোগ্রাম অনুসারে আর চারিটি বক্তৃতা দেন নির্ধারিত ৯ই, ১১ই, ১৩ই ও ১৫ই ফেব্রুআরি তারিখে।

স্বামীজীর মাদ্রাজ অবস্থানকালের আর কয়েকটি অতিরিক্ত সংবাদ অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ার[১] দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, স্বামীজী মাদ্রাজ আসার অল্প পরে তিনি একদিন তাঁহার ভক্তগণের অনুরোধে জয়দেবের একটি গান গাহিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন, প্রতিদিন বহু পুরুষ ও নারী দর্শনপ্রার্থী নিয়ত আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ

১। আমরা দেখিয়াছি, পরিব্রাজকরূপে ভারত ভ্রমণকালে স্বামীজী ত্রিবান্দ্রামে ইহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

করিয়াছেন এবং বিশেষভাবে সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাগণ যেন কোন দেবমন্দিরে আসিতেছেন এইভাবে আসিতেন ও ভূমিতে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিতেন। ইহা ব্যতীত, ক্যাস্‌ল্‌ কার্নানে লোকের ভিড় সর্বদাই লাগিয়া থাকিত এবং কোন কারণে স্বামীজী বাহিরে আসিলে তাহারা দল বাঁধিয়া সটান মাটিতে পড়িয়া তাঁহাকে তাহাদের প্রণতি জানাইতেন। এই সকল নারী-পুরুষের অনেকেই বিশ্বাস করিতেন স্বামীজী (সম্বন্ধস্বামী বা) শিবের অবতার।

পরিশেষে ইহা লক্ষণীয়, মাদ্রাজে স্বামীজী যে সকল বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতেই তিনি সর্বপ্রথম ভারতের প্রতি তাঁহার বাণীকে একটি সজ্জিত রূপ দান করিয়াছেন। আর তাহার মধ্যেই রহিয়াছে জ্বলন্ত ভাষায় অঙ্কিত ভারতবর্ষের আদর্শ ও জীবনোদ্দেশ্যের সুনির্দিষ্ট পরিচয় ও তাহার জাতীয় জীবনের ভবিষ্যৎ কল্যাণ, অভ্যুদয় ও কর্তব্য সাধনের পথ-নির্দেশ। এই অমূল্য বক্তৃতাগুলি তাঁহার "Lectures from Colombo to Almora" (বাংলা "ভারতে বিবেকানন্দ") নামক পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

দেখা যায়, মাদ্রাজ অবস্থানকালে স্বামীজী আমেরিকা হইতেও তিনখানা সংবর্ধনা পত্র পান। ইহার প্রথমখানা ডাঃ জেন্‌স্‌, অধ্যাপক রাইট, অধ্যাপক জেম্‌স্‌, অধ্যাপক রয়স্‌ প্রভৃতি আমেরিকার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর দ্বারা স্বাক্ষরিত। দ্বিতীয়খানা ব্রুকলিন এথিক্যাল এ্যাসোসিয়েসনের লিখিত। তৃতীয় খানা স্বামীজীর ডেট্রয়েট শহরের বেয়াল্লিশ জন বিশেষ বন্ধুর প্রেরিত। এই তিনখানা পত্রের দ্বিতীয়খানা মাদ্রাজে ছাপাইয়া জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত হয়।

১৫ই ফেব্রুআরি তারিখে স্বামীজী তাঁহার সঙ্গীগণ সহ মাদ্রাজ হইতে স্টীমারে কলিকাতা রওনা হন। তৎপূর্বে শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলক তাঁহাকে পুণা যাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামীজী এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার পক্ষে ঐ আমন্ত্রণ গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। তিনি জাহাজে উঠিবার পূর্বে আর্য-বৈশ্য জাতীয় কতিপয় ব্যবসায়ী সমুদ্রতীরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া

তাঁহাকে আনুষ্ঠানিকভাবে একখানি মানপত্র দেন। অনারেবল মিঃ সুব্বা রাউ তাহাদের পক্ষ হইতে স্বামীজীকে ঐ মানপত্র প্রদান করেন।

স্বামীজীর জন্মভূমি বাংলায় তাঁহাকে যথাযোগ্যভাবে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দ্বারভাঙ্গার মহারাজাকে সভাপতি করিয়া একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করা হইয়াছিল। এবং ঐ সমিতি ঐ কার্যের জন্য আবশ্যকীয় সকল ব্যবস্থাই যথাসময়ে করিয়া রাখিয়াছিলেন।

২০শে ফেব্রুআরি তারিখে স্বামীজীর স্টীমার খিদিরপুরে পৌঁছিল। সেখানে একখানা স্পেশাল ট্রেন তাঁহাকে পরদিন সকালে শিয়ালদহ স্টেশনে লইয়া যাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তদনুসারে পরের দিন সকাল সাড়ে সাতটার সময় স্বামীজী তাঁহার সঙ্গীগণ সহ ঐ গাড়ীতে উঠিলেন। এই সময়ে কয়েক দিনের বিশ্রাম ও সমুদ্র ভ্রমণের ফলে তাঁহার শরীর অনেকটা ভাল হইয়াছিল।

গাড়ী পৌঁছিবার অনেক পূর্ব হইতেই শিয়ালদহ ষ্টেশন লোকে লোকারণ্য। শেষ রাত্রি হইতে হাজার হাজার লোক সেখানে আসিয়া জড় হইতেছিল। গাড়ী হুইসিল দিয়া স্টেশনের নিকট আসিতেই তাহাদের সম্মিলিত কণ্ঠে এক বিপুল জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। গাড়ী থামিলে স্বামীজী উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত জোড় করিয়া জনতাকে তাঁহার নমস্কার জানাইলেন। তৎপর তিনি গাড়ী হইতে নামিতেই তাঁহার পদধূলি লইবার জন্য সামনের লোকদের মধ্যে একটা হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। তখন অভ্যর্থনা সমিতির নরেন্দ্রনাথ সেন-প্রমুখ সভ্যগণ বহু কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া স্বামীজী এবং মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়ারকে তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট গাড়ীর নিকট লইয়া গেলেন। তখন জনগণের নিকট হইতে স্বামীজীর গলায় অতি সুন্দর ও সুগন্ধি ফুলের অপর্যাপ্ত মালা পড়িতে লাগিল। তাহাদের উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিয়া স্বামীজীর চোখে জল দেখা দিল।

এই দিন স্বামীজীর কয়েকজন সন্ন্যাসী গুরুভাইও স্টেশনে ভিড়ের

মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তখন তাহাদের সহিত তাঁহার মিলন সম্ভব হয় নাই। স্বামীজী মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়ারকে লইয়া তাঁহার ল্যান্ডতে উঠিতেই ছাত্রগণ উহার ঘোড়া খুলিয়া দিয়া নিজেরাই তাহা টানিয়া লইতে নিযুক্ত হইল। তখন এক বিরাট শোভাযাত্রা তাঁহাকে রিপন কলেজ অভিমুখে লইয়া চলিল। এই শোভাযাত্রার সম্মুখভাগে একটি ব্যাণ্ড পার্টি বাজনা বাজাইয়া আগে আগে যাইতে লাগিল এবং পিছনের ভাগে একটি সংকীর্তনের দল ধর্মসঙ্গীত গাহিতে গাহিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। শোভাযাত্রাটির গমনপথের রাস্তাগুলি ফুল, পাতা ও পতাকার দ্বারা সুশোভিত করা হইয়াছিল। ঐ পথের মাঝে সার্কুলার রোডের উপর একটি, হ্যারিসন রোডের উপর একটি এবং রিপন কলেজের সম্মুখে একটি, এই মোট তিনটি বিজয়-তোরণ উত্তোলিত করা হইয়াছিল এবং উহাদের গায়ে যথাক্রমে লিখিত ছিল—"Hail, Swamiji," "Jaya Ramakrishna" এবং "Welcome।"

অভ্যর্থনা কমিটি পূর্বেই স্থির করিয়াছিলেন যে স্বামীজীর আগমনের এক সপ্তাহ পরে তাঁহাকে কলিকাতা ও বাংলার অপর নানা স্থানের অধিবাসীগণের পক্ষ হইতে আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যর্থনা করা হইবে। তাই, শোভাযাত্রা রিপন কলেজে পৌঁছিলে, তাঁহাকে সেদিন সেখানে ঘরোয়া ধরণে অভ্যর্থনা করা হয় এবং তিনি খুব সংক্ষেপে তাহার উত্তর দেন। উহার অল্প পরে তিনি তাঁহার সঙ্গীদের লইয়া গাড়ীতে বাগবাজার রওনা হইলেন। সেখানে শ্রীপশুপতিনাথ বোসের (রাজপ্রাসাদের ন্যায় বিরাট) বাড়ীতে তাহাদের ভোজের নিমন্ত্রণ ছিল। বৈকাল চারিটার সময় তিনি পূর্ব ব্যবস্থানুসারে তাঁহার ইউরোপীয় শিষ্যদের লইয়া কাশীপুরের গঙ্গাতীরবর্তী গোপাল লাল শীলের বাগান-বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। সেখানেই তাঁহাদের উপস্থিত মত থাকিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। কার্যতঃ স্বামীজী দিনের বেলায় এই বাড়ীতে ও রাত্রে আলমবাজার মঠে থাকিতেন। পূর্বের বরাহনগর মঠ ১৮৯২ সনের শেষ ভাগে আলমবাজার উঠিয়া আসিয়াছিল।

২৮শে ফেব্রুআরি (১৮৯৭) তারিখে শোভাবাজারের (পরলোকগত রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের) রাজবাটীতে স্বামীজীকে আনুষ্ঠানিক ভাবে কলিকাতা শহরের মানপত্র দেওয়া হয়। সভায় অন্ততঃ পাঁচ হাজার সুশিক্ষিত লোক উপস্থিত ছিল। এবং তাহাদের মধ্যে রাজা, মহারাজা, পণ্ডিত, সন্ন্যাসী, পদস্থ লোক, শত শত কলেজের ছাত্র এবং কতিপয় খ্যাতিসম্পন্ন ইওরোপীয়ও ছিলেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও সভায় স্বামীজীকে সর্ব-ভারতের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় করাইয়া দেন। অভ্যর্থনার মানপত্রখানি একটি রৌপ্য আধারে করিয়া স্বামীজীকে দেওয়া হয় এবং তাহার উত্তরে তিনি যে বক্তৃতা করেন তাহা তাঁহার বাগ্মিতা ও দেশপ্রাণতার এক অপূর্ব নিদর্শন বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। এই বক্তৃতার কয়েকদিন পরে স্বামীজী ষ্টার থিয়েটারে আর একটি উচ্চাঙ্গের বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাটির বিষয় ছিল—"সর্বাবয়ব বেদান্ত।"

এই কালে স্বামীজীকে অভ্যর্থনা ও সংবর্ধনা জানাইয়া, অথবা একবার যাইবার জন্য আমন্ত্রণ লইয়া নানা শহর হইতে বহু টেলিগ্রাম আসিত। কলিকাতার কোন না কোন ধনী ব্যক্তি প্রায়ই তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করাইতেন। আর তাঁহাকে দেখিতে ও তাঁহার কথা শুনিতে সারা দিন ধরিয়া শত শত যুবক, কলেজের ছাত্র, অধ্যাপক ও নানাশ্রেণীর উচ্চ-শিক্ষিত ও পদস্থ লোক সকল গোপাল লাল শীলের বাগানবাড়ীতে ও অনেকে রাত্রেও আলমবাজার মঠে আসা-যাওয়া করিত। তাই, এই কালে তাঁহার আদৌ কোন বিশ্রাম ছিল না। ফলে, তাঁহার স্বাস্থ্য পুনরায় যারপরনাই খারাপ হইয়া উঠিল ও অবিলম্বে তাঁহার পূর্ণ বিশ্রাম লওয়া একান্ত আবশ্যক হইল।

পঁয়ত্রিশ

ভারতের কাজে

(১৮৯৭—১৮৯৯)

১৮৯৭

স্বামীজী যখন কলম্বো হইতে এক দিক-উজ্জ্বলকরা জয়যাত্রায় নিজ জন্মস্থান কলিকাতায় পৌঁছেন ও তথাকার জনগণের উচ্ছ্বসিত আদর-আপ্যায়নে সংবর্ধিত হইতে থাকেন, তখন তিনি যে কি ভীষণভাবে ক্লান্ত ও নিঃশেষিত বোধ করিতেছিলেন, তাহা তাঁহার এই কালের একখানি পত্র হইতে জানা যায়। তিনি ২৫শে ফেব্রুআরি (১৮৯৭) তারিখে আলমবাজার মঠ হইতে মিসেস্ বুলের নিকট একখানি পত্রে লিখেন, "আমি ক্লান্ত—এতই ক্লান্ত যে, যদি বিশ্রাম না পাই, তবে আর ছ-মাসও বাচব কিনা সন্দেহ!"

তাহা হইলেও দেখা যায়, ঐ ক্লান্ত দেহমনেই তিনি সমগ্র ১৮৯৭ সন (ও তৎপর ১৮৯৮ ও ১৮৯৯ সনেও) প্রচণ্ডবেগে ভারতের পুনরুত্থানের কার্যে নিযুক্ত থাকেন। অবশ্য, এই কার্যের প্রথম উদ্যোগ-আয়োজন তিনি (১৮৯৪-৯৬ সনে) আমেরিকা থাকিতেই আরম্ভ করেন। ঐ সময়ে বহুসংখ্যক চিঠিপত্রের দ্বারা তিনি অগ্নিময় ভাষায় তাঁহার গুরুভাইদের ও তাঁহার মাদ্রাজের শিষ্যগণকে ঐ মহান কার্যে তাঁহার সহায় হইতে ও তাহাদের জীবনোৎসর্গ করিতে আহ্বান জানাইতে থাকেন। তাঁহার ঐ আহ্বানে সাড়া দিয়া তাঁহার মাদ্রাজী শিষ্যগণ (তাঁহারই উৎসাহ ও অর্থ-সাহায্যে) ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে "ব্রহ্মবাদিন্" নামে একখানি ইংরেজি পাক্ষিক (পরে মাসিক) পত্রিকা বাহির করিয়া তদ্দ্বারা ভারতবর্ষে তাঁহার ভাব ও শিক্ষা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। স্বামীজীর প্রিয় শিষ্য

আলাসিঙ্গা পেরুমল এই পত্রিকার সম্পাদক হন। পরে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ হইতে "প্রবুদ্ধ ভারত" নামে ঐরূপ আরও একখানি ইংরেজি পত্রিকা বাহির করা হয় এবং স্বামীজীর পরম ভক্ত ও মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ ডাক্তার নঞ্জুণ্ড রাও উহার সম্পাদক হন। ইহা ছাড়া, স্বামীজী যখন যেরূপ উপদেশ দিতেন, তাঁহার মাদ্রাজী শিষ্যগণ তখন সেই ভাবেই চলিবার ও কার্য করিবার যথাসাধ্য প্রয়াস পাইতেন।

অন্যদিকে, স্বামীজীর সন্ন্যাসী গুরুভাইগণ ছিলেন তাঁহার নিঃসঙ্গ কর্মময় জীবনের প্রধান আশা ও ভরসাস্থল। এবং তাহারা না জানিলেও, তিনি জানিতেন যে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনের আরব্ধ সকল কার্যের ভারই তাহাদের শিরে তুলিয়া দিয়া তাঁহার এই ধরাধাম হইতে বিদায় লইতে হইবে। তাই, তাহাদের উপর তিনি চালাইতেন একটি অপ্রতিহত দাবী। আর তাহারাও, নিজেদের অন্তরে প্রশ্ন ও আপত্তি থাকিলেও, স্বামীজীর ঐ দাবী কখনও অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই। তাই দেখা যায়, তাহারা স্বামীজীর আদেশে তাহাদের অতি প্রিয় তীর্থ-ভ্রমণ ও সাধন-ক্ষেত্র সকল হইতে একে একে মঠে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাহাদের দুই জন—স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ—যথাক্রমে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের প্রচার-কার্যে যোগ দিয়াছেন এবং স্বামী অখণ্ডানন্দ খেতড়িতে ও স্বামী শিবানন্দ মাদ্রাজে কিছুকালের জন্য জন-কল্যাণ সাধনে ব্রতী হইয়াছেন। আর সর্বোপরি তাহাদের সকলেই নিজেদের সংঘটিকে দৃঢ়তর করিতে ও স্বামীজীর জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

তবে, ভারতে—স্বামীজীর অনুপস্থিতিতে—এই সকল প্রারম্ভিক কাজ ছিল সামান্য প্রস্তুতি ও অপেক্ষাকালীন কাজ। তাই, ইহার মধ্যে তেমন বড় কিছু ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। এবং কি স্বামীজীর গুরুভাইগণ, কি তাঁহার মাদ্রাজী শিষ্যগণ, সকলেই তাঁহার প্রত্যাগমন ও প্রত্যক্ষ পরিচালনার জন্য উন্মুখভাবে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

তারপর পরিশেষে যখন তিনি দেশে ফিরিলেন, তখন তিনি সত্যই

ভারতের বুকে একটি বোমার মত ফাটিয়া পড়িলেন। এবং তাঁহার আগমন-বার্তা ভারতের সর্বত্রই উচ্চশব্দে ধ্বনিত হইতে লাগিল। আর সঙ্গে সঙ্গে—তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া—তিনি ভারতের পুনরুত্থানের কার্যে নিযুক্ত হইলেন। এই কাজ তিনি কিভাবে কত ধারায় আরম্ভ ও সম্পূর্ণ করেন, আমরা এখন নিম্নে তাহাই সংক্ষেপে লক্ষ করিব।

১। দেখা যায়, স্বদেশে পদার্পণ করিয়াই স্বামীজী সর্বপ্রথম ভারতকে বজ্রনির্ঘোষে শুনাইয়াছেন তাঁহার বাঁচিবার ও পুনরুত্থানের পথের বার্তা। এই কাজে তিনি তাঁহার প্রথম অবতরণ স্থান কলম্বো হইতেই বক্তৃতার পর বক্তৃতা দিতে দিতে মাদ্রাজ আসেন ও সেখানে আরও কয়েকটি অপূর্ব বক্তৃতায় এই বিষয়ে তাঁহার বুকের বোঝা বহুল-পরিমাণে লাঘব করিতে সক্ষম হন। পরে কলিকাতায় ও উত্তর ভারতের নানাস্থানে আরও কতকগুলি বক্তৃতা দিয়া তিনি তাঁহার এই বাণী প্রদানের কাজ সম্পূর্ণ করেন। এই মহাবীর্যপূর্ণ ভারতীয় বক্তৃতাবলী ভারতের জাতীয় জীবনের মূলনীতি সম্বলিত Gospel বা বেদস্বরূপ। ইহা ভারতকল্যাণ সাধনে অবতীর্ণ সত্যদ্রষ্টা ঋষির দান। এবং ইহার নির্দেশিত পথে চলিয়াই ভারত লাভ করিবে তাঁহার প্রার্থিত কল্যাণ, উন্নতি ও অভ্যুদয়।

২। ভারতে ফিরিবার পর স্বামীজীর দ্বিতীয় বড় কাজ হইতেছে তাঁহার ত্যাগী গুরুভাইদের তাঁহার স্বমতে আনিয়া তাহাদের ভারতের ও জগতের সেবায় নিযুক্ত করা। আমরা দেখিয়াছি এ প্রচেষ্টা তিনি আমেরিকা থাকিতেই করিয়াছেন এবং তাহার আংশিক কৃতকার্যতাও আমরা লক্ষ করিয়াছি। তাহা হইলেও তাঁহার গুরুভাইগণ ছিলেন প্রাচীনপন্থী এবং ঠাকুরকেও ঐ মতাবলম্বী মনে করিয়া তাহারা অন্তরে অন্তরে ঐ পথই আঁকড়াইয়া ছিলেন। তাই, দেশ বা জগতের প্রতি তাহাদের কোন দৃষ্টি ছিল না। এবং স্বামীজীর আকর্ষণ ও তাঁহার প্রতি নিজেদের অন্তরের অহেতুক ভালবাসার টানে তাহারা পূর্বেই তাঁহার নির্দেশমত কিছু কিছু কাজ করিলেও, তাহাদের জীবনের লক্ষ্য

ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন—সংসার-সম্পর্কহীন হইয়া ত্যাগ, তপস্যাদি সহায়ে আত্মকল্যাণ ও আত্মমুক্তি সাধন। এজন্য স্বামীজী তাঁহার আমেরিকার চিঠিপত্রাদিতে তাহাদের মাঝে মাঝে যেমন বিদ্রূপ ও তিরস্কার করিয়াছেন, এখানে আসিয়াও ঠিক তেমনই করিতে লাগিলেন। এবং তৎসঙ্গে তাহাদের নানাভাবে বুঝাইতে লাগিলেন—আত্মা চিরমুক্ত, চিত্তশুদ্ধির দ্বারা নিজের মনের অজ্ঞানান্ধকার দূর হইলেই তাহা অনুভব করা যায়। এবং এই চিত্তশুদ্ধি লাভের উপায় শুধু পূজা ও জপ-ধ্যানাদি তপস্যাই নয়, আরও নানা উপায়ে তাহা লাভ করা যায়। তন্মধ্যে জীবসেবা, দেশের সেবা ও জনকল্যাণ সাধন একটি প্রশস্ত এবং বর্তমান যুগের বিশেষ উপযোগী ও প্রয়োজনীয় পথ। দেশমাতার আহ্বানে ও সর্বজগতের প্রয়োজনে এই পথ চালু করিবার জন্যই তাঁহার ও শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাচীন ভারতের মূর্ত বিগ্রহ হইলেও, তিনি জন্ম লইয়াছিলেন নূতনকে গ্রহণ করিতে, তাহার রক্ষার উপায় করিতে, তাহাকে পথনির্দেশ দিতে। তাই, এই মহান অবতারপুরুষের জগৎ-কল্যাণের ব্রতে নিযুক্ত না হইয়া, শুধু আত্মমুক্তির পিছনে ছোটা তাঁহার শিষ্যগণের পক্ষে যারপরনাই নিন্দনীয়। তিনি তাহাদের শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহার দ্বারাই তাহাদের মুক্তি সুনিশ্চিত হইয়া আছে। এবং তাহাদের কর্তব্য আর সব কিছু পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার জীবনোদ্দেশ্য সফল করিতে নিযুক্ত হওয়া। এইরূপ নানাভাবে বিষয়টি বুঝাইয়া স্বামীজী তাহাদের পরিশেষে বলিলেন, ঠাকুর তাঁহার কার্যসম্পাদন করিবার সকল ভার এবং তৎসঙ্গে তাহাদের সকলের ভারও তাঁহার উপর দিয়াছেন। তাই, তাহাদের কর্তব্য তাঁহার নির্দেশ অনুসারে চলা ও কাজ করা।

স্বামীজীর এই ব্যাকুল আহ্বানে ও তাঁহার উপর তাহাদের আন্তরিক বিশ্বাস-ভালবাসার টানে, তাহারা পরিশেষে তাঁহার ইচ্ছার নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিলেন ও তিনি যাহা বলেন তাহাই করিতে সম্মত হইলেন। এবং তৎসঙ্গেই স্বামীজীর ভারত ও জগৎ-কল্যাণের কার্য পরিচালনা করিবার বহু-ঈপ্সিত মহাযন্ত্র—রামকৃষ্ণ

সন্ন্যাসী সঙ্ঘ—ক্রিয়মান হইল। এই অমোঘ ও অব্যর্থ যন্ত্রটি তাঁহার কাজে লাগাইবার সঙ্কল্প তিনি ভারত-ত্যাগের পূর্বেই করিয়াছিলেন। এবং তিনি নিয়ত স্বপ্ন দেখিয়াছেন ঠাকুরের সৃষ্ট এই মহাযন্ত্রটি তাঁহার অভাবেও শতাব্দির পর শতাব্দি ধরিয়া তাঁহার আরব্ধ কার্য অবিচলিত ভাবে ও পরম সার্থকতার সহিত করিয়া যাইতেছে। এখন তাঁহার সে স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইল। রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী সংঘ তাঁহার কার্যভার মাথায় তুলিয়া লইল।

৩—৪। উক্তরূপে স্বামীজী যখন তাঁহার সন্ন্যাসী গুরুভাইদের সংঘবদ্ধভাবে তাঁহার কার্যে যোগ দিতে সম্মত করান, তখন (এবং বস্তুতঃ তাহার অনেক পূর্ব হইতেই) তিনি তাহাদের দ্বারা তাঁহার কার্যপরিচালনার সুব্যবস্থার জন্য আরও দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিতে বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। এবং সে কাজ দুইটি হইতেছে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠা। একটি মঠ (অর্থাৎ বরাহনগর ও পরে আলমবাজার মঠ) অবশ্য পূর্ব হইতেই ছিল। কিন্তু উক্ত উভয়স্থানেই উহা ছিল নামহীন, সম্বলহীন ও অতি পুরাতন জীর্ণ ভাড়াটিয়া বাড়ীতে অবস্থিত। ঐরূপ স্থানে থাকিয়া সঙ্ঘ হিসাবে বৃদ্ধি লাভ করা বা কোন বৃহৎ কাজে নিযুক্ত হওয়া উহার পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না। তাই, স্বামীজী মঠটিকে নিজস্ব ও বিরাট কার্যোপযোগী সুপ্রশস্ত জমিবাটীতে সংস্থাপিত করিতে উদ্যোগী হন। কিন্তু ঐ জন্য আবশ্যকীয় টাকা ও উপযুক্ত জমি সংগ্রহ করিতে এবং ঐ সংগৃহীত জমির উপর নূতন মঠবাড়ী নির্মাণ করিতে প্রায় দুই বৎসর সময় লাগে। তৎপর তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমে যে নূতন মঠ (বর্তমান বেলুড় মঠ) পরিশেষে স্থাপিত হয়, তাহা বিপুল বৃদ্ধি ও বিস্তারের সম্ভাবনাযুক্ত (ইহা এখন আমরা সুস্পষ্টভাবেই দেখিতে পাইতেছি) এক অপূর্ব প্রতিষ্ঠান। এবং উহার প্রতিষ্ঠাতেই স্বামীজীর ভারত ও সর্বজগতের কাজের অক্ষয় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মঠ-নির্মাণের ইতিহাস আমরা পরে যথাস্থানে দেখিতে পাইব।

এইভাবে নূতন রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপন করিতে অনিবার্যভাবে কিছু

বিলম্ব ঘটিলেও, রামকৃষ্ণ মিশন গঠন করিতে স্বামীজীর সেরূপ কোন বিলম্ব হয় না। এই মিশন প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত এইরূপ।

কোন কারণে কলিকাতা থাকা আবশ্যক হইলে, স্বামীজী বাগবাজারে বলরামবাবুর বাড়ীতে থাকিতেন। ঐরূপ এক সময়ে উক্ত মিশন স্থাপনের জন্য তিনি ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে বৈকালবেলা ঐ বাড়ীতে ঠাকুরের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তগণের একটি সভা আহ্বান করেন। সকলে উপস্থিত হইলে তিনি ঐ সভার কার্যারম্ভ করিয়া বলিলেন, "নানা দেশ ঘুরে আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, সংগঠন ব্যতীত কোন স্থায়ী বড় কাজ করা অসম্ভব। তাই, স্বদেশে ও বিদেশে ঠাকুরের কার্য পরিচালনার জন্য একটি সংঘ গঠন করা আবশ্যক। আমরা ঠাকুরের নামে কেহ সন্ন্যাসী, কেহ বা গৃহী হয়েছি। তাই, এই সংঘ ঠাকুরের নামেই হওয়া উচিত।"

স্বামীজীর এই প্রস্তাব উপস্থিত সকলেই উৎসাহের সহিত সমর্থন করিলেন। এবং তৎপর সভায় প্রস্তাবিত সংঘের নাম, উদ্দেশ্য এবং কার্যপদ্ধতি ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইল, তাহার মর্ম সংক্ষেপতঃ এই :—

'এই সংঘের নাম রামকৃষ্ণ মিশন হইবে। এবং ইহার উদ্দেশ্য' হইতেছে মানবকল্যাণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ যেসকল সত্য প্রচার করিয়াছেন তাহা প্রচার করা ও লোক সকলের ঐহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য ঐ সকল সত্য অনুশীলন করিতে তাহাদিগকে সাহায্য করা, ইত্যাদি।

'ঐ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উপায়-স্বরূপ মিশন জনগণকে তাহাদের ঐহিক-পারমার্থিক কল্যাণপ্রসূ জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা দিবার জন্য কতকগুলি লোককে উপযুক্ত শিক্ষণ দিবে; শিল্প, কলা ইত্যাদির উন্নতিসাধন করিবে; এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাখ্যানুযায়ী বেদান্ত ও অপর ধর্মভাব সকল প্রচার করিবে।

'সন্ন্যাসী ও লোকশিক্ষার কাজে জীবনোৎসর্গ করিতে ইচ্ছুক গৃহীদের শিক্ষণ দিবার জন্য মিশন ভারতের বিভিন্ন অংশে মঠ ও

আশ্রম স্থাপন করিবে ও তাহাতে শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের নানাস্থানে গিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাজ করিবার আবশ্যকীয় অর্থাদি সংগ্রহ করিবে। ইহা ব্যতীত, মিশন ভারতের বাহিরের দেশসমূহে বেদান্ত প্রচারের কেন্দ্র খুলিবার জন্য শিক্ষণপ্রাপ্ত সন্ন্যাসীগণকে প্রেরণ করিবে।

'এই মিশনের লক্ষ্য ও আদর্শ আধ্যাত্মিক ও জনকল্যাণমূলক এবং রাজনীতির সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। যাহারা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনোদ্দেশ্যে বিশ্বাসী, অথবা যাহারা উপরি-বর্ণিত লক্ষ্য ও কার্য সকলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন তাহারাই এই মিশনের সভ্য হইতে পারিবেন।'

এই প্রস্তাবগুলি পাশ হইলে, মিশনের পদাধিকারী সকল নিযুক্ত করা হইল। স্বামীজী মিশনের সাধারণ সভাপতি এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী যোগানন্দ উহার কলিকাতা কেন্দ্রের যথাক্রমে সভাপতি ও সহকারী সভাপতি হইলেন। এই সভায় এবং ৫ই মে তারিখের আর একটি সভায় আরও স্থির হইল যে, প্রত্যেক রবিবার বলরামবাবুর বাড়ীতে মিশনের সভ্যদের একটি করিয়া সভা হইবে এবং ঐ সভায় নানা বিষয় আলোচিত হইবে। তদনুসারে ৯ই মে তারিখে মিশনের প্রথম সাধারণ সভা হয় এবং স্বামীজীর অনুপস্থিতির জন্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ সভায় সভাপতিত্ব করেন। এইভাবে প্রায় দুই তিন বৎসর যাবৎ ঐ বাড়ীতে মিশনের সভাদি হয়। এবং তৎপর অনিবার্যভাবে একটি পরিবর্তন আসে।

আমরা পরে দেখিতে পাইব, ১৮৯৯ সনের ২রা জানুআরি তারিখে স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠ চালু হয়। তৎপর ১৯০১ ——— তিনি একখানি ট্রাস্ট দলিলের দ্বারা ঐ মঠ পরিচালনের ভার কতিপয় (মঠবাসী সন্ন্যাসী) ট্রাস্টীর হস্তে অর্পন করেন। এবং তাহাতে উল্লেখ থাকে যে, এই মঠের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে—একদল সন্ন্যাসীকে আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে ও জগৎকে সর্বপ্রকারে সেবা করিবার যোগ্যতা অর্জন করিতে শিক্ষণ দেওয়া। দেখা যায়, (১৮৯৯ সনে) এই কেন্দ্রীয় মঠটি স্থাপিত হওয়ার অল্প পরেই

রামকৃষ্ণ মিশন সংঘটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠানরূপে কাজ করিতে বিরত হন এবং উহার করণীয় জনহিতকর ও সেবামূলক সকল কার্যই বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষই করিতে আরম্ভ করেন।

কিন্তু ক্রমে কাজ ও দায়িত্ব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা অনুভব করিতে লাগিলেন যে, জনহিতকর, সেবামূলক ও ধর্মপ্রচার সম্বন্ধীয় কার্যগুলির জন্য রামকৃষ্ণ মিশন নামে একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান থাকা বাঞ্ছনীয়। তদনুসারে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা রামকৃষ্ণ মিশন নামে একটি সংঘ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২১ আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রি করেন। ইহা স্বামীজী কর্তৃক ১৮৯৭ সনে প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন সংঘের নীতি ও উদ্দেশ্য লইয়াই গঠিত হয় এবং মঠের ট্রাস্টীগণ ইহার পরিচালক নিযুক্ত হন। এইভাবে এই সময় হইতে মঠের সন্ন্যাসীগণ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন এই দুই মূর্তিতে দুইটি পৃথক ধারায় তাহাদের কার্য করিয়া আসিতেছেন।

৫-৬। ভবিষ্যতের এই বিরাট প্রতিষ্ঠান দুইটি স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াই স্বামীজীর নিশ্চিন্ত হইবার উপায় ছিল না। তিনি জানিতেন, তিনি যে সকল প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবেন তাহার সাফল্য, স্থায়িত্ব ও আকাঙ্ক্ষিত বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য প্রয়োজন আত্মোৎসর্গ করিতে ইচ্ছুক দৃঢ় সঙ্কল্পযুক্ত শিক্ষিত যুবকদের। তাই, ভারতে ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গেই এই লোক সংগ্রহের কাজই তাঁহার প্রথম ও প্রধান দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই বিষয়ে মাদ্রাজ ও বাংলার যুবকগণই ছিল তাঁহার আশার স্থল। তাই, আসিবার পথে যে স্বল্প কয়েকদিনের জন্য তিনি মাদ্রাজ ছিলেন, তখনই তিনি সেখানকার যুবকদের তাঁহার কাজের সহায় হইতে উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানাইয়া আসিয়াছিলেন। তারপর কলিকাতায় আসিয়া তিনি তথাকার যুবকদের শুধু যে এইভাবে আহ্বানই করেন তাহা নয়। তাহারা যখন দলে দলে আসিয়া তাহার সহিত (গোপাল লাল শীলের বাগানবাড়ীতে, আলমবাজার মঠে বা বলরামবাবুর বাড়ীতে) দেখা করিতে লাগিল, তখন তিনি সানন্দে ও অক্লান্তভাবে তাহাদের সকল প্রশ্নের জবাব দিতেন এবং

তাহাদের মধ্যে যাহারা অবিবাহিত তাহাদের তিনি ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া ইহজীবনেই সত্যলাভ করিতে এবং দেশ ও জগৎকল্যাণে জীবনোৎসর্গ করিতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিতেন। আর এই উৎসাহ তিনি দিতেন তাঁহার স্বাভাবিক অগ্নিময় ভাষায় এবং উহার সহিত জড়িত থাকিত তাঁহার দেহমন হইতে বিচ্ছুরিত প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক শক্তি ও প্রভাব। যাহারা উহা শুনিত তাহারা অনিবার্যভাবে উহার দ্বারা (ঐরূপ নূতন জীবন লাভের জন্য) উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত বোধ করিত।

কতিপয় উপযুক্তক্ষেত্রে অতি সত্বরই ইহার ফল ফলিল। কয়েকজন শিক্ষিত যুবক (আলমবাজার) মঠে যোগদান করিলেন। ইহার পূর্বে স্বামীজী পাশ্চাত্য দেশে থাকিতেই অপর চারিটি যুবক মঠে যোগ দিয়া ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করিতেছিল। তিনি এখন তাহাদের সন্ন্যাস দিলেন (এপ্রিল, ১৮৯৭)। ইহাদের নাম স্বামী বিরজানন্দ, প্রকাশানন্দ, নির্ভয়ানন্দ ও নিত্যানন্দ। ইহার পর মে মাসের প্রথম সপ্তাহে (১৮৯৭) স্বামীজী তাঁহার গৃহীভক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী ও মঠের নূতন (অদীক্ষিত) ব্রহ্মচারী সুধীর মহারাজকে (পরে, স্বামী শুদ্ধানন্দ) দীক্ষা দেন। এই সময়ে এবং ইহার পর স্বামীজী ভারতে থাকিতেই আর যাহারা মঠে যোগ দেন, তাহারাও বিভিন্ন সময়ে দীক্ষা, ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস প্রাপ্ত হন। জানা যায়, তাহাদের কয়েক জনের নাম হইতেছে—স্বামী সুরেশ্বরানন্দ, বিমলানন্দ, বোধানন্দ, স্বরূপানন্দ, কল্যাণানন্দ ও সোমানন্দ। ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনজন মঠ আলমবাজারে থাকিতে এবং অপর সকলে উহা ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে (বেলুড় গ্রামের) নীলাম্বর বাবুর বাগানবাড়ীতে স্থানান্তরিত হইলে, উহাতে যোগ দেন।

অন্যদিকে, এই সকল নবাগত ও নবদীক্ষিত যুবকদের আগমন ও দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীজী আরম্ভ করিতেন তাহাদিগকে একটি অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও শিক্ষণ দিবার কাজ, যাহাতে তাহারা তাঁহার আরব্ধ ও ঈপ্সিত কার্যগুলি সুষ্ঠুভাবে চালাইতে সক্ষম হয়।

এই কাজ তিনি কিভাবে, কত যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত করিতেন তাহা আমরা তাঁহার ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের কার্যাবলী আলোচনাকালে দেখিতে পাইব। বস্তুতঃ তিনি আশা ও বিশ্বাস করিতেন, এই সকল মহান আত্মত্যাগী যুবকদের একটি অবিচ্ছিন্ন ধারাই ভারত ও জগৎ-কল্যাণের জন্য তাঁহার কর্মপ্রবাহ যুগ হইতে যুগান্তরে পৌছাইয়া দিবে। এবং দেখাও যায়, এইভাবে তিনি যে লোক সংগ্রহ ও লোক তৈরী করিবার কাজ শুরু করেন, তাহা (তাঁহার ঐ আশা ও বিশ্বাসকে সত্যে পরিণত করিয়া) আজিও তাঁহারই অগ্নিময় বাণীর আকর্ষণ-প্রভাবে ও তাঁহার নির্দেশিত পথেই অব্যাহত গতিতে চলিয়া আসিতেছে। যে সাফল্যের সহিত তাহা চলিতেছে, তাহার অতি সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখা যায়—মঠ ও মিশনের চমকপ্রদ বৃদ্ধি ও বিকাশে, চতুর্দিকে উহাদের অপ্রতিহত বিস্তারে।

স্বামীজীর স্বাস্থ্য ও কর্ম সংক্রান্ত ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের অন্যান্য ঘটনাবলীর বিবরণ এইরূপ। আমরা দেখিয়াছি তিনি যখন প্রথম কলিকাতায় পৌছেন, তখন তিনি ভয়ানকভাবে ক্লান্ত ছিলেন। এবং উহার হেতু সম্বন্ধে তিনি (২৮শে এপ্রিল তারিখে) মেরী হেলের নিকট লিখেন, "দুর্ভাগ্যক্রমে আমি ইতিপূর্বে ইংলণ্ডের কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়েছি, আবার এখানে দাক্ষিণাত্যের ভীষণ গরমে অতিরিক্ত পরিশ্রম করায় একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছি।" শরীরের এই অবস্থায় উপরিবর্ণিত (গুরুতর চিন্তা ও শ্রমসাধ্য) কাজগুলিতে নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহার শরীরের অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে, ডাক্তারগণ তাঁহাকে অবিলম্বে পূর্ণ বিশ্রাম লইতে উপদেশ দিলেন। এবং তাহাদের পরামর্শেই তিনি মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে (১৮৯৭) দার্জিলিঙে রওনা হইয়া গেলেন। আর তাঁহার সঙ্গে গেলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীত, মিঃ গুডউইন এবং স্বামীজীর তিনজন মাদ্রাজী শিষ্য (আলাসিঙ্গা পেরুমল, জি জি নরসিংহাচার্য ও সিঙ্গারাভেলু মুদেলিয়ার)। এই শেষোক্ত তিনজন মাদ্রাজ হইতে স্বামীজীর সহিত

কলিকাতায় আসিয়া আলমবাজার মঠে অবস্থান করিতেছিলেন। ইহা ব্যতীত, মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার স্বামীজীর পূর্বেই দার্জিলিঙে গিয়াছিলেন। স্বামীজী সেখানে পৌঁছিয়া মিঃ ও মিসেস্ এম্ এন্ ব্যানার্জীর অতিথি হইলেন। এবং বর্ধমানের মহারাজার "রোজ-ব্যাঙ্ক" নামক বাড়ীর কতকাংশও তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গীগণের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

এখানে স্বামীজী প্রায় এপ্রিল মাসের শেষ পর্যন্ত থাকেন। মাঝে দুইবার কলিকাতায় আসেন। প্রথমবার তিনি আসেন ২১শে মার্চ তারিখে খেতড়িরাজের অনুরোধে। রাজা সত্বরই ইংলণ্ডে যাওয়া স্থির করিয়াছিলেন। তাই, স্বামীজীর সহিত দেখা করিতে কলিকাতায় আসিয়া, তাঁহাকে সেখানে আসিতে তার করেন। স্বামীজী আসিলে তিনি তাঁহাকেও তাহার সহিত ইংলণ্ডে যাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া ডাক্তারগণ তাঁহাকে যাইতে অনুমতি দিলেন না। এবং বলিলেন, এখন তাঁহার কোন বই পড়া বা কোন গুরুতর চিন্তা করাও অনুচিত। কাজেই স্বামীজীর আর ইংলণ্ড যাওয়া হইল না। এবং খেতড়ির মহারাজকে একদিন আলমবাজার মঠে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়া তিনি দার্জিলিঙ্ ফিরিয়া গেলেন।

পরে এপ্রিল মাসে তিনি দুই সপ্তাহের জন্য পুনরায় কলিকাতায় আসেন এবং তখন পূর্বোক্তরূপে স্বামী বিরজানন্দ প্রমুখ চারজনকে সন্ন্যাস দান করেন ও মঠের যুবকদের শিক্ষা দিতে থাকেন। অতঃপর তিনি পুনরায় দার্জিলিঙ গিয়া এপ্রিল মাসের একদিন কি দুইদিন থাকিতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন ও ১লা মে তারিখে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এবং তাহারই দুই-এক দিন পরে তিনি (পূর্বোল্লিখিতরূপে) শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী ও সুধীর মহারাজকে দীক্ষা দেন।

যাহা হউক, পূর্ণ একমাসকাল দার্জিলিঙে থাকিয়া স্বামীজী অনেকটা সুস্থ বোধ করিলেন। এই স্বাস্থ্যোন্নতি সম্পূর্ণ করিবার

জন্য তিনি ডাক্তারদের উপদেশে ৬ই মে তারিখে (১৮৯৭) কলিকাতা হইতে আলমোড়া রওনা হইয়া গেলেন। সঙ্গে কয়েকজন গুরুভাই ও শিষ্য। সেখানে একবার যাইবার জন্য সেখানকার অধিবাসীগণও তাঁহাকে পুনঃপুনঃ আমন্ত্রণ জানাইতেছিলেন।

ইহার কিছু পূর্বে মিস্ মুলার ইংল্যাণ্ড হইতে কলিকাতায় আসিয়া স্বামীজীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এবং তারপর তিনি ও গুডউইন আলমোড়ায় চলিয়া যান। স্বামীজী কাঠগোদামে পৌঁছিয়া দেখিলেন সেখানে গুডউইন ও আলমোড়ার কতিপয় ভদ্রলোক তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। বৈকালে তাঁহারা আলমোড়ার সন্নিকটস্থ লোদিয়ায় পৌঁছিলেন। সেখানে একটি বিপুল জনতা স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য উপস্থিত ছিল। তাহাদের অনুরোধে তিনি একটি সজ্জিত ঘোড়ার উপর উঠিয়া এক বিরাট মিছিলে আলমোড়া শহরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে একটি সুবৃহৎ প্যাণ্ডালে তাঁহাকে তিনটি মানপত্র দেওয়া হইল। প্রথমটি অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি যথাক্রমে লালা বদ্রী সা ও একজন পণ্ডিতের পক্ষ হইতে। প্রথম মানপত্রটি হিন্দি ভাষায় এবং তৃতীয়টি সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল। স্বামীজী সংক্ষেপে এই মানপত্র তিনটির উত্তর দেন এবং তাহাতে তিনি আবেগের সহিত ভারতীয় চিন্তার উপর হিমালয় পর্বতমালার আধ্যাত্মিক প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন, 'প্রাণের একান্ত আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও উহাদের শান্তিময় গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে জীবন যাপন করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। উহাদের দর্শন মাত্রেই মনে জাগে উহাদের এক শাশ্বত বাণী—ত্যাগ।'

আলমোড়ায় স্বামীজী (তাঁহার ভক্ত ও ব্যবসায়ী) লালা বদ্রী সার আতিথ্য গ্রহণ করেন। এখানে তিনি সমাগত ব্যক্তিদের সহিত ধর্মালোচনা করিতেন, সঙ্গের গুরুভাই ও শিষ্যদের নানা বিষয়ে শিক্ষা ও উপদেশ দিতেন এবং দেশবিদেশের নানা স্থানে অনেক চিঠিপত্র লিখিতেন। ইহা ব্যতীত, স্বাস্থ্যোদ্ধারের নিমিত্ত প্রচুর

পরিমাণে ব্যায়াম করা, পাহাড়ে ওঠা-নামা এবং ঘোড়ায় চড়িয়া বহুদূর পর্যন্ত দৌড়ানো ছিল তাঁহার নিত্যকর্ম। আর ঐ সঙ্গে সুযোগ হইলেই তিনি তাঁহার গুরুভাই ও শিষ্যদের সহিত নানা রঙ্গরস ও হাসিতামাসাতেও সময় কাটাইতেন। এইভাবে কিছুদিন চলিয়া তাহার শরীরের খুবই উন্নতি সাধন হইল। এবং তিনি ২৯শে জুন তারিখের এক পত্রে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখেন, 'ঘোড়ায় চড়িয়া বিশ-ত্রিশ মাইল ছুটিয়া আসিয়াও ক্লান্তিবোধ হয় না।'

এদিকে স্বামীজী কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের নানাস্থানে যাইবার জন্য জরুরী আমন্ত্রণ পাইতেছিলেন। তাই, প্রায় পৌনে তিনমাস কাল আলমোড়ায় থাকিয়া এবার স্বাস্থ্যোদ্ধারের কার্য সম্পূর্ণ হইয়াছে মনে করিয়া তিনি উত্তর ভারত ভ্রমণে যাওয়া স্থির করিলেন। তখন বন্ধুগণের অনুরোধে তিনি যাইবার পূর্বে আলমোড়া জিলা স্কুলে দুইটি ও স্থানীয় ইংরেজ অধিবাসীগণের আমন্ত্রণে ইংলিশ ক্লাবে একটি, এই মোট তিনটি বক্তৃতা দেন। উদ্যোক্তাদের অভিপ্রায়ানুসারে তিনি জিলা স্কুলের বক্তৃতা দুইটির একটি ইংরেজিতে ও অপরটি হিন্দিতে দেন। এই দুইটি বক্তৃতাই শ্রোতাদের উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। ইংলিশ ক্লাবের বক্তৃতাটিতে আলমোড়া শৈলাবাসের সমস্ত ইংরেজ অধিবাসীগণ উপস্থিত ছিলেন। এবং একজন প্রত্যক্ষদর্শী লিখিয়াছেন, "ঐ বক্তৃতায় স্বামীজী যখন জীবাত্মা ও ঈশ্বরের সম্পর্ক বর্ণনা করিতেছিলেন, তখন মনে হইতেছিল বক্তা, বক্তৃতা ও শ্রোতাগণ—এ সবই যেন একটি মহাভাবানুভূতিতে এক হইয়া গিয়াছে।"

নানা স্থান হইতে প্রাপ্ত নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ স্বামীজী (কতিপয় শিষ্য ও গুরুভাইকে সঙ্গে করিয়া) আলমোড়া হইতে রওনা হইয়া ৯ই আগস্ট তারিখে বেরিলী পৌঁছেন ও তারপর তথা হইতে পর পর আম্বালা, অমৃতসর, রাওয়ালপিণ্ডি ও মারী হইয়া কাশ্মীরে যান। বেরিলীতে স্বামীজী (৯ই আগস্ট হইতে ১২ই আগস্ট পর্যন্ত মোট) চারদিন থাকেন। সেখানে একটি অভ্যর্থনা সমিতি তাঁহাকে ও

তাঁহার সঙ্গীগণকে স্টেশন হইতে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া (তাঁহাদের জন্য নির্দিষ্ট বাসস্থান) স্থানীয় ক্লাব হাউসে লইয়া যান। কিন্তু সেইদিন রাত্রেই স্বামীজীর জ্বর হয়। তবে তৎসত্ত্বেও তিনি এখানে প্রচুর ধর্মালোচনা করেন, ১০ই আগস্ট সকালবেলা আর্য সমাজের অনাথ আশ্রম দেখিতে যান এবং তৎপরদিন ছাত্রদের সহিত একটি প্রেরণাময় কথোপকথনে নিযুক্ত হন ও ফলে তাঁহার ব্যবহারিক বেদান্ত ও জীবসেবার ভাবগুলি কার্যে পরিণত করিবার জন্য তখনই একটি ছাত্র-সমিতি গঠিত হয়। এই দিন দুপুরবেলা আহারের পর স্বামীজী বলেন, তিনি আর মাত্র পাঁচ-ছয় বৎসর বাঁচিবেন।

১২ই আগস্ট তারিখে স্বামীজী বেরিলী হইতে আম্বালায় যান ও সেখানে এক সপ্তাহ থাকেন। আম্বালা রেল স্টেশনে বহু লোক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসেন এবং তাহাদের মধ্যে মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়ারও ছিলেন। তাহারা সিমলা ভ্রমণে গিয়াছিলেন এবং তথা হইতে স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আম্বালায় আসেন। অসুস্থতা সত্ত্বেও স্বামীজী আম্বালায় রোজই প্রায় সারাদিন হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম ও আর্যসমাজী প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের লোকের সহিত ধর্ম-বিষয়ে আলোচনা করিতেন। ১৬ই তারিখে লাহোর কলেজের একটি অধ্যাপকের অনুরোধে তিনি ফোনোগ্রাফ রেকর্ডের জন্য একটি ছোট ভাষণ দেন এবং তৎপরদিন শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের একটি সভায় দেড় ঘণ্টাকালব্যাপী একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি মাতৃভূমি ভারতের পুনরুত্থানের জন্য তাঁহার পরিকল্পনা প্রাণস্পর্শী ভাষায় বিবৃত করেন। বক্তৃতাটি সকলকেই মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে এবং শ্রোতাগণ ঘন ঘন করতালি ধ্বনির দ্বারা তাঁহাকে তাহাদের সংবর্ধনা জানান।

২০শে আগস্ট তারিখে স্বামীজী তাঁহার সঙ্গীগণ এবং মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার সহ অমৃতসরে পৌঁছেন। সেখানকার রেলস্টেশনে তাঁহাকে বিপুল সম্মানের সহিত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান অসুস্থতার জন্য তিনি সেখানে মাত্র চার-পাঁচ ঘণ্টা থাকিয়া নিকটবর্তী ধরমশালা

শৈলাবাসে চলিয়া যান। ৩১শে আগস্ট পর্যন্ত সেখানে থাকিয়া তিনি অমৃতসরে ফিরিয়া আসেন ও দুইদিন সেখানে থাকেন। তখন আর্যসমাজের স্থানীয় নেতৃবর্গের সহিত ধর্মসম্বন্ধে তিনি নানা বিষয় আলাপ-আলোচনা করেন।

অমৃতসর হইতে স্বামীজী স্বাস্থ্যোদ্ধারের নিমিত্ত রাওয়ালপিণ্ডি হইয়া মারী যান ও সেখানে ৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত থাকেন। মারীতে স্বামীজী ঐ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ উকীল মিঃ হংসরাজের অতিথি হন। সেখানে তিনি নানা আমন্ত্রণ সত্ত্বেও অসুস্থতার জন্য কোন বক্তৃতা দিতে সক্ষম হন না। তবে কয়েকটি আলাপ-আলোচনায় তিনি তাঁহার প্রধান চিন্তাগুলি ও ভারতের জন্য তাঁহার কার্যপরিকল্পনা সমাগত লোকদের নিকট বিবৃত করেন।

মারী হইতে স্বামীজী সঙ্গীগণ সহ কাশ্মীর যান। পূর্বে ঠিক ছিল মিঃ ও মিসেস সেভিয়ারও তাঁহার সহিত সেখানে যাইবেন। কিন্তু মারীতে মিঃ সেভিয়ার হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায়, তাহাদের দুইজনের আর যাওয়া হইল না। তাই, মিঃ সেভিয়ার স্বামীজীকে (রওনা হইবার পূর্বদিন) তাঁহার কাশ্মীর যাত্রার ব্যয় বাবদ আট শত টাকা পাঠাইয়া দেন। স্বামীজী তাহার অর্দ্ধেক রাখিয়া, বাকী অর্দ্ধেক প্রয়োজনের অতিরিক্ত বোধে (তাঁহাকে দেখিতে গিয়া) ফেরত দিয়া আসেন।

৮ই সেপ্টেম্বর স্বামীজী সঙ্গীগণ সহ টাঙ্গায় করিয়া (মারী হইতে) বারমুল্লা পৌঁছেন এবং তথা হইতে নৌকায় শ্রীনগর রওনা হন। ১০ই সেপ্টেম্বর সেখানে পৌঁছিয়া তিনি বিচারপতি ঋষিবর মুখোপাধ্যায়ের আতিথ্য গ্রহণ করেন। তৎপর ১২ই সেপ্টেম্বর তিনি রাজপ্রাসাদে যান। সেখানে দুইজন উচ্চ রাজকর্মচারী তাঁহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করেন। কিন্তু মহারাজা এই সময়ে জম্মুতে থাকায় তাহার সহিত তাঁহার দেখা হয় না। তবে মহারাজার ভ্রাতা রাজা রাম সিং পরদিন তাঁহাকে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আমন্ত্রণ জানাইলেন। তদনুসারে স্বামীজী আসিলে, তিনি তাঁহাকে

একখানি চেয়ারে বসাইয়া নিজে রাজকর্মচারীদের সহিত মেঝের উপর বসিলেন। এবং দুই ঘণ্টাকাল তাঁহার কথা শুনিয়া রাজা এত মুগ্ধ হইলেন যে, তিনি নিজ হইতে তাঁহার ভারতের কার্যে অর্থসাহায্য করিবার আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

ইহার পর স্বামীজী কাশ্মীরের নানা দর্শনীয় স্থান সকল দেখিয়া, শহরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বাড়ীতে আহারের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া এবং সাধু, পণ্ডিত, ছাত্র ও উচ্চ রাজকর্মচারী প্রভৃতি বহু সমাগত লোকদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া সময় কাটাইতে লাগিলেন। এই সময় রাজা অমর সিং'এর উজির স্বামীজীর ব্যবহারের জন্য একখানি হাউসবোট দেন। তাহাতে করিয়া স্বামীজী পাম্পুর ও অনন্তনাগ এবং শেষোক্ত স্থান হইতে পায়ে হাঁটিয়া মার্তণ্ড গিয়া কয়েকটি প্রাচীন মন্দির দর্শন করেন। মার্তণ্ড হইতে তিনি অচ্ছাবল যান।

এইভাবে প্রায় একমাসকাল কাশ্মীরে থাকিয়া স্বামীজী ফিরিবার পথে নৌকায় বারমুল্লায় আসেন ও অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে মারীতে প্রত্যাগমন করেন। এই সময়ে (কাশ্মীরবাসের ফলে) তিনি বেশ সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

এইবার মারীতে স্বামীজী কখনও নিবারণ বাবুর, কখন বা মিঃ ও মিসেস সেভিয়ারের অতিথি হইয়া থাকেন। ১৪ই অক্টোবর সেখানকার বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবী অধিবাসীগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া একখানি মানপত্র দান করেন। ইহার উত্তরে স্বামীজী যে ভাষণ দেন তাহাতে সকলেই যারপর নাই মুগ্ধ ও আনন্দিত হন।

১৫ই অক্টোবর তারিখে স্বামীজী মারী হইতে রাওয়ালপিণ্ডি যান। সেখানে তিনি মিঃ হংসরাজের অতিথি হন। এবং দুই দিন পরে সুজন সিং'এর বাগানে 'হিন্দুধর্ম' সম্বন্ধে দুই ঘণ্টাকালব্যাপী একটি বক্তৃতা দেন। ইহা ব্যতীত, লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করা, কথোপকথনে নিযুক্ত হওয়া ও নানাস্থানে আহারের নিমন্ত্রণ রক্ষা করা, ইত্যাদি কার্যে তিনি এখানে সর্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন।

২০শে অক্টোবর রাত্রে তিনি কাশ্মীরের মহারাজার আমন্ত্রণে

(গুডউইন ও অপর সঙ্গীগণ সহ) জম্মু যান ও তথায় রাজ-অতিথি হইয়া থাকেন। ২৩শে অক্টোবর মহারাজার সহিত তাঁহার প্রায় চারঘণ্টাকাল ব্যাপী একটি সুদীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয়। তখন সেখানে মহারাজার দুই ভাই ও প্রধান রাজকর্মচারীগণও উপস্থিত ছিলেন। এই আলোচনাকালে স্বামীজী প্রসঙ্গক্রমে বলেন, "সমাজের অর্থহীন নিয়মগুলি আঁকড়াইয়া থাকা এক মহা নির্বুদ্ধিতা। আমাদের গত সাতশ বছরের দাসত্বের মুল কারণ হচ্ছে, ধর্মের সত্য আদর্শ সকল সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা ও অন্ধভাবে সকল প্রকারের কুসংস্কারগুলি অনুসরণ করে চলা।" এবং ইহা তিনি ইতিহাসের দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়া বলেন, "আজকাল ব্যভিচারাদি প্রকৃত পাপানুষ্ঠানে আমাদের জাত যায় না। যত পাপ, যত সামাজিক অপরাধ সব খাদ্যসম্পর্কিত।" তারপর তিনি সমুদ্রযাত্রা ও শিক্ষা সমাপ্ত করিবার জন্য বিদেশ ভ্রমণের আবশ্যকতা বুঝাইয়া, ইউরোপে ও আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের সার্থকতা, তাঁহার জীবনোদ্দেশ্য এবং ভারতের জন্য তাঁহার কার্য-পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কথা বলেন। এবং পরিশেষে এই বলিয়া তাঁহার বক্তব্য শেষ করেন, "আমার দেশের হিত করার ফলে যদি আমার নরকে যেতে হয়, তাও আমি এক মহা সৌভাগ্য মনে করব।"

পরের দিন (২৪শে অক্টোবর) স্বামীজী সাধারণের সমক্ষে একটি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাটি শুনিয়া মহারাজা এত সন্তুষ্ট হন যে, তিনি তাঁহাকে তৎপরদিনই আর একটি এবং তাহার পর আরও দশ-বারো দিন জম্মুতে থাকিয়া একদিন অন্তর একটি করিয়া বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করেন। মহারাজার ইচ্ছানুসারে স্বামীজী ২৫শে অক্টোবর বৈকালে দুই ঘণ্টা কালব্যাপী একটি বক্তৃতা দেন। ইহার পরের তিন দিন তিনি প্রধানতঃ দর্শনকামী ব্যক্তিদের সহিত ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। এই সকল ব্যতীত, জম্মু অবস্থানকালে তিনি স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল পাওয়ার হাউস, লাইব্রেরি ও দেওয়ালি উৎসবের আলোক-সজ্জা দর্শন করেন। এবং জানা যায়,

জম্মুতে তিনি প্রধানতঃ হিন্দী ভাষায় কথা বলিয়াছেন ও বক্তৃতা দিয়াছেন।

ইতিমধ্যে শিয়ালকোট হইতে একদল প্রতিনিধি তাঁহাকে তথায় যাইবার জন্য এক জরুরী আমন্ত্রণ লইয়া আসায়, স্বামীজী ২৯শে অক্টোবর তারিখে মহারাজার নিকট হইতে বিদায় লইয়া শিয়ালকোট রওনা হইয়া যান। বিদায় দিবার সময় মহারাজা তাঁহাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিয়া বলেন, তিনি যখনই জম্মু বা কাশ্মীর আসিবেন তিনি তখনই যেন তাহার অতিথি হন।

শিয়ালকোটে স্বামীজী লালা মূলচাঁদ, এম্ এ, এল্এল্ বি, মহাশয়ের অতিথি হন। এবং সেখানে তিনি ব্যবস্থানুসারে দুইদিন থাকেন ও দুইটি বক্তৃতা দেন—একটি ইংরেজিতে ও একটি হিন্দীতে। দেখা যায়, এই বক্তৃতা দুইটিতে এবং তাঁহার এইকালের সকল বক্তৃতাতেই স্বামীজী একটি বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দিতেন এবং তাহা হইতেছে ধর্মকে ব্যবহারিক জীবনে কার্যকরী করা। এবং তাঁহার ঐ কথানুসারে কাজ করাইবার জন্য, তিনি যেখানে যাইতেন সেখানেই তাঁহার শ্রোতাগণকে স্থানীয় প্রয়োজনানুযায়ী প্রতিষ্ঠান সকল গড়িয়া তুলিতে প্রেরণা ও উৎসাহ দিতেন। এইভাবে তাঁহার প্রেরণায় শিয়ালকোটে অবিলম্বে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য শহরের প্রভাবশালী ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করা হয়। লালা মূলচাঁদ ঐ কমিটির সেক্রেটারি হন।

শিয়ালকোট হইতে স্বামীজী লাহোর যান। লাহোরের রেল স্টেশনে এক বিপুল জনতা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করে। তারপর তাঁহাকে গাড়ীতে করিয়া প্রথমে রাজা ধ্যান সিং'এর প্রাসাদে লইয়া যাওয়া হয় এবং পরে তিনি তথা হইতে তাঁহার বাল্যবন্ধু ও "লাহোর ট্রিবিউনের" সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের বাড়ীতে গিয়া থাকেন। লাহোরে স্বামীজী মোট দশ দিন ছিলেন। এবং ঐ সময় মধ্যে তিনি তিনটি বক্তৃতা দেন। প্রথমটি দেন ৫ই নভেম্বর (১৮৯৭) ধ্যান সিং'এর পুরাতন প্রাসাদ-প্রাঙ্গনে (বিষয়—হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তিসমূহ)।

দ্বিতীয় বক্তৃতাটি দেন ৯ই নভেম্বর প্রফেসর বোসের সার্কাস প্যাণ্ডালে (বিষয়—ভক্তি)। এবং তৃতীয় বক্তৃতা দেন ১২ই নভেম্বর (বিষয়—বেদান্ত)। কয়টি বক্তৃতাতেই খুব ভিড় হয়। তৃতীয় বক্তৃতাটির উদ্‌যোক্তা ছিলেন লাহোরের চারটি কলেজের ছাত্রগণ। বক্তৃতাটি সুদীর্ঘ ও অত্যুৎকৃষ্ট এবং উহা দিতে স্বামীজীর দুই ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। এই সুবিখ্যাত বক্তৃতাটি লাহোরে প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। এবং শহরের যেসকল ছাত্র প্রায় সকল সময়েই স্বামীজীর নিকটে থাকিত, তাহাদের দ্বারা তিনি উহা অবিলম্বে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করাইবার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার উপদেশে তাহারা তাঁহার উপস্থিতি-কালেই স্থানীয় দুঃস্থ, পীড়িত ও অশিক্ষিত দরিদ্রদের সাহায্য, শুশ্রূষা ও নৈশ শিক্ষা-দান করিবার উদ্দেশ্যে একটি অসাম্প্রদায়িক সংঘ স্থাপন করে।

লাহোরে স্বামীজীর বহু লোকের সহিত দেখাসাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়। বিশেষভাবে তিনি সেখানে আর্যসমাজী ও সনাতনী হিন্দুদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনের প্রয়াস পান ও তাহাতে অন্ততঃ তখনকার জন্য সাময়িকভাবে কৃতকার্য হন। এই উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহাকে সমভাবে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন এবং দলে দলে তাঁহার কথা শুনিতে আসিতেন।

সমতল প্রদেশের গরমে স্বামীজীর স্বাস্থ্য এই সময়ে ভাল যাইতেছিল না। তাই, লাহোরে মাত্র দশ দিন থাকিয়া তিনি সঙ্গের সকলকে লইয়া দেরাদুন চলিয়া গেলেন। দেরাদুনে স্বামীজী বেশ শান্ত পরিবেশেই ছিলেন ও তখন সঙ্গের শিষ্যগণকে ব্রহ্মসূত্রের রামানুজভাষ্য পড়াইতে রত হন।

কিন্তু এই সময়ে খেত্‌ড়ির মহারাজা তাঁহাকে একবার খেত্‌ড়ি যাইবার জন্য পুনঃপুনঃ আমন্ত্রণ করিতে থাকেন। তাই, তিনি দেরাদুনে মাত্র দিন দশেক থাকিয়া খেত্‌ড়ি অভিমুখে রওনা হইলেন। পথে তিনি দিল্লী, আলোয়ার ও জয়পুরে অবতরণ করেন।

দিল্লীতে স্বামীজী ধনী ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ গ্রহণ না করিয়া, তাঁহার

পরিব্রাজক জীবনে পরিচিত হাতরাসের নটকৃষ্ণের অতিথি হইয়া থাকেন। এখানে তিনি একদিন বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আসরে সুদীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করেন। তদ্ব্যতীত, তিনি মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়ার সহ সঙ্গের শিষ্য ও গুরুভাইদের লইয়া দিল্লীর মোগল আমলের সমস্ত স্মৃতিসৌধ সকল দর্শন করেন। সঙ্গের একজন বলিয়াছেন, "(এই সময়ে) তিনি আমাদের সম্মুখে অতীতকে পুনর্জীবিত করেন। এবং তখন আমরা সত্যসত্যই বর্তমান ভুলিয়া অতীতকালের মহাশক্তিশালী মৃত রাজা ও সম্রাটদের সহিত বাস করিয়াছি।"

দিল্লী হইতে স্বামীজী আলোয়ার যান। সেখানে তাঁহাকে বিপুল-ভাবে অভ্যর্থনা করা হয় এবং তাঁহার অনুগামীগণের চেষ্টায় মহারাজার একটি বাড়ীতে তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা হয়। মহারাজা এই সময়ে আলোয়ারে না থাকায়, প্রধান রাজকর্মচারীগণ তাঁহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করেন। তবে এইবার তাঁহার এখানে আসিবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তাঁহার পুরাতন বন্ধু ও শিষ্যগণের সহিত সাক্ষাৎ করা। এই সাক্ষাৎ ও পুনর্মিলনের কয়েকটি ঘটনা খুবই মর্মস্পর্শী। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, রেল স্টেশনে যখন স্বামীজীর অভ্যর্থনা-অনুষ্ঠান চলিতেছিল, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন তাঁহার একটি ভক্তিমান দরিদ্র শিষ্য সামান্য পোশাকে কিছু দূরে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়াই তিনি ঐ অনুষ্ঠানের মধ্যেই তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, "রামাস্নেহী! রামাস্নেহী!" এবং তারপর তাঁহার নির্দেশে সম্ভ্রান্ত লোকদের ভিড় ঠেলিয়া তাহাকে তাঁহার কাছে আনা হইলে, তিনি তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার সহিত পূর্বের ন্যায় খোলাভাবে আলাপ করিতে লাগিলেন।

এই শ্রেণীর আর একটি ঘটনা অতি করুণ। পূর্ববারে স্বামীজী আলোয়ারের একটি দরিদ্র বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া তাহার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবারে তিনি নিজেই তাহাকে সংবাদ পাঠাইলেন যে তাহার হাতের চাপাটি খাইতে তাঁহার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে। বৃদ্ধা আনন্দে অধীর হইয়া স্বামীজীর জন্য

আহার্য প্রস্তুত করিলেন এবং পরিবেশনকালে দুঃখের ভয়ে কহিলেন, "বাবা, আমি গরীব, আমি তোমাকে ভাল খাবার কোথা থেকে দেব ?" স্বামীজী তৃপ্তির সহিত ঐ খাবার খাইতে খাইতে শিষ্যদের নিকট বলিতে লাগিলেন, "দেখ, এই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি কি ভক্তিমতী ও কিরূপ মাতৃভাবাপন্ন। এর হাতের তৈরী এই মোটা চাপাটিগুলি কি সাত্ত্বিক!" এবং তাহার দারুণ অভাবের বিষয় জানিয়া, তিনি ফিরিবার সময় তাহার অজ্ঞাতে বাড়ীর অভিভাবকের হাতে একখানি একশত টাকার নোট গুঁজিয়া দিলেন।

কয়েকদিন আলোয়ারে থাকিয়া স্বামীজী জয়পুর গেলেন ও সেখানে 'খেতড়ি হাউসে' বিশ্রাম লইলেন। তারপর তথা হইতে তিনি (নব্বই মাইল দূরবর্তী) খেতড়ি রওনা হইলেন। খেতড়িরাজ নিজে বার মাইল অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা ও তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। তাঁহারা খেতড়ি পৌঁছিতেই, ক্ষুদ্র রাজ্যটি দুইটি সম্মিলিত আনন্দোৎসবে মাতিয়া উঠিল। ইহার একটি ছিল খেতড়ি-রাজের সম্মান ও সংবর্ধনার জন্য। কারণ, তিনি মাত্র অল্প কিছুদিন পূর্বে ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়াছিলেন। অপরটি ছিল রাজগুরু স্বামীজীর আগমন ও অভ্যর্থনা উপলক্ষে। এই উৎসবে জায়-গিরদার ও প্রজাগণ বিপুল ভোজ, আলোকসজ্জা ও বাজি পোড়াইবার ব্যবস্থা করেন। তাহাদের পক্ষ হইতে রাজা ও স্বামীজীকে পৃথক পৃথক মানপত্র দেওয়া হয় এবং তাঁহারা উভয়ে উহার যথাযোগ্য উত্তর দেন।

ইহার পর ১১ই ডিসেম্বর তারিখে স্থানীয় স্কুলে একটি বিরাট সভা হয়। তাহাতে রাজা ও স্বামীজীকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে মানপত্র দেওয়া হয়। এই মানপত্রগুলির মধ্যে একটি ছিল রাজার সম্মানার্থ স্বয়ং স্বামীজীর প্রদত্ত। তিনি কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ হইতে এই মানপত্রটি প্রদান করেন। ইহার উত্তরে রাজা বলেন, 'স্বামীজীর উপদেশেই রাজ্যে জনসাধারণের শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক উন্নতিসাধন করা হইয়াছে এবং বর্তমানে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা সকলের

উন্নয়নের চেষ্টা করা হইতেছে।' পরিশেষে স্বামীজী একটি বক্তৃতায় রাজা ও প্রজাগণকে ধন্যবাদ জানাইয়া বলেন, "ভারতের উন্নতির জন্য আমি যে সামান্য কাজ করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহা রাজার সহিত আমার সাক্ষাৎ না হইলে করা সম্ভব হইত না।"

প্রথানুসারে এই অভ্যর্থনা সভায় প্রজাগণ পাঁচটি বৃহৎ পাত্র স্বর্ণ-মুদ্রায় পূর্ণ করিয়া রাজাকে উপহার দেন। উহার অধিকাংশই রাজা রাজ্যের বিদ্যালয়সমূহের উন্নতি-সাধনের জন্য দান করিলেন। ইহার পর, প্রজা ও রাজকর্মচারীগণ সকলেই একে একে আসিয়া স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া প্রত্যেকে দুই টাকা করিয়া তাঁহাকে প্রণামী দিলেন। স্বামীজীর খেত্‌ড়ি ত্যাগকালে, মহারাজা তাঁহার কলিকাতার মঠের জন্য তিন হাজার টাকা দান করেন। ঐ টাকা স্বামী সদানন্দ ও স্বামী সচ্চিদানন্দের দ্বারা মঠে পাঠানো হয়।

খেত্‌ড়িতে স্বামীজী তাঁহার শিষ্য ও গুরুভাইগণ সহ মহারাজার একটি মনোরম বাংলোতে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ বাংলোর হলে তিনি ২০শে ডিসেম্বর তারিখে 'বেদান্ত' সম্বন্ধে দেড় ঘণ্টাব্যাপী একটি অতি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। তবে অসুস্থ শরীরে এক ঘণ্টা বক্তৃতা দিবার পর ক্লান্তিবশতঃ তাঁহার কিছুক্ষণ বিশ্রাম লইতে হইয়াছিল। তারপর তিনি আর আধ ঘণ্টা বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাটি খেত্‌ড়িবাসীগণের মনে একটি স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। এইদিনকার সভায় কয়েকটি ইওরোপীয় নরনারীও উপস্থিত ছিলেন।

এইভাবে প্রায় একপক্ষকাল খেত্‌ড়ি থাকিয়া স্বামীজী জয়পুরে ফিরিয়া আসিলেন। রাজাও তাঁহার সঙ্গে ঐ পর্যন্ত আসিলেন। জয়পুরের অধিবাসীগণের অনুরোধে (রাজার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত) একটি সভায় স্বামীজী একটি বক্তৃতা দেন।

জয়পুর হইতে স্বামীজী কিষেণগড়, আজমীড়, যোধপুর ও ইন্দোর হইয়া খাণ্ডোয়া যান। যোধপুরে স্বামীজী তথাকার দেওয়ান রাজা স্যার প্রতাপ সিং'এর অতিথি হইয়া প্রায় দশদিন থাকেন। খাণ্ডোয়াতে তিনি তাঁহার পূর্ব-পরিচিত হরিদাস চ্যাটার্জির অতিথি

হন। সেখানে তাঁহার প্রবল জ্বর হয়, তবে অল্পেই সারিয়া উঠেন। খাণ্ডোয়াতে প্রায় এক সপ্তাহ থাকিয়া স্বামীজী কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন (১৮৯৮, জানুআরি)। খাণ্ডোয়া-ত্যাগের পূর্বদিন রাত্রে হরিদাসবাবু তাঁহার নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করেন। কিন্তু যে কারণেই হউক স্বামীজী তাঁহাকে দীক্ষা দেন না এবং নানা উপদেশ দিয়া ঐ চেষ্টা হইতে বিরত করেন।

খাণ্ডোয়া-ত্যাগের সঙ্গেই স্বামীজী তাঁহার ভারতবর্ষের বক্তৃতা-অভিযান শেষ করেন।

১৮৯৮

এইভাবে ভারতকে তাঁহার বাণী শুনাইবার কাজ শেষ হইয়া আসিলে, স্বামীজী তাঁহার সঙ্কল্পিত (কলিকাতার) মঠটি অবিলম্বে স্থাপনের জন্য যারপরনাই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি দেখিতে-ছিলেন, তিনি অসুস্থ ও ক্লান্ত,—জীবনের স্বল্প কয়েকটি অবশিষ্ট বৎসরের দিনগুলি দ্রুত ফুরাইয়া আসিতেছে। এবং উহারই মধ্যে তাঁহার জীবনের কাজ স্থায়ী করিবার জন্য তাঁহার মঠ তৈরী ও লোক-তৈরীর কার্য দুইটি পাকাপাকিভাবে সম্পূর্ণ করিতে হইবে। আবার, উহার প্রথমটি না হইলে, দ্বিতীয়টিকে সুসম্পন্ন বা স্থায়ী করা অসম্ভব ছিল। তাই, মঠ-স্থাপনের জন্য স্বামীজী তাঁহার উত্তর ভারতের বক্তৃতা-সফরের শেষের দিকে অধীর হইয়া উঠেন। লাহোর হইতে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে এক পত্রে (১১ই নভেম্বর, ১৮৯৭) তিনি লিখেন, "এবার লেকচারাদি আর নয়।······মঠ না করে আর কথা নয়।" এবং ঐ স্থান হইতেই অন্য এক পত্রে (১৫ই নভেম্বর, ১৮৯৭) একটি স্ত্রীভক্তের নিকট তিনি লিখেন, "কলিকাতায় এক মঠ হইলে আমি নিশ্চিন্ত হই। এত যে সারা জীবন দুঃখ-কষ্টে কাজ করিলাম, সেটা (মঠ হইলে) আমার শরীর যাওয়ার পর নির্বাণ যে হইবে না, সে ভরসা হয়।"

কিন্তু এই মঠের যে বিরাট পরিকল্পনা তাঁহার মস্তিষ্কে রচিত

হইয়াছিল, তাহা কোন অল্প পরিমাণ অর্থের দ্বারা কার্যে পরিণত করা সম্ভব ছিল না। তাই, তাঁহার প্রয়োজনীয় অর্থ-সংগ্রহের জন্য তাঁহার চিন্তারও অবধি ছিল না। এবং প্রধানতঃ ঐ উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি খেত্‌ড়িরাজ, লিম্বডির ঠাকুর সাহেব প্রভৃতির আমন্ত্রণে রাজপুতানা, কাথিয়াওয়াড় ইত্যাদি স্থানে যাইবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি তিনি রাজপুতানার পরে খাণ্ডোয়া গিয়াই তথা হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। অসুস্থ শরীরে কষ্ট করিয়া আর ভ্রমণ করেন নাই।

ইহার হেতু এই। অনেক চেষ্টা-অনুসন্ধানের পরে, এই সময়ে (কলিকাতার সন্নিকটস্থ) বেলুড় গ্রামের গঙ্গাতীরে মঠের উপযোগী সুপ্রশস্ত জমির সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। এবং ভগবানের ইচ্ছায় উহা ক্রয় করিবার ও উহার উপর মঠ নির্মাণ করিবার আবশ্যকীয় টাকার ব্যবস্থাও হইয়া গিয়াছিল। জমি কিনিবার অধিকাংশ টাকা দেন স্বামীজীর ইংরেজ শিষ্যা ও বন্ধু মিস্ মূলার। স্বামীজী কলিকাতায় ফিরিয়া ঐ টাকার সাহায্যে বেলুড়ের গঙ্গাতীরে একটি একতলা পাকা বাড়ী সহ প্রায় পনর একর জমি খরিদ করিলেন (১৮৯৮, ফেব্রুআরি)। তৎপর উহার উপর মঠ স্থাপন জন্য প্রয়োজন হইল আরও তিনটি কার্যের সুসাধন। প্রথম, ক্রীত জমি উঁচুনীচু ও খানাখন্দময় থাকায় উহা ভরাট করিয়া সমান করা ; দ্বিতীয়, ক্রীত একতলা পাকা-বাড়িটি বে-মেরামতে থাকায় উহা মেরামত করা ও উহা মঠবাড়ীরূপে ব্যবহারের জন্য উহার উপর একটি নূতন তলা (অর্থাৎ, দ্বিতল) সংযোগ করা ; এবং তৃতীয়, মঠের জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করা। এই তিনটি কাজের প্রথম দুইটি স্বামীজী তাঁহার লণ্ডনের শিষ্যগণের নিকট হইতে পূর্বে প্রাপ্ত টাকার দ্বারাই সুসিদ্ধ করিতে সক্ষম হইলেন। আর তৃতীয় কাজটির টাকা আসিল, স্বামীজীকে মঠের জন্য তাঁহার ভবিষ্যৎ ভাবনা হইতে মুক্ত করিয়া, সম্পূর্ণ ভিন্ন দিক হইতে। স্বামীজীর আমেরিকান শিষ্যা ও জননীস্বরূপা মিসেস্ ওলি বুল তাঁহার মঠ স্থাপনের কার্যের সাহায্যের জন্য এই সময়ে একটি মোটা টাকা

তাঁহাকে দিলেন। এই টাকাই ছিল স্বামীজীর প্রাপ্ত সর্বাপেক্ষা বড় দান। এবং ইহার একাংশের দ্বারা তিনি মঠের মন্দির নির্মাণ করিলেন এবং বক্রী অংশের দ্বারা মঠের ব্যয় নির্বাহার্থ একটি স্থায়ী ফাণ্ড বা এনডাউমেণ্ট স্থাপন করিলেন। এই এনডাউমেণ্ট সহ সমস্ত মঠ-বাড়ীর নির্মাণে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হয়।

মিস্ মুলারের টাকা পাওয়ার অল্প পরেই মিসেস্ বুলের টাকা স্বামীজীর নিকট পৌঁছে। তাহা হইলেও, উপরি-বর্ণিত কাজ কয়টি সম্পূর্ণ করিতে নয়-দশ মাস সময় আবশ্যক হয়। তাই, ঐ সকল কার্য দেখাশুনা করিবার সুবিধার জন্য স্বামীজী জমি ক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আলমবাজার মঠ (ঐ ক্রীত জমি হইতে অদূরবর্তী) বেলুড়ের নীলাম্বরবাবুর ভাড়াটিয়া বাগানবাড়ীতে উঠাইয়া আনিলেন (১৮৯৮, ফেব্রুআরি)।

অন্যদিকে দেখা যায়, স্বামীজী যখন উক্তরূপে মঠ প্রতিষ্ঠার কার্যে ব্যস্ত, তখন (এবং বস্তুতঃ খাণ্ডোয়া হইতে কলিকাতায় ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গেই) তিনি পূর্বের ন্যায় উদ্দামভাবে তাঁহার লোক তৈরীর কার্যেও নিযুক্ত হন। আলমবাজার মঠে, বলরাম বাবুর বাড়ীতে এবং বেলুড়ের উক্ত নীলাম্বরবাবুর ভাড়াটিয়া মঠ-বাড়ীতে—ইহার যেখানে যখন তিনি রহিয়াছেন, তখন সেখানেই তিনি মঠের যুবক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণকে শিক্ষা দিতে রত হইয়াছেন। নিয়মিত ক্লাস গ্রহণ পূর্বক শাস্ত্র ব্যাখ্যা, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং নানা বিষয়ে উপদেশ, কথোপকথন ও বক্তৃতাদির দ্বারা তিনি তাহাদের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান ও আদর্শের সহিত সুপরিচিত করাইয়া দিবার প্রয়াস পাইতেন। মাঝে মাঝে তিনি তাহাদের তাঁহার সমক্ষে বক্তৃতা দিতেও আহ্বান করিতেন। আবার, কখন কখন তাহাদের সহিত একত্রে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যান, সঙ্গীত বা অধ্যয়নে কাটাইতেন। আর তৎসঙ্গে সুযোগ হইলেই, তিনি তাহাদের কায়িক শ্রমের কাজেও নিযুক্ত করিতেন। ইহা ব্যতীত, তাঁহার এই শিক্ষাদানের কার্যের কোন বিরাম-বিরতি ছিল না। এমন কি, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন উত্তর-

ভারত ভ্রমণ জন্য কলিকাতা হইতে অনুপস্থিত ছিলেন, তখনও তিনি তাঁহার এই কাজ বন্ধ হইতে দেন নাই। তখন ইহা চালাইবার ভার তিনি সুযোগ্য স্বামী তুরীয়ানন্দের উপর রাখিয়া যান এবং তাহার দ্বারা ইহা অতি উত্তমভাবে চালিত হইয়াছে দেখিয়া তিনি যারপরনাই সন্তুষ্ট ও আশান্বিত হন। অবশ্য তাঁহার এই অমূল্য কাজটি কিভাবে, কত ধারায় চলিত তাহার খুঁটিনাটির মধ্যে প্রবেশ করিবার সুযোগ আমাদের নাই। তবে সংক্ষেপতঃ ইহা ছিল আত্মোন্নতি ও আত্মোৎসর্গের এক মহোজ্জ্বল ও মহা উদ্দীপনাময় বহুমুখী শিক্ষা। ইহার লক্ষ্য ছিল আত্মার মুক্তি ও জগতের হিত। ইহার তুলনা ছিল না।

মঠের যুবক সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীগণকে এইরূপ সর্বতোমুখী শিক্ষাদানের কার্যের সঙ্গে, আবার সত্বরই আসিয়া জুটিল স্বামীজীর কয়েকটি পাশ্চাত্য শিষ্যাকেও তাহাদের উপযোগী শিক্ষা দিবার দায়িত্ব। স্বামীজীর আইরিশ শিষ্যা মিস্ মার্গারেট নোব্‌ল্ ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুআরি তারিখে কলিকাতায় আসেন। তাহার প্রায় দুই সপ্তাহ পরে ৮ই ফেব্রুআরি তারিখে ভারতবর্ষ দর্শনের নিমিত্ত (আমেরিকা হইতে স্বামী সারদানন্দের সহিত) কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছেন মিসেস্ ওলি বুল ও মিস্ ম্যাকলাউড। তাহারা মঠের নূতন জমির উপরিস্থিত খোলামেলা একতলা বাড়ীটি দেখিয়া সেখানে থাকাই পছন্দ করেন। এবং উহা যথোচিতভাবে মেরামত ও আসবাবপত্রাদির দ্বারা সজ্জিত হইলে, মার্চ মাসের প্রথম দিকে তাহারা ঐ বাড়ীতে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে স্বামীজী তাঁহার গুরুভাইদের সহিত নীলাম্বর বাবুর ভাড়াটিয়া বাড়ীতে থাকিতেন। সেখান হইতে তিনি প্রতিদিন সকালে আসিয়া ঐ মহিলা দুইটির সঙ্গে দুই-তিন ঘণ্টা সময় কাটাইয়া যাইতেন। অল্প কয়েকদিন পরে তাহারা স্বামীজীর নিকট শুনিলেন যে মিস্ মার্গারেট নোব্‌ল্ও তখন কলিকাতাতেই (সম্ভবতঃ পার্ক ষ্ট্রীটে) আছেন। শুনিয়া তাহারা তখনই মিস্ নোব্‌ল্কে তাহাদের অতিথি হইয়া থাকিতে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। ইহার পরের দিনই মিস্ নোব্‌ল্ সেখানে

আসিয়া তাহাদের সহিত একত্রে বাস করিতে লাগিলেন। এবং তখন হইতেই আরম্ভ হইল স্বামীজীর আর একটি উদ্দাম, উদ্দীপনাময় ও অত্যুচ্চ ধরনের মহামূল্যবান শিক্ষাদানের কার্য। এই শিক্ষার প্রধান বিষয় ছিল—এই পাশ্চাত্য মহিলা তিনটির নিকট ভারতকে ব্যাখ্যা করা, তাহার ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি কি মহান, কি গৌরবময়, কত যুগের কত সাধনা ও সত্যানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত, কত অভিজ্ঞতা উহাদের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল, ইহা তাহাদের বুঝাইয়া দেওয়া। আর শুধু ব্যাখ্যাই নয়। ভারতকে ভালবাস, ভারতের নিকট প্রণত হও, ভারতের ভালমন্দ সব কিছুকেই স্নেহ-প্রীতির চক্ষে দেখো—এই আহ্বান ধ্বনিত হইতে থাকিত স্বামীজীর প্রতিটি কথায়, প্রতি আত্মভোলা আবেগময় ভাষণে। অপূর্ব বাক্যচ্ছটায় তিনি তাহাদের চোখের সম্মুখে ফুটাইয়া তুলিতেন ভারতের শতাব্দীর পর শতাব্দী, পুনর্জীবিত করিয়া তাহাদের সামনে আনিয়া খাড়া করিতেন তাহার রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধকে, তাহার গুরু নানক ও গুরু গোবিন্দকে, তাহার শিবাজী, রাণা প্রতাপ, ঝাঁসীর রাণীকে, তাহার মহামহিমান্বিতা অতুলনীয়া সীতাকে, তাহার প্রতিগৃহের ধর্ম ও কর্তব্যপরায়ণা প্রতিটি নারীকে, তাহার সরল, ধর্মভীরু ও অতিথিসেবাপরায়ণ দরিদ্র চাষীকে। কি মহিমা, কি গরিমা! কি প্রাণ উজ্জ্বল করা কাহিনী সকল!

স্বামীজী প্রতিদিন সকালে এই মহিলা তিনটির কুটিরে আসিতেন ও উহার প্রাঙ্গনের বৃক্ষতলে বসিয়া কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া তাহাদের এইরূপ কথা সকল বলিতেন, আর মহিলা কয়টি স্তব্ধ, মুগ্ধ ও ভাবাচ্ছন্ন হইয়া তাহা শুনিতেন। ইহাদের তিনজনকেই তিনি এইভাবে শিক্ষা দিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ও নাড়াচাড়ার বিষয় ছিল মিস্ মারগারেট নোব্‌ল্। প্রধানতঃ তাহার জন্যই তাঁহার এই প্রাণপাত করা শ্রম।

মিস্ নোব্‌ল্ ভারতে আসিয়াছিলেন স্বামীজীর পরিকল্পিত ভারতের নারীদের কাজে জীবনোৎসর্গ করিতে। তাই, কলিকাতার জনসাধারণের নিকট তাহাকে পরিচিত করাইবার উদ্দেশ্যে, স্বামীজী

১১ই মার্চ তারিখে ষ্টার থিয়েটারে তাহার জন্য একটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। স্বামীজী নিজে এই সভায় সভাপতি হন এবং একটি ছোট বক্তৃতার দ্বারা মিস্ নোবল্‌কে সভার নিকট পরিচয় করাইয়া দেন। মিস্ নোবলের বক্তৃতার বিষয় ছিল "ইংলণ্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব।" এই সভায় স্বামীজীর আহ্বানে মিসেস্ বুল ও মিস্ মুলারও কিছু বলেন। মিস্ মুলার এই সময়ে কলিকাতাতেই ছিলেন।

ইহার কয়েকদিন পরে (স্বামীজীর পরিচালনায়) মিসেস্ বুল, মিস্ ম্যাকলাউড ও মিস্ নোবল্ ১৭ই মার্চ তারিখে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে তাঁহার ১০।২ নং বোসপাড়া লেনের বাড়ীতে যান। মা তাহাদের সাদরে গ্রহণ করিয়া বিশেষ আদর যত্ন করেন। তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার কথা শুনিয়া পাশ্চাত্য মহিলা কয়টি যারপরনাই মুগ্ধ ও প্রভাবিত বোধ করেন। বিশেষ, মিস্ নোবল্ তাঁহাকে আর কখন ভুলিতে পারেন নাই।

ইহার পরের স্মরণীয় ঘটনা হইতেছে ২৫শে মার্চ তারিখের। আমরা দেখিয়াছি ইংলণ্ডে থাকিতেই স্বামীজী মিস্ নোবলের মেধা, বুদ্ধি ও আন্তরিকতায় আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে ভারতের নারীদিগের কাজে পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন। এখন তাঁহার ঐ আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া মিস্ নোবল্ ভারতে আসিয়াছেন। তাই, স্বামীজী কিছু মাত্র দ্বিধা না করিয়া উক্ত ২৫শে মার্চ তারিখে (১৮৯৮) তাহাকে মঠের ঠাকুর ঘরে লইয়া ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত ও "নিবেদিতা" নাম দান করিলেন। দীক্ষার পূর্বে তিনি তাহাকে শিবপূজা করিতে শিখাইলেন এবং দীক্ষার শেষে তাহার দ্বারা শ্রীবুদ্ধের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়াইয়া বলিলেন, "যাও, এখন তাঁকেই অনুসরণ করে চল, যিনি বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে পরার্থে পাঁচ শতবার জন্মগ্রহণ ও জীবন দান করেছিলেন।"

নিবেদিতাকে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করিবার চার দিন পরে, ২৯শে মার্চ তারিখে স্বামীজী স্বামী স্বরূপানন্দ ও স্বামী সুরেশ্বরানন্দকে সন্ন্যাস

দান করেন। কিন্তু তাহার পরের দিনই (৩০শে মার্চ তারিখে) তিনি বিশ্রাম লইবার জন্য কলিকাতা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইহার হেতু এই। খাণ্ডোয়া হইতে ফিরিবার পর স্বামীজীর স্বাস্থ্য ভাল যাইতেছিল না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি কোন বিশ্রাম লন নাই। দেখা যায়, উপরি-বর্ণিত ক্লান্তিকর কাজগুলি ব্যতীত, তিনি আরও নানা কাজ করিতেন। তিনি ঠাকুরের গৃহীভক্তদের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়া তাহাদের সহিত দেখা করিতেন, মঠে বা বলরামবাবুর বাড়ীতে বহু লোক প্রতিদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত এবং দেশ-বিদেশে তাহার বহু চিঠি-পত্রাদি লিখিতে হইত। আবার, অনেক ভক্ত নানা উপলক্ষে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের নিজেদের বাড়ীতেও লইয়া যাইতেন। এই শেষোক্ত ঘটনাগুলির একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ৬ই ফেব্রুআরি তারিখে (১৮৯৮) স্বামীজী নিমন্ত্রিত হইয়া সদলবলে রামকৃষ্ণপুর গিয়া ঠাকুরের গৃহীভক্ত নবগোপাল ঘোষের নবনির্মিত বাড়ীর মন্দিরে ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন একটি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে, যাহা এই অনুষ্ঠানটিকে চির-স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। প্রতিষ্ঠা-কার্য সুসম্পন্ন করিয়া স্বামীজী পূজাসনে বসিয়া ধ্যান করিতেছিলেন। এমন সময়ে ঐ অবস্থাতেই ঠাকুরের প্রসিদ্ধ প্রণাম মন্ত্রটি হঠাৎ আপনা হইতেই তাঁহার মনে রচিত হইয়া উঠে—

স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

যাহা হউক, এইভাবে অসুস্থ শরীরে নানা কাজে অবিশ্রাম পরিশ্রম করায় স্বামীজী পুনরায় অত্যন্ত দুর্বল ও ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। এবং ডাক্তারগণ তাঁহার শরীর পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, তাঁহার এখন কোন গুরু বিষয়ে চিন্তা করাও অনিষ্টকর। তাই, তাহাদের উপদেশে তিনি বিশ্রামের জন্য কলিকাতা হইতে পূর্বোক্ত ৩০শে মার্চ তারিখে দার্জিলিঙ রওনা হইয়া গেলেন। সেখানে তিনি পূর্ববারে যে পরিবারের অতিথি হইয়াছিলেন, এবারেও তাহাদের কাছেই রহিলেন।

কিন্তু তাঁহার শরীর আংশিক ভাল হইতেই তিনি সংবাদ পাইলেন যে, কলিকাতায় প্লেগ দেখা দিয়াছে এবং লোক সকল ভয়ে এখানে সেখানে পলাইয়া যাইতেছে। সংবাদটি পাইয়াই তিনি অবিলম্বে কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন এবং যেদিন পৌঁছিলেন (৩রা মে, ১৮৯৮), সেই দিনই তিনি জনসাধারণের মধ্যে বিতরণের জন্য প্লেগ সম্বন্ধে দুইটি ইস্তাহার (একটি বাংলায় ও একটি হিন্দীতে) রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপর তাঁহার নিজ শিষ্য ও সেচ্ছাসেবকগণকে প্লেগ-অধ্যুষিত অঞ্চলের পাড়ায় পাড়ায় পাঠাইয়া লোকদিগকে সাহস দেওয়া, রোগীদিগের সেবাশুশ্রূষা করা এবং বাড়ী ও রাস্তাগুলির ময়লা পরিষ্কার করা ইত্যাদির কার্যে নিযুক্ত করিলেন। জানা যায়, তিনি এই সকল কাজ করাইতে উদ্যোগী হইলে তাঁহার একজন গুরুভাই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "স্বামীজী, এই কাজের টাকা কোথা থেকে আসবে?" ইহাতে স্বামীজী দৃঢ়ভাবে উত্তর দেন, "কেন, দরকার হলে আমরা মঠের নূতন জমিটা বেচে টাকা তুলব। আমরা সন্ন্যাসী, গাছতলায় থাকব ও ভিক্ষা করে খাব।" অবশ্য সত্যসত্যই এইরূপ কোন চরম উপায় গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন হয় নাই। কারণ কার্যারম্ভের আবশ্যকীয় টাকা সহজেই জুটিয়া গিয়াছিল। তাঁহার উল্লিখিত দ্রুত ব্যবস্থার ফলে লোক সকল আশ্বস্ত হইল এবং স্বামীজীর উপর তাহাদের শ্রদ্ধা ও আস্থা বহুলপরিমাণে বাড়িয়া গেল।

এবার অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই প্লেগের ভয় কাটিয়া গেল এবং গভর্নমেণ্ট তাহাদের প্লেগের জন্য প্রচারিত আইনগুলি তুলিয়া লইলেন। তখন স্বামীজী তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যগণকে লইয়া হিমালয় ভ্রমণে যাওয়া স্থির করিলেন। এই সময়ে মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়ার ভারতের নানাস্থান ভ্রমণান্তে আলমোড়ায় গিয়া বাস করিতেছিলেন এবং তাহারা স্বামীজীকে একবার সেখানে আসিবার জন্য পুনঃপুনঃ পত্র লিখিতেছিলেন। তাই, স্বামীজী ১১ই মে (১৮৯৮) রাত্রে একটি বড় দল লইয়া হাওড়া ষ্টেসন হইতে আলমোড়ায় রওনা

হইলেন। তাঁহার এই দলে ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, সদানন্দ ও স্বরূপানন্দ, মিসেস্ বুল, মিস ম্যাকলাউড, ভগ্নী নিবেদিতা এবং আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী মিসেস্ প্যাটারসন। মিসেস প্যাটারসন স্বামীজীর ভক্ত ও বন্ধু ছিলেন। একবার আমেরিকার একস্থানে স্বামীজী তাঁহার গায়ের রংএর জন্য হোটেলে জায়গা পাইতেছেন না শুনিয়া, মিসেস প্যাটারসন ক্রুদ্ধ হন এবং তখনই তাঁহাকে তাহার নিজ বাটীতে লইয়া রাখেন।

স্বামীজী তাঁহার উক্ত সঙ্গীগণকে লইয়া ১৩ই মে ভোরবেলায় কাঠগোদাম পৌঁছিলেন। তারপর তথা হইতে প্রথমে টাঙ্গায় ও পরে ঘোড়া ও ডাণ্ডিতে নৈনিতাল আসিলেন। এই সময়ে খেত্ড়ির মহারাজা সেখানে তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। স্বামীজী তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যাগণকে তাহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাঁহারা সকলেই মহারাজার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া কয়েকদিন সেখানে রহিলেন। তখন স্বামীজী নৈনিতালের সম্ভ্রান্ত অধিবাসীগণের কয়েকটি আসরে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। এখানে একটি মুসলমান ভদ্রলোক স্বামীজীকে দেখিয়া ও তাঁহার কথাবার্তা শুনিয়া এত মুগ্ধ হন যে তিনি তাঁহাকে বলেন, "স্বামীজী, ভবিষ্যতে কেউ যদি আপনাকে অবতার বলে দাবী করে, তবে জানবেন তাদের মধ্যে আমিই—একটি মুসলমান—হব সর্বপ্রথম।"

কয়েকদিন খেত্ড়ির মহারাজার অতিথি হইয়া থাকিয়া ১৬ই মে তারিখে বৈকালে সকলে নৈনিতাল হইতে আলমোড়া অভিমুখে রওনা হইলেন—মেয়েরা ডাণ্ডিতে ও অপর সকলে ঘোড়ায় চড়িয়া। সঙ্গের মালপত্রগুলি কুলিরা লইয়া চলিল। আলমোড়ায় পৌঁছিয়া স্বামীজী তাঁহার গুরুভাই ও ভারতীয় শিষ্যগণ সহ ('Thompson House'এ) মিঃ ও মিসেস সেভিয়ারের অতিথি হইলেন। তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যাগণ ঐ বাড়ীর সন্নিকটেই একটি বাংলোতে রহিলেন। বেলুড়ের ন্যায় আলমোড়াতেও স্বামীজী প্রতিদিন সকালে মিসেস্

বুল ও তাহার অতিথিগণের ঐ বাড়ীতে একবার করিয়া আসিতেন ও তাহাদের সহিত কয়েক ঘণ্টা কাল কাটাইয়া যাইতেন। এবং তখন তিনি বেলুড়ের গঙ্গাতীরের ন্যায় এখানেও তাহাদের নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। তবে এই শিক্ষা ভগ্নী নিবেদিতার পক্ষে সত্বরই একটা বেদনাপ্রদ পর্যায়ে আসিয়া পড়িল। কারণ, স্বামীজী এই সময়ে তাহার জন্মলব্ধ পাশ্চাত্য দেশীয় সংস্কার ও ধারণা সকলের উপর কঠিন আঘাত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য, তাহার বৃদ্ধি ও বিকাশের পথ মুক্ত করা, তাহাকে ভারতমাতার নিজস্ব সন্তানে রূপান্তরিত করা। কিন্তু তেজস্বিনী নিবেদিতা ছিলেন প্রবল স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রীতিসম্পন্না এবং তাহার স্বদেশে ও স্বসমাজে প্রাপ্ত শিক্ষা ও ধারণাগুলির উপর ছিল তাহার অবিচল শ্রদ্ধা। তাই, ইংলণ্ডের কোন আদর্শ, সংস্কার, সংস্কৃতি ও প্রথা যে কোন অংশে নিকৃষ্ট, দোষযুক্ত বা পরিত্যাজ্য, ইহা তিনি মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে, আলমোড়ায় অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি অপরিহার্যভাবে তাঁহার গুরুর একটি বিদ্রোহী শিষ্যের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইলেন এবং তাহার সহিত চলিতে লাগিল তাহার একটা মানসিক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ। কিন্তু স্বামীজী তাঁহার এই অনুপম শিষ্যাটির কল্যাণ-সাধনে ছিলেন নির্মম—বদ্ধপরিকর। তাই, এই অবস্থাতেও তিনি তাহার মনের উপর আঘাত চালাইতে কিছুমাত্র শিথিল বা বিরত হইলেন না। শুধু তাহাই নহে। যে নিবেদিতা তাঁহার অপার্থিব স্নেহ-ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া ও তাঁহাকেই আশ্রয়-অবলম্বন মনে করিয়া সুদূর ইংলণ্ড হইতে তাঁহার ভারতের কাজে জীবন নিবেদন করিতে আসিয়াছেন, তিনি এখন তাঁহার নিকট হইতে উদাসীনের ন্যায় আলগা হইয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি তাহাকে নানাভাবে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন, 'নিবেদিতা, তুমি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। ভারতের জন্য যে কাজ তুমি করিবে তাহা তোমারই দায়িত্ব এবং তাহাতে তোমার অবলম্বনীয় পথ তোমার নিজেরই বাছিয়া লইতে হইবে। আমি কেবল দূর হইতে তোমাকে সম্ভবমত সাহায্য করিব, কোন

বিষয়ে আমার মত জানিতে চাহিলে তাহাও তোমাকে জানাইব, কিন্তু আমি কোন বিষয়েই কোন নির্দেশ তোমাকে দিব না।' ইহাও নিবেদিতার এক মহা নৈরাশ্য ও ব্যথা-বেদনার বিষয় হইল। যে বিপুল স্নেহ-অভয়ের ছায়াতলে দাঁড়াইয়া তিনি কাজ করিবেন আশা করিয়াছিলেন, তাহা নিমেষে কোথায় উড়িয়া গেল ?

নিবেদিতা চমকিত ও দিশেহারা হইলেন। দিনের পর দিন গুরুর কথার প্রতিবাদ করিয়া ও তাঁহার নির্মম আঘাত সকল সহ্য করিয়া তিনি যারপরনাই ক্লিষ্ট ও নিষ্পিষ্ট বোধ করিতে লাগিলেন। এবং তাহার বুকের এই দুঃসহ ব্যথা-বেদনা রাখার কোন জায়গাও তিনি আর দেখিলেন না। তথাপি দেখা যায়, এই ঘোর নৈরাশ্যের মধ্যেও তাহার একথা একবারও মনে হয় নাই যে, ভারত ত্যাগ করি, গুরুকে অস্বীকার করি, স্বদেশে ফিরিয়া যাই ও স্বস্তি লাভ করি। এইভাবে কিছুদিন গত হইলে, হঠাৎ একদিন অতি অপ্রত্যাশিতভাবে গুরুর অপার কৃপা তাহার উপর ঝরিয়া পড়িল। নিবেদিতার তীব্র মানসিক যন্ত্রণা ও তাহার অসুস্থ গুরুর সেবা ও শান্তির প্রয়োজন লক্ষ্য করিয়া, মিস্ ম্যাকলাউড একদিন সকালবেলায় স্বামীজীকে নিবেদিতার অবস্থা জানাইয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "সত্বর এই অবস্থার একটা পরিবর্তন হওয়া দরকার।" স্বামীজী নীরবে সব শুনিলেন ও তখন কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন। পরে সেদিন সন্ধ্যাকালে ফিরিয়া আসিয়া তিনি (নিবেদিতার সহিত বারান্দায় উপবিষ্ট) মিস্ ম্যাকলাউডের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার কথাই ঠিক। একটা পরিবর্তন একান্ত আবশ্যক। আমি একা থাকবার জন্য বনে যাচ্ছি এবং যখন আমি ফিরব, তখন আমি শান্তি নিয়ে ফিরব।"

তারপর তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইতেই দেখিলেন আকাশে প্রতিপদের নূতন চাঁদ। দেখিয়াই তিনি উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "দেখ, মুসলমানেরা নূতন চাঁদকে বড় শুভ বলিয়া মনে করে। এস, আমরাও এই নূতন চাঁদের সঙ্গে নূতন জীবন আরম্ভ করি।" এবং এই কথা কয়টি বলিয়াই তিনি নিবেদিতার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে নিবেদিতার অন্তরে এক যুগান্তর উপস্থিত হইল। নিমেষ না যাইতেই তিনি তাহার গুরুর চরণোপান্তে নতজানু হইলেন ও এক অপূর্ব শান্তি ও পুনর্মিলনের মাধুর্যে তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিল। তাহার প্রাণের সকল ক্ষত নিরাময় হইল। সেদিন রাত্রে ধ্যানে বসিয়া নিবেদিতা দেখিলেন, তিনি এক অনন্ত মঙ্গলময় সত্তার অনুভূতিতে নিমগ্ন হইয়া আছেন। এবং বুঝিলেন, যে মহান মানবাত্মা নিজেকে তাহার সম্মুখে মেলিয়া ধরিতেছেন, তাঁহাকে কোন কিছুর দ্বারা অস্পষ্ট করিয়া তোলা এক মহা নির্বুদ্ধিতা। তাঁহার যে-সকল কথার অর্থ ও উদ্দেশ্য তিনি আজ বুঝিতেছেন না, তাহা পরে যথাসময়ে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন। এবং বুঝিয়া অপার কল্যাণ লাভের অধিকারী হইবেন।

এইরূপে গুরুর অমোঘ স্পর্শে নিবেদিতা শান্তিলাভ করিলেন এবং নিজেকে সত্যসত্যই তাঁহার মানস কন্যা বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন। এই অনুভূতির আনন্দেই তিনি গুরুর চরণে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিলেন এবং এইদিন হইতেই নিবেদিতা পরম শ্রদ্ধার সহিত তাহার গুরুর প্রতিটি বাণী ও উপদেশ ধরিতে, বুঝিতে ও নির্ভুল অর্থোপলব্ধির সহিত আত্মস্থ করিতে সচেষ্ট হইলেন। এবং তাহারই ফলস্বরূপ তিনি তাহার গুরুর বহু অমূল্য বাণী ও উপদেশ যে শক্তি, সৌন্দর্য ও বিশ্বস্ততার সহিত জগৎকে দান করিতে সক্ষম হইয়াছেন, শুধু তাহাই তাহাকে চির অমর করিয়া রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট। এবং বস্তুতঃ এ বিষয়ে স্বামীজীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশীয় বহু শিষ্য, বন্ধু ও গুণমুগ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে আর একজনকেও নিবেদিতার সমকক্ষ বলিয়া মনে করা যায় না।

যাহা হউক, ভারতের জন্য নিবেদিতার চিত্ত জয় করিয়া, স্বামীজী তপস্যার্থ ২৫শে মে হইতে ২৮শে মে পর্যন্ত প্রতিদিন দশ ঘণ্টা করিয়া বনে কাটাইলেন। ৩০শে মে তিনি মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়ারের সহিত তাহাদের সঙ্কল্পিত হিমালয়ের মঠের জন্য জমি দেখিতে গেলেন। ৫ই জুন (রবিবার) সন্ধ্যাকালে তিনি ফিরিয়া আসিলেন এবং একখানি

পত্র হইতে সংবাদ পাইলেন যে পওহারী বাবা দেহ রাখিয়াছেন। এই সংবাদে স্বামীজী খুবই ব্যথিত হইলেন। কারণ এই মহাত্মার উপর তাঁহার একটা গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল। কিন্তু ইহার দুইদিন পূর্বে আর একটি আরও গুরুতর দুঃসংবাদ আলমোড়ায় নিবেদিতাদের নিকট পৌঁছিয়াছিল। কিন্তু তাহা এই দিন স্বামীজীকে বলা হইল না। পরদিন (৬ই জুন) সকালে তিনি মিসেস্ বুলের বাংলোতে আসিলে, তাঁহাকে জানানো হইল যে, ২রা জুন তারিখে গুড্‌উইন উতকামণ্ডে আন্ত্রিক জ্বরে (enteric fever) মারা গিয়াছেন। সংবাদটি স্বামীজী শান্তভাবেই শুনিলেন ও তৎপর তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যাগণের সহিত নানা কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। এবং বিশেষ ভাবে ভক্তি ও ত্যাগের কথাই অধিক আলোচনা করিলেন।

কিন্তু প্রথম দিন সংবাদটি এইরূপ শান্তভাবে গ্রহণ করিলেও, গুড্-উইনের দুঃসহ মৃত্যুব্যথা স্বামীজীকে সত্বরই অধীর করিয়া তুলিল। এবং কয়েকদিন পরে তিনি নিবেদিতাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, "আলমোড়ায় আমি আর থাকবো না। যেখানে আমি গুড্‌উইনের মৃত্যু-সংবাদ পেয়েছি, সেখানে থেকে আমি তার স্মৃতি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। এটা পুরুষোচিত নয়, এ মায়াও মানুষকে জয় করতে হবে।" ইহার পর সত্বরই স্থির হইল, স্বামীজী (কোন সেবক সঙ্গে না লইয়া) শুধু তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যা তিনটি সহ মিসেস্ বুলের অতিথি-রূপে কিছুকাল কাশ্মীরে বাস করিবেন।

তদনুসারে—উক্তরূপে প্রায় একমাস কাল আলমোড়ায় থাকিয়া—স্বামীজী তথা হইতে ১১ই জুন সকালবেলায় মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউড ও নিবেদিতাকে লইয়া কাঠগোদাম রওনা হইলেন। পথে ১২ই জুন বৈকালে তাঁহারা ভীমতাল হ্রদের উচ্চ তীরে বিশ্রাম করিলেন। পরদিন ১৩ই জুন কাঠগোদাম হইতে ট্রেনে উঠিয়া, ১৪ই জুন তাঁহারা পাঞ্জাবে প্রবেশ করিলেন। এবং পরিশেষে রাওয়াল-পিণ্ডিতে ট্রেন হইতে অবতরণ করিয়া তাহারা তথা হইতে টাঙ্গায় মারী পৌঁছিলেন (১৫ই জুন ১৮৯৮)।

মারীতে কয়েক দিন থাকিয়া, ১৮ই জুন তাঁহারা টাঙ্গায় পাঞ্জাব সীমান্ত আতক্রম করিয়া কাশ্মীর প্রবেশ করিলেন এবং ২০শে জুন বারমুল্লায় পৌঁছিলেন। ঐ দিনই বৈকালে তাঁহারা তথা হইতে তিন-খানি হাউসবোটে (বাসোপযোগী নৌকা) শ্রীনগর অভিমুখে রওনা হইলেন। ২২শে জুন তাঁহারা শ্রীনগরে পৌঁছিলেন। এবং উক্ত ২২শে জুন হইতে ২৫শে জুলাই পর্যন্ত তাঁহারা হাউসবোটে ঝিলাম নদীর উপর (শ্রীনগর ও তাহার নিকটবর্তী স্থান সমূহে) বাস করেন।

এইভাবে হাউসবোটে বাসকালে স্বামীজী পূর্বের ন্যায় প্রতিদিন সকালে তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যাগণের নিকট আসিয়া কয়েক ঘণ্টাকাল তাহাদের শিক্ষা দিতেন। দেখা যায়, তাঁহার সুদীর্ঘ ভ্রমণপথেও তিনি তাঁহার এই কার্য বন্ধ রাখেন নাই। হাওড়া হইতে আলমোড়া এবং আলমোড়া হইতে শ্রীনগর পর্যন্ত সমস্ত পথটিতে তিনি তাঁহার এই শিষ্যা কয়টির নিকট ভারতের নানা ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কথা ও কাহিনী এবং তৎসমূহের আবশ্যকীয় ব্যাখ্যা বর্ণনা করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ইহার দ্বারা তিনি তাহাদের মনে ভারতের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের যে উজ্জ্বল ছবি অঙ্কিত করেন তাহা তাহাদের যারপরনাই মুগ্ধ করে। শ্রীনগরে এবং কাশ্মীরের নানা স্থান দর্শনকালে এই শিক্ষা ক্রমে আরও তীব্রতর আকার ধারণ করে। পদে পদে এবং প্রতি ঘটনা ও দর্শনীয় বস্তু হইতেই তিনি তাহাদিগকে কিছু না কিছু শিখাইতেন। আর যাহা শিখাইতেন তাহা অনেক সময়েই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাহিত্য, ইতিহাস, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐহিক-পারমার্থিক আদর্শের একটা তুলনা ও তন্মূলক ব্যাখ্যার দ্বারা সমৃদ্ধ থাকিত। আর তাঁহার সকল শিক্ষার ন্যায় এই শিক্ষাও ছিল তাঁহার অমোঘ অধ্যাত্ম শক্তি ও প্রভাব মণ্ডিত। তাই, তাঁহার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যানুসারে তাঁহার এই শিক্ষার ফলে তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যা কয়টি দ্রুত রূপান্তরিত হইতেছিলেন। বিশেষভাবে ইহাদের মধ্যে যাহাকে তিনি তাঁহার ভারতের কাজের জন্য টানিয়া লইয়াছিলেন,

সেই নিবেদিতা পরিপূর্ণরূপে ভারতেরই নিজস্ব লোক হইয়া দাঁড়াইলেন। গুরুর ন্যায় তাহার নিকটও ভারতের প্রতি ধূলিকণা পবিত্র হইয়া উঠিল এবং ভারতের কল্যাণ ও ভারতের সেবা হইয়া দাঁড়াইল তাহার প্রার্থনীয়, বাঞ্ছনীয়, অপরিহার্য কর্ম। বস্তুতঃ ঠিক গুরুর ন্যায়ই নিবেদিতা ভারতের সঙ্গে মিশিয়া এক হইলেন।

যে মহান শিক্ষার দ্বারা নিবেদিতা এই মহিমাময় পরিণতি লাভ করিয়াছিলেন তাহার খুঁটিনাটি বর্ণনা দিবার কোন চেষ্টা আমরা করি নাই। কারণ উহার রূপের বৈচিত্র্য ও বহুমুখী ধারা সকল আমাদের এই ক্ষুদ্র পুস্তকে ফুটাইয়া তোলা অসম্ভব। তবে ভগ্নী নিবেদিতা নিজেই এই শিক্ষার কিছু পরিচয় অতি উত্তম ভাবে ও কবিত্বময় ভাষায় তাঁহার দুইখানি পুস্তকে দিয়াছেন। ইহার একখানির নাম "Notes of some Wanderings with the Swami Vivekananda" এবং অপরখানি হইতেছে তাহার সুবিখ্যাত গ্রন্থ "The Master as I Saw Him"। এই দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ আমরা সকলকেই পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এই দুইখানি পুস্তকের বাংলা অনুবাদও "উদ্বোধন" কার্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীনগর অবস্থানকালে স্বামীজী তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যগণ সহ যে-সকল স্থান দর্শন করেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত স্থান কয়টির নাম উল্লেখ-যোগ্য—(১) ক্ষীরভবানী (২৬শে জুন), (২) (একটি ছোট পাহাড়ের উপরিস্থিত) তখ্‌ত-ই-সুলেমান নামক একটি ক্ষুদ্র মন্দির (২৯শে জুন) এবং (৩।৪) নূর মহলের শালিমারবাগ ও নিশাৎবাগ (৪ঠা জুলাই)। এই স্থানগুলির মধ্যে ক্ষীরভবানীর কথা আমরা পরে আর একটু বিস্তৃতভাবে পাইব।

আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস ৪ঠা জুলাই তারিখে আমেরিকান শিষ্যা দুইটিকে চমৎকৃত করিবার উদ্দেশ্যে, স্বামীজী (নিবেদিতার সহযোগিতায়) গোপনে একটি আমেরিকান জাতীয় পতাকা তৈয়ার করান ও "To the Fourth of July" (৪ঠা জুলাই'এর প্রতি) শীর্ষক একটি কবিতা রচনা করেন। উক্ত উৎসবের দিন (৪ঠা জুলাই)

প্রত্যুষে খাবারের নৌকায় চা পানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং আমেরিকান মহিলা দুইটি ঐ নৌকায় আসিতেই ঐ পতাকাটি নৌকার পুরোভাগে জুড়িয়া দেওয়া হইল। এই ক্ষুদ্র উৎসবটিতে যোগ দিবার জন্য স্বামীজী একস্থানে যাওয়া স্থগিত রাখিয়াছিলেন এবং উৎসবকালে তাঁহার শ্রদ্ধাঞ্জলি-স্বরূপ তিনি নিজে তাঁহার পূর্বোক্ত কবিতাটি পাঠ করেন।

৬ই জুলাই তারিখে মিসেস্ বুল ও মিস্ ম্যাকলাউড কোন কাজে গুলমার্গ গেলেন। স্বামীজী কিছু পথ তাহাদের সঙ্গে যান। তারপর ১০ই জুলাই তারিখে শুধু আমেরিকান মহিলা দুইটি ফিরিয়া আসিলেন। তখন অনুসন্ধান লইয়া তাহারা জানিতে পারিলেন যে, স্বামীজী একাকী ও কপর্দকহীন অবস্থায় সোনমার্গের পথে অমরনাথ রওনা হইয়া গিয়াছেন।

ঘটনাটি লক্ষণীয়। কাশ্মীরে আশা অবধি স্বামীজীর অন্তরে একটা প্রবল ত্যাগ-তপস্যার ভাব জাগিয়া উঠিতেছিল। এবং তাহারই বশে তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া তাঁহার হাউসবোটে প্রায়ই একদিকে চলিয়া যাইতেন ও দুই-এক দিন একাকী তপস্যামগ্ন থাকিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিতেন। দুর্গম অমরনাথ তীর্থে যাইবার সঙ্কল্পও তিনি ঐ ভাবের বশবর্তী হইয়াই কাহাকেও না জানাইয়া অতি গোপনেই করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রীষ্মের গরমে কতকগুলি হিমবাহ গলিয়া যাওয়ায় সোনমার্গের পথে অমরনাথ যাওয়া অসম্ভব হয় এবং ১৫ই জুলাই তারিখে স্বামীজী মধ্যপথ হইতে ফিরিয়া আসেন।

ইহার পর, ১৮ই জুলাই তারিখে তাহারা সকলেই তাঁহাদের হাউস-বোটে ইসলামাবাদ রওনা হইলেন। সেখানে ১৯শে জুলাই বৈকালবেলা তাহারা ঝিলাম নদী-তীরবর্তী পাণ্ড্রেস্থান (পাণ্ডবদের স্থান) মন্দির দর্শন করেন। তৎপর তাঁহারা ঐ নদী বাহিয়া আরও কিছুদূর গিয়া ২০শে জুলাই অবন্তীপুরের দুইটি বৃহৎ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও ২১শে জুলাই বিজবেহার মন্দির দেখেন। তাহার পর ২২শে জুলাই তারিখে তাহাদের হাউসবোটগুলি ইসলামাবাদ ফিরিয়া আসে।

পরদিন সকালে তাহারা (অনেকগুলি কুলী প্রভৃতি সহ) ঐ স্থান হইতে রওনা হইয়া প্রথমে মার্তণ্ড মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ (২৩শে জুলাই) এবং তারপর বেরীনাগে (২৪শে জুলাই) ও অচ্ছাবলে (২৫শে জুলাই) জাহাঙ্গীরের প্রাচীন রাজপ্রাসাদ ও প্রমোদোদ্যান সকল দর্শন করেন। অচ্ছাবলের প্রথম উদ্যানটিতে মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়ে স্বামীজী হঠাৎ বলিলেন, তিনি দুই-তিন হাজার যাত্রীদের সহিত অমরনাথ যাইতেছেন। এবং সেখানে শিবের চরণে উৎসর্গিত হইবার জন্য তিনি নিবেদিতাকেও তাঁহার সহিত যাইতে আমন্ত্রণ করিলেন। মিসেস্ বুল ও মিস্ ম্যাকলাউড ইহাতে হাসিয়া ও আনন্দ প্রকাশ করিয়া সম্মতি জানাইলেন। সেইদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহারা (ইসলামাবাদে) তাহাদের হাউসবোটে ফিরিয়া আসিলেন ও স্থির করিলেন যে তাঁহারা সকলেই (অমরনাথের পথে) পহলগাম পর্যন্ত যাইবেন এবং স্বামীজী ও নিবেদিতার প্রত্যাগমণ পর্যন্ত মিসেস্ বুল ও মিস্ ম্যাকলাউড সেখানে অপেক্ষা করিবেন।

তদনুসারে পরদিন বৈকালে (২৬শে জুলাই) তাঁহারা (আবশ্যকীয় মালপত্র ও কুলি প্রভৃতি সহ) বওয়ান রওনা হইলেন এবং তথা হইতে ২৮শে জুলাই তারিখে তাহারা পহলগামে পৌছিয়া সেখানে (কয়েকশত সাধু সহ) প্রায় তিন হাজার যাত্রীদের মধ্যে তাঁবু খাটাইয়া রহিলেন। এই পথে প্রত্যেক বিশ্রাম স্থানে ছোট-বড় তাঁবুগুলি অতি সুশৃঙ্খলার সহিত স্থাপিত হইত এবং ঐ গুলির মাঝখান দিয়া চলিবার প্রশস্ত রাস্তা সকল থাকিত। ইহা ছাড়া, যাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে একটি বাজারও চলিত। ঐ বাজারে চাল, ডাল, দুধ, মেওয়া প্রভৃতি পাওয়া যাইত। কাশ্মীর গভর্নমেণ্টের একটি মুসলমান তহশীলদার তাহার কয়েকটি অধীনস্থ কর্মচারী সহ যাত্রীদের দেখাশুনা করিবার জন্য স্বামীজীদের দলের সঙ্গে যাইতেছিলেন। তাহারা অতি অল্পেই স্বামীজীর অত্যন্ত ভক্ত হইয়া উঠিলেন। এবং প্রতিদিনই তাহারা তাঁহার কথা শুনিতে আসিতেন ও পরিশেষে তাঁহার নিকট দীক্ষাও প্রার্থনা করেন। নিবেদিতাও তাহার অমায়িক

ব্যবহারের দ্বারা যাত্রীদের বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠেন। একটি নাগা সাধু তাহাদের বিশেষ বন্ধু হন এবং সকল বিশ্রাম স্থানেই তাহাদের খোঁজ-খবর লন।

একাদশীর উপবাসের জন্য যাত্রীদল পহলগামে একদিন অপেক্ষা করেন (২৯শে জুলাই)। তৎপর ৩০শে জুলাই তারিখে ভোরবেলায় স্বামীজী ও নিবেদিতা অপর যাত্রীদের ন্যায় পহলগাম হইতে রওনা হইয়া প্রথমে চন্দনবাড়ীতে (৩০শে জুলাই), তারপর (শেষ নাগের পরে) তুষারমণ্ডিত গিরিচূড়া সকলের অন্তর্বর্তী ১৮০০০ ফিট উচ্চ একটি স্থানে (৩১শে জুলাই) এবং তৎপর কিছু নীচে নামিয়া পঞ্চতরণীতে (১লা আগস্ট) তাবু ফেলিয়া বিশ্রাম করেন। পরিশেষে ২রা আগস্ট তারিখে ভোর হইবার অনেক পূর্বে তাঁহারা পূর্ণিমার চাঁদের আলোর সাহায্যে (পঞ্চতরণী হইতে) অমরনাথের অভিমুখে রওনা হইলেন। পথে সূর্যোদয় হইল। তারপর একস্থানে ডাণ্ডি, ঘোড়া প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া তাঁহারা একটা খাড়া চড়াই ও তৎপর একটি বিপদশঙ্কুল উৎড়াই অতিক্রম করিয়া মাইলের পর মাইল বরফমণ্ডিত পথের উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিলেন। পথের শেষ মাইলের বরফ গলিয়া একটি নদী হইয়াছিল। প্রথানুসারে প্রায় তিন হাজার যাত্রী এই অতি শীতল বরফগলা নদীর জলে স্নান করিলেন। এবং তারপর আরও একটি চড়াই'এর পর তাঁহারা দলে দলে অমরনাথের বিশাল গুহায় পৌঁছিতে লাগিলেন।

অত্যধিক ক্লান্তিবশতঃ স্বামীজী কিছু পিছনে পড়িয়াছিলেন। তাই নিবেদিতা ঐ নদীর নিকট তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। সেখানে পৌঁছিয়া স্বামীজী নিবেদিতাকে অগ্রসর হইতে বলিয়া, ঐ নদীতে স্নান করিতে গেলেন। এবং নিবেদিতা অমরনাথের গুহায় পৌঁছিবার আধঘণ্টা পরে, তিনি ভস্মাচ্ছাদিত হইয়া ঐ গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিরাট বরফের লিঙ্গটি সুবিস্তৃত গুহার (অন্ধকারের ন্যায়) গভীর ছায়াচ্ছন্ন স্থানে অবস্থিত। স্বামীজী স্মিতমুখে ঐ শিবলিঙ্গের দুই পার্শ্ব হইতে দুইবার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অন্তরে এক প্রবল ভাবাবেগ উত্থিত হইল এবং তাহার মধ্যে তিনি এক অপূর্ব দর্শন লাভ করিলেন। তখন নিজেকে সামলাইবার জন্য তিনি মাত্র অল্প অয়েক মিনিট পরেই গুহা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

এই দর্শনটি সম্বন্ধে স্বামীজী বেশী কিছু কখনও প্রকাশ করেন নাই। তবে বলিয়াছেন, ঐ দিন তিনি অমরনাথের সাক্ষাৎ ও তাঁহার নিকট হইতে ইচ্ছামৃত্যুর বর লাভ করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত জানা যায়, অমরনাথ আসিবার পথে তিনি তীর্থদর্শনের সমস্ত খুঁটিনাটি নিয়ম পালন করিতে করিতে আসিয়াছেন। উপবাস, মালাজপ, পঞ্চতরণীর পাঁচটি নদীরই বরফ-গলা জলে স্নান ইত্যাদি সকল নিয়মই (সাধারণ যাত্রীর ন্যায়) পালন করিয়াছেন। এবং নিবেদিতাকেও পথের সব কিছুই দেখাইতে ও বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বস্তুতঃ নিবেদিতার তীর্থ দর্শনের কাজ যাহাতে সম্পূর্ণ হয়, তৎপ্রতি তিনি প্রখর দৃষ্টি রাখিয়াছেন। পরে তিনি তাহাকে বলিয়াছেন, "তুমি এখন বুঝতে পারছ না। তীর্থ তুমি করেছ এবং তা তার কাজ করে যাবে। কারণ তার ফল দেবেই। পরে তুমি আরও ভাল বুঝতে পারবে। এর ফল আসবেই।"

গুহা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া স্বামীজী ও নিবেদিতা (তাহাদের পূর্বোক্ত নাগা সঙ্গীটির সহিত) নদী তীরবর্তী একটি শিলার উপর বসিয়া খাবার খাইলেন। তৎপর প্রত্যাবর্তনের পথে তাঁহারা তাহাদের তাঁবুগুলির নিকট আসিয়া, তাহা তখনই উঠাইয়া লইয়া আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটি তুষারাবৃত স্থানে রাত্রি যাপন করিবার জন্য তাঁবু খাটাইলেন। পরদিন সূর্যোদয় হইলে তাঁহারা পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন। এবং একস্থানে একটি অত্যন্ত সরু খাড়া পথ দিয়া নামিয়া আসিয়া তাহাদের প্রত্যাবর্তনের পথ খুবই সংক্ষেপ করিয়া লইলেন। নীচে গ্রামবাসীরা এই পথের যাত্রীদের জন্য আগুন জ্বালাইয়া চা ও চাপাটি তৈয়ার করিয়া রাখিতেছিল। সেই দিন বৈকালবেলা স্বামীজী ও নিবেদিতা পহলগাম

পৌঁছিলেন। ইহার পরের দিন তাঁহারা মিসেস্ বুল ও মিস্ ম্যাকলাউডের সহিত ইস্‌লামাবাদ রওনা হইলেন এবং ৯ই আগষ্ট সকালে শ্রীনগর ফিরিয়া আসিলেন।

স্বামীজীর এইবার কাশ্মীর আগমনের একটি বিশেষ হেতু ছিল কাশ্মীরের মহারাজার আমন্ত্রণ। প্রথমবারের সাক্ষাৎকালীন কথাবার্তানুসারে, মহারাজা স্বামীজীকে কাশ্মীরে আসিয়া একটি মঠ ও একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের জন্য একখণ্ড জমি পছন্দ করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে স্বামীজী ঝিলাম নদীর তীরবর্তী একটি অতি সুন্দর স্থান পছন্দ করেন এবং মহারাজা তাহা তাঁহাকে দিতে উদ্যোগী হন।

পূর্বে স্থির করা হইয়াছিল যে, স্বামীজীর পাশ্চাত্য শিষ্যাগণ অগ্রে কাশ্মীর দেশটি দেখিবেন এবং তৎপর তিনি তাহাদের কোন নির্জন স্থানে লইয়া ধ্যান করিতে শিখাইবেন। এখন অমরনাথ হইতে ফিরিবার পর, স্বামীজীর নির্জনবাস ও ধ্যানবিষ্ট ভাব দেখিয়া তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যাগণও নির্জনে ধ্যানাভ্যাস করিতে উদ্‌গ্রীব হইলেন। স্বামীজী এ বিষয়ে তাহাদের উৎসাহিত করিয়া পূর্বোক্ত ভাবী মঠের জমিতে তাঁবু ফেলিয়া, কিছুদিন সেখানে বাস করিতে উপদেশ দিলেন ও তৎসহ বলিলেন, হিন্দুদের সংস্কারানুসারে কোন নূতন বাড়ীতে অগ্রে মেয়েদের দ্বারা মঙ্গলানুষ্ঠান করানো খুবই শুভ-সূচক। শুনিয়া মহিলা কয়টি বিশেষ উৎসাহের সহিত ঐ জমিতে তাঁবু খাটাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন।

স্বামীজী মাঝে মাঝে স্বল্প সময়ের জন্য তাহাদের ঐ আবাসে গিয়া তাহাদের সহিত কথাবার্তা বলিলেও, তাঁহার মন এই সময়ে প্রায়ই থাকিত ধ্যানবিষ্ট, অথবা গভীর চিন্তামগ্ন। তাই, এইকালে তাঁহার নির্জনবাসের আকাঙ্ক্ষা অতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল এবং তজ্জন্য তাঁহার আদেশে তাঁহার হাউসবোট প্রায়ই কোন নির্জন স্থানে সরাইয়া রাখা হইত। দেখা যায়, অমরনাথ হইতে ফিরিবার পরেও স্বামীজী কয়েকদিন শিবের ভাবেই আচ্ছন্ন ছিলেন এবং প্রায় সময়েই তাঁহার

মুখে শিবের কথাই শোনা যাইত। কিন্তু অল্প পরেই তাঁহার মধ্যে একটা ভাবান্তর আসিল এবং তাঁহার সমস্ত মনঃপ্রাণ সুখদুঃখ-ভালমন্দ-বিধায়িনী জগন্মাতার ধ্যান-চিন্তায় বিভোর হইয়া উঠিল। এই সময়ে তিনি অনুক্ষণ রামপ্রসাদের গান গাহিতেন। এবং তাঁহার হাউসবোটের মুসলমান মাঝির চার বছরের শিশু কন্যাটিকে উমাজ্ঞানে প্রতিদিন পূজা করিতেন। একদিন তিনি তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যাগণের নিকট বলেন, "(আজকাল) আমি যেখানেই থাকি, ঘরে উপস্থিত একটি ব্যক্তির মতই আমি মায়ের উপস্থিতি অনুভব করি। আর টের পাই তিনি সর্বদাই আমার হাত ধরে আছেন ও একটি কচি শিশুর মত আমাকে চালিত করছেন।" স্বামীজীর অন্তরের মায়ের এই প্রগাঢ় ভাবানুভূতি তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যা কয়টিকেও প্রভাবিত করিল। এবং তাহারাও স্বামীজীর ন্যায় সকল বিষয় সম্পর্কেই বলিতে আরম্ভ করিলেন, "(কি হবে না হবে) মাই ভাল জানেন।"

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে, একটি নৈরাশ্যজনক সংবাদ স্বামীজীর এই অতি গভীর ও অতি গাঢ় মায়ের ভাবানুভূতিকে চরমে তুলিয়া দিল। কাশ্মীর গভর্ণমেণ্ট তখন তাঁহাকে সরকারীভাবে জানাইলেন যে, তিনি মঠ ও সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের জন্য যে জমি পছন্দ করিয়াছিলেন তাহা মহারাজার আগ্রহ ও আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহাকে দেওয়া গেল না। কারণ, ঐ বিষয় বিবেচনার জন্য দুইবার কাউন্‌সিলের কার্যতালিকায় দেওয়া হয় এবং দুইবারই ইংরেজ রেসিডেণ্ট উহার আলোচনা নিষিদ্ধ করেন। কাশ্মীর আগমনের মূল উদ্দেশ্য এইভাবে ব্যর্থ হওয়ায় স্বামীজী যে আঘাত পাইলেন, তাহা তাঁহাকে জগন্মাতার সুভীষণ ভাব সকলের প্রতিই বিশেষভাবে মন নিবিষ্ট করিতে নিযুক্ত করিল। ফলে, তিনি এখন তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যাগণের নিকট প্রায়ই নানাভাবে বলিতে লাগিলেন, "মা ভালমন্দ সব কিছুতেই সমভাবে প্রকাশিতা। তাই, আমরা তাঁকে শুধু ভালর মধ্যে দেখব কেন? তিনি যে সর্ববিধ্বংসী কাল, পরিবর্তন, অনন্ত শক্তি। যেমন ভালোর মধ্যে, তেমনি মন্দের মধ্যে,

দুঃখ-কষ্ট-বিফলতার মধ্যে, ভয় ও ধ্বংসের মধ্যে তাঁকে চিনতে শেখ। শুধুই করুনাময়ী, সুখদাত্রী মায়ের উপাসনা! সে তো হিসাবের কথা, ব্যবসা-বুদ্ধির কথা। এসো, আমরা কিছুই কামনা না করে পরিপূর্ণা ভীষণরূপিনী মায়ের উপাসনা করি। তিনিই ব্রহ্ম। তাঁর অভিশাপও একটা আশীর্বাদ। হৃদয়কে শ্মশান করতে হবে, তবে তো মা সেখানে আসবেন। ইত্যাদি।”

এই সর্বরূপা ভীষণা মাঝেই তিনি এখন সর্বত্র ও সকল বিষয়েই অনুভব করিতে লাগিলেন। দারুণ ব্যাধি ও বেদনার মধ্যেও তাঁহাকে বলিতে শোনা যাইত, “তিনিই (বেদনা-অনুভূতির) ইন্দ্রিয়। তিনিই বেদনা। এবং তিনিই বেদনা-দাত্রী। কালী! কালী! কালী!” ক্রমে এই সুভীষনার চিন্তা তাঁহার মনের উপর এমনভাবে চাপিয়া আসিল যে, উহার অনিবার্য ফলস্বরূপ হঠাৎ একদিন তাঁহার চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল ঐ ভয়ঙ্করার একটি মহাত্রাসসঞ্চারকারী রূপ—সৃষ্টির তুমুল তোলপাড়—জগন্মুর্তি মায়ের তাণ্ডব আনন্দ নৃত্য। ঐ অবস্থাতে তিনি যন্ত্রবৎ একটি কলম লইয়া মায়ের এই বিশ্বসন্ত্রাসী রূপ বর্ণনা করিয়া একটি কবিতা (Kali the Mother) লিখিলেন এবং উহা লেখা শেষ হইতেই তিনি ভাবাবেগে সমাধিমগ্ন হইয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেলেন।

এই ঘটনার পরে ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে স্বামীজী হঠাৎ একাকী ক্ষীরভবানী চলিয়া গেলেন এবং যাইবার সময় আদেশ রাখিয়া গেলেন যে, কেহ যেন তাঁহার অনুসরণ না করে। এইবার ক্ষীরভবানীতে তিনি এক সপ্তাহকাল ধরিয়া অতি কঠোর তপস্যা করেন। সেখানে তিনি উপবাসী থাকিয়া প্রতিদিন দেবীর সম্মুখে হোম করিতেন ও এক মন দুধ, চাল ও বাদামের দ্বারা ক্ষীর বা পায়স প্রস্তুত করিয়া কুণ্ডে ভোগ দিতেন। প্রতিদিন সকালে তিনি একটি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের শিশু কন্যাকে উমাকুমারী জ্ঞানে পূজা করিতেন। এবং রাত্রে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন। জানা যায়, গভীর রজনীতে ধ্যানকালে তিনি ক্ষীর-ভবানীতে অতি আশ্চর্য সব দর্শন লাভ করেন। তাহা তিনি তাঁহার

দুই একজন গুরুভাইকে গোপনে জানাইলেও, তাহা (সম্ভবতঃ তাঁহারই উপদেশে) কখন সাধারণের নিকট প্রকাশ করা হয় নাই। ইহা ছাড়া আরও জানা যায়, স্বামীজী ক্ষীরভবানীতে জগন্মাতার কতকগুলি অত্যদ্ভুত বাণীও শুনিতে পান। তৎসম্বন্ধে তিনি কাশ্মীর থাকিতেই কয়েকটি কথা তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যাগণের নিকট প্রকাশ করেন। ভগ্নী নিবেদিতা তাহা নিম্ন-লিখিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

৬ই অক্টোবর তারিখে স্বামীজী ক্ষীরভবানী হইতে শ্রীনগরে ফিরেন। সেই দিন বৈকালে তিনি কতকগুলি গাঁদাফুল হাতে করিয়া আমাদের হাউসবোটে আসিলেন। এবং তাহা আমাদের প্রত্যেকের মাথায় ছোঁয়াইয়া আমাদের আশীর্বাদ করিলেন ও বলিলেন, "আমি এগুলি মাকে নিবেদন করেছিলাম।" তারপর তিনি আসন গ্রহণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "আর 'হরি ওঁ' নয়। এখন সবই মা।" একটু থামিয়া তিনি আবার বলিলেন, "আমার সকল স্বদেশপ্রেম চলে গেছে। এবং আমার সবই গেছে। এখন কেবল 'মা, মা'।" ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "আমার খুবই ভুল ধারণা ছিল। মা আমাকে বল্‌লেন, 'যদি অবিশ্বাসীরা আমার মন্দিরে প্রবেশ করে ও আমার মূর্তি অপবিত্র করে, তাতে তোর কি? তুই আমাকে রক্ষা করিস্‌, না আমি তোকে রক্ষা করি?' তাই, আমার আর কোন স্বদেশপ্রেম নেই। আমি এখন (মায়ের) একটি ক্ষুদ্র শিশু মাত্র।"

এই দৈববাণীটি শোনার উপলক্ষ এই। ক্ষীরভবানীর মন্দির মুসলমান আক্রমণকারীরা ধ্বংস ও অপবিত্র করিয়াছিল। একদিন ঐ কথা স্মরণ করিয়া স্বামীজী ক্ষোভের সহিত ভাবিতেছিলেন, "লোকে কেমন করে বিনাবাধায় এ হতে দিয়েছিল? আমি যদি তখন এখানে থাকতাম, আমি এ কিছুতেই হতে দিতাম না। আমি মাকে রক্ষা করবার জন্যে জীবন দিতাম।" ঠিক এই সময়েই তিনি ঐ দৈববাণীটি শুনিতে পান। স্বামীজীর পাশ্চাত্য শিষ্যাগণ বিস্ময়াভিভূত হইয়া নীরবে তাঁহার কথাগুলি শুনিলেন। যাইবার পূর্বে তিনি

তাহাদের বলিলেন, "আমি এর অতিরিক্ত তোমাদের বলতে পারি না। তা বলা বিধিসঙ্গত নয়।"

ক্ষীরভবানীতে স্বামীজীর শ্রুত আর একটি দৈববানীর কথাও জানা যায়। একদিন পূজাকালে ক্ষীরভবানীর মন্দিরের ভাঙ্গাচোরা অবস্থা দেখিয়া স্বামীজীর মনে (নানা স্থানে মঠ নির্মাণের আকাঙ্ক্ষার সহিত) ঐ পুরাতন ভগ্ন মন্দিরটির স্থলে একটি নূতন মন্দির নির্মাণ করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগে। ঠিক তখনই তিনি সুস্পষ্টভাবে শুনিলেন মা তাহাকে বলিতেছেন, "বাছা, আমি ইচ্ছা করিলেই অসংখ্য মন্দির ও মঠ নির্মাণ করতে পারি। আমি ইচ্ছামাত্রে এই স্থানে এই মুহূর্তেই সাত-তলা সোনার মন্দির তুলতে পারি।" স্বামীজী পরে কলিকাতায় তাঁহার একটি শিষ্যের নিকট বলেন, "এই দৈববাণীটি শুনবার পর থেকে আমি আর কোন প্লান করি না। এ সব বিষয়ে মা যা ইচ্ছা করবেন তাইই হোক।"

ক্ষীরভবানী হইতে ফিরিয়া স্বামীজী তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যাগণের সহিত উপরিবর্ণিত প্রথম সাক্ষাতের সময়েই তাঁহার অবিলম্বে কলিকাতায় ফিরিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাই, তাহার ব্যবস্থা করা হইতে লাগিল। কিন্তু রওনা হইবার পূর্বে একটি ঘটনা ঘটিল যাহা স্বামীজীকে খুবই অশান্ত করিয়া তুলিল। একটি মুসলমান ফকিরের একটি চেলা (ফকিরের নিষেধ সত্ত্বেও) স্বামীজীর নিকট আসিত বলিয়া ফকির একদিন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বলে, "তুই যার কাছে যাস, তাঁকে পেটের অসুখে ভুগে তিন দিনের মধ্যে কাশ্মীর ছেড়ে যেতে হবে।" ফকিরের তুকতাক করার কিছু বিদ্যা ছিল। তাই, তাহার অভিশাপের ফল ফলিল। ইহাতে স্বামীজী এত ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হন যে, তিনি কলিকাতায় ফিরিয়াই বিষয়টি শ্রীশ্রীমায়ের নিকট নিবেদন করেন ও তখন তাঁহার মুখের দুই-একটি কথাতেই শান্ত হন।

উক্ত ঘটনার কয়েকদিন পরে (স্বামীজীর ইচ্ছানুসারে) সকলে শ্রীনগর হইতে বারমুল্লা রওনা হইলেন। পথে স্বামীজী প্রায় একাকীই

থাকিতেন। সকালে ও সন্ধ্যায় তিনি তাঁহার হাউসবোট হইতে তীরে নামিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া বেড়াইতেন, ক্বচিৎ তাঁহার শিষ্যাগণের হাউসবোটে প্রবেশ করিতেন। তাঁহার স্বাস্থ্য এই সময়ে একেবারেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

১১ই অক্টোবর তারিখে সকলে বারমুল্লা পৌঁছিলেন। স্থির হইয়াছিল, স্বামীজী পরদিন লাহোর রওনা হইয়া যাইবেন এবং তাঁহার শিষ্যাগণ কয়েকদিন পরে সেখানে গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন। যাত্রার দিন (১২ই অক্টোবর) স্বামীজী তাঁহার শিষ্যাগণের নিকট হইতে বিদায় লইতে গিয়া তাহাদের নিকট কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক কথা সকল বলিলেন। মাঝে মাঝে মাতৃসঙ্গীত এবং বিশেষভাবে মা-কালীর গান গাহিয়া তাহাদিগকে তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। নিজ ভবিষ্যতের কথায় তিনি বলিলেন, গঙ্গাতীরে নগ্ন, নিঃসঙ্গ পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর জীবন ছাড়া তাঁহার কামনা করিবার কিছু নাই। 'স্বামীজী' মরে গেছে। জগৎকে শিক্ষা দিবার তিনি কে? তাকে দিয়ে মায়ের কোন প্রয়োজন নেই। শুধু তাঁরই মায়ের প্রয়োজন আছে।

ঐদিন যথাসময়ে স্বামীজী লাহোর রওনা হইয়া গেলেন। তাঁহাকে তথা হইতে কলিকাতা লইয়া যাইবার জন্য স্বামী সদানন্দকে ভার করিয়া আলমোড়া হইতে সেখানে আনা হইয়াছিল। কয়েক দিন পরে মিসেস বুল প্রভৃতিও সেখানে পৌঁছিলে, স্বামীজী স্বামী সদানন্দের সহিত কলিকাতায় রওনা হইয়া গেলেন এবং তৎপর তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যাগণ ব্যবস্থানুসারে স্বামী সারদানন্দের সহিত দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ স্থান সকল দেখিতে যাত্রা করিলেন।

লাহোর হইতে রওনা হইয়া ১৮ই অক্টোবর (১৮৯৮) তারিখে স্বামীজী বেলুড়ের (ভাড়াটিয়া) মঠবাড়ীতে পৌঁছিলেন। এই সময়ে তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা যারপরনাই খারাপ ছিল। শিবের ভাবে

আবিষ্ট হইয়া তিনি যন্ত্রের ন্যায় দুর্গম অমরনাথের পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন সত্য। কিন্তু তাহাতে তাঁহার শরীরে যে চোট লাগিয়াছিল তাহা তিনি এখনও সামলাইয়া উঠিতে পারেন নাই। তারপর ক্ষীরভবানীতে তিনি কয়েকদিন যে সুতীব্র ধ্যান করিয়াছিলেন, তাহার ফলে তাঁহার বাম চক্ষের একস্থানে কিছু রক্ত এখনও জমিয়া ছিল। আর তাঁহার সেই তখনকার ধ্যানোন্মুখ আবিষ্টতা এই সময়েও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। তিনি যখন তখন গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া পড়িতেন। সমস্ত লক্ষ করিয়া তাঁহার গুরুভাইগণের আশঙ্কা হইল, এই অবস্থা চলিতে থাকিলে তিনি যে কোনও মুহূর্তে নির্বিকল্প সমাধিমগ্ন হইয়া দেহত্যাগ করিতে পারেন।

এই অবস্থায় স্বামীজী কিছুদিন হাঁপানিতে ভুগিলেন। শঙ্কিত হইয়া তাঁহার গুরুভাইগণ তাঁহাকে কলিকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার আর এল দত্তের দ্বারা পরীক্ষা করাইলেন। পরীক্ষান্তে ডাক্তার দত্ত ও তাঁহার সাহায্যকারী অপর ডাক্তারগণ সকলেই একমত হইয়া বলিলেন, স্বামীজীর খুবই সতর্ক হইয়া থাকা উচিত।

কিন্তু সতর্ক হওয়া স্বামীজীর পক্ষে অসম্ভব ছিল। হয় কর্ম, না হয় ধ্যান-সমাধি, মাত্র এই দুইটিই ছিল তাঁহার স্বাভাবিক বিচরণ ক্ষেত্র। এবং এই দুইটিকে একেবারে বাদ দিয়া বিরাম বিশ্রাম লওয়া তাঁহার ধাত-বিরুদ্ধ ছিল। তাই মঠে ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার পূর্বের ন্যায় বিরামহীন কর্মও আরম্ভ হইয়াছিল। তবে (দুই-একটি হালকা কাজ ব্যতীত) তাঁহার এবারকার প্রায় সকল কর্মই ছিল তাহার পূর্বারব্ধ কাজগুলির পরিসমাপন বা তদুদ্দেশ্যে কৃত। আমরা নিম্নে তাহা সংক্ষেপে লক্ষ করিবার প্রয়াস পাইলাম।

স্বামীজী পূর্বে মঠে নূতন ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদের যে শিক্ষা ও শিক্ষণ দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অনুপস্থিতির জন্য কখন বন্ধ হয় নাই। ধ্যান-ধারণা, বেদ ও অপর নানা শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং জড়-বিজ্ঞানাদির শিক্ষা-গ্রহণ ইত্যাদি সবই নিয়মিতভাবে চলিয়া আসিয়াছিল। এখন স্বামীজী মঠে ফিরিয়া ঐ কাজ পূর্বের ন্যায়

নিজে পরিচালনা করিতে লাগিলেন। জানা যায়, প্রথম দিন (১৮ই অক্টোবর) তিনি তাঁহার কাশ্মীরে রচিত তিনটি কবিতা (To the Fourth of July, To the Awakened India ও Kali the Mother) নিজে পড়িয়া সকলকে শুনান। তাহার পরের দুই দিন (১৯শে ও ২০শে অক্টোবর) তিনি হোম করেন। এবং তাহার পরের তিন দিন দুর্গাপূজার দিন থাকায়, ঐ তিন দিন তিনি তাঁহার সমাগত গৃহী শিষ্য ও ভক্তগণের উপকারার্থে ব্যয় করেন।

১লা নভেম্বর হইতে তিনি কখন মঠে, কখন কলিকাতায় বলরামবাবুর বাড়ীতে থাকিতে আরম্ভ করেন। ৫ই নভেম্বর তিনি মঠে কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতি শ্রীঋষিবর মুখোপাধ্যায় ও প্রধান মন্ত্রী শ্রীনীলাম্বর মুখোপাধ্যায়কে অভ্যর্থনা করেন। তৎপরদিন (৬ই নভেম্বর) তিনি তাঁহার কাশ্মীর ভ্রমণের সঙ্গী পাশ্চাত্য শিষ্যা তিনটিকে মঠে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান। তাহারা সকলেই ইতিমধ্যে তাহাদের উত্তর ভারত ভ্রমণ শেষ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন।

উক্ত পাশ্চাত্য শিষ্যাকয়টির মধ্যে ভগ্নী নিবেদিতা সকলের আগে ১লা নভেম্বর তারিখে একটা আবেগভরে একাকী কলিকাতায় ফিরেন। আলমোড়া ও কাশ্মীর ভ্রমণকালে গুরুর সাহচর্য, শিক্ষা ও উপদেশে তিনি এখন সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত। মনে মনে ও সর্বান্তঃকরণে নিজেকে গুরুর চরণে পরিপূর্ণরূপে নিবেদন করিয়া দিয়া, তিনি এখন চাহিতেছিলেন (তাহার গুরুরই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়া) তাহার জীবনের এক মহা পরিনতি—'আমি ভুলিতে চাই আমি ইওরোপীয়, আমি অনুভব করিতে চাই আমি একজন খাঁটি ভারতবাসী, ভারতমাতার নিজস্ব কন্যা ও তাহার সেবায় চির-উৎসর্গিতা।' তাই, তিনি হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়া, তথা হইতে সোজা বাগবাজারে বলরামবাবুর বাড়ীতে আসিয়া স্বামীজীর নিকট দাবী করিয়া বলেন, 'আমি মায়ের বাড়ীতে মায়ের সঙ্গে থাকব।' শ্রীশ্রীমা এই সময়ে ঐ বাড়ীরই নিকটবর্তী ১০।২ নং বোসপাড়া লেনের বাড়ীতে থাকিতেন এবং তাঁহার সহিত তখন বাস করিতেছিলেন গোলাপমা, যোগীনমা,

লক্ষ্মীদিদি, গোপালের মা প্রভৃতি আচারনিষ্ঠ বিধবা সকল। তাহাদের সকলের জীবনই ছিল নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণীর জীবন। তাই, তাহাদের বাড়ীতে পাশ্চাত্যের একটি আইরিশ মেয়েকে স্থান দিতে তাহাদের রাজি করানো সহজ ব্যাপার ছিল না। কিন্তু মা ও স্বামীজীর চেষ্টায় তাহাদের সকল আপত্তি দূর হইল। এবং ঐ ১লা নভেম্বর তারিখেই মায়ের বাড়ীতে একখানি ঘর খালি করিয়া নিবেদিতাকে পৃথকভাবে থাকিতে দেওয়া হইল।

আমরা দেখিয়াছি নিবেদিতা ভারতে আসেন প্রধানতঃ ভারতের নারীদিগের উন্নতিকল্পে কাজ করিবার উদ্দেশ্যে। এবং প্রথম হইতেই স্থির ছিল যে, তিনি ঐ জন্য সর্বপ্রথম যত সত্বর সম্ভব কলিকাতায় মেয়েদের জন্য একটি স্কুল খুলিবেন। পরে তিনি ঠিক করেন যে স্কুলটির প্রথম পর্যায়ে উহা হইবে পরীক্ষামূলক, সুতরাং অস্থায়ী। এই স্কুলটি কিছুদিন চালাইয়া তিনি প্রথম আবিষ্কার করিবেন ভারতের নারীদিগের আধুনিক শিক্ষাদানের সর্বত্র প্রযোজ্য ও কার্যকরী ধারাগুলি কিরূপ হওয়া উচিত। এবং তারপর তাহার স্থায়ী স্কুলের কাজ আরম্ভ হইবে। এই বিষয়ে কলিকাতায়, আলমোড়ায় ও কাশ্মীরের নানাস্থানে স্বামীজীর সহিত তাহার যে আলাপ-আলোচনা হয়, তাহাতে স্থির হয় নিবেদিতা এই কাজ স্বাধীনভাবে ও কাহাকেও সহকারীরূপে না লইয়া একাকী ও খুব ছোটভাবে আরম্ভ করিবেন।

এখন কলিকাতায় ফিরিয়া নিবেদিতা যথাসত্বর তাহার ঐ প্রস্তাবিত স্কুলটি স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হইলেন। এবং মার বাড়ীতে আসার আট-দশ দিন পরেই, তিনি তাহার ঐ স্কুল চালু করিবার উদ্দেশ্যে নিকটবর্তী ১৬ নং বোসপাড়া লেনে উঠিয়া গেলেন। কিন্তু তখনও তিনি মায়ের সঙ্গ ছাড়িলেন না। প্রতিদিন সমস্ত বৈকাল-বেলাটা মার কাছে আসিয়া কাটাইতে লাগিলেন এবং পরে গ্রীষ্মকাল আসিলে তিনি মায়ের আদেশে প্রতিদিন রাত্রে তাঁহার (অপেক্ষাকৃত শীতল) বাড়ীতে আসিয়া শুইতেন। কিন্তু এবার আর তিনি পৃথক

ঘরে থাকেন নাই। মায়ের সঙ্গীনীদের সহিত একই ঘরে মেঝের উপর বিছানা পাতিয়া একই রকমের শয্যায় শয়ন করিয়াছেন।

যাহা হউক, ১৬নং বোসপাড়া লেনের বাড়ীতে আসিয়াই নিবেদিতা তাহার উক্ত স্কুল করিবার সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিলেন এবং ১২ই নভেম্বর তারিখে উহার প্রতিষ্ঠার দিন ধার্য করিলেন। ঐ দিন ছিল কালীপূজার দিন। সেদিন মা মঠে আসিয়া মঠের নবনির্মিত ঠাকুর ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করেন। তাই, ব্যবস্থানুসারে নিবেদিতা বৈকালে মঠে আসিলেন। এবং তিনি একখানি নৌকায় মা ও তাঁহার সঙ্গিনীগণকে ও অপর একখানি নৌকায় স্বামীজী, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দকে লইয়া বাগবাজার ফিরিয়া, তাঁহাদের দ্বারা ১৬নং বোসপাড়া লেনে তাঁহার বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-কার্য সম্পন্ন করাইলেন। সর্বশেষে মা স্কুলটির কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিলেন, "জগদম্বা এই স্কুলটিকে আশীর্বাদ করুন এবং এখানকার মেয়েরা যেন আদর্শ মেয়ে হয়।" এই ক্ষুদ্র স্কুলটির প্রতিষ্ঠার সঙ্গেই ভারতের নারীদিগের জন্য স্বামীজীর বহু-বিস্তৃত কার্যপরিকল্পনার প্রথম কাজ উদ্‌যাপিত হয়।

অল্প পরেই নূতন বেলুড়মঠের নির্মান কার্য শেষ হইলে, স্বামীজীর ব্যবস্থায় ৯ই ডিসেম্বর তারিখে (১৮৯৮) শ্রীশ্রীঠাকুরকে মঠের নবনির্মিত মন্দিরে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা হইল। এই প্রতিষ্ঠা-অনুষ্ঠানের প্রায় সকল কার্যই স্বামীজী নিজে করেন। এই দিন তিনি বিধিমত গঙ্গাস্নানান্তে (নীলাম্বরবাবুর ভাড়াটিয়া বাড়ীর) ঠাকুর ঘরে পূজকের আসনে বসিয়া প্রথমে ঠাকুরের ধ্যান করিলেন, তৎপর নিজেই আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁহার পূজা করিলেন ও তারপর আবার গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। পূজান্তে ঠাকুরের গৃহী ও ত্যাগী ভক্তদের একটি মিছিল নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ী হইতে নূতন মঠের দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। এই অপূর্ব মিছিলটির পুরোভাগে থাকিয়া স্বামীজী ঠাকুরের ভস্মাস্থিপূর্ণ তাম্রকৌটাটি নিজের দক্ষিণ স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। পথে তিনি তাঁহার

একটি শিষ্যকে বলিলেন, "ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন, তুই আমাকে কাঁধে করে যেখানে নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই থাকব,—তা সে গাছতলাই হোক বা দীনতম কুড়ে ঘরই হোক।" তারপর নূতন মঠ দেখা গেলে তিনি পুনরায় বলিলেন, "এই মঠ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে প্রদর্শিত সকল মত-পথের এক মহাসমন্বয়ের প্রচার কেন্দ্র হবে এবং এখান থেকেই শান্তি সমন্বয়ের মহা বার্তাসকল জগৎকে প্লাবিত করবে।"

নূতন মঠ-বাড়ীতে পৌঁছিয়া জমির উপর বিস্তৃত একটি আসনের উপরে উক্ত তাম্র কৌটাটি রাখিয়া সকলে সেখানে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তারপর আনুষ্ঠানিক পূজান্তে, স্বামীজী (বিধি অনুসারে শুধু সন্ন্যাসীগণের উপস্থিতিতে) বিরজা হোম করিলেন। ভোগের জন্য পায়সান্নও তিনি নিজে রাঁধিয়া ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন। সকল অনুষ্ঠান শেষ হইলে, স্বামীজী উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা সকলে প্রার্থনা কর—ঠাকুর যেন এই স্থানটিকে আশীর্বাদ করেন, এখানে তিনি যেন চিরবর্তমান থাকেন ও জগৎ-কল্যাণের জন্য এটিকে সর্বধর্মসমন্বয়ের এক মহা পুণ্যক্ষেত্রে পরিণত করেন।"

এই অনুষ্ঠানটির সহিত স্বামীজী তাঁহার সঙ্কল্পিত মঠ স্থাপনের বিরাট ও সুদুষ্কর কার্যটি সুসম্পন্ন করিয়া যারপরনাই আনন্দিত বোধ করিতে লাগিলেন। এবং অন্তরের একটা পরম পরিতৃপ্তির সহিত তিনি সেদিন বলিলেন, "যে বোঝা আজ বার বছর ধরে বুকে করে বেড়িয়েছি, তার দায়িত্ব থেকে আমি আজ মুক্ত হলাম।"

এই প্রতিষ্ঠা-দিবস (৯ই ডিসেম্বর, ১৮৯৮) হইতে স্বামীজী ও অপর কয়েকটি সাধু নূতন মঠে বাস করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাহা হইলেও সমগ্র মঠটি নীলাম্বরবাবুর ভাড়াটিয়া বাড়ী হইতে এখানে উঠিয়া আসে ২রা জানুআরি তারিখে (১৮৯৯) এবং কার্যতঃ সেই দিন হইতেই নূতন মঠটি বেলুড় মঠ নামে তাহার সুদূরপ্রসারী মহা কর্মময় জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করে।

১৮৯৭—৯৯

(সম্ভবতঃ নিজেকে স্বল্পায়ু বলিয়া ধারণা থাকায়) স্বামীজী কোন কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাহা দ্রুত সুসমাপনের জন্য যারপরনাই ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন। তাই দেখা যায়, ভারতের পুনরুত্থানের কার্যে হাত দিয়াই তিনি উহার সকল ধারাই একেবারে একসঙ্গে ভারতবক্ষে প্রবাহিত করাইয়া দিতে সচেষ্ট হন। কার্যারম্ভ করিয়া ১৮৯৭ ও ১৮৯৮ সনে তিনি যে সকল কাজ করিয়াছেন তাহার কতকগুলির একটা বর্ণনা আমরা বুঝিবার সুবিধার জন্য পৃথকভাবে উপরে দিয়াছি। ঐ দুই সনে এবং তাহার পরে ১৮৯৯ সনেও তিনি অপর যে কাজগুলি করেন, তাহার ফর্দ ও সংক্ষেপ বিবরণ এইরূপ ঃ

১। প্রচার কার্য ঃ এই কার্যের জন্য স্বামীজীর আদেশে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের শেষের দিকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজে, ঐ সনের মধ্যভাগে স্বামী শিবানন্দ সিংহলে এবং উহার পরবর্তী সনের (১৮৯৮) ৪ঠা ফেব্রুআরি তারিখে স্বামী বিরজানন্দ ও স্বামী প্রকাশানন্দ ঢাকায় ও তাহার মাত্র তিন দিন পরে স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ গুজরাটে যান। মাদ্রাজে প্রথম দিকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বেদান্ত দর্শন ও মহাপুরুষদের জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি বক্তৃতা দেন এবং শহরের নানা স্থানে সপ্তাহে এগারটি ক্লাস লইতে থাকেন। এবং তারপর অতি অল্পেই তিনি সেখানে একটি স্থায়ী প্রচার কেন্দ্র ও মঠ স্থাপন করিতে সক্ষম হন। সিংহলে স্বামী শিবানন্দ তামিল ও সিংহলীদের বেদান্তের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং রাজযোগ ও গীতার ক্লাস খোলেন। তাঁহার এই ক্লাসে কতিপয় ইউরোপীয়ও যোগ দেন। তাহাদের মধ্যে মিসেস্ পিকেট নামে একজন ছাত্রীকে তিনি বেদান্ত-প্রচার কার্যে বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়া হরিপ্রিয়া নাম দেন এবং তাহাকে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে বেদান্ত প্রচার করিতে পাঠান। ঢাকায় স্বামী বিরজানন্দ ও স্বামী প্রকাশানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচার করেন ও স্থানীয় লোকদের আন্তরিক ইচ্ছা ও অনুরোধে সেখানে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখা স্থাপন করেন।

গুজরাটে স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ কাথিয়াওয়ারের শহর-গুলিতে বক্তৃতা ও কথোপকথনের দ্বারা বেদান্ত প্রচার করেন। ঐ সকল স্থানে স্বামীজীর ভক্ত ও গুণমুগ্ধ ব্যক্তিগণের দ্বারা তাহারা সমাদরের সহিত অভ্যর্থিত হন এবং সর্বত্রই তাহাদের বক্তৃতাদি শুনিয়া সকলেই বিশেষ মুগ্ধ ও প্রভাবিত বোধ করেন। এইভাবে ঢাকা ও গুজরাটে তিনমাস কাল প্রচার ও শিক্ষাদানের কার্য চালাইবার পর, এই দুই স্থানের সন্ন্যাসী চারিজন স্বামীজীর আহ্বানে মঠে ফিরিয়া আসেন। তাহাদের নিকট হইতে তাহাদের সাফল্যের বিবরণ শুনিয়া তিনি যারপরনাই আনন্দিত হন। এই সকল ব্যতীত দেখা যায়, (স্বামীজীর অনুপ্রেরণায়) তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনও প্রচার কার্যের সাহায্যে ১৮৯৮-৯৯ সনে কলিকাতাতে ঘন ঘন জনসভা আহ্বান করিয়াছেন ও তাহাতে স্বামী সারদানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা অনেক সময়ে বক্তৃতা দিয়াছেন।

২। সেবাকার্য: স্বামীজীর আদেশ, অনুপ্রেরণা ও সাহায্যে ১৮৯৭-৯৯ সনে তাঁহার গুরুভাই ও শিষ্যগণ নানাস্থানে সেবাকার্যে নিযুক্ত হন। স্বামীজীর গুরুভাইদের মধ্যে তাঁহার দ্বারা স্বামী অখণ্ডানন্দ সর্বপ্রথম ও বহুপূর্বে জনহিতকর কার্য করিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন এবং স্বামীজী আমেরিকায় চলিয়া গেলে, তিনি তাঁহার উপদেশানুসারে খেতড়িতে শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তারের জন্য বিশেষ সফলতার সহিত অনেক কাজ করেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন মুর্শিদাবাদ জিলায় ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন সেখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তিনি কপর্দকশূন্য হইয়াও তথাকার অনশন ক্লিষ্ট লোকদের সাহায্যে যাহা সামান্য তাহার পক্ষে করা সম্ভব তাহা করিতে আরম্ভ করেন। সংবাদ পাইয়া স্বামীজী আনন্দিত হইয়া তাহার সাহায্যে কিছু টাকা সহ স্বামী নিত্যানন্দ ও ব্রহ্মচারী সুরেশ্বরানন্দকে পাঠাইয়া দেন এবং তৎসঙ্গে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সাহায্যার্থে একটি রিলিফ ফাণ্ড খুলেন। এই ফাণ্ডে কলিকাতা, বারাণসী, মাদ্রাজ ও মহাবোধি সোসাইটি হইতে প্রচুর অর্থসাহায্য পাওয়া যায়। ঐ টাকার সাহায্যে

অখণ্ডানন্দ তাহার সাহায্যদানের কাজ এত সুষ্ঠুভাবে চালিত করেন যে, (গবর্নমেণ্ট সাহায্য পরিবেশক) মুর্শিদাবাদের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার রিপোর্টে লিখেন, "স্বামী (অর্থাৎ স্বামী অখণ্ডানন্দ) যে সকল গ্রামে কাজ করিয়াছেন, সে সকল গ্রামের কোনও দায়িত্বই আমার বহন করিতে হয় নাই।" ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে স্বামী অখণ্ডানন্দ দুইটি পিতৃমাতৃহীন শিশুকে লইয়া (মুর্শিদাবাদের) মহুলাগ্রামে একটি অসাম্প্রদায়িক অনাথ আশ্রম (orphanage) স্থাপন করেন। এই আশ্রমের অনাথ শিশুদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে এবং ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি আশ্রমটি সারগাছিতে উঠাইয়া আনেন। আশ্রমের অনাথ বালকবালিকাদের খাওয়া, থাকা, শিক্ষা ও লালন পালনের সর্বপ্রকার ব্যবস্থাই তিনি অতি যত্নের সহিত করিতেন। এবং ক্রমে ক্রমে এই কার্যেরই বৃদ্ধি, বিস্তার ও নানা আবশ্যকীয় পরিবর্তনের ফলে সারগাছির ঐ আশ্রম বর্তমানে একটি অতি উচ্চশ্রেণীর শিক্ষা ও সেবাকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে।

১৮৯৭ সনে মুর্শিদাবাদের ন্যায় দিনাজপুর জেলাতেও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় ও ফলে কয়েকটি লোকের অনাহারে মৃত্যু ঘটে। এই সংবাদ মঠে পৌঁছিতেই, স্বামী ত্রিগুণাতীতের দ্বারা সেখানেও একটি সাহায্য কেন্দ্র খোলা হয় (আগষ্ট, ১৮৯৭) এবং মুর্শিদাবাদের কার্য-পদ্ধতি অনুসারেই সেখানকার কাজ চালানো হয়। স্বামী ত্রিগুণাতীত এরূপ দক্ষতা ও তৎপরতার সহিত এই কাজ পরিচালনা করেন যে, তিনি দুই মাসের মধ্যে চুরাশিটি গ্রামে তাঁহার সাহায্য দানের কাজ বিস্তৃত করিতে সক্ষম হন। তাঁহার নিঃস্বার্থ ও অক্লান্ত কর্ম দেখিয়া দিনাজপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট অবাক ও মুগ্ধ হন। ফলে স্বামী অখণ্ডানন্দের ন্যায় তিনিও সাহায্য দিবার জন্য গবর্নমেণ্টের নিকট হইতে কম মূল্যে চাউল কিনিবার সুযোগ ও অপর নানা সহযোগিতা পান। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার রিপোর্টে লিখেন, "স্বামী ত্রিগুণাতীত জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সাহায্য বিতরণ করিয়াছেন। তিনি

আমার বা অপর কাহারও বিনাসাহায্যে অতি উত্তমভাবে তাঁহার কার্য চালাইয়াছেন।"

স্বামী ত্রিগুণাতীত দিনাজপুর সদর শহরেও কিছু সাহায্যকার্য চালান। তাহার ঐ কার্য স্বচক্ষে দেখিয়া শহরবাসীগণ মুগ্ধ হন। এবং তাহার সাহায্য দানের কাজ শেষ হইলে, তাহাকে সংবর্ধনা জানাইবার জন্য শহরের প্রধান ব্যক্তিগণ ৩রা ডিসেম্বর তারিখে একটি সভা আহ্বান করেন এবং তাহাতে শহরবাসীগণের পক্ষ হইতে তাহাকে একটি মানপত্র দেওয়া হয়। ঐ মানপত্রের উত্তরে স্বামী ত্রিগুণাতীত 'দুর্ভিক্ষ ও তাহার প্রতিকার' সম্বন্ধে দুই ঘণ্টাকাল-ব্যাপী একটি বক্তৃতা করেন।

দিনাজপুরের সাহায্য কেন্দ্র খুলিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, মঠ স্বামী বিরজানন্দের দ্বারা দেওঘরেও একটি সাহায্য-কেন্দ্র খুলেন এবং উহার কার্যও মুর্শিদাবাদ ও দিনাজপুরের কর্ম-পদ্ধতিতেই চালানো হয়। ইহা ব্যতীত, কলিকাতা ও দক্ষিণেশ্বরে আর দুইটি সাহায্য-দানের কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ভারতের এইবারকার এই দুর্ভিক্ষ জনিত দুঃখ-দুর্দশার বিবরণ পাইয়া, স্বামীজীর আমেরিকা এবং ইংলণ্ডের শিষ্য ও বন্ধুগণ নানা স্থানে সভা করেন ও দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সাহায্যে প্রচুর অর্থ পাঠান।

অন্যদিকে, আমরা দেখিয়াছি ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে কলিকাতায় প্লেগ দেখা দিলে, স্বামীজী কিরূপ তৎপরতার সহিত ঐ রোগ-অধ্যুষিত পাড়াগুলির অধিবাসীদিগের সাহায্য করিবার ব্যবস্থা সকল সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। ১৮৯৯ সনের মার্চ মাসে কলিকাতায় পুনরায় ঐ রোগ দেখা দিলে, স্বামীজীর উপদেশে রামকৃষ্ণ মিশন অবিলম্বে ঐ রোগাক্রান্ত অঞ্চলগুলির সাহায্যার্থ (Ramakrishna Mission Plague Service নামে) একটি সেবকসমিতি গঠন করেন (৩১শে মার্চ, ১৮৯৯)। এবং প্লেগ-আক্রান্ত অঞ্চলগুলির কর্মী ও ভয়ার্ত অধিবাসীদিগকে সাহস ও মনোবল দিবার জন্য স্বামীজী নিজে একটি বস্তিতে বাস করিতে যান। ভগিনী নিবেদিতা উক্ত সেবকসমিতির

সেক্রেটারি, স্বামী সদানন্দ উহার প্রধান কার্য-নির্বাহক এবং স্বামী শিবানন্দ, নিত্যানন্দ ও আত্মানন্দ সহকারী কার্য-নির্বাহক নিযুক্ত হন। তাহাদের তত্ত্বাবধানে ঝাড়ুদারদিগের দ্বারা প্লেগ-অধ্যুষিত চারিটি পাড়ার গাড়ী গাড়ী ময়লা অপসারিত করা হয় এবং ঔষধাদি ছড়াইয়া পাড়াগুলিকে রোগজীবাণুমুক্ত করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ইহা ব্যতীত, ২১শে এপ্রিল তারিখে স্বামীজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি সভায়, নিবেদিতা ও স্বামীজী ছাত্রদিগকে প্লেগ নিবারণের কার্যে সেচ্ছাসেবক হইয়া যোগ দিতে আহ্বান করেন। ইহার ফলে, পনর জন ছাত্র সেচ্ছাসেবক হইয়া পাড়ায় পাড়ায় গিয়া স্বাস্থ্যরক্ষা সংক্রান্ত সাহিত্য বিতরণ করিতে ও মৌখিক উপদেশাদি দিতে লাগিলেন। এইভাবে প্লেগের উপশম না হওয়া পর্যন্ত তাহারা ভগিনী নিবেদিতার পরিচালনায় কার্য করিতে থাকেন ও প্রতি রবিবারে তাহার নিকট তাহাদের কার্যের রিপোর্ট দাখিল করিতেন।

৩। মঠ ও আশ্রম প্রতিষ্ঠা : স্বামীজীর জীবিতকালেই কলিকাতা, মাদ্রাজ ও মায়াবতী এই তিনস্থানে তিনটি মঠ বা আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম দুইটি প্রতিষ্ঠার বিবরণ আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করিয়াছি। মায়াবতী আশ্রম যে ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা এই। কলিকাতায় মঠ স্থাপনের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই, স্বামীজী মিঃ ও মিসেস সেভিয়ারের সাহায্যে শান্ত ও শীতল হিমালয়ের ক্রোড়ে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্যও প্রয়াসী হন। এই জন্য তিনি ধরমশালা, মারী, শ্রীনগর, দেরাদুন (১৮৯৭) ও আলমোড়া (১৮৯৮) প্রভৃতি স্থানে জমি খুঁজিয়াছেন। কিন্তু পছন্দসই জমি পান নাই। তারপর তিনি আলমোড়া হইতে দ্বিতীয়বার কাশ্মীর যাইবার সময় (১৮৯৮) মিঃ ও মিসেস সেভিয়ারের উপর জমি দেখিবার ভার দিয়া যান। তদনুসারে তাহারা (স্বামী স্বরূপানন্দকে সঙ্গে করিয়া) অনেক অনুসন্ধানের পর আলমোড়া জিলার সুন্দর মায়াবতী স্টেট পছন্দ ও খরিদ করেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ তারিখে (ঠাকুরের শুভ জন্মতিথিতে) স্বামীজীর আশীর্বাদ লইয়া তাঁহারা এই আশ্রমটি "অদ্বৈত আশ্রম"

নামে চালু করেন। স্বামীজী দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যে যাইবার পূর্বে এই আশ্রমের সাধুদের বাসের জন্য একটি বাড়ী ও উহার রাস্তাদি নির্মাণ কার্যের সাহায্যে স্বামী সচ্চিদানন্দ, বিরজানন্দ, বিমলানন্দ এবং ব্রহ্মচারী হরেন্দ্রনাথকে সেখানে পাঠাইয়া দেন। স্বামী স্বরূপানন্দ 'অদ্বৈত আশ্রমের' প্রথম সভাপতি নিযুক্ত হন।

৪। পত্রিকা প্রকাশ: স্বামীজী মৌখিক প্রচারের সহিত পত্রিকাদির সাহায্যে লেখনী-প্রচারের উপরও সমভাবে জোর দিতেন। এবং আমরা দেখিয়াছি তিনি পাশ্চাত্য দেশে থাকিতেই, তাঁহার উৎসাহ ও প্রেরণায় তাঁহার মাদ্রাজী শিষ্যগণ 'ব্রহ্মবাদিন্' (১৮৯৫, সেপ্টেম্বর) ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' (১৮৯৬) নামে দুইখানি ইংরেজি মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। কিন্তু ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে 'প্রবুদ্ধ ভারতের' তৎকালীন সম্পাদকের মৃত্যু হওয়ায় উহার প্রকাশ বন্ধ হয়। এই পত্রিকাখানি স্বামীজীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাই, তিনি ঐ সনেই (১৮৯৮) আলমোড়া থাকাকালে, ঐ কাগজখানির সম্পাদকীয় অফিস আলমোড়ায় আনিয়া স্বামী স্বরূপানন্দকে সম্পাদক ও মিঃ সেভিয়ারকে ম্যানেজার করিয়া উহা পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থা করেন। ইহার পরে তিনি কাশ্মীর চলিয়া গেলে, ঐ ব্যবস্থানুসারে উক্ত অফিস আলমোড়ায় উঠিয়া আসে এবং মিঃ সেভিয়ার ঐ পত্রিকাটির জন্য একটি হ্যাণ্ড প্রেস, টাইপ, কাগজ, ইত্যাদি নিজ ব্যয়ে খরিদ করেন। স্বামীজী শ্রীনগরে পৌঁছিয়া ঐ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশের জন্য "To The Awakened India" ('জাগ্রত ভারতের প্রতি') শীর্ষক তাঁহার একটি প্রসিদ্ধ ইংরেজি কবিতা রচনা করিয়া পাঠান। আলমোড়ায় এই পত্রিকাখানি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মুখপত্ররূপে বাহির হয়। এবং মায়াবতী আশ্রম স্থাপিত হইলে, ইহার অফিস সেখানে উঠিয়া যায়।

ইহা ব্যতীত দেখা যায়, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে স্বামীজী তাঁহার গুরুভাইদের একখানি বাংলা পত্রিকা বাহির করিবার জন্য উপদেশ ও প্রেরণা দিতে থাকেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে স্বামী ত্রিগুণাতীত তাঁহার ঐ ইচ্ছা কার্যে পরিণত করিতে অগ্রসর হন। কিন্তু নানা অনিবার্য

কারণে পত্রিকাখানি প্রকাশ করিতে বিলম্ব হয়। এবং উহার প্রথম সংখ্যা বাহির হয় ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুআরি। স্বামীজীর ইচ্ছা অনুসারে পত্রিকাখানির নাম হয় "উদ্বোধন"। স্বামী ত্রিগুণাতীত একক উহার সম্পাদক ও ম্যানেজার হইয়া কার্যারম্ভ করেন। উহা প্রথম দিকে পাক্ষিক পত্রিকা ছিল, পরে মাসিক হয়।

এইভাবে স্বামীজী নিজেকে নানাদিকের নানা কাজে নিযুক্ত করিলেও, তিনি ছিলেন অসুস্থ। পাশ্চাত্য দেশে থাকিতে তিনি কর্ম-ক্লান্ত দেহমনে আকুলভাবে আশা করিয়াছেন যে, ভারতে গিয়া তিনি দীর্ঘ বিশ্রাম লইয়া সুস্থ হইবেন। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, সে বিশ্রাম তিনি নিজেকে কখনও দিতে পারেন নাই। মাঝে মাঝে দার্জিলিঙ, আলমোড়া ও কাশ্মীর প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চলে থাকিয়া কিছুটা সুস্থ বোধ করিলেও, সমতল প্রদেশে আসিয়াই তিনি পুনরায় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। এবং কখন কখন তাঁহার অবস্থা যারপরনাই শঙ্কাজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেখা যায়, দ্বিতীয়বার কাশ্মীর হইতে কলিকাতায় ফিরিবার অল্প পরেই ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি মঠ-বাসীদের বলেন, তিনি উপস্থিত স্বাস্থ্যোদ্ধারের নিমিত্ত বৈদ্যনাথ যাইবেন এবং পরে—সম্ভবতঃ আগামী গ্রীষ্মেই—পুনরায় একবার ইওরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণে রওনা হইবেন। তদনুসারে তিনি স্বাস্থ্যো-দ্ধারের নিমিত্ত ১৯শে ডিসেম্বর (১৮৯৮) তারিখে ব্রহ্মচারী হরেন্দ্রনাথকে লইয়া বৈদ্যনাথ যাত্রা করেন ও ৩১শে জানুআরি (১৮৯৯) পর্যন্ত সেখানে থাকিয়া কিছুটা সুস্থ হন। কিন্তু গ্রীষ্ম আসিতেই তাঁহার শরীরের অবস্থা পুনরায় এত খারাপ হইয়া পড়িল যে, তাঁহার বন্ধু ও ডাক্তারগণ তাঁহাকে অবিলম্বে পাশ্চাত্য দেশে রওনা হইয়া যাইতে উপদেশ দিলেন। তাহারা আশা করিতেছিলেন যে, সমুদ্রভ্রমণে তাঁহার স্বাস্থ্যের বিশেষ উপকার হইবে। তাই, পরিশেষে স্থির হইল তিনি ২০শে জুন তারিখে প্রিন্সেপ্‌স্ ঘাট হইতে জাহাজে রওনা হইবেন এবং স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগ্নী নিবেদিতা তাঁহার সঙ্গে যাইবেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ যাইবেন তাঁহার আমেরিকার কার্যের সাহায্যার্থে এবং ভগ্নী

নিবেদিতা যাইবেন তাঁহার বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে।

জানা যায়, রওনা হইবার দিন শ্রীশ্রীমা স্বামীজী, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও মঠের অপর সন্ন্যাসীগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার কলিকাতার বাটীতে আনিয়া পরিতোষপূর্বক আহার করান। এবং প্রথমবারের ন্যায় স্বামীজী এবারও (স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত) শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ লইয়া যাত্রা করেন।

ছত্রিশ

দ্বিতীয়বার আমেরিকা ও ইওরোপে

(জুন, ১৮৯৯—নভেম্বর, ১৯০০)

(১) দ্বিতীয়বার আমেরিকায়

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন তারিখে স্বামীজী আমেরিকা যাইবার উদ্দেশ্যে স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগ্নী নিবেদিতাকে লইয়া "গোলকোণ্ডা" নামক জাহাজে কলিকাতা হইতে লণ্ডন রওনা হইলেন। ২৪শে জুন তারিখে জাহাজ মান্দ্রাজে থামিল। সেখানে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও কয়েকজন ভক্ত ফল, ফুল প্রভৃতি উপহার লইয়া নৌকায় জাহাজের পার্শ্বে আসিলে, স্বামীজী রেলিং-এর নিকট আসিয়া তাহাদের সহিত কথা বলিলেন। তাঁহার প্রিয় শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমল "ব্রহ্মবাদিন্" পত্রিকার পরিচালনা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে কলম্বোর একখানি টিকিট কিনিয়া ঐ জাহাজে উঠিলেন। জাহাজ কলম্বো পৌঁছিলে, স্বামীজী সেখানে এক বিপুল সংবর্ধনা লাভ করিলেন। স্যার কুমারস্বামী, মিঃ অরুণাচলম প্রভৃতি পুরাতন বন্ধুগণকে দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন। এবং তীরে নামিয়া মিসেস্ হিগিন্সের বৌদ্ধ বালিকাদের বোর্ডিং স্কুল ও কাউণ্টেস্ ক্যানোভারার (খৃষ্টান) স্ত্রীমঠ ও স্কুল পরিদর্শন করিলেন। ২৮শে জুন তারিখে জাহাজ কলম্বো ত্যাগ করিয়া, পর পর এডেন (৮ই জুলাই) সুয়েজ (১৪ই জুলাই), নেপ্ল্স্, মার্সাই প্রভৃতি বন্দর হইয়া ইংলণ্ডে গমন করিল। স্বামীজী ৩১শে জুলাই তারিখে লণ্ডন পৌঁছিলেন।

তাঁহার এবারকার এই ছয় সপ্তাহের সমুদ্রভ্রমণ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তাঁহার বিরামহীন অমূল্য কথাবার্তার দ্বারা উজ্জ্বল। ভগ্নী নিবেদিতা তাঁহার "The Master As I Saw Him" গ্রন্থে

উহার কিয়দংশ লিপিবদ্ধ করিয়া এই ভ্রমণটিকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। ইহা ব্যতীত, এই সময়ে স্বামীজী প্রতিশ্রুতি অনুসারে "উদ্বোধন" পত্রিকার জন্য কতকগুলি বাংলা প্রবন্ধও লিখেন। সেগুলি পরে একত্র করিয়া পুস্তকাকারে "পরিব্রাজক" নামে প্রকাশ করা হইয়াছে।

স্বামীজী লণ্ডন পৌঁছিলে যাহারা ষ্টেশনে গিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন, তাহাদের মধ্যে তাঁহার দুইজন আমেরিকান শিষ্যাও ছিলেন। তাহারা (মিসেস্ ফাঙ্কে ও ভগ্নী ক্রিষ্টিন) শুনিয়াছিলেন স্বামীজী অত্যন্ত অসুস্থ, তাই তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত তাহারা ডেট্রয়েট হইতে লণ্ডনে আসিয়াছিলেন। মিসেস্ ফাঙ্কে লিখিয়াছেন, 'স্বামীজী এই সময়ে খুবই কৃশ হইয়াছিলেন। তবে ছয় সপ্তাহ সমুদ্র-ভ্রমণের ফলে অনেকটা সবল বোধ করিতেছিলেন।' লণ্ডনের উপকণ্ঠ উউম্‌ব্‌ল্‌ডনে তিনি দুই সপ্তাহ বাস করেন। ঐ সময়টা গ্রীষ্মাবকাশের সময় থাকায় তাঁহার অধিকাংশ বন্ধু ও শিষ্যগণ লণ্ডনের বাহিরে ছিলেন। তাই, দুই চারিটি ঘরোয়া আসরে কথাবার্তা বলা ব্যতীত তিনি এইবার লণ্ডনে অপর কোন কাজ করেন নাই। অন্যদিকে, এই কালে সত্বর আমেরিকায় ফিরিবার জন্য তিনি সেখানকার বন্ধু ও শিষ্যগণের দ্বারা পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইতেছিলেন। তাই, তিনি আর অধিক বিলম্ব না করিয়া, ১৬ই আগষ্ট তারিখে স্বামী তুরীয়ানন্দ ও উক্ত আমেরিকান শিষ্যা দুইটিকে লইয়া লণ্ডন হইতে আমেরিকা রওনা হইলেন। গ্লাসগোতে তাঁহারা জাহাজে উঠেন ও দশ দিন পরে নিউ ইয়র্কে পৌঁছেন। মিসেস ফাঙ্কে লিখিয়াছেন, 'এই দশ দিন তাহারা গুরুর সান্নিধ্যে থাকিয়া তাঁহার নিকট হইতে যে শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাহারা জীবনে কখন ভুলিতে পারিবেন না।'

স্বামীজী যেদিন নিউ ইয়র্কে পৌঁছিলেন, সেই দিনই তিনি তাঁহার গুরু ভাইকে লইয়া মিঃ ও মিসেস্ লেগেটের সহিত তাহাদের (দেড় শত মাইল দূরবর্ত্তী) হাডসন নদীতীরস্থিত সুন্দর গ্রাম্য বাড়ী রিজলি

ম্যানরে (Ridgley Manor) যান ও সেখানে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন। একমাস পরে (সেপ্টেম্বর মাসে) ভগ্নী নিবেদিতাও সেখানে আসিলেন এবং মিঃ ও মিসেস্ লেগেটের অতিথি হইয়া ঐ একই বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। স্বামীজী তাঁহার উপস্থিতি ও কথাবার্তার দ্বারা সকলকে প্রচুর শিক্ষা ও আনন্দ দান করিয়া ৫ই নভেম্বর পর্যন্ত ঐ বাড়ীতে রহিলেন। তিনি যখন নিউ ইয়র্কে পৌঁছিয়াছিলেন, তখন স্বামী অভেদানন্দ একটি বক্তৃতা-সফরের কার্যে অন্যত্র ছিলেন। তাই, রিজলি ম্যানরে যাইবার অল্প পরেই তিনি নিউ ইয়র্কের কার্যের অবস্থা জানিবার জন্য স্বামী অভেদানন্দকে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য তার করেন। তদনুসারে, স্বামী অভেদানন্দ রিজলি ম্যানরে আসিয়া দশ দিন ছিলেন। তাহার নিকট হইতে নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির জন্য স্থায়ী স্থান হওয়ার সংবাদ পাইয়া স্বামীজী যারপরনাই আনন্দিত হন। স্বামী অভেদানন্দ ১৫ই অক্টোবর তারিখে বেদান্ত সোসাইটির ঐ নূতন ঘরগুলিতে প্রবেশ করেন এবং ২২শে অক্টোবর তারিখ হইতে সেখানে ক্লাস করিতে আরম্ভ করেন।

৬ই নভেম্বর তারিখে স্বামীজী রিজলি ম্যানর হইতে নিউ ইয়র্কে আসেন ও সেখানে একপক্ষকাল থাকেন। এই সময়ে ৮ই নভেম্বর তারিখে প্রশ্নোত্তরের ক্লাসে তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১০ই নভেম্বর তাঁহাকে বেদান্ত সোসাইটির লাইব্রেরি ঘরে সাধারণের পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা করা হয়। এই সভায় তাঁহার নিউ ইয়র্কের পুরাতন বন্ধুগণ এবং তাঁহাকে দর্শনেচ্ছু অনেক নূতন লোকও উপস্থিত ছিলেন। এই সকল ব্যতীত, তিনি এই সময়ে তাঁহার শিষ্য ও সমাগত ব্যক্তিগণের সহিত নানা আলাপ-আলোচনা করেন, নিউ ইয়র্কের নিকটবর্তী কয়েকটি শহরে যান ও স্বামী তুরীয়ানন্দকে তাঁহার আমেরিকার কার্যে নিয়োজিত করেন। দেখা যায়, অল্প পরেই স্বামী তুরীয়ানন্দ নিউ ইয়র্ক, ক্যামব্রিজ প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতাদান, প্রবন্ধপাঠ ইত্যাদি নানা কার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

উক্তরূপে একপক্ষকাল নিউ ইয়র্কে থাকিয়া, স্বামীজী ২২শে নভেম্বর তারিখে (আমন্ত্রিত হইয়া) আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলের কালিফোর্ণিয়া স্টেটে রওনা হইয়া যান। যাইবার পথে তিনি তাঁহার চিকাগোর বন্ধু ও গুণমুগ্ধ ব্যক্তিগণের অনুরোধে ঐ শহরে নামিয়া কয়েকদিন থাকেন। সেখানে তাঁহার সম্মানে কয়েকটি অভ্যর্থনা সভা হয়। শহরের উপকণ্ঠের নানাস্থানেও তিনি ঐরূপে অভ্যর্থিত হন এবং কয়েকজন ধনী ও পদস্থ লোক তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করান। তারপর চিকাগোর নূতন ও পুরাতন বন্ধুগণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, তিনি ডিসেম্বর মাসের প্রারম্ভে কালিফোর্ণিয়ায় পৌঁছেন ও পরবর্তী বৎসরের মে মাসের শেষ পর্যন্ত (অর্থাৎ, মোট ছয় মাস) সেখানে থাকেন। প্রথমবারে এই অঞ্চলে তিনি আদৌ আসিতে পারেন নাই।

এই অঞ্চলে স্বামীজীর প্রথম গন্তব্য স্থান ছিল দক্ষিণ কালিফোর্ণিয়ার লস্ এঞ্জেলেস্ শহর। সেখানে তিনি প্রথম মিসেস্ ব্লজেটের অতিথি হন। তখন মিস্ ম্যাকলাউড ও তাঁহার ভ্রাতাও ঐ মহিলাটির অতিথি হইয়া ঐখানেই ছিলেন। লস্ এঞ্জেলেসে স্বামীজী ডিসেম্বর মাসের (১৮৯৯) সুরু হইতে ফেব্রুআরি মাসের (১৯০০) মাঝামাঝি পর্যন্ত (অর্থাৎ, মোট আড়াই মাস কাল) থাকেন। এখানে তিনি (পূর্বে কখন না আসিলেও) একেবারে অপরিচিত ছিলেন না। কারণ, এখানকার শত শত লোক তাঁহার বইগুলি, বিশেষতঃ "রাজযোগ", পড়িয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে উদ্‌গ্রীব ছিল। তাহাদের আমন্ত্রণে তিনি লস্ এঞ্জেলেসে অনেকগুলি বক্তৃতা দেন। উহার প্রথমটি তিনি দেন ব্লাঞ্চার্ড হলে ৮ই ডিসেম্বর তারিখে (বিষয়, বেদান্ত দর্শন) এবং দ্বিতীয় বক্তৃতা দেন এ্যমিটি চার্চে (বিষয়, ব্রহ্মাণ্ড)। তৎপরের বক্তৃতাগুলি তিনি দেন শহরের বিভিন্ন হলে। ইহা ছাড়া, "হোম অব ট্রুথ" (Home of Truth) নামক এ্যাসোসিয়েসনের অনুরোধে তিনি উহার লস্ এঞ্জেলেসের হেড কোয়ার্টার্সে প্রায় একমাস কাল

থাকিয়া, সেখানে অনেকগুলি ক্লাস গ্রহণ করেন ও সর্বসাধারণের জন্য কয়েকটি বক্তৃতা দেন। ফলে, হোম অব ট্রুথ এ্যাসোসিয়েসনের অনেক সভ্য স্বামীজীর অতি উৎসাহী ভক্ত হইয়া উঠেন। অন্যদিকে, ঐ একই সময়ে তিনি লস্ এঞ্জেলেস্ হইতে দশ মাইল দূরবর্তী প্যাসাডেনা শহরে গিয়াও তথাকার ইউনিভারস্যালিস্ট চার্চ ও সেক্সপিয়ার ক্লাবে অনেকগুলি বক্তৃতা দেন। বস্তুতঃ এইকালে তিনি লস্ এঞ্জেলেস্ ও প্যাসাডেনা শহরের কোথাও না কোথাও রোজই (বিপুল সংখ্যক শ্রোতার সম্মুখে) একটি না একটি বক্তৃতা দিয়াছেন। কালিফোর্ণিয়ার স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় তাঁহার শরীর এইকালে অনেক ভাল হইয়াছিল এবং তিনি প্রায় পূর্বের ন্যায় পরিশ্রম করিতে সক্ষম হন। এইকালে আর একটি সংবাদ এই। লস্ এঞ্জেলেসে তিনি কিছুদিন মিস্ স্পেন্সারের অতিথি ছিলেন। অল্প পরেই এই মহিলাটি তাঁহার একজন অত্যুৎসাহী শিষ্যা হন।

স্বামীজীর লস্ এঞ্জেলেসের কার্য সম্বন্ধে একটি পত্রিকা (Unity) লিখেন, "হিন্দু মিশনারীগণ আমাদের কোন নূতন ধর্ম গ্রহণ করাইতে আসেন নাই। তাঁহারা আমাদের বুঝাইতে চাহেন যে ধর্ম প্রকৃতপক্ষে একটিই এবং আমরা যাহা বিশ্বাস করি তাহা আমাদের ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করিয়া চলা কর্তব্য।...স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে একটি বিশ্ববিদ্যালয়-সভাপতির পাণ্ডিত্য, একটি আর্চবিশপের গরিমা ও একটি মুক্ত শিশুর কমনীয়তা ও মিষ্টত্ব একাধারে বর্তমান। কোন রকমে প্রস্তুত না হইয়া এবং মঞ্চের উপর উঠিয়াই মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া তিনি তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করেন।"

ফেব্রুআরি মাসের মধ্যভাগে স্বামীজী আমন্ত্রিত হইয়া লস্ এঞ্জেলেস্ হইতে উত্তর কালিফোর্ণিয়ার ওকল্যাণ্ড শহরে যান ও সেখানে ফার্স্ট ইউনিটেরিয়ান চার্চের ধর্মযাজক রেভারেণ্ড ডাঃ বেঞ্জামিন ফে মিল্‌সের অতিথি হন। এই সময়ে ঐস্থানে একটি প্রাদেশিক ধর্ম সম্মেলনের অধিবেশন চলিতেছিল। ঐ সম্মেলনে স্বামীজী (প্রায় দুই হাজার শ্রোতার সম্মুখে) মোট আটটি বক্তৃতা দেন। তখন

কালিফোর্ণিয়ার শত শত বিশিষ্ট ধর্মযাজক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা করেন এবং তাহাদের অনেকেই তাঁহার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন। পূর্বোক্ত রেঃ ডাঃ মিল্‌স্ একদিন তাঁহার একটি বক্তৃতায় (বিষয়, পরিত্রাণলাভের হিন্দুপন্থা) স্বামীজীকে এইভাবে পরিচয় করাইয়া দেন, "ইনি একজন বিপুল মেধাসম্পন্ন লোক, এমন লোক যাহার কাছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সর্বপ্রধান অধ্যাপকগণ নেহাৎ শিশুর মত।"

ওকল্যাণ্ডের ধর্মসম্মেলনে স্বামীজী যে বক্তৃতাগুলি দিলেন, তাহা তাঁহার শ্রোতাগণের মনে এক গভীর ছাপ অঙ্কন করিল। ফলে, কালিফোর্ণিয়া স্টেটের সমস্ত প্রধান বিদ্বৎসমাজগুলিতে একটা সাড়া দেখা দিল। ঐ স্টেটের প্রধান শহর স্যান ফ্রান্সিস্‌কোর (San Francisco) বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির অনুরোধে স্বামীজী ফেব্রুআরি মাসের শেষের দিকে সেখানে যান ও সমস্ত মার্চ ও এপ্রিল মাস ভরিয়া শহরের বহু বিভিন্ন হলে প্রচুর বক্তৃতা দেন। মাঝে মাঝে অদূরবর্তী ওকল্যাণ্ড ও আলামেডা শহরে গিয়াও বহু বক্তৃতা দিয়াছেন। এই শেষোক্ত শহরে তিনি তথাকার হোম অব ট্রুথ এ্যাসোসিয়েসনের ভবনে থাকিতেন।

উক্তরূপে বক্তৃতা দেওয়া ব্যতীত, স্বামীজী স্যান ফ্রান্সিস্‌কোতে উক্ত মার্চ ও এপ্রিল মাসে (স্থানীয় লোকদের আগ্রহ-অনুরোধে) নিয়মিতভাবে রাজযোগ ও ধ্যান শিক্ষা দিবার ক্লাস করেন। ইহা অতি সত্বরই বিশেষ সুফলপ্রদ হইল। অনেক ছাত্র-ছাত্রী স্বামীজী ও তাঁহার শিক্ষার একান্ত ভক্ত ও অনুগামী হইয়া উঠিল। তাহাদের একজন মিস্ মিন্নি বুক (Miss Minnie C. Boock) ছাত্রদের জন্য নির্জন স্থানে একটি শান্তি আশ্রম (Peace Retreat) স্থাপনের জন্য স্বামীজীকে ১৬০ একর জমি দান করিলেন। এই জমি কালিফোর্ণিয়ার স্যাণ্টা ক্লারা কাউণ্টিতে (Santa Clara County) ২৫০০ ফিট উচ্চে এবং নিকটতম লোকালয় হইতে ১২ মাইল ও নিকটতম রেল ষ্টেশন হইতে ৫০ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। মাত্র তিন মাইল দূরে একটি

পোষ্ট অফিস পাওয়া যাইত। স্থানটির বর্ণনা শুনিয়া স্বামীজী সন্তুষ্ট হন এবং নিউ ইয়র্কে ফিরিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দকে ঐ স্থানে একটি শান্তি আশ্রম স্থাপনের জন্য (ও স্যান ফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটির কাজের ভার লইবার নিমিত্ত) কালিফোর্ণিয়ায় পাঠাইয়া দেন (৩রা জুলাই, ১৯০০)।

কালিফোর্ণিয়ায় আসিয়া স্বামীজীর স্বাস্থ্য প্রথমটা অনেক ভাল হইলেও, তিনি সেখানে অত্যধিক পরিশ্রম করেন। তিনি পাঁচ মাসে সেখানে অন্ততঃ এক শতটি বক্তৃতা দেন, লস্ এঞ্জেলেস্ ও স্যান ফ্রান্সিস্কোতে নিয়মিত ক্লাস করেন, সাক্ষাৎকামী বহু লোকের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা করেন এবং ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা-প্রার্থী অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে সযত্নে শিক্ষা দেন। ইহা ব্যতীত, তিনি নিউ ইয়র্কের ন্যায় লস্ এঞ্জেলেস্ ও স্যান ফ্রান্সিস্কোতে একটি করিয়া বেদান্ত সোসাইটি স্থাপন করেন। এই সকল বহু রকমের বহু কর্মের গুরুশ্রমে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়েন। তাই, তিনি মে মাসে (১৯০০) কয়েকটি বন্ধুর সহিত ক্যাম্প টেলরে (Camp Taylor) গিয়া তিন সপ্তাহ বিশ্রাম করেন। এবং তারপর তথা হইতে স্যান ফ্রান্সিস্কোতে ফিরিয়া আসিয়াও, তিনি তাঁহার একটি ডাক্তার শিষ্যের (Dr. Logan) বাড়ীতে তাহার ও অপর একটি ডাক্তারের (Dr. William Forster) চিকিৎসাধীনে থাকেন। তাহারা তাঁহার সাধারণের সমক্ষে বক্তৃতা দেওয়া বন্ধ করিয়া দেন। তবে দেখা যায়, মে মাসের শেষের দিকে (২৪, ২৬, ২৮ ও ২৯ তারিখে) তিনি শহরের দুইটি স্থানে গীতা সম্বন্ধে চারিটি ঘরোয়া ভাষণ দিয়াছেন।

স্বামীজীর কালিফোর্ণিয়ার শিষ্যগণের মধ্যে লস্ এঞ্জেলেসের তিন ভগ্নীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহারা উচ্চ সমাজের লোক ছিলেন এবং লস্ এঞ্জেলেসে স্বামীজীর সকল প্রয়োজন তাহারাই মিটাইতেন। তাহাদের একজন (Mrs. Hansborough) তাঁহার জন্য না করিতেন এমন কাজ নাই।

স্বামীজীর কালিফোর্ণিয়ায় অবস্থানের শেষের দিকে মিঃ ও মিসেস্

লেগেট লণ্ডনে ছিলেন। তাহারা তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা জ্ঞাত হইয়া, তাঁহাকে জুলাই মাসে (১৯০০) প্যারিসে আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। ইহা ব্যতীত, তিনি ১৯০০ খৃষ্টাব্দের প্যারিস এক্সিবিসনের "ধর্মেতিহাস-মহাসভায়" (The Congress of the History of Religions) বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় প্যারিসে যাইবার পূর্বে নিউ ইয়র্কে কয়েক সপ্তাহ থাকিবার জন্য তিনি মে মাসের শেষে তাঁহার স্যান ফ্রান্সিস্কো, আলামেডা ও ওকল্যাণ্ডের শিষ্যগণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া ও কালিফোর্ণিয়ায় বেদান্ত প্রচারের পরিচালনার জন্য স্বামী তুরীয়ানন্দকে সত্বর পাঠাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়া নিউ ইয়র্কে রওনা হইলেন।

পথে তিনি চিকাগো ও ডেট্রয়েটে দুই-এক দিন করিয়া থাকিয়া পুরাতন বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ৭ই জুন তিনি নিউ ইয়র্কে পৌঁছিলেন এবং সেখানে স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দের সহিত বেদান্ত সোসাইটির হেডকোয়ার্টার্সে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভগিনী নিবেদিতাও নিউ ইয়র্কে ছিলেন। এবার স্বামীজী এখানে চার রবিবারে চারিটি বক্তৃতা দেন এবং চার শনিবার সকাল-বেলায় চারিটি গীতার ক্লাস গ্রহণ করেন। এই সকল সভা ও ক্লাসে ভগ্নী নিবেদিতা প্রায়ই যোগ দিতেন ও তিনি দুই দিন সন্ধ্যায় দুইটি বক্তৃতাও করেন। এবার স্বামীজীর অধিকাংশ সময় কাটিত তাঁহার পুরাতন বন্ধু ও শিষ্যদের শিক্ষাদানে ও তাহাদের সহিত নানা বিষয়ে নানা আলাপ-আলোচনায়। বিশেষভাবে মিস্ ওয়াল্ডোকে তিনি তাঁহার আমেরিকার কার্য-পরিচালনা বিষয়ে অনেক উপদেশ দেন। নিউ ইয়র্কের বেদান্ত সোসাইটির ও তাহার কার্যের উন্নতি ও বিস্তারে তিনি যারপরনাই সন্তুষ্ট হন। কিছু পূর্বে মিঃ লেগেট তাহার নিজ নানা কার্যের গুরুচাপে বেদান্ত সোসাইটির সভাপতিত্ব কলম্বিয়া কলেজের অধ্যাপক ডাঃ পার্কারের (Dr. Herschell C. Parker) অনুকূলে ত্যাগ করায়, তাহার স্থানে উক্ত অধ্যাপক সর্বসম্মতিক্রমে

নূতন সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। তাহা ছাড়া, অপর অনেক গণ্য, মান্য ও পদস্থ ব্যক্তি সোসাইটির সভ্য অথবা সমর্থক হইয়াছেন। ৩রা জুলাই তারিখে স্বামীজী পুনরায় একবার ডেট্রয়েটে যান এবং সেই দিনই ও তাঁহারই নির্দেশে স্বামী তুরীয়ানন্দ নিউ ইয়র্ক হইতে প্রস্তাবিত শান্তি আশ্রম স্থাপন করিতে ও স্যান ফ্রান্সিস্কোর বেদান্ত সোসাইটির পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে কালিফোর্ণিয়া যাত্রা করেন। ডেট্রয়েটে স্বামীজী মিসেস্ গ্রীনষ্টিডেলের (Mrs Greenstidel) বাড়ীতে থাকিয়া সাত দিন বিশ্রাম লন। তারপর নিউ ইয়র্কে ফিরিয়া তিনি আর দশ দিন ঐরূপ বিশ্রাম ও (শিষ্য ও অনুগামীদের সহিত) হালকা কথাবার্তায় অতিবাহিত করেন। এবং পরিশেষে ২০শে জুলাই তারিখে সকলের নিকট হইতে তাঁহার শেষ বিদায় লইয়া তিনি প্যারিস্ অভিমুখে রওনা হইলেন।

(২) প্যারিস কংগ্রেস ও ইওরোপ ভ্রমণ

১লা আগস্ট (১৯০০) তারিখে প্যারিসে পৌঁছিয়া স্বামীজী প্রথম মিঃ ও মিসেস্ লেগেটের অতিথি হইয়া থাকেন। তখন তাহাদের প্রদত্ত বহু ভোজের নিমন্ত্রণে যে সকল কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপক প্রভৃতি বিখ্যাত মনীষীগণ এবং ভাস্কর, চিত্রকর, গায়ক, অভিনেতা, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শিল্পীগণ যোগ দিতেন, তাহাদের সহিত আলাপ-আলোচনা ও চিন্তা-বিনিময়ের সুযোগে স্বামীজী তাহাদের মধ্যে তাঁহার বাণী প্রচার করিতে প্রয়াস পাইতেন। কিন্তু প্যারিসের ধর্মেতিহাসের কংগ্রেস বা মহাসভায় ইহা করিবার কোন উপায় ছিল না। কারণ, এই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল, বিভিন্ন ধর্ম সকল কিভাবে উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছে মাত্র তৎসম্বন্ধেই একটা অনুসন্ধান চালানো। এবং স্বামীজীর উপর নির্দেশ ছিল যে, বৈদিক ধর্ম প্রকৃতির উপাসনা হইতে উৎপন্ন কি না তৎসম্বন্ধে তিনি পাশ্চাত্যের প্রাচ্য ধর্মবিদ্‌গণের সহিত তর্ক করিবেন। এই কার্যের প্রস্তুতি হিসাবে তিনি দুই মাস ধরিয়া ফরাসী ভাষা শিক্ষা

করেন এবং প্যারিস ধর্মেতিহাস-কংগ্রেসে তিনি ঐ ভাষাতেই বক্তৃতা দেন। তবে অসুস্থতার জন্য তিনি ঐ সভায় দুইটির অধিক বক্তৃতা দিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রথম বক্তৃতাটি তিনি দেন একটি জার্মান প্রাচ্য-ধর্মবিদের বক্তৃতার প্রতিবাদে—শালগ্রামশিলা ও শিবলিঙ্গের উৎপত্তি সম্বন্ধে। এবং তাঁহার দ্বিতীয় বক্তৃতাটির প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল বিবিধ, যথা—হিন্দু, বৌদ্ধ ও ভারতে উৎপন্ন অপর সকল ধর্মেরই ভিত্তি হইতেছে বেদ, শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধের পূর্ববর্তী, গীতা মহাভারতের রচনাকালে বা তৎপূর্বে রচিত—পরে কখন নয়, ইত্যাদি। এই বক্তৃতাটির পরে অনেকেই স্বীকার করেন যে, তাঁহার ব্যক্ত মতই আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতবিদ্‌গণের মত।

প্যারিসে অবস্থানকালে স্বামীজীর বহু জগদ্‌বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও মনীষীগণের সহিত পরিচয় হয়। তন্মধ্যে তাঁহার স্বদেশীয় ডাঃ জে সি বোস্‌ও ছিলেন। ডাঃ বোস্ প্যারিস্ এক্সিবিসনের বিজ্ঞান-কংগ্রেসে যোগ দিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাঁহার একজন স্বদেশ-বাসীর এই সম্মান ও গৌরবে স্বামীজী বিশেষ গর্ব প্রকাশ করেন। এবং তাহাকে দেখাইয়া তিনি তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিদের বলিতেন, "ভারতের এই বৈজ্ঞানিকটি হইতেছেন বাঙ্গলার গর্ব ও গৌরব।"

জানা যায়, প্যারিসে স্বামীজী কিছুদিন মনীষী মিঃ জেরাল্ড নোবেলের সহিত ছিলেন। পরে প্যারিস কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হইলে, তিনি মিসেস্ ওলি বুলের আমন্ত্রণে বৃট্যানির (Brittany) অন্তর্গত লানিয়ন (Lannion) নামক স্থানে গিয়া তাহার অতিথি হন। এই সময়ে ভগ্নী নিবেদিতাও সেখানে মিসেস্ বুলের অতিথি হইয়া ছিলেন। স্বামীজী তাহাদের ও উপস্থিত অপর সকলকেই কতকগুলি কথোপকথনের দ্বারা অতি মূল্যবান শিক্ষা ও অপূর্ব আনন্দ দান করেন। এইভাবে কিছুদিন কাটিলে, ভগ্নী নিবেদিতা তাহার ভারতের মেয়ে স্কুলের কাজে ইংলণ্ডে চলিয়া গেলেন। এবং তাহার অল্প পরে স্বামীজী প্যারিসে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

প্যারিসে এইবার তিনি মনীষী মসিয়ে জুলস্ বয়েসের (M. Jules

Bois) অতিথি হইলেন এবং পূর্বের ন্যায় বিখ্যাত লোকদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা করিতে লাগিলেন। ইহাদের মধ্যে উক্ত জুলস বয়েস্, অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডিডস্, মিঃ হিরাম ম্যাক্সিম, মসিয়ে লয়সন্, ম্যাডাম সারা বার্ণহার্ড, ম্যাডাম কালভে ইত্যাদি বহু লোকের নাম জানা যায়। ইহারা ব্যতীত, প্যারিসে স্বামীজীর একটি বিশেষ সাহায্যকারী সঙ্গী ছিলেন মিস্ ম্যাক্লাউড। তিনি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া প্যারিসের দর্শনীয় ও বেড়াইবার স্থান সকলে লইয়া যাইতেন।

উক্তরূপে প্রায় তিনমাস ফ্রান্সে থাকিয়া, স্বামীজী ২৪শে অক্টোবর রাত্রে (Oriental Express Train'এ) পূর্ব ইওরোপ ও মিশর দেশ ভ্রমণে যাত্রা করিলেন। এই ভ্রমণে স্বামীজীর সঙ্গী ছিলেন মসিয়ে জুলস্ বয়েস্, ম্যাডাম কাল্ভে, মিস ম্যাকলাউড এবং মসিয়ে ও ম্যাডাম লয়সন। ম্যাডাম কালভে স্থির করিয়াছিলেন যে, ঐ বৎসর শীতকালে তিনি আর গান গাহিবেন না, সময়টা মিশর দেশের মনোরম আবহাওয়ায় কাটাইবেন। এবং স্বামীজী তাহার আমন্ত্রণে তাহারই অতিথি হইয়া যাইতেছিলেন। ২৫শে অক্টোবর সন্ধ্যায় তাঁহারা ভিয়েনায় পোঁছিলেন। এই শহরটিতে তিন দিন থাকিয়া, ২৮শে অক্টোবর তারিখে তাঁহারা পুনরায় (Oriental Express) ট্রেনে রওনা হইয়া হাঙ্গেরী, সার্ভিয়া, রুমানিয়া ও বুলগেরিয়ার মধ্য দিয়া ৩০শে অক্টোবর কনষ্ট্যান্টিনোপ্‌ল্ পোঁছিলেন। সেখানে কয়েক দিন থাকিয়া, তাহারা তথা হইতে ষ্টীমারে এথেন্‌স্ রওনা হইলেন। এথেন্‌সে চার দিন থাকিয়া, তাহারা ষ্টীমারে ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করিয়া মিশর দেশের প্রধান শহর ও বন্দর কায়রো পোঁছিলেন।

জানা যায়, উপরি-উক্ত ভিয়েনা প্রভৃতি সকল শহরেই তাঁহারা মিউজিয়ামাদি প্রতিষ্ঠান, প্রাচীন স্মৃতি-চিহ্ন সকল ও সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত স্থানগুলি সযত্নে দর্শন করেন। এবং এই ভ্রমণের সমস্ত পথে, প্রতি অপেক্ষার স্থানে, এমন কি, রেলওয়ে ওয়েটিং রুমেও স্বামীজী তাঁহার অপূর্ব কথাবার্তার দ্বারা তাঁহার সঙ্গীদের অতি মূল্যবান শিক্ষা ও

অপার আনন্দ দান করিয়াছেন। আর প্রত্যেক স্থানেই প্রাচীন কালের স্মৃতি-চিহ্ন সকল তিনিই ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাই আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, তিনি সব বিষয়েই মন দিয়াছেন, সব কিছুতেই কৌতুহল প্রকাশ করিয়াছেন এবং নিজ মনের আনন্দে সঙ্গীদের উপর অপার স্নেহ, শান্তি ও কল্যাণ বর্ষণ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছেন।

কিন্তু বাস্তবিক এই সময় তাঁহার দেহমন জুড়িয়া ছিল এক অতি দুর্বহ ও দুরপনেয় ক্লান্তি। শুধু শ্রমের ক্লান্তি নয়—পৃথিবীবাসের ক্লান্তি, সংসারের অর্থহীন ও অন্তহীন খেলায় অংশ গ্রহণ ও দায়িত্ব বহনে অপরিসীম বিরাগ। এখন স্বস্থানে ফিরিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল। আর সে মহাযাত্রার দিনও যে অদূরবর্তী, তাহা তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। তাই, এখন বিদায়—শুধুই বিদায়। এবং তাহারই অশ্রান্ত আহ্বানে তিনি সত্বর দেশে ফিরিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তদনুসারে, মাত্র অল্প কয়েক দিন মিশরে থাকার পর, তিনি হঠাৎ একদিন তাঁহার সঙ্গীদের জানাইলেন যে, তিনি অবিলম্বে ভারতে ফিরিবেন। সকলেই ব্যথিত হইলেন। কিন্তু কেহ তাঁহার ইচ্ছায় বাধা দিলেন না। এবং ম্যাডাম কাল্‌ভে একখানি প্রথম শ্রেণীর টিকিট কাটিয়া তাঁহাকে প্রথম জাহাজে ভারতে পাঠাইয়া দিলেন।

সাঁইত্রিশ

ভারতে প্রত্যাগমন ও মহাসমাধি

(৬ই/৭ই ডিসেম্বর, ১৯০০—৪ঠা জুলাই, ১৯০২)

কায়রো হইতে জাহাজ যথাসময়ে (৬ই বা ৭ই ডিসেম্বর) বম্বে পৌঁছিল। স্বামীজী তথা হইতে নিঃশব্দে (ও কাহাকেও কোন পরিচয় না দিয়া) ট্রেনে কলিকাতা রওনা হইলেন। ৯ই ডিসেম্বর রাত্রে হাওড়া ষ্টেশন হইতে তিনি যখন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে বেলুড় মঠে পৌঁছিলেন, তখন মঠের সাধুগণ আহার করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ও পুনরায় কাছে পাইয়া তাঁহারা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইলেন। সে রাত্রিতে স্বামীজী তাহাদের সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া নানা কথাবার্তা বলিলেন।

তবে তাঁহার এবার এই অকস্মাৎ ভারতে ফিরিবার প্রধান উদ্দেশ্য উপস্থিত চাপাই রহিল। তিনি ইতিপূর্বে ইওরোপ ও তাঁহার অতি প্রিয় আমেরিকাকে তাঁহার অন্তরের শেষ বিদায় জানাইয়া আসিয়াছেন। এখন বাকী শুধু তাঁহার প্রিয়তম জন্মভূমি ভারতবর্ষের ক্রোড় হইতে বিদায় লওয়া। এজন্য তিনি এখন ব্যাকুল। তাহা হইলেও দেখা যায়, এই মহাপ্রস্থানের জন্য তিনি (যে কারণেই হউক) দেড় বৎসরাধিক কাল অপেক্ষা করেন। এই সময়টার প্রায় সমস্ত অংশই তিনি অসুস্থতার মধ্যে কাটাইয়াছেন—অসুখ কখন বেশী, কখন কম। আর এই সময়ে তিনি কোন বড় বা নূতন কাজেও হাত দেন নাই। যাহা পূর্বে করিয়াছেন বা গড়িয়াছেন, শুধু তাহারই পরিপূরক বা পরিপোষক ছোট ছোট কাজে লিপ্ত হইয়াছেন। তাহা হইলেও, ঐ কাজই ছিল তাঁহার প্রাণ। কারণ, কোনও কাজ না করিয়া বাঁচিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। আমরা নিম্নে তাঁহার এই কালের ঐ কাজ ও জীবনধারা যথাসম্ভব সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম।

মিশর থাকিতেই স্বামীজী (কোন অলৌকিক দর্শন বা ইঙ্গিত হইতে) অনুমান করিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রিয় শিষ্য মিঃ সেভিয়ার হয়তো আর ইহধামে নাই। মঠে পৌঁছিয়া তিনি জানিলেন যে তাঁহার ঐ অনুমান সত্য। মিঃ সেভিয়ার ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর মায়াবতীতে দেহ রাখিয়াছেন। সংবাদটি শুনিয়া স্বামীজী মিসেস্ সেভিয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। তাই, মাত্র ১৮ দিন বেলুড় মঠে থাকিয়া, তিনি অসুস্থ শরীরে স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী সদানন্দকে লইয়া ২৭শে ডিসেম্বর মায়াবতী যাত্রা করিলেন। ট্রেনে কাঠগোদাম পর্যন্ত গিয়া (২৯শে ডিসেম্বর, ১৯০০), তিনি তথা হইতে ডাণ্ডিতে ৩রা জানুআরি তারিখে (১৯০১) মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে পৌঁছিলেন। সেখানে এক পক্ষকাল থাকিয়া তিনি মিসেস্ সেভিয়ারকে সান্ত্বনা দিলেন এবং তাঁহাকে ও আশ্রমের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীদের নানা বিষয়ে অনেক অমূল্য উপদেশ দান করিলেন। অল্প কিছুদিন পূর্বে আশ্রমে একটি ক্ষুদ্র মন্দির স্থাপিত হইয়াছিল। একদিন সকালবেলা ঐ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া স্বামীজী দেখিলেন যে, সেখানে ঠাকুরের ছবি রাখা হইয়াছে ও তাহা ফুল ও ধূপ, দীপ ইত্যাদির দ্বারা নিয়মিতভাবে পূজা করা হইতেছে। দেখিয়া তিনি তখন কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিলেন। কিন্তু সন্ধ্যাকালে সকলে যখন (শীতের জন্য প্রজ্জ্বলিত) অগ্নিকুণ্ডের নিকট একত্র হইয়াছেন, তখন তিনি তাহাদের বলিলেন, তিনি অদ্বৈত আশ্রমে ঠাকুরের পূজা অনুমোদন করিতে পারিতেছেন না। এবং ইহা করা আদৌ উচিত হয় নাই। এই আশ্রমে শুধু ধ্যান, চিন্তা ও অধ্যায়নাদিই চলিবে এবং যাহাতে আশ্রমবাসীদের উচ্চতম অদ্বয় তত্ত্বের শিক্ষা, ধারণা ও উপলব্ধি হয় তাহাই ইহার লক্ষ্য থাকিবে। দ্বৈতভাবের দুর্বলতা হইতে ইহাকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রাখিতে হইবে। স্বামীজীর এইরূপ অগ্নিময় কথা সকল শুনিয়া মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের সাধুগণ সেখানে ঠাকুরের পূজা বন্ধ করিলেন। এবং ক্রমে

এখনও দেখা যায়, রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের এই আশ্রমটিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি পূজার কোন চল নাই।

মায়াবতী এই সময়ে শীতকালের বরফে আচ্ছন্ন ছিল। এবং এখানকার দারুণ শীত স্বামীজীর দুর্বল ও অসুস্থ শরীরে সহ্য হইতেছিল না। তাহা ছাড়া, তিনি এখানে মাঝে মাঝে হাঁপানি রোগের মৃদু আক্রমণেও কষ্ট পাইতেছিলেন। তাই, ১৮ই জানুআরি তিনি মায়াবতী ত্যাগ করেন এবং পিলিভিটে ট্রেন ধরিয়া ২৪শে জানুআরি বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসেন।

এই সময়ে (তাঁহারই পূর্বের পরিচালনা ও ব্যবস্থায়) মঠে লোক তৈরীর জন্য নিয়মিতভাবে নানা বিষয়ের ক্লাস, ধ্যান-ধারণা ও শারীরিক ব্যায়ামাদি চলিত। স্বামীজীর গুরুভাইগণ নিজেরাও অধ্যয়ন, শিক্ষা ও শিক্ষণ দান এবং সেবাকার্য ইত্যাদিতে গুরুতর পরিশ্রম করিতেছিলেন। ইহা ছাড়া, তিনি পাশ্চাত্য দেশে থাকিতে কয়েকটি নূতন ব্রহ্মচারীও মঠে যোগ দিয়াছিলেন। ভারতে ফিরিয়া এই সকল দেখিয়া স্বামীজী যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে ছিলেন অসুস্থ। এবং মায়াবতী হইতে তিনি যখন বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন তাঁহার শরীরের অবস্থা এত খারাপ হইয়া পড়িল যে কোন শ্রমসাধ্য শারীরিক বা মানসিক কাজ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল। তাই, তিনি তখন কখনও মঠে, কখনও বা বলরামবাবুর বাড়ীতে থাকিয়া কয়েকটি হালকা ধরনের কাজ করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। জানা যায়, এই সময়ে তাঁহার কাজ ছিল হালকা অধ্যয়ন, পৃথিবীর নানাস্থান হইতে আগত চিঠি-পত্রের জবাব দেওয়া এবং তাঁহার নিকটে যাহারা থাকিতেন, তাহাদের মৌখিক ঘরোয়া ধরনের শিক্ষা ও শিক্ষণ দেওয়া।

এই ভাবে কিছু দিন গত হইলে, স্বামীজী ঢাকা ও পূর্ববঙ্গের অপর নানা স্থানে যাইবার জন্য বহু অনুরোধ-উপরোধপূর্ণ আমন্ত্রণ পত্র সকল পাইতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার গর্ভধারিণী জননীও পূর্ববঙ্গ ও আসামের তীর্থ সকল দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ

করিলেন। তাই, ১৮ই মার্চ তারিখে (১৯০১). স্বামীজী তাঁহার নিজ জননী ও কতিপয় সন্ন্যাসী শিষ্য সহ একটি বিরাট দল লইয়া ঢাকা রওনা হইলেন। পরদিন তিনি (নারায়ণগঞ্জ হইয়া) ঢাকা পৌঁছিলেন ও তথাকার রেল ষ্টেশনে তিনি বিপুলভাবে সংবর্ধিত হইলেন। সেখানে (অভ্যর্থনা সমিতির ব্যবস্থায়) তিনি জমিদার ৺মোহিনীমোহন দাসের রাজপ্রাসাদের ন্যায় বিরাট বাড়ীতে রহিলেন। ঢাকার অধিবাসীগণের অনুরোধে তিনি সেখানে দুইটি বক্তৃতা দেন। প্রথমটি তিনি দেন, জগন্নাথ কলেজে (বিষয়—'আমি কি শিখিয়াছি') এবং দ্বিতীয়টি দেন পোগোজ স্কুলের খোলা ময়দানে (বিষয়—'আমাদের জন্মলব্ধ ধর্ম')। দুইটি বক্তৃতাতেই ভয়ানক ভিড় হয় এবং প্রথমটি দিতে তাঁহার এক ঘণ্টা এবং দ্বিতীয়টি দিতে দুই ঘণ্টা সময় লাগে। বক্তৃতা দুইটি বিপুল হর্ষধ্বনির সহিত গৃহীত হয় এবং উহা শুনিয়া বহু লোক তাঁহার বাণী ও ভারত-কল্যাণের জন্য তাঁহার পরিকল্পনা জানিতে ও বুঝিতে প্রয়াসী হন।

ঢাকায় প্রতিদিন ও প্রায় প্রতিক্ষণ বহু লোক উপদেশের জন্য স্বামীজীর নিকট আসিত। তবে বিশেষভাবে বৈকালবেলার আসরে তিনি দুই-তিন ঘণ্টাকাল সমাগত লোকদের সহিত কথা বলিতেন। ঢাকায় থাকিতে বুদ্ধাষ্টমীর দিন তিনি তাঁহার মা ও শিষ্যগণকে লইয়া নৌকায় লাঙ্গলবাঁধ গিয়া ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করেন। অপর একদিন তিনি ঠাকুরের অতুলনীয় ভক্ত নাগ মহাশয়ের জন্মভূমি (নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্তী) দেওভোগ গ্রামে যান। তাহা হইলেও এইকালে তাঁহার শরীর আদৌ ভাল ছিল না। তিনি অনেক দিন হইতে বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছিলেন। তদুপরি ঢাকাতে হাঁপানি রোগের একটি তীব্র আক্রমণে তিনি কয়েকদিন খুবই শঙ্কাজনক অবস্থায় থাকেন। জানা যায়, এই সময়ে তিনি একদিন আচ্ছন্ন অবস্থায় স্বগতভাবে বলেন, "শরীরটা যদি যায়ই, তাতেই বা কি? জগৎকে যা দিয়েছি, তা পনর শ' বছর ধরে (তার কল্যাণ সাধনের) কাজ ক'রবার পক্ষে যথেষ্ট।"

কিছু সুস্থ হইয়া স্বামীজী ঢাকা হইতে চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ ও আসামের কামাখ্যা তীর্থ দর্শনে রওনা হন। চন্দ্রনাথ দর্শনান্তে কামাখ্যা যাইবার পথে তিনি গোয়ালপাড়া ও গৌহাটি কয়েক দিন করিয়া অপেক্ষা করেন। গৌহাটিতে তিনি তিনটি বক্তৃতা দেন। কামাখ্যায় গিয়া তাঁহার শরীর পুনরায় যারপরনাই খারাপ হইয়া পড়ে এবং তিনি স্বাস্থ্যোদ্ধারের নিমিত্ত (আসামের রাজধানী ও শৈলাবাস) শিলং যান। শিলং'এর চীফ কমিশনার স্বনামধন্য স্যার হেনরি কটন স্বামীজীর নাম-যশের সংবাদ রাখিতেন, তাই তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য উদ্‌গ্রীব হইলেন। তাহার অনুরোধে স্বামীজী শিলং'এ একটি বক্তৃতা দেন। এই সভায় স্থানীয় ইংরেজ রাজকর্মচারীগণ ও বহুসংখ্যক ভারতীয় শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। পরে স্যার হেনরি কটন স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন ও তাঁহাকে অসুস্থ দেখিয়া স্থানীয় সিভিল সার্জেনকে তাঁহার চিকিৎসায় নিযুক্ত করেন। ইহা ব্যতীত, তিনি প্রতিদিন স্বামীজীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সংবাদ লইতেন। তাহার সম্বন্ধে স্বামীজী বলিয়াছেন, 'স্যার হেনরি কটন ভারতের অভাব-অভিযোগ ও তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা বোঝেন এবং আন্তরিক-ভাবে তাহার কল্যাণার্থই কাজ করেন।'

শিলং'এ স্বামীজীর স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি না হওয়ায়, তিনি মে মাসের মধ্যভাগে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসেন এবং শিষ্য ও গুরুভাইদের অনুরোধে একাদিক্রমে সাত মাস কাল মঠে থাকিয়া বিশ্রাম লইবার প্রয়াস পান। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি পূর্ণ বিশ্রাম লওয়া তাঁহার ধাত-বিরুদ্ধ ছিল। তাই কোনও গুরু শ্রমে নিযুক্ত হইতে সক্ষম না হইলেও, তিনি এইকালে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ও সমাগত শিষ্যগণকে কথাবার্তার দ্বারা শিক্ষা দিতেন, ইচ্ছামত বই প্রভৃতি পড়িতেন ও যখন তখন গভীর ধ্যান বা চিন্তায় নিমগ্ন হইতেন। আবার, অনেক সময়ে তিনি গান গাহিতে ও শিষ্যগণকে গান শিখাইতে রত হইতেন। তাঁহার সেবক, শিষ্য ও গুরুভাইগণ তাঁহাকে রোগমুক্ত করিবার জন্য তাঁহাকে সর্বপ্রকারে সেবা ও শুশ্রূষা

করিতে ও সর্বোত্তম চিকিৎসাধীনে রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাহাদের ও ডাক্তারগণের নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহার উক্ত কাজগুলি চলিতেই থাকিত। আর ঐ সকল ব্যতীত, ভারতের নানা স্থান হইতে বহুলোক তাঁহার আশীর্বাদ ও উপদেশ লাভের জন্য বেলুড় মঠে আসিতেন। মঠের খুঁটিনাটি সমস্ত কাজই তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিতেন। এবং আমেরিকা, ইংলণ্ড ও ভারতে তাঁহার কার্যের অবস্থা ও পরিচালনার পরিপূর্ণ সংবাদ তিনি রাখিতেন।

অবশ্য এই সকলের সঙ্গে ইহাও দেখা যাইত, স্বামীজী সখের বশে মাঝে মাঝে মঠের বাগানের কাজ, রান্নার কাজ ও গরুগুলিকে দেখিবার কাজেও লিপ্ত হইতেন। এবং পূর্ববঙ্গ হইতে ফিরিয়া তিনি (মঠের "বাঘা" কুকুরটি ও কতকগুলি গরু সহ) কয়েকটি হাঁস, রাজহাঁস, মেষ, একটি হরিণ, একটি ছাগল, একটি সারস-পক্ষী ও একটি ছাগশিশু পুষিতে আরম্ভ করেন। স্বামীজী ছাগলটিকে "হংসী" ও ছাগ শিশুটিকে মট্রু নাম দেন। ইহাদের লইয়া এবং বিশেষভাবে মট্রুকে লইয়া, তিনি সময়ে সময়ে বালকের ন্যায় খেলা করিতেন। এই সকল আনন্দদায়ক হালকা কাজ ও খেলায় স্বামীজীর মন মাঝে মাঝে অল্প সময়ের জন্য (চিন্তামুক্ত হইয়া) কিছু বিশ্রাম লাভ করিলেও, তাহা তাঁহার প্রয়োজনের পক্ষে অতি অপ্রচুর ছিল। তাই তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিল। ক্রমে তাঁহার হাত-পায়ে শোথ দেখা দিল এবং তজ্জন্য তিনি হাঁটিতে কষ্ট বোধ করিতে লাগিলেন। ইহা ব্যতীত, তাঁহার স্নায়ুগুলির অবস্থা এমন হইল যে, সামান্য মাত্র স্পর্শেই তিনি তাঁহার শরীরে অতি তীব্র বেদনা অনুভব করিতেন। এবং নিদ্রা তাঁহাকে একেবারেই পরিত্যাগ করিল।

এই অবস্থায় জুলাই ও আগষ্ট মাসে যতটা সম্ভব বিশ্রাম লইয়া, সেপ্টেম্বর মাসে তিনি একটু ভাল বোধ করিতে লাগিলেন। এবং ঐ বৎসর অক্টোবর মাসে (শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতি লইয়া) তিনি মঠে প্রতিমায় ৺দুর্গাপূজা করিলেন। পরে ঐ বৎসরেই তিনি মঠে লক্ষ্মীপূজা ও কালীপূজাও করেন। ৺কালীপূজার পর স্বামীজী তাঁহার

মায়ের আদেশে অসুস্থ শরীরেই তাঁহার সহিত একদিন কালীঘাটে যান। বাল্যকালে তাঁহার একটি কঠিন অসুখের সময়ে তাঁহার মা মানত করিয়াছিলেন যে, ছেলে আরাম হইলে তিনি কালীঘাটে মা কালীর পূজা দিবেন ও ছেলেকে দিয়া মায়ের সম্মুখে মাটিতে গড়াগড়ি দেওয়াইবেন। কিন্তু পরে তিনি এই মানতের বিষয় একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এখন স্বামীজীকে পুনঃপুনঃ অসুস্থ হইতে দেখিয়া, তাঁহার ঐ মানতের কথা মনে পড়িল ও তিনি তাহাকে লইয়া কালীঘাটের কালীবাড়ীতে গেলেন। সেখানে স্বামীজী তাঁহার মায়ের নির্দেশে গঙ্গস্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে মন্দিরে গিয়া মা কালীর পায়ের সম্মুখে তিনবার মাটিতে গড়াগড়ি দিলেন। তারপর মা কালীর পূজা শেষ করিয়া তিনি সাতবার মায়ের মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন ও পরিশেষে নাটমন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বের অনাবৃত চত্বরে বসিয়া মায়ের সম্মুখে হোম করিলেন। ইহার পর এই কালেই স্বামীজী একদিন মঠের জঙ্গল সাফ ও জমি ভরাট করিতে নিযুক্ত কতকগুলি দরিদ্র সাঁওতাল স্ত্রী-পুরুষকে নিমন্ত্রণ করিয়া লুচি, তরকারি, দই ও মণ্ডা-মেঠাই ইত্যাদি দিয়া পরিতোষপূর্বক আহার করান ও পরে বলেন, "আজ আমার নারায়ণের ভোগ দেওয়া হল।"

অক্টোবর-নভেম্বর মাসে (১৯০১) স্বামীজী এই সকল কাজ করেন। তাহা হইলেও দেখা যায়, (সেপ্টেম্বর মাসে একটু ভাল থাকার পর) অক্টোবর মাস হইতে তাঁহার শরীর পুনরায় অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়ে। এবং কলিকাতার প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ সণ্ডার্স (Dr. Saunders) তাঁহাকে কোন প্রকার শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করিতে নিষেধ করিয়া পূর্ণ বিশ্রাম লইতে উপদেশ দেন। ইহারই কিছু পরে, স্বামীজী একরূপ শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। যখন একটু ভাল বোধ করিতেন, তখন তিনি সামান্য সামান্য দৈহিক শ্রমের কাজে নিযুক্ত হইতেন। কখন তিনি নিড়ানির দ্বারা মঠের জমির ঘাস পরিস্কার করিতেন, কখন ফল-ফুলের চারা লাগাইতেন, কখন বা তরি-তরকারির বীজ রোপন করিতেন।

এই অবস্থায়, ১৯০১ সনের ডিসেম্বর মাসের শেষার্ধে কলিকাতায় ভারতের জাতীয় মহাসভার (Indian National Congress) অধিবেশনকালে ভারতের নানা প্রদেশের প্রতিনিধিগণ স্বামীজীর সহিত দেখা করিতে আসিতেন এবং তিনি তাহাদের সহিত নানা বিষয় আলোচনা করিতেন। তৎপর ঐ ডিসেম্বর মাসেই জাপানের দুইজন প্রখ্যাত ও প্রভাবশালী মনীষী বেলুড় মঠ দর্শনে আসিয়া স্বামীজীকে জাপানের প্রস্তাবিত ধর্মমহাসভায় যোগ দিতে অনুরোধ করেন। ইহাদের মধ্যে একজন ছিলেন (একটি বৌদ্ধ মঠের মোহন্ত) রেভারেণ্ড ওডা এবং অপর জন ছিলেন জাপানের বিখ্যাত দার্শনিক ও শিল্পী মিঃ ওকাকুরা। তাহাদের আন্তরিকতা দেখিয়া স্বামীজী তাহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হন। মিঃ ওকাকুরা স্বামীজীর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া কয়েক দিন মঠে থাকেন। ঐ সময়ে তিনি তাঁহাকে তাহার সহিত বুদ্ধগয়ায় যাইতে অনুরোধ করেন। ইহার পূর্বেই স্বামীজী (স্বাস্থ্যোদ্ধারের নিমিত্ত) কিছু দিনের জন্য কাশী যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন ও সেখানে গোপাল লাল ভিলাতে তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। তাই, তিনি ওকাকুরার প্রস্তাবে রাজি হইলেন ও তৎপর তাহার সহিত ১৯০২ সনের জানুআরি মাসে রওনা হইয়া তিনি (তাঁহার জীবিতকালের শেষ জন্মদিনের সুপ্রভাতে) বুদ্ধগয়ায় পৌঁছিলেন। সেখান হইতে তাঁহারা একত্রে ৺কাশীধামে যান। কাশী পৌঁছিয়া মিঃ ওকাকুরা ভারতের বৌদ্ধ তীর্থ সকল দেখিতে রওনা হইয়া গেলেন এবং স্বামীজী পূর্ব-নির্দিষ্ট গোপাল লাল ভিলাতে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

কাশীতে সাধু, মোহন্ত, পণ্ডিত ও অপর বহু লোক স্বামীজীর সহিত প্রতিদিন দেখা করিতে আসিতেন। ভিঙ্গার মহারাজা তাঁহাকে কাশীতে একটি মঠ স্থাপন করিতে অনুরোধ করিয়া ঐ জন্য কিছু অর্থ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দেন। স্বামীজী তাহার প্রস্তাবে সম্মত হন ও পরে কলিকাতায় ফিরিয়া স্বামী শিবানন্দকে

ঐ মঠ স্থাপন করিতে একটি ব্রহ্মচারী সহ কাশীতে পাঠাইয়া দেন। ১৯০২ সনে স্বামীজীর দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে স্বামী শিবানন্দ ঐ মঠ (বর্তমান কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম) স্থাপন করেন।

কাশীতে স্বামীজী অনেক দিন বৈকালবেলা নৌকায় গঙ্গাবক্ষে বেড়াইয়াছেন। এবং কয়েক দিন গঙ্গাস্নান করিয়া বিশ্বনাথ ও অপর দেবদেবীর মন্দির দর্শন করিয়াছেন। স্বামীজীর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া কাশীর কয়েকটি বাঙ্গালী যুবক দলবদ্ধ হইয়া তথাকার আর্ত, দুঃস্থ, পরিত্যক্ত এবং রাস্তা-ঘাটে রোগে শায়িত যাত্রী, বিধবা ও বৃদ্ধ লোকদের সাহায্য করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তাহারা একটি ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাদের স্বল্প সম্বলের দ্বারা সম্ভবমত ঐ সকল লোকদের খাদ্য, আশ্রয় ও ঔষধাদি দিতেন এবং ডাক্তারের দ্বারা চিকিৎসাও করাইতেন। স্বামীজী কাশী আসিলে এই যুবকগণ তাঁহার সহিত দেখা করেন। স্বামীজী তাহাদের ঐ সেবাকার্যের বিবরণ শুনিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হন। এবং তাহাদের ঐ কার্যের উচ্চ প্রশংসা করিয়া, উহা চালাইয়া যাইবার জন্য তাহাদিগকে অগ্নিময় ভাষায় উৎসাহ দেন। তিনি তাহাদের ঐ সেবা প্রতিষ্ঠানের নাম (Poor Men's Relief Association) পরিবর্তন করিয়া নূতন "রামকৃষ্ণ হোম অব সার্ভিস" নাম দেন। এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রথম রিপোর্টের সহিত ছাপাইবার জন্য তিনি সাধারণের নিকট অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিয়া একখানি আবেদনপত্র লিখিয়া দেন। ঐ প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে ভারতবর্ষের একটি শ্রেষ্ঠ সেবা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। উহার বর্তমান নাম "রামকৃষ্ণ মিশন হোম অব সার্ভিস"।

এইভাবে কিছুকাল (জানুআরি-ফেব্রুআরি, ১৯০২) কাশীতে থাকিয়া স্বামীজী (ঠাকুরের জন্মোৎসবের অল্প পূর্বে) মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কাশীর শুষ্ক আবহাওয়ায় তাঁহার স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু মঠে ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার শরীর পুনরায় যারপরনাই খারাপ হইয়া পড়িল। শোথে পুনরায় পা ফুলিয়া উঠায় তিনি আর চলিতে পারিতেন না, তাই তাঁহার (দ্বিতলের শুইবার)

ঘরে আবদ্ধ হইয়া রহিলেন। ঐ অবস্থায় (মার্চ মাসে) তিনি তাঁহার ঘরের জানালার ভিতর দিয়া শেষবারের মত ঠাকুরের জন্মোৎসব দর্শন করিলেন। এদিকে তাঁহার অসুখের বাড়াবাড়ি দেখিয়া তাঁহার গুরুভাইগণ যারপরনাই উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। এবং তাহাদের একান্ত অনুরোধে তিনি কবিরাজী চিকিৎসা করাইতে রাজি হইলেন ও কলিকাতার বিখ্যাত কবিরাজ মহানন্দ সেনগুপ্তের চিকিৎসাধীনে রহিলেন। কবিরাজ তাঁহার জল ও নুন খাওয়া বন্ধ করিলেন। স্বামীজী দৃঢ়তার সহিত (সমগ্র এপ্রিল, মে ও জুন মাস ধরিয়া) ঐ নিয়ম পালন করিয়া চলিলেন। আর তৎসঙ্গে তিনি প্রস্তুত হইতে লাগিলেন তাঁহার শেষ বিদায় লইবার জন্য।

দেখা যায়, কাশী হইতে ফিরিবার পর তাঁহার জীবনের শেষ চারিমাস (মার্চ, এপ্রিল, মে ও জুন) তিনি প্রায় একই ভাবে কাটাইয়াছেন। কখন একটু সুস্থ, কখন শঙ্কাজনক অবস্থায়। যখন একটু সুস্থ তখন তিনি পূর্বের ন্যায় নানা কাজে মন দিয়াছেন সত্য। কিন্তু এ সবই ছিল তাঁহার বিদায়কালীন অনুষ্ঠান—সব কিছু দিয়া সকলের উপর তাঁহার শেষ আশীর্বাদ বর্ষণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কাশী হইতে ফিরিয়াই তিনি তাঁহার সমস্ত সন্ন্যাসী শিষ্যগণকে দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হন। তাই, যাহারা ভারতের অন্য কেন্দ্র বা পৃথিবীর অপর নানা দেশে ছিলেন, তাহাদের সত্বর মঠে আসিতে পত্র লেখা হইল। কিন্তু তাহাদের সহিত সাক্ষাতের অল্প পরে তিনি একদিন বলেন, "শিষ্যদের শিক্ষণ শেষ হলেই গুরুর কর্তব্য তাদের নিকট থেকে সরে যাওয়া। অন্যথায় তারা নিজেদের বিকশিত করতে পারে না।" তাঁহার এই বিদায়োন্মুখ মনোভাবের আর একটি প্রকৃষ্ট ইঙ্গিত এই। আমরা দেখিয়াছি ঠাকুর বলিতেন; 'নরেন যখন জানতে পারবে সে কে, তখন সে আর দেহ রাখবে না।' ভগ্নী নিবেদিতা লিখিয়াছেন, "স্বামীজীর দেহত্যাগের অল্প পূর্বে তিনি যখন একদিন তাঁহার গুরুভাইদের সহিত কথা বলিতেছিলেন, তখন তাহাদের একজন কথাপৃষ্ঠে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, 'তুমি কি জান্‌তে পেরেছ তুমি

কে ?' স্বামীজী গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ'। এই অপ্রত্যাশিত উত্তরে সকলেই স্তব্ধ হইলেন এবং কেহ আর তাঁহাকে ঐ বিষয়ে দ্বিতীয় প্রশ্ন করিতে সাহস করিলেন না।" ইহার পর দেখা যায়, জুন মাসের শেষের দিকে কোন জাগতিক বিষয়ে তাঁহার মত চাহিলে তিনি বলিতেন. "আমি আর এ সকল বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করতে পারি না। আমি মৃত্যুর পথে চলেছি।" ইহার পর মৃত্যুর দুইদিন পূর্বে (বুধবার) তিনি ভগ্নী নিবেদিতাকে বলেন, "আমার উপর এক মহা তপস্যা ও ধ্যান চেপে এসেছে, এবং আমি মৃত্যুর জন্যে তৈরী হচ্ছি।" কিন্তু এই সকল কথা বা ইঙ্গিত সত্ত্বেও কেহ তখন মনে করেন নাই যে তিনি সত্য সত্যই অতি সত্বর ইহধাম ত্যাগ করিয়া যাইবেন।

দেহত্যাগের সাতদিন পূর্বে তিনি তাঁহার একটি শিষ্যকে (স্বামী শুদ্ধানন্দ) একখানি পঞ্জিকা আনিতে বলেন। তাহা আনা হইলে, তিনি সেদিন উহার কয়েকখানি পাতা উল্টাইয়া উহা তাঁহার নিজের কাছেই রাখিয়া দেন। এবং পরে আরও কয়েক দিন তিনি ঐ পঞ্জিকাখানি মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করেন। তাঁহার দেহত্যাগের পরে তাঁহার গুরুভাই ও শিষ্যগণ বুঝিতে পারেন, ঐ পঞ্জিকা দেখিয়াই তিনি দেহত্যাগের দিন স্থির করিয়াছিলেন। মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে স্বামী প্রেমানন্দের সহিত মঠের ময়দানে বেড়াইবার সময়, তিনি তাহাকে মঠের দক্ষিণ পশ্চিমকোণে গঙ্গা-তীরবর্তী একটি জায়গা দেখাইয়া বলেন, "আমি দেহত্যাগ করলে দেহটাকে ঐখানে দাহ করিস্।"

তাঁহার জীবনের শেষের দিন (৪ঠা জুলাই, শুক্রবার), তিনি অতি প্রত্যুষে চা পান করিতে করিতে তাঁহার গুরুভাইদের সহিত পুরাতন দিনের অনেক কথা বলিলেন। তারপর বেলা ৮টার সময় তিনি ঠাকুরঘরে গিয়া সমস্ত দরজা জানালায় খিল দিয়া ধ্যানে বসিলেন। বেলা ১১টা পর্যন্ত ঐ ধ্যান চলিল। তারপর তিনি একটি শ্যামা-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে মন্দির হইতে বাহির হইলেন

ও উঠানে নামিয়া সেখানে পায়চারি করিতে লাগিলেন। তখন স্বামী প্রেমানন্দ তাঁহার কাছেই ছিলেন। তিনি হঠাৎ শুনিলেন, স্বামীজী অস্ফুট স্বরে বলিতেছেন, "বিবেকানন্দ যা করেছে, তা আর একটা বিবেকানন্দ যদি থাকত তো বুঝতো।"

অসুস্থতার জন্য স্বামীজীর আহারের পৃথক ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এই দিন দুপুরে তিনি সকলের সহিত একত্রে বসিয়া আহার করিলেন। এবং বলিলেন, তিনি খুবই সুস্থ বোধ করিতেছেন। তারপর মাত্র পনর মিনিট বিশ্রাম করিয়া বেলা ১টার সময় তিনি ব্রহ্মচারীদের ঘরে গিয়া তাহাদের সংস্কৃত ব্যাকরণের ক্লাসে আসিতে বলিলেন ও প্রায় তিন ঘণ্টাকাল তাহাদের পড়াইলেন। বিকালবেলা তিনি স্বামী প্রেমানন্দকে সঙ্গে করিয়া (বেলুড় বাজার পর্যন্ত গিয়া) প্রায় দুই মাইল পথ বেড়াইয়া আসিলেন।

মঠে ফিরিয়া স্বামীজী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলিলেন। পরে ধীরে ধীরে সন্ধ্যা আসিলে তিনি ক্রমশঃ গম্ভীর হইতে লাগিলেন। এবং সাতটার সময় আরতির ঘণ্টা বাজিলে তিনি তাঁহার নিজের ঘরে গিয়া সেবককে বাহিরে বসিতে আদেশ দিয়া বলিলেন, তিনি না ডাকা পর্যন্ত কেহ যেন তাঁহার ঘরে না আসে। তারপর তিনি জপমালা হাতে লইয়া গঙ্গার দিকে মুখ রাখিয়া জপে বসিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পরে সেবককে ডাকিয়া ঘরের সমস্ত জানালাগুলি খুলিয়া দিতে ও তাঁহার মাথায় বাতাস করিতে বলিলেন। তারপর তিনি মেঝের উপর পাতা বিছানায় বাঁ পাশ ফিরিয়া শুইয়া পড়িলেন। ঐ ভাবে ঘণ্টাখানেক ধ্যানমগ্ন থাকিয়া তিনি পাশ ফিরিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হাতখানা একটু কাঁপিয়া উঠিল এবং তিনি একটি গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাহার অল্প পরেই তিনি ঘুমন্ত শিশুর ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। ক্ষণপরে তিনি আর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন ও তৎসঙ্গে তাঁহার মাথাটি বালিশ হইতে গড়াইয়া পড়িল, তাঁহার দৃষ্টি ভ্রূমধ্যে নিবদ্ধ ও মুখে অপূর্ব জ্যোতিঃ।

তখন সময় রাত্রি ৯টা ১০ মিনিট, মঠের আহারের ঘণ্টা সবে মাত্র পড়িয়াছে।

সেবক ছুটিয়া নীচে আসিয়া সংবাদ দিলে, সকলে তাড়াতাড়ি স্বামীজীর ঘরে গেলেন। দেখা গেল নাড়ী নাই। তখনই ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ মজুমদারকে আনা হইল। তিনি নানা উপায়ে তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাস সঞ্চার করিতে চেষ্টা করিয়াও বিফল হইলেন। পরে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় তিনি বলিলেন, দেহে আর প্রাণ নাই। স্বামীজী মহাসমাধিমগ্ন হইয়াছেন।

পরদিন নানা দিক হইতে গাড়ীতে, নৌকায় বা পদব্রজে দলে দলে লোক সকল স্বামীজীকে শেষবারের মত দর্শন করিতে মঠে আসিতে লাগিলেন। পূর্বরাত্রে ডাক্তার তাঁহাকে মৃত বলিয়া গেলেও, তিনি হয়তো নির্বিকল্প সমাধিমগ্ন হইয়া আছেন এবং ঐ অবস্থা হইতে হয়তো পুনরায় নামিয়া আসিতে পারেন মনে করিয়া, তাঁহার দেহ অনেক বেলা পর্যন্ত তাঁহার ঘরে রাখা হইল। কিন্তু তাঁহার শরীর ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছে দেখিয়া তাঁহার গুরুভাইগণ বুঝিলেন তিনি দেহ ছাড়িয়াছেন। তখন কয়েকজন শিষ্যকে সংবাদটি ঘোষণা করিবার জন্য এবং অপর কয়েকজনকে উহা ভারত ও পৃথিবীর নানা স্থানে টেলিগ্রাফ করিবার জন্য কলিকাতায় পাঠানো হইল। এবং আরও কয়েকজন ফুল, চন্দন কাঠ ও ধূপ-ধূনা প্রভৃতি আনিবার জন্য প্রেরিত হইলেন। অল্প সময়ের মধ্যে মঠের বিস্তৃত জমি লোকে ভরিয়া গেল। এবং উহার চতুর্দিকে সুগন্ধি ধূপ-ধূনা পোড়ানো হইতে লাগিল। সকলেই স্বামীজীর শেষ দর্শনের জন্য ব্যাকুল।

বেলা দুইটার পরে তাঁহার দেহ খাটে করিয়া নীচে নামানো হইল। শেষকৃত্যাদি সমাপন হইলে দেহটি নূতন গৈরিক বস্ত্র ও পুষ্প-মাল্যাদির দ্বারা ভূষিত করিয়া, শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনির সহিত ধূপ, দীপ প্রভৃতির দ্বারা উহার আরতি করা হইল। তখন সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণ স্বামীজীর দেহ প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। তারপর একটি শোভাযাত্রা করিয়া "জয় শ্রীগুরু মহারাজ-

জীকী জয়", "জয় শ্রীস্বামী বিবেকানন্দ মহারাজজীকী জয়", ইত্যাদি ধ্বনি করিতে করিতে তাঁহার দেহ মঠের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে তাঁহার নির্দেশিত স্থানে আনা হইল। এবং সেখানে চন্দনকাষ্ঠাদির দ্বারা রচিত চিতায় তাঁহার দেহ রক্ষিত হইলে, মন্ত্র ও স্তব পাঠাদির সহিত চিতা প্রজ্বলিত করা হইল। গোধূলি শেষ হইবার পূর্বেই স্বামীজীর নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইয়া পঞ্চভূতে মিশিয়া গেল।

আটত্রিশ

উপসংহার

স্বামী বিবেকানন্দের মহান জীবন-কাহিনী আমরা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত লক্ষ করিয়াছি। জীবনটির স্থিতিকাল সংক্ষিপ্ত। কিন্তু উহার কর্ম ও চিন্তার বিস্তার সুবিপুল, গতিবেগ প্রচণ্ড। তাই, জীবন স্বল্পকালের হইলেও, উহার কাহিনী বিরাট। আমরা তাহা অতি সংক্ষিপ্তভাবেই বর্ণনা করিতে সক্ষম হইয়াছি।

ইহা ব্যতীত, এই জীবনটির যাহা সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান—উহার দিক-উজ্জ্বলকরা অতুলনীয় অবদান—তাহা আমাদের আলোচনার বাহিরে রাখিয়া, আমরা এই পুস্তকে শুধু জীবনটির অত্যাশ্চর্য বৃদ্ধি, বিকাশ ও কর্মপ্রবাহের একটা ছেদহীন পরিচ্ছন্ন বর্ণনা দিবার প্রয়াস পাইয়াছি। তাই আমাদের বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে পুস্তকখানির শেষে ঐ অবদান সম্বন্ধে একটি বড় অধ্যায় সংযুক্ত করিব। কিন্তু বইখানির কলেবর ইতিমধ্যে যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে উহা আর বৃদ্ধি করা সমীচীন মনে করা যাইতেছে না। বিশেষ, স্বামীজীর জীবনের ঐ অবদান সুবিরাট, ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের সর্বদিক-ব্যাপী ও যুগযুগান্তর-প্রসারী। তাই, তাঁহার ঐ বিপুল অবদানের কোন বর্ণনা দিবার চেষ্টা না করিয়া, আমরা শুধু নিম্নে ঐ সম্বন্ধে কয়েকটি মৌলিক কথা অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম।

১। প্রথমতঃ, আমরা দেখিয়াছি স্বামীজীর প্রথম জীবনের সর্বগ্রাসী লক্ষ্য ছিল সত্যলাভ—সেই চরম সত্য যাহার লাভে জীবনের সকল দুঃখ ও সকল সংশয়-সমস্যার অবসান হয়। এবং সেই সত্য লাভ করিয়া ও তাহারই অটল ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া তিনি জগৎকে তাঁহার বাণী শুনাইয়াছেন।

২। দ্বিতীয়তঃ, আমরা দেখিয়াছি উক্তরূপে সত্যলাভের দ্বারা নিজ জীবনের প্রয়োজন ও সমস্যা সকল মিটিয়া গেলে, তাঁহার প্রাণে জাগে ভারত ও জগৎ-কল্যাণ সাধনের এক প্রচণ্ড দুর্নিবার আবেগ, যাহা তাঁহাকে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত সারা পৃথিবী ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইয়াছে। ইহার মূলেও ছিল তাঁহার ঐ চরম সত্যের জাগ্রত অনুভূতি। তিনি দেখিতেন, যে সত্য তাঁহার অন্তরে, তাহাই প্রতিটি জীবের অন্তরে এবং এই জীব-জগৎ তাহারই বিকাশ। তাই, জীব বস্তুতঃ জীব নয়, চরম সত্য শিব, ব্রহ্ম বা আত্মা। এবং এই একত্বের অনুভূতিই তাঁহার অন্তরে জাগ্রত করে সকল জীবের প্রতি এক অপার অহেতুক প্রেম, করুণা ও সমবেদনা। ফলে, জীবের দুঃখ দূর করাই তাঁহার জীবনের ব্রত হয়।

৩। আর শুধু দুঃখ দূরই নয়, তিনি উহার মূলোৎপাটন করিতে প্রয়াসী হন। তিনি দেখিলেন, যে মানুষ সকল সুখদুঃখের অতীত চিরানন্দময়, নিত্যমুক্ত, অবিনাশী আত্মা, সে আত্মবিস্মৃত হইয়া জরা, ব্যাধি, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি সর্বদুঃখের আকর একটা স্বপ্নাচ্ছন্ন মায়িক অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া অপার দুঃখজ্বালা ভোগ করিতেছে। তাই, জীবের এই মহাদুঃখের মূলোৎপাটন করিবার জন্য তিনি তাহাকে সিংহগর্জনে শুনাইতে আরম্ভ করিলেন বেদান্তের মহা বার্তা—"মানুষ, তুমিই 'তাই'—সুখদুঃখ জন্মমৃত্যুর অতীত পরমাত্মা। ওঠো, জাগো, তোমার স্বরাজ্য লাভ কর এবং লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থামিও না।"

৪। আর ঐ মহা আহ্বানের সঙ্গে এবং ঐ একই মহাসত্যের উপর দাঁড়াইয়া তিনি জগৎকে দিয়াছেন তাঁহার মহাসমন্বয়ের মহা বাণী।

এইভাবে তিনি যাহা কিছু দিয়াছেন, তাহাই ঐ বেদান্তোক্ত চরম সত্যের উপর দাঁড়াইয়া দিয়াছেন। আর তৎসঙ্গে তিনি জগদ্বাসী সকলকেই পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন, "ব্যক্তি, সমাজ ও সমগ্র মানবকুলের কল্যাণের জন্য তোমরা তোমাদের ধর্মে, কর্মে ও জীবনের সব

কিছুতেই ঐ মহা সত্যের প্রয়োগ করিয়া চল। ইহার দ্বারাই রচিত হইবে নূতন জীবন ও নূতন সমাজ-সভ্যতা, যাহার মূলমন্ত্র হইবে ত্যাগ ও সেবা, মিলন ও সহযোগিতা, গ্রহণ ও সমন্বয়।"

কি সুন্দর, কি মোহময় ও চিত্তাকর্ষক স্বামীজীর এই বহুমুখী অবদান, তাহার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়া আমরা আমাদের কথা শেষ করিব। স্বামীজী তাঁহার কালিফোর্ণিয়ার একটি বক্তৃতা (The Way to the Realisation of Universal Religion) এইভাবে শেষ করেন—

"আমাদের মূলমন্ত্র হবে গ্রহণ, বর্জন নয়।···আমি মুসলমানের মসজিদে যাব; আমি খ্রীষ্টানদের গির্জায় যাব ও সেখানে ক্রুশের সামনে নতজানু হব; আমি বৌদ্ধ মন্দিরে যাব এবং সেখানে বুদ্ধ ও তাঁহার ধর্মের শরণ লব। আমি বনে যাব ও সেখানে সকলের হৃদয় উজ্জ্বলকরা আলো দর্শনের প্রয়াসী হিন্দুর সহিত ধ্যানে বস্‌ব।

"···বেদ, বাইবেল, কোরান এবং অপর সকল ধর্মপুস্তক (ঈশ্বরের বিরাট পুস্তকের) কতকগুলি পৃষ্ঠামাত্র এবং (ঐ পুস্তকের) আরও অনন্ত পৃষ্ঠা ওলটানো বাকী রয়েছে।···অতীতে যা কিছু ছিল তা আমরা গ্রহণ করব, বর্তমানের আলো আমরা উপভোগ করব এবং ভবিষ্যতে যা কিছু আসবে তার জন্যে হৃদয়ের সকল জানালা খুলে রাখব। অতীতের ঈশ্বরজ্ঞ পুরুষদের নমস্কার, বর্তমানের মহাপুরুষদের নমস্কার এবং ভবিষ্যতে যারা আসবেন তাদেরও নমস্কার।"

কথাগুলি শুনিতে শুনিতে মনে পড়ে সর্ব ধর্মের উপাসক শ্রীশ্রীঠাকুরকে ও তাঁহার (সিঁথির ব্রাহ্মসমাজে উক্ত) একটি প্রণাম-উক্তি —"ভাগবত-ভক্ত-ভগবান, জ্ঞানীর চরণে প্রণাম, ভক্তের চরণে প্রণাম; সাকারবাদী ভক্তের, নিরাকারবাদী ভক্তের চরণে প্রণাম; আগেকার ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে, ব্রাহ্মসমাজের ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে প্রণাম।"

বস্তুতঃ স্বামীজী বেদান্ত প্রচার করিয়া উহার এই মূর্ত বিগ্রহ শ্রীশ্রীঠাকুরকেও প্রচার করিয়াছেন। এবং এই যুগ-দেবতারই

বার্তাবহরূপে তিনি একটি অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় সারা পৃথিবী পরিক্রমা করিয়া গিয়াছেন। গিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার উদাত্ত কণ্ঠস্বর আজিও বাজে আমাদের প্রাণে, মনে, শ্রুতিতে। এবং যতদিন—যত শতাব্দী ধরিয়া তাঁহার কাজ চলিবে, ততদিনই তাহা বাজিতে থাকিবে।

ওঁ তৎ সৎ ওঁ।